ইমদাদুল হক মিলন

নূরজাহান

প্রথম পর্ব

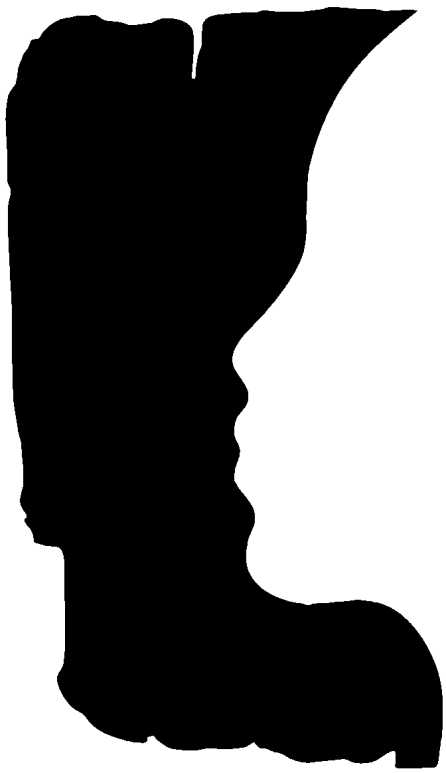

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা
anannyadhaka@gmail.com

উৎসর্গ

বেগম রোকেয়া স্মরণে

নূরজাহান

প্রথম পর্ব

শেষ হেমন্তের অপরাহ্ণ বেলায় উত্তরের হাওয়াটা একদিন বইতে শুরু করল।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘরের ছায়ায় বসেছে দবির গাছি, হাওয়াটা গায়ে লাগল। গা কাঁটা দিয়ে উঠল। পলকে দিশাহারা হল সে। বুকের ভিতর আনচান করে উঠল। যেন উত্তরের হাওয়া বুকের ভিতরও ঢুকে গেছে তার, ঢুকে তোলপাড় করে দিয়েছে সব।

খাওয়া দাওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে তামাক খায় দবির। রান্নাচালায় বসে গুছিয়ে, সুন্দর করে তামাক সাজিয়ে দেয় নূরজাহান আর নয়তো তার মা। নূরজাহান এখন বাড়িতে নাই। ঢাকা থেকে অনেক উঁচু হয়ে একটা সড়ক আসছে বিক্রমপুরের দিকে। মেদিনীমণ্ডলের পাশ দিয়ে মাওয়া হয়ে সেই সড়ক চলে যাবে খুলনায়। মাওয়ার পর রাজকীয় নদী পদ্মা। সড়কের মাঝখানে নিজের মহিমা নিয়ে ঠিকই দাঁড়িয়ে থাকবে পদ্মা, তবু এই সড়কের নাম ঢাকা খুলনা মহাসড়ক। বিরাট একটা কারবার হচ্ছে দেশগ্রামে। কত নতুন নতুন চেহারা যে দেখা যাচ্ছে! নানান পদের মানুষে ভরে গেছে গ্রামগুলি। একটা মাত্র সড়ক রাতারাতি বদলে দিচ্ছে বিক্রমপুর অঞ্চল। শহরের হাওয়া লেগে গেছে গ্রামে। যেন গ্রাম এখন আর গ্রাম না, যেন গ্রাম হয়ে উঠছে শহর। হাজার হাজার মানুষ লেগে গেছে সড়কের কাজে। ফাঁক পেলেই সেই সড়ক দেখতে চলে যায় নূরজাহান।

আজও গেছে।

নাকেমুখে দুপুরের ভাত গুঁজে শিশুর মতো ছটফট করে বাড়ি থেকে বের হয়েছে। মা বাবা কারও দিকে তাকিয়েও দেখেনি। এই ফাল্গুনে তেরো হবে নূরজাহানের। তাকে দেখায় বয়সের চেয়ে বড়। নূরজাহানের শরীর বাড়ন্ত। সীতারামপুরের হাতপাকা কারিগরদের বোনা ডুরেশাড়ি পরছে দুই বছর হল। শাড়ি পরলে বাড়ন্ত শরীরের কিশোরী চোখের পলকে যুবতী হয়ে যায়। তেমন যুবতী নূরজাহান হয়েছে দুই বছর আগে।

তবে মনের দিক দিয়ে, আচার আচরণ কথাবার্তা চালচলনে নূরজাহান শিশু। সারাক্ষণ মেতে আছে গভীর আনন্দে। গরিব গিরস্থ ঘরে জন্মে এত আনন্দ কোথায় যে পায় মানুষ!

বাড়ির উঠান পালান (আঙিনা) মাতিয়ে নূরজাহান যখন চলাফিরা করে মনে হয় না সে রক্ত মাংসের মানুষ। মনে হয় চঞ্চল পাখি।

কথায় কথায় খিলখিল করে হাসে নূরজাহান। নূরজাহানের হাসি হাসি মনে হয় না।

শেষ হেমন্তের অপরাহ্ণ বেলায় উত্তরের হাওয়াটা একদিন বইতে শুরু করল।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘরের ছায়ায় বসেছে দবির গাছি, হাওয়াটা গায়ে লাগল। গা কাঁটা দিয়ে উঠল। পলকে দিশাহারা হল সে। বুকের ভিতর আনচান করে উঠল। যেন উত্তরের হাওয়া বুকের ভিতরও ঢুকে গেছে তার, ঢুকে তোলপাড় করে দিয়েছে সব।

খাওয়া দাওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে তামাক খায় দবির। রান্নাচালায় বসে গুছিয়ে, সুন্দর করে তামাক সাজিয়ে দেয় নূরজাহান আর নয়তো তার মা। নূরজাহান এখন বাড়িতে নাই। ঢাকা থেকে অনেক উঁচু হয়ে একটা সড়ক আসছে বিক্রমপুরের দিকে। মেদিনীমণ্ডলের পাশ দিয়ে মাওয়া হয়ে সেই সড়ক চলে যাবে খুলনায়। মাওয়ার পর রাজকীয় নদী পদ্মা। সড়কের মাঝখানে নিজের মহিমা নিয়ে ঠিকই দাঁড়িয়ে থাকবে পদ্মা, তবু এই সড়কের নাম ঢাকা খুলনা মহাসড়ক। বিরাট একটা কারবার হচ্ছে দেশগ্রামে। কত নতুন নতুন চেহারা যে দেখা যাচ্ছে! নানান পদের মানুষে ভরে গেছে গ্রামগুলি। একটা মাত্র সড়ক রাতারাতি বদলে দিচ্ছে বিক্রমপুর অঞ্চল। শহরের হাওয়া লেগে গেছে গ্রামে। যেন গ্রাম এখন আর গ্রাম না, যেন গ্রাম হয়ে উঠছে শহর। হাজার হাজার মানুষ লেগে গেছে সড়কের কাজে। ফাঁক পেলেই সেই সড়ক দেখতে চলে যায় নূরজাহান।

আজও গেছে।

নাকেমুখে দুপুরের ভাত গুঁজে শিশুর মতো ছটফট করে বাড়ি থেকে বের হয়েছে। মা বাবা কারও দিকে তাকিয়েও দেখেনি। এই ফাল্গুনে তেরো হবে নূরজাহানের। তাকে দেখায় বয়সের চেয়ে বড়। নূরজাহানের শরীর বাড়ন্ত। সীতারামপুরের হাতপাকা কারিগরদের বোনা ডুরেশাড়ি পরছে দুই বছর হল। শাড়ি পরলে বাড়ন্ত শরীরের কিশোরী চোখের পলকে যুবতী হয়ে যায়। তেমন যুবতী নূরজাহান হয়েছে দুই বছর আগে।

তবে মনের দিক দিয়ে, আচার আচরণ কথাবার্তা চালচলনে নূরজাহান শিশু। সারাক্ষণ মেতে আছে গভীর আনন্দে। গরিব গিরস্থ ঘরে জন্মে এত আনন্দ কোথায় যে পায় মানুষ!

বাড়ির উঠান পালান (আঙিনা) মাতিয়ে নূরজাহান যখন চলাফিরা করে মনে হয় না সে রক্ত মাংসের মানুষ। মনে হয় চঞ্চল পাখি।

কথায় কথায় খিলখিল করে হাসে নূরজাহান। নূরজাহানের হাসি হাসি মনে হয় না।

ANWARBOI.COM

বর্ষার মুখে পদ্মার ফুলে ওঠা পানি যখন খাল বেয়ে গ্রামে ঢোকে, এক পুকুর ভরে পানি যখন অন্য পুকুরে ঢোকার জন্য উঁকিঝুকি মারে, জোয়ারে মাছের লোভে দুই পুকুরের মাঝখানে যখন সরু নালা কেটে দেয় চতুর মানুষ, সেই নালা ধরে এক পুকুরের পানি যখন গিয়ে লাফিয়ে পড়ে অন্য পুকুরে, পানির সঙ্গে পানির মিলন, তখনকার যে শব্দ, নূরজাহানের হাসি তেমন। শস্যের চকমাঠ ভেঙে নূরজাহান যখন ছোটে, নূরজাহানের ছুটে যাওয়াও জোয়ারে মাছের মতো, চোখের পলকে আছে, চোখের পলকে নাই।

এই মেয়ের দিকে তাকিয়ে কখনও কখনও মন উদাস হয় দবিরের। দুইদিন পর বিয়াশাদি হবে মেয়ের, কোথাকার কোন সংসারে গিয়ে পড়বে! কেমন হবে সেই সংসারের মানুষ! হাত পায়ে শিকল বেঁধে মেয়েটাকে হয়তো তারা খাঁচার পাখি বানিয়ে ফেলবে। ইচ্ছা করলেও সেই শিকল ছিঁড়তে পারবে না নূরজাহান। আস্তে ধীরে এই মুক্ত জীবনের কথা ভুলে যাবে, অভ্যস্ত হবে বন্দি জীবনে।

এইসব ভেবে মেয়েকে কখনও শাসন করে না দবির। মেয়ের মাকেও কিছু বলতে দেয় না। ফলে নূরজাহান আছে নূরজাহানের মতো।

আজ দুপুরের পর, নূরজাহান বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘরের ছায়ায় বসে নূরজাহানের কথাই ভাবছিল দবির আর তামাকের অপেক্ষা করছিল। তখনই উত্তরের হাওয়াটা এল। সারাবছর এই হাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে দবির। এক শীত শেষ হলে শুরু হয় আরেক শীতের অপেক্ষা। কবে আসবে শীতকাল, কবে বইবে উত্তরের হাওয়া। কবে উত্তরের হাওয়ায় গা কাঁটা দিবে দবির গাছির, বুকের ভিতর তোলপাড় করবে। কবে উত্তরের হাওয়ায় কানের কাছে শন শন করবে খাজুরের অবোধ পাতা। দেশগ্রামের রসবতী খাজুরগাছ ডাক পাঠাবে।

আজ সেই ডাক পেল দবির, পেয়ে দিশাহারা হল। এত যে প্রিয় তামাক, খাওয়া দাওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে তামাক না খেলে মনেই হয় না ভাত খাওয়া হয়েছে, খেয়ে পেট ভরেছে, সেই তামাকের কথা একদম ভুলে গেল। নিজের অজান্তে উঠে দাঁড়াল। খাজুরগাছ ঝুড়ার ঠুলই আছে ঘরের পশ্চিম দিককার খামের সঙ্গে ঝুলানো। তিনচার বছরের পুরানা জিনিস। তবু এখনও বেশ মজবুত। শীতকাল শেষ হওয়ার লগে লগে যত্ন করে খামের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে দবির। ঠুলইয়ের ভিতর থাকে ছ্যান কাটাইল আর কাঠের একটা আতুর (হাতুড়ি)। আতুর দেখবার দরকার হয় না। ছ্যান কাটাইল দেখতে হয়। বর্ষাকালে যখন নিঝুম হয়ে নামে বৃষ্টি, টানা দুইদিন তিনদিন যখন বৃষ্টি থামার নামগন্ধ থাকে না, তখন ছ্যান কাটাইলে জং ধরার সম্ভাবনা। দবির মাঝে মাঝেই তখন জিনিসগুলো বের করে। অলস ভঙ্গিতে বালিকাচায় ঘষে ঘষে ধার দিয়ে রাখে ছ্যান কাটাইলে।

বর্ষা শেষ হওয়ার পর তো আর কথাই নাই। কী শরৎ কী হেমন্ত দুইদিন একদিন পর পরই বালিকাচা নিয়ে বসে দবির। মন দিয়ে বালিকাচায় ঘষে যায় ছ্যান কাটাইল।

কাল বিকালেও কাজটা সে করেছে। তখন কে জানত একদিন পরই উত্তরের হাওয়ায় গিরস্তবাড়ির বাগান আঙিনা থেকে রসবতী খাজুরগাছেরা তাকে ডাক পাঠাবে!

ঘরে ঢুকে চঞ্চল হাতে ঠুলই নিল দবির। বাতার সঙ্গে গুঁজে রাখা মাজায় বান্ধার

AMARBOI.COM

(কোমরে বাঁধার) মোটা কাছি নিল। আদ্যিকালের উঁচু চকির (চৌকির) তলায় যত্নে রাখা আছে রসের দশ বারোটা হাঁড়ি, হাঁড়ির সঙ্গে বাঁশের বাখারির ভার। আশ্চর্য এক নেশায় আচ্ছন্ন মানুষের মতো জিনিসগুলো বের করল দবির। লুঙ্গি কাছা মেরে মাজার পিছনে, ডানদিকে ঝুলাল ঠুলই। তারপর ভারের দুইদিকে হাড়িগুলি ঝুলিয়ে, কাছি মাফলারের মতো গলায় প্যাঁচিয়ে ঘর থেকে বের হল। খানিক আগে ঘরের ছায়ায় বসে থাকা মানুষটার সঙ্গে এখনকার এই মানুষটার কোনও মিল নাই।

ঘর থেকে বের হয়েই বাড়ির নামার দিকে হাঁটতে শুরু করেছে দবির। তার মেয়ের মা হামিদা তখন হুঁকা নিয়ে ছুটে আসছিল, এসে দেখে স্বামী গাছ ঝুড়তে যায়। তামাক খাওয়ার কথা তার মনে নাই। ফ্যাল ফ্যাল করে নামার দিকে হেঁটে যাওয়া মানুষটার দিকে তাকিয়েছে সে। ঠিক তখনই উত্তরের হাওয়া এসে মুখে ঝাঁপটা দিল। অদ্ভুত এক আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল হামিদার। রসের দিন আইয়া পড়ছে, সংসারে অহন আর কোনও অভাব থাকবো না।

AMARBOI.COM

ঢোল কলমির গাঢ় সবুজ পাতায় লাল রঙের লম্বা একটা ফড়িং বার বার বসছে, বার বার উড়াল দিচ্ছে। ফড়িংটার দিকে তাকিয়ে নূরজাহান বলল, ও কনটেকদার সাব আপনেগো রাস্তা শেষ অইবো কবে?

লোকটার নাম আলী আমজাদ। সাব কনট্রাক্টে মাটি কাটার কাজ করছে। সড়কের দুইপাশ থেকে মাটি কেটে তুলছে তার শতখানেক মাটিয়াল। আলী আমজাদ লেবার কনট্রাক্টর। নিজের মাটিয়াল নিয়ে মূল কনট্রাক্টরদের কাছ থেকে কাজ নিয়ে করছে। লাভ ভালই থাকে। কাজ শুরুর কয়দিন পরই ফিফটি সিসির সেকেন্ডহ্যান্ড একটা মোটর সাইকেল কিনে ফেলেছে। সেই মোটর সাইকেল নিয়ে সাইটে আসে। গলায় জড়ানো থাকে খয়েরি রঙের মাফলার। রোদে পোড়া কালা কুচকুচা গায়ের রঙ। ছেলেবেলায় বসন্ত হয়েছিল। গালে মুখে বসন্তের দাগ রয়ে গেছে। চোখ কুতকুতা আলী আমজাদের, শরীর দশাসই। টেটরনের নীলপ্যান্ট পরে থাকে আর সাদাশার্ট। সড়কের কাজ পাওয়ার পর ভুঁড়ি বেড়েছে, পেটের কাছে শার্ট এমন টাইট হয়ে থাকে, দেখতে বিচ্ছিরি লাগে।

আলী আমজাদ ঘড়ি পরে ডানহাতে। কালা কুচকুচা লোমশ হাতে সাদা চেনের ঘড়ি বেশ ফুটে থাকে। আর তার সামনের পাটির একটা দাঁত সোনায় বাঁধানো। হাসলে মনে হয় অন্ধকার মুখের ভিতর কুপির আলো পড়েছে।

নূরজাহানের কথা শুনে হাসল আলী আমজাদ। তার হাসি দেখে আলী আমজাদকে কী জিজ্ঞাসা করেছিল ভুলে গেল নূরজাহান। আলী আমজাদের সোনায় বাঁধানো দাঁতের

দিকে তাকিয়ে বলল, সোনা দিয়া দাত বান্দাইছেন ক্যা? হাসলে মনে অয় ব্যাটারি লাগাইয়া হাসতাছেন।

মেয়েদের কাছে এরকম কথা শুনলে লজ্জায় যে কোনও পুরুষের মুখ নিচু হয়ে যাবে। আলী আমজাদের হল না। প্রথমে হেসেছিল নিঃশব্দে, ঠোঁট ছড়িয়ে। এবার খে খে করে হাসল। দাত না থাকলে বান্দামু না?

কথার লগে মুখ থেকে বিচ্ছিরি গন্ধ এল। দিনের পর দিন দাঁত না মাজলে এরকম গন্ধ হয় মুখে।

আলী আমজাদের মুখের গন্ধে উকাল (বমি) এল নূরজাহানের। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে থু করে ছ্যাপ (থুতু) ফেলল। আগের দুইটা প্রশ্নই ভুলে গেল। প্রচণ্ড ঘৃণায় নাক মুখ কুঁচকে বলল, ইস আপনের মুখে এমুন পচা গন্দ ক্যা? দাত মাজেন না?

একথায়ও লজ্জা পেল না আলী আমজাদ। আগের মতোই খে খে করে হাসল। তিনখান কথা জিগাইছো। কোনডার জব (জবাব) দিমু?

আলী আমজাদ কথা শুরু করার আগেই বেশ কয়েক পা সরে দাঁড়িয়েছে নূরজাহান। যেন তার মুখের গন্ধ নাকে এসে না লাগে। ব্যাপারটা বুঝল আলী আমজাদ। বুঝেও গা করল না। বলল, কইলা না?

কী কমু?

কোন কথার জব দিমু আগে?

আপনের যেইডা ইচ্ছা।

বুক পকেট থেকে ক্যাপস্টান সিগ্রেটের প্যাকেট বের করল আলী আমজাদ, ম্যাচ বের করল। সিগ্রেট ধরিয়ে হাওয়ায় ধুমা (ধোঁয়া) ছেড়ে বলল, কনটেকদারের কাম অইলো লেবারগো লগে কথা কওয়া, ধমক দেওয়া, গাইল দেওয়া। গাইল না দিলে লেবাররা কোনওদিন ঠিক মতন কাম করে না। যেই কনটেকদার লেবারগো যত বেশি গাইল দিতে পারবো সে তত বড় কনটেকদার। আমি সকাল থিকা লেবারগো গাইল্লাইতে থাকি। গাইল্লাইতে গাইল্লাইতে মুখে দুরগন্দ (দুর্গন্ধ) অইয়া যায়।

আবার সিগ্রেটে টান দিল আলী আমজাদ। খে খে করে হাসল। তয় মাইনষের মুখের গন্দও কইলাম কোনও কোনও মাইনষে পছন্দ করে।

ভুরু কুঁচকে আলী আমজাদের মুখের দিকে তাকাল নূরজাহান। কী?

হ। আমার মুখের এই গন্দ তোমার ভাবীছাবে বহুত পছন্দ করে।

নূরজাহান আবার ছ্যাপ ফেলল। আপনের বউ তো তাইলে মানুষ না। পেতনি, পেতনি।

বুড়া মতন একজন মাটিয়াল মাথায় মাটির য়োড়া (ঝুড়ি) নিয়ে সড়কের উপর দিকে উঠছিল। বোঝা তার তুলনায় ভারী। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যখন তখন উপুড় হয়ে পড়বে। হলও তাই। আলী আমজাদ আর নূরজাহানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হুড়মুড় করে পড়ল। লগে লগে ডানপা উঠে গেল আলী আমজাদের। জোরে লোকটার কোকসায় একটা লাথথি মারল। অশ্লিল একটা বকা দিল। বোবা জন্তুর মতো ভয়ে সিটকে গেল লোকটা। কাচুমাচু ভঙ্গিতে য়োড়া তুলে নামার দিকে নেমে গেল। কয়েক পলকের মধ্যে ঘটল ঘটনা। নূরজাহান বোবা হয়ে গেল।

AMARBOI.COM

আলী আমজাদ নির্বিকার ভঙ্গিতে নূরজাহানের দিকে তাকাল। হাসল। কী বোজলা? এইডা আসলে ছোট্ট একখান নমুনা দেখলা। তুমি সামনে আছিলা দেইক্কা মাত্র একটা লাথথি দিছি। তুমি না থাকলে লাইথথাইয়া নিচে হালাইয়া দিতাম শালারে। শালায় ইচ্ছা কইরা বোঝা হালাইছে। য্যান অর য়োড়ায় কম মাডি দেওয়া অয়। আরামে আরামে কাম করতে পারে। আমার লগে এই হগল চালাকি চলে না। এই পড়া আমি বহুত আগে পইড়া থুইছি।

ভিতরে ভিতরে রাগে তখন ফেটে যাচ্ছে নূরজাহান। বাপের বয়সী একটা লোককে এমন লাথথি মারতে পারে কেউ!

দাঁত কটমট করে নূরজাহান বলল, আপনে একটা খবিস। আপনে মানুষ না।

আমার জাগায় তুমি অইলে তুমিও এমুন করতা।

না করতাম না। যাগো দিলে রহম আছে তারা এমুন কাম করে না।

আমার দিলে নাই। নিজের লেইগা সব করতে পারি আমি।

করেন আপনের যা ইচ্ছা। আমি যাই।

নূরজাহান চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। আলী আমজাদ বলল, কই যাইবা?

গেরামে ঘুইরা ঘাইরা বাইত্তে যামু।

গেরামে ঘোরনের কাম কী? এহেনেই থাকো, তোমার লগে গল্প করি।

আপনে মনে করছেন রোজ রোজ সড়কে আমি আপনের লগে গল্প করতে আহি?

আলী আমজাদ সিগ্রেটে টান দিয়ে বলল, তয় ক্যান আহো?

আহি সড়ক দেকতে। মানুষজন দেকতে। সড়ক কতাহানি (কতখানি) অইলো না অইলো দেইক্কা যাই। কাইল থিকা আপনের সামনে আর আমু না। অন্য দিকদা সড়ক দেইক্কা যামু গা। আপনে মানুষ ভাল না।

আলী আমজাদ আবার হাসল। এইডা ঠিক কথা কইছো। আমি মানুষ ভাল না। বহুত বদ মানুষ আমি। যা ভাবি সেইটা কইরা ছাড়ি। টেকা পয়সা জান পরান কোনও কিছুর মায়া তহন আর করি না।

আলী আমজাদের কথা শুনে এই প্রথম ভয়ে বুক কেঁপে উঠল নূরজাহানের। অকারণে শাড়ি বুকের কাছে টানল। জড়সড় হয়ে গেল।

ব্যাপারটা খেয়াল করল আলী আমজাদ। হাসল। হাতের সিগ্রেট শেষ হয়ে আসছে। সিগ্রেটে শেষটান দিল। তারপর টোকা মেরে ফেলে দিল। আড়চোখে নূরজাহানের দিকে তাকিয়ে চটপটা গলায় বলল, এতক্ষুণ ধইরা নানান পদের প্যাচাইল পাড়লাম তোমার লগে, এইবার ভালকথা কই। তুমি আমার দাতের কথা জিগাইছিলা। সামনের একখান দাত পোকে খাইয়া হালাইছিলো। তহন নিজে কনটেকদারি করি না, ঢাকার বড় এক কনটেকদারের ম্যানাজারি করি। সে কইলো দাতের ডাক্তরের কাছে যাও, দাত ঠিক কইরা আহো। ডাক্তরের কাছে গেলাম, পোকড়া দাত হালাইয়া এই দাত লাগাইয়া দিলো। চাইছিলো পাথথরের দাত লাগাইতে, কম খরচে অইয়া যায়। আমি কইলাম, না সোনা দিয়াই বান্দান। তহন সোনার দামও কম আছিলো। আইজ কাইল তো সোনার বহুত দাম। এই দাতটাও দামি অইয়া গেছে।

AMARBOI.COM

আলী আমজাদ হাসল। এই দাত অহন আমার সম্পদ। বিপদ আপদে পড়লে খুইল্লা বেইচ্চা হালাইলে ভাল টেকা পামু।

নূরজাহান ঠাট্টার গলায় বলল, বেচনের আগে ভাল কইরা মাইজ্জা লইয়েন। এই রকম পচা গন্দ থাকলে সোনারুরা দাত কিনবো না।

আলী আমজাদ আবার হাসল। টেকা আর সোনার পচা গন্দরে গন্দ মনে করে না মাইনষে। হাতে পাইলেঐ খুশি অয়। পচা গন্দরে মনে করে আতরের গন্দ।

বাদ দেন এই সব প্যাচাইল। আমি যাই।

আড়চোখে আবার নূরজাহানকে দেখল আলী আমজাদ। কথা অন্যদিকে ঘুরাল। সড়কের কাম কবে শেষ অইবো হুইন্না যাইবা না?

নূরজাহান উদগ্রীব হয়ে আলী আমজাদের মুখের দিকে তাকাল। কবে?

দুইতিন মাসের মইধ্যে।

তারবাদে এই রাস্তা দিয়া গাড়ি চলবো?

তয় চলবো না? না চললে রাস্তা বানানের কাম কী?

কী গাড়ি চলবো?

বাস টেরাক মিনিবাস বেবিটেসকি।

আমগো গেরাম থিকা ঢাকা যাইতে কতক্ষুণ লাগবো?

ঘণ্টাহানি।

কন কী?

হ। তুমি ইচ্ছা করলে দিনে দুইবার ঢাকা গিয়া দুইবার ফিরত আইতে পারবা। অহন তো বিয়ানে মাওয়ার ঘাট থিকা লঞ্চে উটলে ঢাকা যাইতে যাইতে বিয়াল অইয়া যায়! ছিন্নগর (শ্রীনগর) দিয়া গেলে আরও আগে যাওন যায়। তয় হাটতে অয় অনেক।

আলী আমজাদের শেষ দিককার কথা আর কানে গেল না নূরজাহানের। আনমনা হয়ে গেল সে। স্বপ্নমাখা গলায় বলল, রাস্তা অইয়া যাওনের পর বাসে চইড়া ঢাকা যামু আমি। ঢাকার টাউন দেখনের বহুত শখ আমার।

বিকালবেলার চমৎকার এক টুকরা আলো এসে পড়েছে নূরজাহানের মুখে। সেই আলোয় অপূর্ব লাগছে মেয়েটিকে। তার শ্যামলা মিষ্টি মুখখানি, ডাগর চোখ, নাকফুল আর স্বপ্নমাখা উদাসীনতা কী রকম অপার্থিব করে তুলেছে তাকে। কুতকুতা চোখে মুগ্ধ হয়ে নূরজাহানকে দেখছে আলী আমজাদ। দেখতে দেখতে কোন ফাঁকে যে ভিতরে তার জেগে উঠতে চাইছে এক অসুর, খানিক আগেও আলী আমজাদ উদিস (টের) পায়নি।

ঠিক তখনই হা হা করা উত্তরের হাওয়াটা এল। সেই হাওয়ায় আলী আমজাদের কিছু হল না, নূরজাহানের কিশোরী শরীর অদ্ভুত এক রোমাঞ্চে ভরে গেল। কোনওদিকে না তাকিয়ে ছটফট করে সড়ক থেকে নামল সে। শস্যের চকমাঠ ভেঙে, ভ্রূণ থেকে মাত্র মাথা তুলেছে সবুজ ঘাসডগা, এমন ঘাসজমি ভেঙে জোয়ারে মাছের মতো ছুটতে লাগল।

AMARBOI.COM

মিয়াদের ছাড়া বাড়ির দক্ষিণের নামায় এলোমেলো ভাবে ছড়ানো আটখানা খাজুর গাছ। সব কয়টা গাছই নারীগাছ। পুরুষগাছ নাই একটাও। নারী গাছে খাজুর ধরে, পুরুষ গাছে ধরে না। দুইরকম গাছের রসও দুইরকম। পুরুষ গাছের রস হয় সাদা। তেমন মিঠা না। নারী গাছের রস হালকা লাল। ভারি মিঠা। ভরা বর্ষায় গাছগুলির মাজা পর্যন্ত ওঠে পানি। কোনও কোনও বর্ষায় মাজা ছাড়িয়ে বুক ছুঁই ছুঁই। এবারের বর্ষা তেমন ছিল না। গাছগুলির মাজা ছুঁয়েই নেমে গেছে। ফলে প্রায় প্রতিটা গাছেরই মাজার কাছে সচ্ছল গিরস্ত বউর বিছার মতো লেগে আছে পানির দাগ। বয়সের ভারে নৌকার মতো বেঁকা হয়েছে যে গাছটা, বর্ষার পানি তারও পিঠ ছুঁয়েছিল। সারাবর্ষা পিঠ ছুঁয়ে থাকা পানি ভারি সুন্দর একখানা দাগ ফেলে গেছে পিঠে। এই গাছটার সামনে দাঁড়িয়ে গভীর আনন্দে শ্বাস ফেলল দবির। বহুকাল পর প্রিয় মানুষের মুখ দেখলে যেমন হয়, বুকের ভিতর তেমন অনুভূতি। ভারের দুইদিকে ঝুলছে দশ বারোটা হাঁড়ি। সাবধানে ভারটা গাছতলায় নামাল সে। তারপর শিশুর মতো উচ্ছল হয়ে গেল। একবার এই গাছের গায়ে পিঠে হাত বুলায়, আরেকবার ওই গাছের। পাগলের মতো বিড়বিড় করে বলে, মা মাগো, মা সগল, কেমুন আছো তোমরা? শইল ভাল তো? কেঐর কোনও ব্যারাম আজাব নাই তো, বালা মসিবত নাই তো?

উত্তরের হাওয়ায় শন শন করে খাজুরডগা। সেই শব্দে দবির শোনে গাছেরা তার কথার পিঠে কথা বলছে। ভাল আছি বাজান, ভাল আছি। ব্যারাম আজাব নাই, বালা মসিবত নাই।

বর্ষাকাল শেষ হওয়ার লগে লগে খাজুরতলায় জন্মেছে টিয়াপাখি রঙের বাকসা ঘাস। কার্তিকের কোনও এক সময় সাতদিনের জন্য নামে যে বৃষ্টি, লোকে বলে কাইত্তানি, এবারের কাইত্তানির ধারায় রাতারাতি ডাঙ্গর (ডাগর) হয়েছে বাকসা ঘাস। এখন মানুষের গুড়মুড়া (গোড়ালি) ডুবে যাওয়ার মতন লম্বা। এই ঘাস ছেঁয়ে আছে মরা খাজুরডগায়। গাছের মাথায় মরে যাওয়ার পর আপনা আপনি খসে পড়েছে তলায়। পাতাগুলি খড়খড়া শুকনা কিন্তু কাঁটাগুলি শুকিয়ে যাওয়ার পরও কাঁটা। টেটার নালের মতো কটমট করে তাকিয়ে আছে। যেন তাদের আওতায় এলেই কারও আর রক্ষা নাই। খাজুরতলায় পা দিলেই সেই পা ফুটা করে শরীরে ঢুকবে, ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। বাড়ি ফিরে কাঁটাফোটা জায়গায় কাঁথা সিলাবার সুই দিয়ে যতই ঘাঁটাঘাঁটি করুক, খাজুরকাঁটার তীক্ষ্ণ ডগার হদিস মিলবে না। সে মিশে যাবে রক্তে। রগ ধরে সারা শরীর

AMARBOI.COM

ঘুরে বেড়াবে। দেড় দুইমাস পর বুক পিঠ ফুটা করে বের হবার চেষ্টা করবে। প্রচণ্ড ব্যথায় মানুষের তখন মরণদশা। কেউ কেউ মরেও।

সীতারামপুরের পুষ্প ঠাইরেনের (ঠাকরুনের) একমাত্র ছেলে মরেছিল খাজুরকাঁটায়। দুরন্ত স্বভাবের ছেলে ছিল। শীতের রাতে ইয়ার দোস্তদের নিয়া রস চুরি করতে গেছে কুমারভোগে। টর্চ মেরে মেরে এইগাছ থেকে হাড়ি নামায়, ওইগাছ থেকে নামায়। তারপর গাছতলায় দাঁড়িয়েই হাঁড়িতে চুমুক। কারও কিছু হল না, ফিরবার সময় ঠাইরেনের ছেলের ডানপায়ে ফুটল কাঁটা। এক দুইদিন ব্যথা হল পায়ে। ঠাইরেন নিজে সুই দিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করল ছেলের পা। কাঁটার দেখা পেল না। চার পাঁচদিনের মাথায় মা ছেলে দুইজনেই ভুলে গেল কাঁটার কথা। দেড়মাস পর এক সকালে পিঠের ব্যথায় চিৎকার শুরু করল ছেলে। কোন ফাঁকে শরীর অবশ হয়ে গেছে। না নড়তে পারে, না বিছানায় উঠে বসতে পারে। শবরীকলা রঙের মুখখানা সরপুটির পিত্তির মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ঠাইরেন কিছু বুঝতে পারে না, দিশাহারা হয়ে ডাক্তার কবিরাজ ডাকে, ফকির ফাকরা ডাকে। হোমিপ্যাথি এলাপ্যাথি, পানিপড়া, তাবিচ কবচ, হেকিমি আর কতপদের যে টোটকা, কিছুতেই কিছু হল না। পাঁচদিন ব্যথায় ছটফট করল ছেলে তারপর বিয়ানরাতের দিকে মারা গেল। পিঠের যেখানটায় ব্যথা হচ্ছিল সেই জায়গা থকথক করছে। দেখেই বোঝা যায় মাংসে পচন ধরেছে। লাশ নাড়াচাড়ার সময় চাপ পড়েছিল, চামড়া ফেটে গদ গদ করে বের হল রোয়াইল ফলের মতো রং, এমন পুঁজ। সেই পুঁজের ভিতর দেখা গেল মাথা উঁচু করে আছে একখানা খাজুরকাঁটা।

এটা অনেককাল আগের কথা। তারপর থেকে দেশগ্রামে আর রস চুরি হয় না। লোকে মনে করে খাজুরগাছ মা জননী। মা যেমন বুকের দুধ সন্তানের জন্য লুকিয়ে রাখে, খাজুরগাছ তেমন করে রস লুকিয়ে রাখে গাছির জন্য। গাছি ছাড়া অন্য কেউ এসে বুকে মুখ দিলে কাঁটার আঘাতে মা জননী তার এসপার ওসপার (এপার ওপার) করেন, জান নেন। নাহলে এই যে এতকালের পুরানা গাছি দবির, বয়স দুইকুড়ির কাছাকাছি, গাছ ঝুড়ছে পোলাপাইন্যা কাল (বালক বয়স) থেকে, কই তার পায়ে তো কখনও কাঁটা বিনলো (ফুটল) না! গাছ ঝুড়তে উঠে কাঁটার একটা খোঁচাও তো সে কখনও খায়নি!

এইসব ভেবে নৌকার মতো বেঁকা হয়ে থাকা গাছটার পায়ের কাছে বিনীত ভঙ্গিতে দুইহাত ছোঁয়াল দবির। তিনবার সালাম করল গাছটাকে। বহুকাল পর মায়ের কাছে ফিরে আসা আদুরে ছেলে যেমন করে ঠিক তেমন আকুলি বিকুলি ভঙ্গিতে গাছটাকে তারপর দুইহাতে জড়িয়ে ধরল। বিড়বিড় করে বলল, মা মাগো, আমার মিহি (দিকে) ইট্টু নজর রাইখো মা। গরিব পোলাডার মিহি নজর রাইখো। এই দুইন্নাইতে তোমরা ছাড়া আমার মিহি চাওনের আর আছে কে! তোমরা দয়া না করলে বাচুম কেমতে! আমি তো হারা বচ্ছর তোমগো আশায় থাকি। তোমগো দয়ায় দুই তিনটা মাস সুখে কাটে। আরবছর (আগের বছর) ভালই দয়া করছিলা। এইবারও তাই কইরো মা। মাইয়া লইয়া, মাইয়ার মারে লইয়া বছরডা য্যান খাইয়া পইরা কাটাইতে পারি।

AMARBOI.COM

ছনুবুড়ির স্বভাব হচ্ছে সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ানো আর টুকটাক চুরি করা, মিথ্যা বলা। কূটনামিতে তার কোনও জুড়ি নাই। বয়স কত হয়েছে কে জানে! শরীরটা কঞ্চির ছিপআলা বড়শিতে বড়মাছ ধরলে টেনে তোলার সময় যেমন বেঁকা হয়ে যায় তেমন বেঁকা হয়েছে। যেন এই শরীর তার নরম কঞ্চির ছিপ, মাটির তলায় লুকিয়ে থাকা বয়স নামের মাছ ছিপের সঙ্গে শক্ত সুতায় ঝুলিয়ে দেওয়া বড়িশির আধার (টোপ) গিলে ভাল রকম বেকায়দায় পড়েছে। দিশাহারা হয়ে মাছ তাকে টানছে, টেনে বেঁকা করে ফেলছে। কোন ফাঁকে ভেঙে পড়বে ছিপ কেউ জানে না। টানাটানি চলছে। আর এই ফাঁকেই নিজের মতো করে জীবনটা চালিয়ে যাচ্ছে ছনুবুড়ি। এই গ্রাম সেই গ্রাম ঘুরছে, এই বাড়ি ওই বাড়ি ঘুরছে, চুরি করছে, মিথ্যা বলছে। এর কথা ওকে, ওর কথা তাকে, ছনুবুড়ি আছে ভাল। মাথায় পাটের আঁশের মতো চুল, মুখে একটাও দাঁত নাই, একেবারেই ফোকলা, শরীরের চামড়া খরায় শুকিয়ে যাওয়া ডোবানালার মাটির মতো, পরনে আঠাইল্লা (এঁটেল) মাটি রঙের থান, হাতে বাঁশের একখানা লাঠি আর দুইচোখে ছানি নিয়ে কেমন করে যে এইসব কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ছনুবুড়ি, ভাবলে তাজ্জব লাগে।

আজ দুপুরে সড়কের ওপাশে, পুব পাড়ার জাহিদ খাঁর বাড়ি গিয়েছিল ছনুবুড়ি। জাহিদ খাঁর ছেলের বউদের অনুনয় করে দুপুরের ভাতটা সেই বাড়িতেই খেয়েছে। খেয়ে ফিরার সময় ছানিপড়া চোখেই দেখতে পেয়েছে বাড়ির পিছন দিককার তরিতরকারির বাগানে বাইগন (বেগুন) ধরেছে, টমাটু (টমেটো) ধরেছে। এখনও ডাঙ্গর হয়নি বাইগন, টমাটুগুলি ঘাসের মতো সবুজ, লাল হতে দিন দশবারো লাগবে। তবু চুরির লোভ সামলাতে পারেনি। বার দুই তিনেক এদিক ওদিক তাকিয়ে টুকটুক করে দুই তিনটা বাইগন ছিঁড়েছে, চার পাঁচটা টমাটু ছিঁড়েছে। তারপর কোনওদিকে না তাকিয়ে হাঁটা দিয়েছে।

সার্থকভাবে চুরি করবার পর মনে বেদম ফুর্তি থাকে ছনুবুড়ির। এমনিতেই দুপুরের খাওয়াটা হয়েছে ভাল, ঢেকিছাটা লক্ষ্মীদিঘা চাউলের ভাত আর খইলসা (খলিসা) মাছের সালুন (ঝোল), তার ওপর সার্থক চুরি, ছনুবুড়ির স্বভাব জেনেও বাড়ির কেউ উদিস পায়নি, পথে নেমে বুড়ি আহল্লাদে একেবারে আটখানা। বাইগন টমাটু টোপরে (কোচর) নিয়ে সন্তানের মতো আঁকড়ে ধরে রেখেছে বুকের কাছে আর হাঁটছে খুব দ্রুত। চুরি করে বের হয়ে আসার পর ছনুবুড়ি হাঁটে একেবারে ছেমড়ির (ছুঁড়ির) মতো। বয়স নামের জুয়ান মাছটা টেনে তখন তাকে কাবু করতে পারে না।

AMARBOI.COM

আজও পারেনি। দ্রুত হেঁটে প্রথমে ছনুবুড়ি গেছে হাজামবাড়ি। সেই বাড়িতে বসে অনেকক্ষণ ধরে তামাক খেয়েছে। টোপরের বাইগন টমাটু একহাতে আঁকড়ে ধরা বুকের কাছে, অন্যহাতে নারকেলের ছোট্ট হুকা। গুরগুর গুরগুর করে যখন তামাক টানছে, হাজাম বাড়ির মুরব্বি সংসার আলী হাজামের সাইজ্জা মেয়ে (সেজোমেয়ে) তছি বুকের কাছে আঁকড়ে ধরা টোপরটা দেখে ফেলল। তছি জন্মপাগল। মাথার ঠিক নাই, কথাবার্তার ঠিক নাই। যুবতী বয়স কিন্তু চালচলন শিশুর মতো। ফলে তছির নাম পড়েছে তছি পাগলনী।

ছনুবুড়ির টোপরের দিকে তাকিয়ে তছি পাগলনী বলল, ও মামানি, টুপরে কী তোমার?

সংসার আলী হাজামের ছেলেমেয়েরা ছনুবুড়িকে ডাকে বুজি, তছি পাগলনী ডাকে মামানি। এই ডাকটা শুনলে পিত্তি জ্বলে যায় বুড়ির। কোথায় বুজি কোথায় মামানি! আত্মীয় অনাত্মীয় যে কাউকে বুজি ডাকা যায়, মামানি ডাকা যায় না। মামানি ডাক শুনলেই মনে হয় হাজামরা বুড়ির আত্মীয়। হাজামরা ছোটজাত। তারা কেমন করে ছনুবুড়ির আত্মীয় হয়! গ্রামের লোকে শুনলে বলবে কী! ছনুবুড়ির শ্বশুরপক্ষকে হাজাম ভাববে না তো! আজকালকার লোকেও মানুষের অতীত নিয়ে কম ঘাঁটায় না। যা না তাই খুঁচিয়ে বের করা স্বভাবের মানুষের কী আকাল আছে গ্রামে!

এসব ভেবে রেগে গেল বুড়ি। তছি যে জন্মপাগল ভুলে গেল। হুকা নামিয়ে ছ্যানছ্যান করে উঠল। ঐ ছেমড়ি, তুই আমারে মামানি কচ ক্যা লো? আমি তর কেমুন মামানি?

ছনুবুড়ির সামনে, মাটিতে শিশুর মতো ল্যাছড় প্যাছড় করে বসল তছি। মাথা ভর্তি উকুন, সারাক্ষণ মাথা চুলকাচ্ছে। এখনও চুলকাল। চুলকাতে চুলকাতে বলল, কেমুন মামানি কইতে পারি না। টুপরে কী কও? কই থিকা চুরি করলা?

একে মামানি ডাক তার উপর চুরির বদলাম (বদনাম), মাথা খারাপ হয়ে গেল বুড়ির। হাতের লাঠি নিয়ে তড়বড় করে উঠে দাঁড়াল। গলা তিন চারগুণ চড়িয়ে ফেলল। আমি চোর? আমি চুরি করি, আ! হাজামজাতের মুখে এতবড় কথা?

ছনুবুড়ির রাগ চিৎকার একদম পাত্তা দিল না তছি। বুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে হি হি করে হাসল। মাথা চুলকাতে চুলকাতে নির্বিকার গলায় বলল, তুমি তো চোর। ঐ মেন্দাবাড়ির ঝাকা থিকা হেদিনও তো তোমারে কহি (চিচিঙ্গা, এক ধরনের সবজি) চুরি করতে দেখলাম। আইজ কী চুরি করছো? দেহি টুপরে কী?

এবার চুরির কথা পাত্তা দিল না বুড়ি, মামানি নিয়ে পড়ল। ইচ্ছা কইরা মামানি কও আমারে! আত্মীয় বানাইছো, হাজাম বানাইছো আমারে! ওই মাগি, আমি কি হাজামজাতের বউঝি যে আমারে তুই মামানি কচ!

তছির বড়ভাই গোবেচারা ধরনের আবদুল তার বউ আর তছির মা তিনজনেই তখন বুড়িকে থামাবার চেষ্টা করছে। অর কথায় চেইত্তেন না বুজি। ও তো পাগল, কী থুইয়া কী কয়!

কীয়ের পাগল, কীয়ের পাগল ও? ভ্যাক ধরছে। অরে আমি দেখছি না তারিক্কার লগে ইরফাইন্নার ছাড়ায় ঢুকতে। পাগল অইলে এই হগল বোজেনি?

AMARBOI.COM

এ কথায় তছির মা ভাই স্তব্ধ হয়ে গেল। ভাইর বউ মুচকি হেসে মাথায় ঘোমটা দিল তারপর পশ্চিমের ছাপড়ায় গিয়ে ঢুকল।

তছি ততক্ষণে বুঝে গেছে তার নামে বদকথা বলছে ছনুবুড়ি। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। পাগল বলে কথার পিঠে কথা বলতে শিখেনি সে, এক কথা শুনে অন্য কথা বলে। এখনও তাই করল। বিলাইয়ের (বিড়ালের) মতন মুখ খিঁচিয়ে বলল, ঐ বুড়ি কূটনি, চুন্নিবুড়ি, মামানি ডাকলে শইল জ্বলে, না? হাজামরা মানুষ না! ছোডজাত? তয় এই ছোডজাতের বাইত্তে আহো ক্যা? তাগো বাইত্তে তামুক খাওনের সময় মনে থাকে না তারা হাজাম! হাজামরা যেই উক্কায় তামুক খায় হেই উক্কায় মুখ দেও কেমতে? হাজামগো থালে বইয়া দেহি কতদিন ভাত খাইয়া গেছো! বাইর অও আমগো বাইত থন, বাইর অও। আর কুনোদিন যদি এই বাইত্তে তোমারে দেহি, টেংরি ভাইঙ্গা হালামু।

তছির মারমুখা ভঙ্গি দেখে ছনুবুড়ি থেমে গেছে। মুখে কথা আটকে গেছে তার। গো গো করতে করতে হাজামবাড়ি থেকে নেমেছে। দক্ষিণের চক ভেঙে হাঁটতে শুরু করছে। এখন শেষ বিকাল। এসময় বাড়ি ফিরা উচিত। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনালে হাঁটা চালায় অসুবিধা। ছানিপড়া চোখে এমনিতেই ঝাপসা লাগে দুনিয়া। তার উপর যদি হয় আন্ধার, পথ চলতে আছাড় উঠা খাবে ছনুবুড়ি। এই বয়সে আতুড় লুলা হয়ে বেঁচে থাকার অর্থ নাই। ঘরে বসে জীবন কাটাবার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।

এসব ভেবে দ্রুত পা চালাচ্ছে বুড়ি, মিয়াদের ছাড়া বাড়ির দক্ষিণে এসেছে, বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে যে লম্বা টোসখোলা ঝোপ সেই ঝোপের এই পাশ থেকে হেলেপড়া খাজুর গাছটার পায়ের কাছে ছানিপড়া চোখেও একটা লোককে বসে থাকতে দেখল। দেখে থমকে দাঁড়াল। গলা টানা দিয়ে বলল, কেডারে খাজুরতলায়?

খাজুরতলা থেকে সাড়া এল। আমি।

আমি কে?

মানুষটা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। হাসি মুখে আমোদের গলায় বলল, কও তো কেডা?

বয়সী মাথা কাঁপাল ছনুবুড়ি। গলাডা চিনা চিনা লাগে!

তারপরই উচ্ছল হল। চিনছি। দউবরা। ঐ দউবরা খাজুরতলায় কী করচ তুই? গাছ ঝুড়ছ?

না অহনও ঝুড়ি না। যন্ত্রপাতি লইয়া বাইর অইছি। আইজ ঘুইরা ঘাইরা গাছ দেকতাছি। কাইল পশু ঝুড়ুম। তুমি আইলা কই থিকা?

জাহিদ খার বাইত্তে দাওত খাইতে গেছিলাম।

কেডা দাওত দিলো তোমারে?

জাহিদ খার বড়পোলায়। পোলার বউডা এত ভাল, দুই একদিন পর পরঐ দাওত দিয়া খাওয়ায় আমারে। কয় আমারে বলে অর মার মতন লাগে।

ছনুবুড়ির কথা শুনে হাসল দবির। কী খাওয়াইল?

ভাত আর চাইর পাচপদের মাছ। ইলসা, টাটকিনি, গজার। বাইং মাছও আছিলো। আমি খাই নাই। শ্যামেষ দিল দুদ আর খাজুরা মিডাই (খেজুরে গুড়)।

AMARBOI.COM

অহন খাজুরা মিডাই পাইলো কই?

আরবছরেরডা মুড়ির জেরে (টিনে) রাইক্কা দিছিলো।

তারপর দবিরকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বলল, বউডা এত ভাল বুজলি দউবরা, গাছের বাইগন, বিলাতি বাইগন (টমেটো) অহনও ডাঙ্গর হয় নাই, হেইডিও কতডি ছিড়া আমার টুপরে দিয়া দিল। কইলো বাইত্তে লইয়া যান। হাজামবাড়ি গেছি তামুক খাইতে, আমার টুপুর দেইক্কা তছি পাগলনী কয় কি, কী চুরি করলা! ক আমি বলে চোর!

ছনুবুড়ির স্বভাব জানার পরও তছির উপর রাগল দবির। বলল, বাদ দেও পাগল ছাগলের কথা। অর কথায় কী যায় আহে!

ছনুবুড়ি খুশি হয়ে বলল, অর কথায় কী যায় আহে। তুই একখান কাম করিচ বাজান, পয়লা দিনের রস আমারে ইট্টু খাওয়াইচ।

খাওয়ামুনে। দুই চাইরদিন দেরি অইবো।

ক্যা, দেরি অইবো ক্যা?

গাছ ঝুইড়া ঠিল্লা পাততে সময় লাগবো না! উততইরা বাতাসটা আইজ খালি ছাড়ছে। আইজ থিকা রস আইছে গাছে। বেবাক কিছু ভাও করতে দুই তিনদিন লাগবো। পয়লা দিনের রস খাওয়ামুনে তোমারে, চিন্তা কইরো না। অহন খালি দেহ উততইরা বাতাসটা কেমনে ছাড়ছে! এইবারের রস দেখবা কেমুন মিডা অয়!

বিকাল শেষের উত্তরের হাওয়ায় ছনুবুড়ির পাটের আঁশের মতো চুল তখন ফুর ফুর করে উড়ছে। এই হাওয়ায় মনে কোনও পাপ থাকে না মানুষের, কূটনামী থাকে না কিন্তু ছনুবুড়ির মনে সামান্য কূটবুদ্ধি খেলা করতে লাগল।

AMARBOI.COM

রান্নাচালার সামনে আমকাঠের পিঁড়ি পেতে বসেছে মজনু। সকাল বেলার রোদ পাকা ডালিমের মতো ফেটে পড়েছে চারদিকে। এই রোদের একটা টুকরা ছিটকে এসে পড়েছে মজনুর ছোটখালা মরনির মুখের একপাশে। মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেছে তার। মজনু অপলক চোখে তাকিয়ে আছে খালার মুখের দিকে। দুনিয়াতে এই একটা মাত্র মুখ যে মুখের দিকে তাকিয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে সে। আর কিছুর দরকার হয় না।

মাটির খোলায় মরনি এখন চিতইপিঠা ভাজছে। চুলার ভিতর চুটপুট চুটপুট করে জ্বলছে নাড়ার আগুন। রোদ নাড়ার আগুন মিলেমিশে হেমন্ত সকালের শীতভাব বিদায় করে দিয়েছে। রান্নাচালার চারপাশে বেশ একটা আরামদায়ক ভাব। লগে আছে

চিতইপিঠা ভাজার গন্ধ। সব মিলিয়ে ভারি সুন্দর পরিবেশ। এই পরিবেশের কিছুই উদিস পাচ্ছে না মজনু। সে তাকিয়ে আছে খালার মুখের দিকে।

খোলা থেকে লোহার চটায় যত্ন করে প্রথম পিঠাটা তুলল মরনি। হাতের কাছে রাখা ছোট্ট বেতের ডালায় পিঠা নিয়ে মজনুর দিকে এগিয়ে দিল। নে বাজান খা। চিতই পিডা গরম গরম না খাইলে সাদ (স্বাদ) লাগে না।

কথা বলতে বলতে মজনুর দিকে তাকিয়েছে মরনি, তাকিয়ে দেখে মজনু একদৃষ্টে চোখে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। মরনি অবাক হল। কীরে, এমতে চাইয়া রইছস ক্যা?

মজনু চোখ নামাল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এমতেঐ। অনেকদিন তোমারে দেহি না তো, ইট্টু দেকলাম।

একথায় মরনির বুকের ভিতর উথাল দিয়ে ওঠে মায়ের আদর। সে যে মজনুর মা না, খালা একথা তার মনে থাকে না। ডানহাত বাড়িয়ে মা যেমন কখনও কখনও তার সন্তানকে আদর করে ঠিক সেই ভঙ্গিতে মজনুর গালে মুখে একটা হাত বুলাল। আমিও তো তরে দেহি না বাজান। আমিও তো তর মুখটা কতদিন দেহি না। তরে না দেইক্কা এতদিন আমি কোনওদিন থাকি নাই।

আমি থাকছি?

না তুইই বা থাকবি কই থিকা! তর মায় মইরা যাওনের পরঐত্তো তরে আমি কুলে কইরা লইয়াইলাম। তারপর থিকা তুই আমার পোলা। আইজ সতরো আঠরো বচ্ছর তরে আমি চোখখের আঐল (আড়াল) করি নাই।

একথায় অদ্ভুত এক অভিমানে বুক ভরে গেল মজনুর। মুখ গোমড়া করে বলল, তাইলে অহন করছো ক্যান? ক্যান আমারে খলিফা (দর্জি) কামে দিলা? ক্যান আমারে টাউনে পাডাইলা?

মরনি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। খাদা (মাটির যে পাত্র ভাতের ফ্যান ঢালার কাজে ব্যবহৃত হয়) থেকে পাতলা করে গোলানো চাউলবাটা নারকেলের আইচায় (মালা) তৈরি হাতায় পরিমাণ মতো তুলে যত্ন করে ঢালল গরম খোলায়। লগে লগে ফুলে ফেপে চিতইপিঠার আকার ধরল জিনিসটা। মজনুর মুখের দিকে আর তাকাল না মরনি। অসহায় গলায় বলল, না পাডাইয়া কী করুম ক! তুই বড় অইছস না? কাম কাইজ হিগবি না? নাইলে খাবি কী কইরা?

এতদিন খাইছি কী কইরা? তুমি কি আমারে কুনোদিন না খাওয়াইয়া রাখছো?

না রাখি নাই। নিজে না খাইয়া রইছি, তরে রাখি নাই। সংসারের অভাব তরে বোঝতে দেই নাই।

তারপরই মরনির খেয়াল হল ডালায় তোলা পিঠা ঠাণ্ডা হচ্ছে। মজনু এখনও মুখে দেয়নি। চঞ্চল হল সে। কীরে খাচ না? ঠাণ্ডা অইলে ভাল্লাগবো না। তাড়াতাড়ি খা। আরেকখান পিডা অইয়া গেল। কুনসুম (কোন সময়) খাবি?

ডালা থেকে পিঠা তুলে কামড় দিল মজনু। নিজে না খাইয়া থাইক্কা আমারে যে তুমি খাওয়াইতা এইডা কইলাম আমি জানতাম খালা।

AMARBOI.COM

মজনুর কথায় চমকে উঠল মরনি। কেমতে জানতি?

আমি দেকছি না! কোনও কোনওদিন দোফরে কোনও কোনওদিন রাইত্রে আমারে ভাত দিয়া তুমি সামনে বইয়া থাকতা। আমি জিগাইতাম, ও খালা তুমি খাইবা না? দোফর অইলে তুমি কইতা আমি অহনতরি (এখন পর্যন্ত) নাই (গোসল। স্নান) নাই। না নাইয়া ভাত খাওন যায়! তুই পোলাপান মানুষ, তর খিদা লাগছে না? তরে খাওয়াইয়া নাইতে যামু আমি, তারবাদে খামুনে। তুই খাইয়া ল। আমি কইলাম বোঝতাম, যেডু (যতটুকু) ভাত তুমি রানছো, অডু (অতটুকু) ভাতে আমগো দুইজনের অইবো না। নিজে না খাইয়া, আমি যেন রাইতে খাইতে পারি এর লেইগা দুইফইরা ভাত তুমি রাইক্কা দিতা।

মজনু আবার পিঠায় কামড় দিল। আরেকটা পিঠা তখনই খোলা থেকে নামাল মরনি। মজনু তা খেয়াল করল না। পিঠা মুখে বলে স্বর জড়িয়ে যাবে জেনেও বলল, রাইতে দেকতাম আমার ভাত শেষ তাও তুমি খাইতে বহো না। এইমিহি চাও, ঐমিহি চাও, টুকুর টাকুর কাম কর। আমি জিগাই, ও খালা ভাত খাও না ক্যা? তুমি কইতা, তুই খাইয়া হুইয়া পর। আমি খাইয়া দাইয়া থাল বাসন ধুইয়া হুমুনে। ঘুমা, তুই ঘুমা বাজান। আমি হুইয়া পরতাম তয় ঘুমাইতাম না। তুমি মনে করতা আমি ঘুমাইয়া গেছি। আমি কইলাম ঘুমাইতাম না। কুপির আলোয় তোমারে দেকতাম হইলদা রঙ্গের একখান মগে কইরা ঢুকুস ঢুকুস কইরা পানি খাও। তারবাদে কুপি নিবাইয়া আমার পাশে হুইয়া একখান নিয়াস (দীর্ঘশ্বাস) ছাড়তা। খালাগো, ঐ নিয়াসটা আমার বুকে আইয়া লাগতো। আমি বোজতাম হারাদিন তুমি না খাইয়া রইছো। দোফরে খাও নাই, রাইতে খাও নাই। ভাদ্দর আশ্বিন মাসে কয়দিন পর পর ঐ ভাত খাওন লইয়া আমার লগে এমন চালাকি করতা তুমি।

খোলায় আবার পিঠা দিল মরনি। চালাকি না বাজান। আমি না খাইয়া রইছি দেকলে তুই খাইতে চাবি না, তর ভাত আমারে ভাগ কইরা দিবি। দোফরে ভাত খাইয়া পেড না ভরলে হারাডা বিয়াল তুই ছটফট ছটফট করবি, রাইতে পেড না ভরলে ঘুমাইতে পারবি না, এর লেইগা তরে বোজতে দিতাম না। ভাদ্দর আশ্বিন মাসে দেশ গেরামে আকাল লাগে। আমগো লাহান গরিব গিরস্ত ঘরের ধান চাউল ফুরাইয়া যায়। একটা দুইডা মাস বড় কষ্ট যায় গিরস্তের। কাতি আগন মাসে হেই কষ্ট আর থাকে না। তহন ধান কাডা লাগে। বাড়ির উডান কাডা ধানে ভইরা যায়, ডোল (গোলা) ভইরা যায়।

তারপরই মজনুকে আবার তাড়া দিল মরনি। কীরে এত আস্তে আস্তে খাইতাছস ক্যা? মাত্র একখান পিডা শেষ করছস!

মজনু বলল, এই পিডাডা তুমি খাও। পরেরডা আমি খামুনে।

আমি খামু না বাজান।

ক্যা?

পিডা অইবো সাত আষ্টখান। অহন যেই কয়ডা পারছ তুই খাবি, যেই কয়ডা থাকবো দোফরে খাবি।

AMARBOI.COM

দোফরে ভাত খামু না?

না। একখান কুকুরার ছাও (মুরগির বাচ্চা)বাইন্দা থুইছি। তর পিডা খাওয়া অইলে জব কইরা দিছ। ঝাল কইরা কসাইয়া দিমু। গরম গরম কসাইন্না গোস্ত দিয়া চিতইপিডা তুই খুব পছন্দ করছ। তর আহনের কথা হুইন্না এই ছাওডা আমি ঠিক কইরা রাকছি। খা।

আগে কখনও এমন হত না। আগেও কোনও কোনওদিন এমন করেই কথা বলত মরনি। মজনু ছোট ছিল, সারাক্ষণ ছিল খালার আঁচলের তলায়, চোখের সামনে। খালা যে গভীর মমতার গলায় প্রতিটি কথা বলে মজনু কখনও তা খেয়াল করত না। চারমাস খালাকে ছেড়ে আছে। দূরে থাকার ফলে, এতদিন পর, কাল বিকালে ফিরে আসার পর খালার প্রতিটা কথায়, প্রতিটা আচরণে বুকের ভিতর কেমন করে উঠছে মজনুর, চোখ ছলছল করে উঠছে। এখনও উঠল। এই চোখ খালাকে সে দেখতে দিল না। অন্যদিকে মুখ ঘুরাল।

মরনি বলল, এই বচ্ছর ধানপান ভাল অয় নাই। যতদিন যাইতাছে খেতের ধান কমতাছে। তরে খলিফা কামে দিয়া ভালঐ করছি। নাইলে তিন ওক্ত (বেলা) তরে আমি কী খাওয়াইতাম? কেমনে বাচাইয়া রাখতাম তরে!

মজনু ভুলে গেল আগের দিনের মতো, ভাদ্র আশ্বিন মাসের অভাবী দিনের মতো আজ সকালেও নিজে না খেয়ে মজনু দুপুরে খাবে বলে চিতইপিঠা তুলে রাখছে খালা। পরের পিঠাটা খেতে খেতে সে বলল, ক্যা, নিজেগো জমিন নিজে চুইতাম (চাষ করতাম) আমি! বিলে চৌদ্দগণ্ডা জমিন আমগো। বর্গা না দিয়া নিজে চুইলে (চষলে) যেই ধান পাইতাম নিজেরা বচ্ছর খাইয়াও বেচতে পারতাম। হেই টেকায় তোমার একজোড়া কাপোড় অইতো। আমার লুঙ্গি পিরন অইতো। মাছ তরকারির তো আকাল নাই দেশ গেরামে। খালে পুকঐরে ম্যালা মাছ। হেই মাছ ধরতাম আমি। খেতখোলা থিকা সেচিশাক, কলমিশাক টোকাইয়া আনতা তুমি। বাড়ির নামায় কদু কোমর বাইগন বিলাতিবাইগন (টমেটো) সব সময়ঐত্তো বোনো তুমি। ধান ওডনের পর সউষ্যা (সরিষা) বোনতাম খেতে। বচ্ছরের তেলডা অইয়া যাইতো। বাইত্তে চাইরখান খাজুরগাছ। গাছি মামায় গাছ ঝুইড়া যেই রস দেয়, বচ্ছরের মিডাই অইয়া যায়। কিননের মইদ্যে কিনতে অইতো খালি নুন। নুন বহুত হস্তা জিনিস। দুইজন মাইনষের কয় টেকার নুন লাগে বচ্ছরে?

মজনুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল মরনি। গিরস্তালি করা বহুত কষ্টের বাজান। এত কষ্ট তুই করতে পারতি না।

ক্যান পারুম না? আমি বড় অইছি না?

কত বড় আর অইছস!

আঠরো বচ্ছর বয়স অইছে, কম মনে করোনি তুমি?

খোলা থেকে আরেকটা পিঠা নামাল মরনি। নীল রঙের ময়লা নোংরা শাড়ির আঁচলে মুখ মুছল। চুলার পারে বসলে শীতকালেও মুখে গলায় ঘাম জমে। সেই ঘাম মুছল মরনি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হ তর বয়স পুরা আঠরো বচ্ছর। কোন ফাকে যে

AMARBOI.COM

দিন গেলগা উদিস পাইলাম না। আমার খালি মনে অয় এই তো হেদিনকার কথা। তর মার বিয়ার আষ্ট মাস পর আমার বিয়া অইলো। আমি খালি এই সংসারে আইছি, তর মার আহুজ পড়বো (বাচ্চা হবে)। তগো বাইত্তে গেলাম বুজির লগে থাকনের লেইগা। আহুজ পড়নের সময় দেশ গেরামের বউঝিরা বাপের বাইত্তে আহে, মা বইনের কাছে থাকে। আমগো তো মা বাপ আছিলো না, ভাই আছিলো না। তিন বইন আমরা মামাগো সংসারে বড় অইছি। আমি যহন খুব ছোড তহন বড়বুজির বিয়া অইছে। জামাই থাকে ফরিদপুর। বড়বুজি ফরিদপুর গেল গা। পাচছয় বচ্ছরে একবার নাইওর আইতো। তর মায় মরণের আগে, আমার বিয়ার সময় বড়বুজিরে শেষ দেখছি। তার বাদে হে আর আহে নাই। তর মার মরণের সমবাদ পাইয়াও আহে নাই।

কথা বলতে বলতে উদাস হয়ে গেল মরনি। খোলায় শেষ পিঠা বসিয়েছে। এখন পিঠার দিকেও খেয়াল নাই।

রান্নাচালার পিছনে ঝাপড়ানো একটা জামগাছ। সকালবেলার রোদে চকচক করছে জামপাতা। একটা টুনটুনি পাখি লাফাচ্ছে গাছের ডালে। এই ডাল থেকে ওই ডালে যায় টুনটুনি, ওই ডাল থেকে সেই ডালে। জামগাছটার দিকে তাকায় মরনি ঠিকই পাখিটা দেখেও দেখে না। মনের ভিতর অতীত দিনের স্মৃতি। চোখ জুড়ে অতীত দিনের প্রিয় মানুষের মুখ।

উদাসীন গলায় মরনি বলল, বড়বুজির চেহারাডাও অহন আর মনে নাই। তর মায় মইরা সইরা গেছে, বড়বুজি বাইচ্চা থাইক্কাও সইরা গেছে। হেয়ও অহন মরা। তিন বইন একলগে গলা প্যাচাপেচি কইরা বড় অইছিলাম, দিন গেল, তিনজন তিনমিহি সইরা গেলাম। একজন মইরা সরলো আর দুইজন বাইচ্চা। আতকা বড়বুজিরে দেকলে আমি মনে অয় হেরে অহন চিনতে পারুম না। হেয়ও চিনতে পারবো না আমারে। সময় এমুন কইরা আপনা মাইনষেরে পর বানাইয়া দেয়, অচিন বানাইয়া দেয়!

তিনখান পিঠা খেয়ে টিনের গেলাসে ঢক ঢক করে এক গেলাস পানি খেল মজনু। শেষ পিঠাটা তখনই খোলা থেকে নামাল মরনি। দেখে মজনুর মনে পড়ল সকালবেলা এখনও কিছু মুখে দেয়নি খালা। পিঠা ভেজে তাকে খাওয়াচ্ছে আর ফাঁকে ফাঁকে গল্প করছে। তিনখান পিঠা খেয়ে তার পেট ঢোল আর খালা এখনও খালি পেটে। ব্যস্ত গলায় মজনু বলল, তুমি দিহি কিছু খাইলা না?

মরনি হাসল। বিয়ানে আমার কিছু খাইতে ইচ্ছা করে না। খিদা লাগে না।

আমার লগে মিছাকথা কইয়ো না খালা। বিয়ানে মাইনষের খিদা না লাইগ্যা পারে?

পারে বাজান, পারে। বহুতদিন পর ঘরের পোলা ঘরে ফিরা আইলে মার পেড এমতেঐ ভইরা থাকে। বিয়ানে দোফরে রাইত্রে কিছু না খাইলেও খিদা লাগে না। এতদিন পর তুই যে আমার সামনে বইয়া খাইলি এইয়া দেইক্কাই আমার খাওয়া অইয়া গেছে। পেড ভইরা গেছে।

মরনির কথা শুনে আবার চোখ ছলছল করে উঠল মজনুর। আবার অন্যদিকে মুখ ফিরাল সে। এই ফাঁকে চুলার জ্বাল নিভিয়ে জিনিসপত্র গোছগাছ করতে লাগল মরনি। পিঠাগুলি মাটির বাসনে রাখতে রাখতে বলল, আফাজদ্দি খলিফা মানুষ কেমুন?

AMARBOI.COM

মজনু কথা বলল না। খালার দিকে তাকালও না। যেমন অন্যদিকে তাকিয়েছিল তাকিয়ে রইল।

মরনি অবাক হল। মজনুর কাঁধের কাছে আস্তে করে ধাক্কা দিয়ে বলল, কী অইলো বাজান, কথা কচ না ক্যা? ব্যাজার অইছস ক্যা?

এবার খালার দিকে মুখ ফিরাল মজনু। ছলছল চোখে অবুঝ গলায় বলল, অমু না? ব্যাজার অমু না? অহনও কি ভাদ্দর আশ্বিন মাস? অহনও কি আমি ছোড?

হায়রে পাগল পোলা, আমারে তুই কী করতে কচ?

আমার সামনে বইয়া পিডা খাইবা তুমি। অহনে খাইবা, দোফরে খাইবা। রাইত্রে আমার লগে বইয়া ভাত খাইবা। আমি যতদিন দেশে থাকুম আমার লগে বইয়াঐ তিন ওক্ত খাওন লাগবো তোমার। যুদি না খাও আমিও খামু না। আমি ঢাকা যামু গা।

মরনি কথা বলে না। অদ্ভুত চোখ করে মজনুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হাত বাড়িয়ে খালার একটা হাত ধরল মজনু। চাইর মাসে খলিফা কাম আমি ভালঐ হিগছি। হাতের কাম পুরাপুরি হিগছি, কাটিংও হিগছি কয়খান। ফিরা গিয়া মিশিনে বমু। আফাজ মামায় কইছিলো আর দুই মাস পর বাইত্তে যা, তহন তুই পুরা খলিফা অইয়া যাবি। অহন তো থাকন খাওন বাদ দিয়া দুইশো টেকা পাছ, দুই মাস বাদে পাবি চাইরশো। একবারে কিছু টেকা লইয়া খালার লগে দেহা করতে যাইচ। আমি কইলাম, না আমি অহনঐ যামু। খালারে এতদিন না দেইক্কা আমি কোনওদিন থাকি নাই। মিশিনে বহনের আগে খালার মুখখান ইট্টু দেইক্কাহি (দেখে আসি)।

মজনুর কথা শুনতে শুনতে শেষদিকে দিশাহারা হয়ে গেল মরনি। গভীর আনন্দের গলায় প্রায় চিৎকার করে উঠল। তর মায়না অইছে বাজান, অ্যা? দুইশো টেকা মায়না অইছে? কবে থিকা মায়না অইছে? কাইল বিয়ালে বাইত্তে আইলি, একটা রাইত গেল, তুই দিহি আমারে কিছু কইলি না?

মজনু নির্মল মুখ করে হাসল। তোমারে দেইক্কা আমার আর কিছু মনে আছিলো না খালা। সন্দা অইতে না অইতে ভাত খাইয়া তোমার কুলের কাছে হুইয়াঐ ঘুমাইয়া গেলাম। হারা রাইত আর উদিস পাইলাম না। বিয়ানে উইট্টা মনে অইলো চাইর মাস বাদে ঘুমাইলাম। কাইল সন্দায় তোমার সামনে বইয়া ভাত খাইয়াও মনে অইলো চাইর মাস বাদে ভাত খাইলাম।

যে রকম আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়েছিল মরনির এখন ঠিক সেই ভঙ্গিতেই ম্লান হল। ক্যা রে বাজান? আফাজদ্দি খলিফা তরে হুইতে দেয় না, খাইতে দেয় না? এর লেইগা তুই এমন কাহিল হইয়া গেছচ, হুগাইয়া (শুকিয়ে) গেছচ!

কেডা কইলো আমি হুগাইছি! তোমার চোক্কে তো আমি সব সমায়ঐ হুগনা। হোনো, খলিফা কাম করতে অয় রাইত দোফর পইরযন্ত। রাইত দোফরে হুইয়া ওটতে অয় ফয়জরের আয়জানের লগে লগে। এক মাতারি (মহিলা) বাসা থিকা ভাত রাইন্দা আইন্না বেবাক কর্মচারিগো খাওয়ায়। শুড়াগাড়ি (ছোট ছোট) মাছ আর ডাইল। রান্দন যে মাইনষের এত খারাপ অইতে পারে, ইস কী কমু তোমারে! মুখে দেওন যায় না।

তাইলে ঐ মাতারির রান্দন খাচ ক্যা?

AMARBOI.COM

কী করুম, বেবাকতে খায়! আফাজ মামার ঠিক করা মাতারি, হে খাওনের টেকা দেয়, তার ইচ্ছায়ঐত্তো খাওন লাগবো! খলিফা কামে পয়লা পয়লা থাকন খাওন খারাপঐ অয়। ছোট্ট একখান ঘরে চিপাচিপি (গাদাগাদি) কইরা হুইতে অয় দশ বারোজন মাইনষের। ওমনে হুইলে ঘুম আহে, কও! তয় খলিফা অইতে পারলে আইজ কাইল লাব আছে। টাউনে বিরাট বিরাট গারমেন হইতাছে। তিন চাইর হাজার টেকা এহেকজন খলিফার মায়না। দুইয়েক বচ্ছর বাদে আমিও ঐরকম গারমেনে চাকরি লমু! তহন বড় খলিফা অইয়া যামু।

গারমেন কী রে বাজান?

জামা কাপোড়ের কারখানা। এইদেশ থিকা জামা কাপোড় বানাইয়া লন্ডন আমরিকায় পাডায়।

একটু থেমে মজনু বলল, গারমেনে চাকরি লইয়াঐ টাউনে একখান বাসা ভাড়া লমু। তোমারে লইয়া যামু। তহন তোমার আর এত কষ্ট করন লাগবো না। অহনও কোনও চিন্তা তুমি কইরো না। পয়লা তিনমাস পেডেভাতে কাম হিগছি। এন্মাস ধইরা দুইশো টেকা মায়না পাই। পনচাস টেকা আমার পকেট খরচার লেইগা রাইখা দেশশো টেকা কইরা মাসে তোমারে পাডামু। কহেক মাস বাদে যহন চাইরশো টেকা মায়না অইবো তহন পাডামু তিনশো কইরা। এইদিন থাকবো না খালা, দিন বদলাইবো।

কথা বলতে বলতে শার্টের বুক পকেট বরাবর একটা বোতাম খুলল মজনু, বুকে হাত দিল। মরনি অবাক হয়ে মজনুর দিকে তাকাল। কী অইলো বাজান, পিপড়ায় কামোড় দিছে?

মজনু হাসল। না, শাডের ভিতরে একখান জেব (পকেট) আছে। টেকা পয়সা হেই জেবে রাখি।

হাত বের করল মজনু। হাতে অনেকগুলি কড়কড়া দশ টাকার নোট। এত টাকা মজনুর হাতে দেখে অবাক হয়ে গেল মরনি। টাকার দিকে তাকিয়ে রইল।

মজনু বলল, আমার পয়লা মাসের মায়নার টেকা। লঞ্চ ভাড়া দিয়া একশো ষাইট টেকা আছে। নেও ধরো।

তখনও অবাক ভাব কাটেনি মরনির। ঘোর লাগা ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে টাকা নিল। কোন ফাঁকে চোখ ভরে গেছে পানিতে, টের পায়নি। গাল বেয়ে চোখের পানি নামল মরনির। তবু মুখখানা হাসিমাখা। একহাতে চোখের পানি মুছে টাকাটা সে একবার বুকে ছোঁয়ায়, একবার কপালে। মুখে কথা নাই।

খালার এই অবস্থা দেখে মুগ্ধ হল মজনু। বলল, চাইছিলাম শতেকখানি টেকা দিয়া তোমার লেইগা একখান কাপোড় কিন্না আনি। পরে মনে করলাম টেকাডাঐ আইন্না তোমার হাতে দেই। আমার পয়লা রুজি দেইক্কা খুশি অইবা তুমি। ও খালা, খুশি অও নাই, খুশি অও নাই তুমি?

আবার চোখ ভরে পানি এল মরনির। তবে মুখে আনন্দের হাসিখানা লেগেই আছে। ঠেলে ওঠা কান্না বুকে চেপে বলল, বহুত খুশি অইছি, বহুত খুশি অইছি বাজান। পোলার পয়লা রুজির টেকা হাতে লইছি, আমার থিকা সুখি মা আর কে আছে দুইন্নাইতে? এই

AMARBOI.COM

টেকা থিকা পাচটেকার সিন্নি দিমু খাইগো বাড়ির মজজিদে (মসজিদ)। মুন্সি সাবরে দিয়া মলুদ শরিফ (মিলাদ) পড়ামু। আল্লায় যে আমার মনের আশা পূরণ করছে, আল্লার কাছে হাজার শুকরিয়া, লাক লাক শুকরিয়া।

একহাতে মজনুর মাথাটা বুকের কাছে টেনে আনল মরনি। তরে ছাইড়া থাকতে কেমুন কষ্ট যে আমার অয়, বাজানরে, আল্লা ছাড়া কেঐ জানে না। খাইতে বইলে মনে অয়, তুই ভাত খাইছসনি! ঘুমাইতে গেলে মনে হয়, তুই কেমতে হুইয়া রইছস, কেমতে ঘুমাইছস! আমার রাইত কাইট্টা যায় তর কথা চিন্তা কইরা। খালি মনে অয় আমার বুকের মানিক কই পইড়া রইছে আর আমি কই। তর কষ্টে আমার বুক ফাইট্টা যায় বাজান।

খালার বুকের কাছে মুখ রেখে মজনু বলল, আমারও তোমার মতনঐ অয় খালা। আমারও তোমার লেইগা মনডা কান্দে। তোমার মুকহান দেহনের লেইগা মন ছুইট্টা যায়।

তরে আমি খলিফা কামে ক্যান দিছি জানচ! ক্যান আমগো গেরামের আফাজদ্দি খলিফা দেশে আহনের পর তারে গিয়া কইছিলাম, আমার পোলাডারে আপনের কাছে লইয়া যান, অরে কাম হিগান, খলিফা বানান।

ক্যান কইছিলা খালা?

তর মায় মরণের পর থিকা তুই আমার কাছে। তরে আমি মাডিতে হোয়াই নাই পিপড়ার ডরে, মাথায় রাখি নাই উকুনের ডরে। তরে আমি রাখছি আমার বুকে। হেই বুকের ধন দূরে ঠেইল্লা দিলাম খালি একখান কথা চিন্তা কইরা। খেতখোলার কাম, গিরস্তালি তুই করতে পারবি না। তর শইল্লে কুলাইবো না। তুই এমুন একখান কাম হিগবি, জীবন ভইরা এমুন একখান কাম করবি, যেই কাম সোন্দর কাম। হাত পায়ে প্যাককেদা লাগে না, কহর পড়ে না, যেই কাম ভাল কাপোড় জামা ফিন্দা করন যায়। যেই কাম অন্য মাইনষেরেও সোন্দর করে। অন্য মাইনষের শইল্লে বসন তুইল্লা দেয়। ঢাকা থিকা ভাল জামা কাপোড় ফিন্দা যে কোনও মানুষ ফিরত আইলে তারে দেইক্কা য্যান তর কথা মনে অয় আমার। য্যান মনে অয় এই জামা কাপোড় আমার মজনুর হাতে বানানো, আমার বাজানের হাতের পরশ আছে দেশের বেবাক সোন্দর সোন্দার জামা কাপোড়ে।

মজনু মুগ্ধ গলায় বলল, আমি তোমার মনের আশা পূরণ করুম খালা। দেইখো আমি ঠিকঐ বড় খলিফা অমু।

ডালা থেকে একটা পিঠা নিল মজনু। খালার মুখের সামনে ধরে বলল, অহন আমার হাত থিকা এই পিডাডা খাইবা। না খাইলে তোমার লগে আর কথা নাই। আইজঐ ঢাকা যামু গা।

টাকা হাতে ধরা মরনি অদ্ভুত চোখে মজনুর দিকে তাকাল, হাসিমুখে এক কামড় পিঠা খেল। তারপর ডানহাত বাড়িয়ে পিঠাটা নিল। দে বাজান, খাইতাছি।

মজনু বলল, খাইতে খাইতে আমার মার কথা কও খালা, বাপের কথা কও।

বাপের কথা কী হুনবি! মেউন্না (মেনিমুখো) পুরুষপোলা। তর মায় মরণের পর চল্লিশ দিনও গেল না, আরেকখান বিয়া করলো। তর মিহি (দিকে) ফিরাও চাইলো না।

AMARBOI.COM

কেমনে চাইবো, আমি তো তহন তোমার কাছে!

আমার কাছে থাকলেই কি পোলা দেকতে আহন যায় না?

আহে নাই?

না কোনওদিন আহে নাই। মাইনষের কাছে কইতে বউ মরছে, পোলাও মরছে। এর লেইগাঐত্তো তর বাপের মুখ তরে আমি কোনওদিন দেকতে দেই নাই। বাপ পোলা কেঐ কেঐরে চিনে না। নতুন সংসারে ম্যালা পোলাপান তার। আছে ভালঐ।

বাপের কথা বাদ দেও। মার কথা কও।

মরনি আরেক কামড় পিঠা খেল। তর মার আহুজ পড়বো, আমি গেছি বইনের কাছে থাকতে। তিনদিন আহুইজ্জা বেদনায় কষ্ট পাইলো বইনে। তারবাদে তুই অইলি। ভালয় ভালয়ই অইলি। মাত্র ছয়দিন, দোফর বেলা ছটফট করতে করতে মইরা গেল বইনে। আমার চোক্কের সামনে। আমি তরে কুলে লইয়া বইয়া রইছি, তুই বুজলিও না কারে তুই জীবনের তরে হারাইলি।

মজনু করুণ মুখে হাসল। আসলে হারাই নাই খালা। যে মরছে হে মরছে, আমি তো আমার মার কুলেই আছি। এই যে আমার মা।

বলেই খালার একটা হাত ছুঁয়ে দিল মজনু।

মরনি আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঠিকঐ কইছস। তর মা অমু দেইক্কাঐ আল্লায় আমারে পোলাপান দিলো না। তর রুজি খামু দেইক্কাঐ বয়েরকালে (বয়সকাল) রাড়ি (বিধবা) অইলাম। বিলে চৌদ্দগণ্ডা জমিন, চাইর শরিকের বাড়িডার দক্ষিণ দিকে এড়ু জাগা, দুইখান ঘর, এই হগল রাইক্কা তর খল্লি মরলো। বাজানরে, দুইন্নাইতে তুই আর আমি ছাড়া আমগো কেঐ নাই।

জামগাছ থেকে টুনটুনিটা কখন উধাও হয়েছে, পাকা ডালিমের মতো রোদ কখন আরও উজ্জ্বল হয়েছে, দুইজন মানুষের কেউ তা খেয়াল করে না। তারা স্তব্ধ হয়ে থাকে গভীর কোনও দুঃখ বেদনায়।

ঘরের খাড়া পিড়ার (পৈঠা) সঙ্গে ঢেলান (হেলান) দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে বালিকাচা। উঠানে বসে বালিকাচায় ঘষে ঘষে ছ্যানে ধার দিচ্ছে দবির। খালি গা, লুঙ্গি কাছা মারা দবিরের পিঠে এসে পড়েছে সকালবেলার রোদ। রোদেপোড়া পিঠ চকচক করছে।

দবিরের হাতের একপাশে পড়ে আছে ঠুলই অন্যপাশে মাটির মালশায় বালি। বালিটা ছাই রঙের। এটা মুড়ি ভাজার বালি। আরবছর (আগের বছর) শীতকালে মুড়ি ভাজার পর যত্ন করে বালিটা মাটির পুরানা ঠিলায় রেখে দিয়েছিল হামিদা।

হামিদার কাছে সংসারের ফেলনা জিনিসটাও দামি। কোনও কিছুই ফেলে না সে। যত্নে তুলে রাখে ঘরদুয়ারের কোথাও না কোথাও। কে জানে কখন দরকার পড়বে কোনটার। হাত বাড়িয়ে না পেলে জোগাড় করতে জান বের হয়ে যাবে। খাটনির খাটনি সময়ও নষ্ট।

মুড়ি ভাজার বালি জোগাড় করতে হয় পদ্মারপার থেকে। মাওয়া কুমারভোগ বরাবর পদ্মারতীরে এখন বিশাল বালিয়াড়ি। পদ্মা সরে যাচ্ছে দূরে। তীরে রেখে যাচ্ছে সাদাবালি। মুড়িভাজার জন্য গরিব গিরস্তরা এসব জায়গা থেকে বালি জোগাড় করে আনে।

কাঁচা বালিতে মুড়ি ভাল ভাজা হয় না। বালি আগুনে ভাজা ভাজা করে নিতে হয়। গরম হলে বালির তেজ বাড়ে। সামান্য নুন পানি মিশান চাউল খোলায় টেলে (সামান্য ভাজা অর্থে) যে হাঁড়িতে গরম করা হয় বালি সেই বালিতে চাউল ঢেলে দুইহাতের কায়দায় আড়াই তিন পাক ঘুরালেই চুরমুর চুরমুর করে ফুটে উঠবে শিউলি ফুলের মতো মুড়ি। ভাজা মুড়ির গন্ধে বিভোর হবে দশদিক।

একবার ব্যবহার করা বালি এজন্য রেখে দেয় গিরস্ত বউরা। হামিদাও রেখেছে। যদিও মুড়ি ভাজার চেয়ে দবির গাছির ছ্যানের ধার দেওয়ার জন্য বালিটা সংসারে বেশি দরকার। মুড়ি ভাজার বালিতে ধার বেশি হয়। পাঁচ আঙুলের একথাবা বালিকাচায় ছিটিয়ে ছ্যানের আগায় একহাত মাথায় একহাত, ঘষা দেওয়ার লগে লগে ঝকঝক করে উঠবে ছ্যান। পাঁচ সাত মিনিটের মাথায় এমন হবে ধার, খাজুরগাছের গলা বরাবর ছোঁয়ালেই কোন ফাঁকে উধাও হবে শক্ত বাকল, খাজুরের নরম অঙ্গ দেখা যাবে রসে চপচপ করছে। আস্তে করে কঞ্চির নল ছোঁয়ালে ঢুকে যাবে। টুপটুপ টুপটুপ করে রস এসে পড়বে হাঁড়িতে। রাত পোহাবার আগেই হাঁড়ি ভরে যাবে রসে। গন্ধে ম ম করবে চারদিক।

ভারটা পড়ে আছে উঠানের মাঝ বরাবর। লগে ছয়সাতটা হাঁড়ি। হাঁড়িগুলি ছিল রান্নাচালার বাতার সঙ্গে ঝুলান। বড়ঘরের চৌকির তলারগুলি কাল বিকালে মিয়াদের ছাড়া বাড়িতে রেখে এসেছে দবির। আজ এইগুলি নামিয়েছে হালদার বাড়িতে নিয়ে যাবে বলে। হাঁড়ি আরও কিছু লাগবে। মঙ্গলবার গোয়ালিমান্দ্রার হাট থেকে কিনে আনবে। এইবছর হাওয়া যেমন ছাড়ছে, রস পড়বে জবরদস্ত। কষ্ট যতই হোক চারপাশের গ্রামের সবগুলি গাছই ধরার চেষ্টা করবে দবির। রস বেচে সংসারের চেহারা ঘুরাতে হবে। চাষের জমিন যেটুকু আছে, এক কানিও হবে না। নিজে চষেও বছরের ধান হয় না। গাছি না হলে তো, শীতকালে রসের কারবার করে আয় না করলে তো তিনজন মানুষের তিন ওক্তের খাওয়াই জুটত না। তার ওপর মেয়ে বড় হচ্ছে। দুইতিন বছরের মধ্যে বিয়াশাদি দিতে হবে। আজকাল মেয়ে বিয়া দেওয়ার অর্থ সর্বস্বান্ত হওয়া। জামাইরে এইটা দেও, ওইটা দেও। যৌতুক ছাড়া মেয়ের বিয়া দেওয়া যায় না। সোনাদানা তো আছেই, নগদ টাকাও দিতে হয়। দবির গাছির মতো মানুষ এসব পাবে কোথায়? এখন থেকে এসব বিষয়ে না ভাবলে মেয়ের বিয়ার সময় জমিন বিক্রি ছাড়া উপায় থাকবে না। ওইটুকু মাত্র জমিন মেয়ের পিছনে গেলে হামিদাকে নিয়ে খাবে কী! দুইজন মানুষের তো বাঁচতে হবে, নাকি!

AMARBOI.COM

ছ্যানে ধার দিতে দিতে এসব ভাবছে দবির। সময় যে অনেকটা কেটেছে খেয়াল করেনি। ছ্যান যে অতিরিক্ত ধার হয়েছে খেয়াল করেনি। ঘষেই যাচ্ছে, ঘষেই যাচ্ছে।

ব্যাপারটা খেয়াল করল নূরজাহান। রান্নাচালায় জলচৌকিতে বসার মতো করে বসেছে সে। টোপরে চাউলভাজা। রান্নাচালার ভিতর চুলার পারে বসে খানিক আগেই দুই খোলা মোটাচাউল ভেজেছে হামিদা। একখোলা দিয়েছে নূরজাহানকে, আরেক খোলার অর্ধেকটা নিজে নিয়েছে, অর্ধেকটা রেখেছে স্বামীর জন্য। কিন্তু স্বামীর দেখি ছ্যানে ধার দেওয়াই শেষ হয় না। কখন চাউলভাজা খাবে, কখন বাড়ি থেকে বের হবে!

একমুঠ চাউলভাজা মুখে দিয়ে স্বামীকে ডাকতে যাবে হামিদা তার আগেই নূরজাহান বলল, ও বাবা, কত ধার দেও? ছ্যান দেহি চকচক করতাছে!

নূরজাহানের কথায় বাস্তবে ফিরল দবির। আনমনা ভাব কেটে গেল। বালিকাচায় ছ্যান ঘষা বন্ধ করে আঙুলের ডগায় ধার দেখল। তারপর হাসিমুখে মেয়ের দিকে তাকাল। ইট্টু বেশি ধার দিলাম মা। ম্যালা গাছ ঝুড়ন লাগবো।

টোপর থেকে একমুঠ চাউলভাজা নিয়ে মুখে দিল নূরজাহান। জড়ান গলায় বলল, আইজ কোন বাড়ির গাছ ঝুড়বা?

হালদার বাড়ির।

হালদার বাইত্তে খাজুরগাছ কো?

আছে। মজনুগো সীমানায় চাইরখান খাজুরগাছ আছে।

মজনু নামটা শুনে ভারি একটা খুশির ভাব হল নূরজাহানের। উচ্ছল গলায় বলল, মজনু দাদায় বলে অহন টাউনে থাকে? আগাজদ্দি খলিফার কাছে খলিফাগিরি হিগে?

হ, আমিও হুনছি। তরে কইলো, কে?

ডালায় করে চাউলভাজা এনে স্বামীর সামনে রাখল হামিদা। নূরজাহান কথা বলার আগেই বলল, অরে কি আর কোনও কিছু কওন লাগে! হারাদিন পাড়া বেড়ায়। এই বাইত্তে যায়, ওই বাইত্তে যায়, কোন বাইত্তে কী অইলো বেবাক অর জানা।

দবির তখন ছ্যান ভরেছে ঠুলইতে। ভারের দুই মাথায় ঝুলিয়েছে হাঁড়িগুলি। এখন ঠুলই মাজায় বেঁধে, কাঁধে কাছি ফেলে বাড়ি থেকে বের হলেই হয়। হামিদা যে তার সামনে চাউলভাজার ডালা রেখেছে সেদিকে খেয়ালই নাই।

ঘটনা বুঝে হামিদা বলল, খাওন লাগবো না?

দবির হাসিমুখে হামিদার দিকে তাকাল। রসের দিনে খাওন দাওনের কথা মনে থাকে না।

হামিদা বলল, মনে না থাকলেও খাওন লাগবো। নাইলে মরবা।

দবির ফুর্তির গলায় বলল, আরে না এত সকালে মরুম না। মাইয়ার বিয়া দেওন লাগবো না?

তারপর ডালা থেকে একমুঠ চাউলভাজা নিয়ে মুখে দিল।

নিজের বিয়ার কথা শুনে, বাবার ওই রকম ফুর্তির ভাব দেখে টোপর ভাল করে চেপে ধরে মা বাবার সামনে এগিয়ে এল নূরজাহান। চঞ্চল গলায় বলল, ভাল কথা কইছো বাবা। আমারে বিয়া দিয়া দেও।

ANKARBOI.COM

মেয়ের কথা শুনে রেগে গেল হামিদা। নূরজাহানের মুখের দিকে তাকিয়ে ধমক দিল। চুপ কর খাচ্চরনি। এত বড় মাইয়া মা বাপের মুখের সামনে বিয়ার কথা কয়!

দবির কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই নূরজাহান বলল, কইলে কী অয়? বিয়া তো আমারে তোমরা দিবাই!

আবার ধমক দিতে চাইল হামিদা, তার আগেই দবির বলল, এমুন কইরো না মাইয়াডার লগে। কইছে কইছে। পোলাপান মানুষ এই হুগল বোজেনি?

হামিদা আগের মতোই রুক্ষ গলায় বলল, কীয়ের পোলাপান মানুষ! বস কম অইছেনি তোমার মাইয়ার? দামড়ি (যৌবনবতী গাভী অর্থে) অইয়া গেছে অহনতরি কথাবার্তির ঠিক নাই। এই মাইয়ারে তুমি হামলাও গাছি। নাইলে কইলাম বিপাকে পড়বা।

কী বিপাকে পড়ুম?

যেমনে পাড়া চড়ে কুনসুম কী অইয়া যাইবো উদিস পাইবা না।

দবির আবার চাউলভাজা মুখে দিল। মাইয়া হামলানের কাম বাপের না, মার। তুমি হামলাও না ক্যা?

হামিদা ঘাড় বেঁকা করে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। আমি কইলাম পারি।

পারলে হামলাও।

তুমি কিছু কইবা না তো?

আমি কী কমু! মাইয়া আমারও যেমুন তোমারও অমুন।

কথাখান য্যান মনে থাকে।

দবির হাসিমুখে বলল, থাকবো।

নূরজাহানের দিকে তাকাল হামিদা। কী কইছে তর বাপে হোনছস?

নূরজাহান নির্বিকার গলায় বলল, হুনছি।

তারপর আবার চাউলভাজা মুখে দিল।

দবির ততক্ষণে মুখভরে চাউলভাজা নিয়ে নিজের ভাগেরটা খেয়ে শেষ করেছে। এখন রান্নাচালার ঠিলা থেকে টিনের মগে পানি ঢেলে খাচ্ছে। মা মেয়ের কথার দিকে খেয়াল নাই।

পানি খাওয়া শেষ করে ঠুলই মাজায় বাঁধল দবির। কাছি ফেলল এক কাঁধে আরেক কাঁধে তুলল ভার। উঠান পালান ভেঙে বাড়ির নামার দিকে হেঁটে যেতে যেতে নূরজাহানের দিকে তাকিয়ে হাসল। আইজ থিকা আমি কইলাম কিছু জানি না। তর মায় যা কইবো হেইডাঐ অইবো।

কথাটা বুঝল না নূরজাহান। বাবার চলে যাওয়া পথের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে মায়ের দিকে মুখ ফিরাল। আরেক মুঠ চাউলভাজা দিল মুখে। চাবাতে চাবাতে (চিবাতে চিবাতে) বলল, কী কইবা কও!

হামিদা বলল, পরে কমুনে।

না অহনেই কও। পরে হোননের সময় পামু না।

ক্যা কই যাবি তুই?

AMARBOI.COM

হালদার বাড়ি যামু মজনু দাদার খবর লইতে। মজনু দাদায় খলিফা অইছে কিনা জানন লাগবো।

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় হামিদা বলল, যাইতে পারবি না। আইজ থিকা ইচ্ছা মতন বাড়িত থন বাইর অইতে পারবি না। তুই ডাঙ্গর অইছস। আমার লগে থাইক্কা সংসারের কাম কাইজ হিগবি।

কথাটা বুঝতে পারল না নূরজাহান। অবাক চোখে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাড়ি থেকে বের হবার সময় ছনুবুড়ি দেখতে পেল তার ছেলের বউ বানেছা এন্দাগেন্দা পোলাপান (ছোট ছোট ছেলেমেয়ে) নিয়ে ঘরের মেঝেতে বসে বউয়া (তেল পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে তৈরি এক ধরনের ভাত। চাল খুদ দুটো দিয়েই হয়) খাচ্ছে। বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে, এসময় বউয়া খেলে দুপুরের ভাত বিকালে খেলেও অসুবিধা নাই। আর বিকালে ভাত খাওয়া মানে রাতে না খেলেও চলবে। গিরস্ত বাড়িতে যখন অভাব দেখা দেয় তখন অসময়ে বউয়া জাউ এসব খায় সংসারের লোকে।

তাহলে কি ছনুবুড়ির ছেলের সংসারে অভাব লেগেছে!

অভাব লাগবার কথা না। বুড়ির একমাত্র ছেলে আজিজ গাওয়ালি (ফেরি করা) করে। ভারে বসিয়ে কাঁসা পিতলের থালাবাসন, জগ গেলাস, কলসি পানদান নিয়ে দেশগ্রাম চষে বেড়ায়। নতুন একখান কাঁসা পিতলের থালা বদনা, পানের ডাবর, পানদান গিরস্ত বাড়ির বউঝিদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিনিময়ে সেই বাড়ি থেকে নিয়ে আসবে পুরানা কাঁসা পিতলের ভাঙাচোরা, বহুকাল ধরে ব্যবহার করা জিনিসপত্র। একখান নতুন জিনিসের বিনিময়ে আনবে দুই তিনখান পুরানা জিনিস। তারপর সপ্তাহে সপ্তাহে দিঘলী বাজারে গিয়ে ওজন দরে সেই সব জিনিস বিক্রি করে অর্ধেক টাকার জিনিস কিনবে অর্ধেক টাকা খুতিতে (টাকা পয়সার থলে) ভরবে। ওই অর্ধেক টাকাই লাভ। তার উপর খেতখোলাও আছে আজিজের। ভালই আছে। আড়াই কানির মতো হবে। পুরা আড়াই কানিই পড়েছে ইরির চাষে। বর্গা দিয়েও ধান যা পাওয়া যায় বছর চলে আরামছে। যদিও আজিজের সংসার বড়। বিয়ার পরের বছর থেকে সেই যে পোলাপান হতে শুরু করেছে বউয়ের, এখনও থামেনি। বড় পোলার বয়স হয়েছে এগারো বারো বছর। এখনও পেট উঁচু হয়ে আছে বানেছার। সাতমাস চলছে। মাস দুইয়েক পর একদিন ব্যথা উঠবে। আলার মা ধরণী এসে খালাস করে দিয়ে যাবে। পোলা না মাইয়া কী হল সেটা নিয়েও আগ্রহ থাকবে না সংসারের কারও। না আজিজের,

AMARBOI.COM

না বানেছার। এমন কী পোলাপানগুলিও তাকিয়ে দেখবে না, ভাই হল তাদের, না বোন। যে যাকে নিয়ে আছে তারা।

আর ছনুবুড়ির তো কথাই নাই। সে এই সংসারে থেকেও নাই। বিয়া করে বানেছাকে যেদিন সংসারে আনল আজিজ তার পরদিন থেকেই সংসারের বাড়তি মানুষ ছনুবুড়ি। বাড়িতে বড়ঘর একটাই, সেই ঘর চলে গেল বউর দখলে। উত্তরের ভিটায় আছে মাথার ওপর টিনের দোচালা আর চারদিকে বুকাবাঁশের (বাঁশ চিড়ে তার ভেতরকার সাদা নরম অংশ দিয়ে তৈরি) বেড়া, ঢেঁকিঘর। একপাশে বেলদারদের (নিচু ধরনের সম্প্রদায়) রোগা ঘোড়ার মতো তেঁতুল রঙের পুরানা ঢেঁকিটা লোটে (ঢেকির মুখ যে গর্তে পড়ে) মুখ দিয়ে পড়ে আছে, আরেক পাশে ভুর (ডাঁই) দেওয়া আছে লাকড়ি খড়ি, এসবের মাঝখানে, লেপাপোছা একটুখানি জায়গা থাকার জন্য পেল ছনুবুড়ি। নিজের কাঁথা বালিস নিয়ে তারপর থেকে ওখানেই শোয়।

দিন চলে যাচ্ছে।

ছেলের বউ হিসাবে বানেছা অতি খারাপ। সংসারে এসে ঢোকার পর থেকেই দুই চোখখে দেখতে পারে না হরিরে (শাশুড়িকে)। কী ভাল কথা কী মন্দ কথা, ছনুবুড়ির কথা শুনলেই ছনছন করে ওঠে। চোপা (মুখ) এত খারাপ, হরিরে কোন ভাষায় গালিগালাজ করা যায় তাও জানে না। মুখে যা আসে তাই বলে। সতীন পর্যন্ত।

প্রথম প্রথম এই নিয়ে ব্যাপক কাইজ্জাকিত্তন (ঝগড়াঝাঁটি) হয়েছে। বানেছা যেমন ছনুবুড়িও তেমন, হরি বউয়ের কাইজ্জাকিত্তনে পাড়ার মানুষ জড় হত। শেষদিকে যখন হাতও তুলতে শুরু করল বানেছা তখন উপায় না দেখে থেমে গেছে ছনুবুড়ি। হরি হয়ে বউর হাতে মার খাওয়া! ছি!

আর পেটের ছেলে আজিজ, সে এমন মেউন্না (মেনিমুখো), বউর উপর দিয়ে কথা বলার সাহস নাই। বউ অন্যায় করলেও দোষ সে মাকেই দেয়। এসব দেখে সংসার থেকে মন উঠে গেছে বুড়ির। তারপর থেকে সংসারে সে থেকেও নাই। বাড়িতে থাকলে নাতি নাতকুরদের হাত দিয়ে ভাত তরকারি পাঠায় বানেছা, ছনুবুড়ি খায়। কখনও যদি না পাঠায়, রাও (রা) করে না। পাড়া চড়ে ছোটখাট চুরি চামাড়ি করে, কূটনামী করে টুকটাক খাদ্য যা জোগাড় করে তাতে নিজের পেট বুড়ির খালি থাকে না। সময় অসময়ের ক্ষুধাটা মিটাতে পারে।

তবে দেশ গ্রামের লোক ছনুবুড়ির আড়ালে আবডালে তাকে নিয়ে খুব হাসি মশকরা করে। এতবড় কূটনী হয়েও বউর কূটনামীর কাছে মার খেয়ে গেছে বুড়ি। কাইজ্জাকিত্তনে ছনুবুড়ির ছ্যানের মতন ধার, সেই ধার মার খেয়ে গেছে বানেছার কাছে। পারতিকে বউর সঙ্গে সে কথা বলে না। বউকে চোখের ওপর দেখেও না দেখার ভাব করে।

আজকের ব্যাপার অন্যরকম। আজ সকাল থেকেই পেটভর্তি ক্ষুধা বুড়ির। সকালবেলা মুখে দেওয়া যায় এমন কোনও খাদ্য নিজের সংগ্রহে ছিল না। কাল দুপুরে জাহিদ খাঁর বাড়িতে ভাত খেয়েছে তারপর থেকে একটা বিকাল গেছে, পুরা একটা রাত তারপর এতটা বেলা, মানুষ বুড়া হলে কী হবে পেট কখনও বুড়া হয় না, ক্ষুধাটা বেদম

AMARBOI.COM

লেগেছে ছনুবুড়ির। আর এসময় বাড়ির বউ পোলাপান নিয়ে বউয়া খাচ্ছে! যদিও ছেলের সংসারের অভাবের কথাটাও মনে হয়েছে ছনুবুড়ির, অন্যদিকে বউয়ার গন্ধে নিজের পেটের ক্ষুধাও লাফ দিয়ে উঠেছে।

ছনুবুড়ি এখন কী করে!

বউর সঙ্গে শেষ কবে কথা হয়েছে মনে নাই। আজ ভাবল নাতি নাতকুরদের মাধ্যমে বউর সঙ্গে ভালভালাই দুই একখান কথা বলে সংসারের অভাবের কথাটা জেনে নেবে আর নিজের জন্য একথাল বউয়াও জোগাড় করবে। কূটনামী একটু করে দেখুক কাজে লাগলেও লাগতে পারে।

বড়ঘরের পিড়ায় বসল ছনুবুড়ি। ঘরের ভিতর গলা বাড়িয়ে মাজারো (মেজো) নাতিকে ডাকল। ও হামেদ, হামেদ, কী করো ভাই? বউয়া খাও?

সংসারে একমাত্র হামেদেরই একটু টান দাদীর জন্য আছে। সে বলল, হ।

কীয়ের বউয়া?

খুদের।

খুদের বউয়া খাও ক্যা, ঘরে চাউল নাই?

হামেদ কথা বলবার আগেই বানেছা কাইজ্জার সুরে বলল, চোক্কে বলে দেহে না? তয় ঘরে বইয়া যে আমি পোলাপান লইয়া বউয়া খাই হেইডা দেহে কেমতে?

খোঁচাটা হজম করল ছনুবুড়ি। যেন বউর সঙ্গেই কথা বলছে এমন স্বরে বলল, কে কইছে চোক্কে দেহি না! অল্পবিস্তর দেহি।

বানেছা বলল, আইজ যে অহনতরি বাইত্তে? আইজ যে অহনতরি পাড়া বেড়াইতে বাইর অয় নাই?

বাইর অইতাছিলাম।

তয়?

ছনুবুড়ি বুঝে গেল বানেছার আওয়াজটা ভাল না। এখনই কাইজ্জাকিত্তন লাগাবে। বুড়ি আর বানেছার উদ্দেশ্যে কথা বলল না। হামেদকে বলল, ও হামেদ, আমারে ইট্টু বউয়া দে। বিয়ানে আমারও তো খিদা লাগে!

হামেদ কথা বলবার আগেই বানেছা তেড়ে উঠল। ইস একদিন পোলাপান লইয়া ইট্টু বউয়া খাইতে বইছি তাও মাগির সইজ্জ অয় না। অরে দেওন লাগবো এক থাল! এই মাগি, বাইর অইলি বাইত থন!

বানেছার কথা শুনে ছনুবুড়িও তেড়ে উঠতে গিয়েছিল, কী ভেবে সামলাল নিজেকে। গলা নরম করে সরাসরি বানেছাকে বলল, এমুন কইরো না বউ। কয়দিন পর আহুজ পড়বো, এই সমায় ময়মুরব্বিগ বড়দোয়া (বদদোয়া) লইতে অয় না। একবার আহুজ পড়ন আর একবার মউতের মুক থিকা ফিরত আহন এক কথা।

একথায়ও বানেছার মন গলল না। আগের মতোই রুক্ষ গলায় বলল, এত আল্লাদ দেহানের কাম নাই। মউতের মুখে আমি পোত্যেক বচ্ছরঐ যাই, আবার ফিরতও আহি। তোমার বড়দোয়ায় আমার কিচ্ছু অইবো না। হকুনের দোয়ায় গরু মরে না। তাইলে দুইন্নাইতে আর গরু থাকতো না। খালি হকুনঐ থাকতো।

AMARBOI.COM

নয় দশ বছরের হামেদ তখন খাওয়া শেষ করেছে। ছেলেটা আমুদে স্বভাবের। এই বয়সেই বয়াতীদের গান শুনে সেই গান ভাল গাইতে পারে। কয়েকদিন আগে তালুকদার বাড়িতে গিয়ে খালেক না মালেক দেওয়ানের দেহতত্ত্বের গান শুনে আসছে। স্মরণশক্তি ভাল। একবার দুইবার শোনা গান একদম বয়াতীদের মতো করেই গায়। মা দাদীর কথা কাটাকাটির মধ্যেও গলা ছেড়ে গান শুরু করল সে।

মালো মা ঝিলো ঝি বইনলো বইন করলাম কী
রঙ্গে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে।।

নাতির গান শুনে ক্ষুধার কষ্ট আর বউর করা অপমানে বহুকাল পর বুকের অনেক ভিতর থেকে ছনুবুড়ির ঠেলে উঠল গভীর কষ্টের এক কান্না। পিড়ায় বসে এখন যদি কাঁদে ছনুবুড়ি ওই নিয়েও কথা বলবে বানেছা। হয়তো আরও অপমান করবে। অপমানের ভয়ে চোখে পানি নিয়েই উঠে দাঁড়াল ছনুবুড়ি। বাড়ির নামার দিকে হাঁটতে লাগল। ঘরের ভিতর হামেদ তখন গাইছে,

নৌকার আগা করে টলমল
বাইন চুয়াইয়া ওঠে জল
কত ভরা তল হইলো এই গাঙ্গে
ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে।

AMARBOI.COM

শক্ত করে কুট্টির হাত ধরেছেন মিয়াবাড়ির কর্ত্রী রাজা মিয়ার মা। ধরে খুবই সাবধানে বড়ঘরের সিঁড়ি ভাঙছেন। একটা করে সিঁড়ি ভাঙছেন, একটু দাঁড়াচ্ছেন। দাঁড়িয়ে গাভীন গাইয়ের শ্বাস ফেলার মতো করে শ্বাস ফেলছেন। সিঁড়ি ভেঙে ওঠার সময় মানুষ না হয় ক্লান্ত হয়, নামার সময়ও যে হয়, তাও মাত্র চার পাঁচটা সিঁড়ি, কুট্টি ভাবতেই পারে না। মোডা অইলে যহন এতই কষ্ট তাইলে মোডা অওনের কাম কী! কে কইছে এত মোডা অইতে!

শেষ সিঁড়ি ভেঙে মাটিতে পা দিলেন রাজা মিয়ার মা, স্বস্তির শব্দ করলেন। যেন পুলসুরাত পেরিয়ে আসছেন এমন আরামদায়ক ভাব। তারপরই কুট্টির মুখের দিকে তাকালেন, বাজখাঁই গলায় বললেন, জলচকি দিছস?

কুট্টি বলল, দিছি বুজান। জলচকি না দিয়া আপনেরে ঘর থিকা বাইর করুমনি? আমি জানি না উডানে নাইম্মা খাড়ইতে পারেন না আপনে! লগে লগে বহন লাগে। এর লেইগা আগেঐ জলচকি দিছি, তারবাদে আপনেরে ঘর থিকা বাইর করছি।

ভাল করছস। তয় আমি তো আইজ উডানে বহুম না।

বলেই কুট্টির কাঁধে কলাগাছের মতো একখানা হাত রাখলেন। শরীরের ভার খানিকটা ছেড়ে দিলেন। সেই ভারে কুট্টি একটু কুঁজা হল। বিশ একুশ বছরের কাহিল মেয়ে কুট্টি, তার পক্ষে এরকম একখানা দেহের একটুখানি ভারও বহন করা মুশকিল।

কুট্টির ইচ্ছা হল কথাটা বুজানকে বলে। কিন্তু বলার উপায় নাই। রাজা মিয়ার মার দেহ মেজাজ দুইটাই এক রকম। রাগ করতে পারেন এমন কোনও কথা মুখের উপর, আড়ালে আবডালে বললে, সেই কথা যদি তাঁর কানে যায় তাহলে আর কথা নাই। লগে লগে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন। তার আগে যে গালিগালাজ করবেন সেই গালিগালাজ শুনে গর্তে গরম পানি ঢেলে দেওয়ার পর যেমন ছটফটা ভঙ্গিতে বের হয় সাপ তুরখুলা (এক ধরনের বড় পোকা) ঠিক তেমন করে কবর থেকে বের হবে কুট্টির সব মরা আত্মীয়। তাতে অবশ্য কুট্টির কিছু আসবে যাবে না কিন্তু এই বাড়ির বান্ধা কাজ হারালে কুট্টির কোথাও দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না। না খেয়ে মরণ। আর ক্ষুধার কষ্ট কী যেনতেন কষ্ট! সব কষ্ট সহ্য করা যায় ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা যায় না। সেই কষ্টের চেয়ে এই ভার বহন করা হাজার গুণ ভাল।

কুঁজা শরীরেও মুখটা হাসি হাসি করল কুট্টি। বলল, আমি জানি আপনে আইজ কই বইবেন।

রাজা মিয়ার মাও হাসলেন। ক তো কো?

আমরুজ (জামরুল) তলায়।

হ ঠিকঐ কইছস।

এর লেইগা জলচকিডা আমরুজ তলায়ঐ দিছি।

এই বাড়ির রান্নাঘর উঠানের একেবারে মাঝখানে। দক্ষিণের ভিটায় দোতালা বিশাল একখানা টিনের ঘর। ঘরটার নিচের তালাও পাটাতন করা। দুইতালাতেই রেলিং দেওয়া বারান্দা। দূর থেকে গাছপালার মাথা ছাপিয়ে মিয়াবাড়ির দোতালা ঘর দেখা যায়।

বাড়ির পশ্চিম আর উত্তরের ভিটায় আছে আরও দুইখান পাটাতন ঘর। সারাবছর তালামারা থাকে ঘর দুইটা। এতদিন হল এই বাড়িতে আছে কুট্টি এক দুইবারের বেশি ঘর দুইটা খুলতে দেখে নাই। বন্ধই যদি থাকবো ঘর তাইলে রাখনের কাম কী!

তিনখান ঘরের প্রত্যেকটার থেকে পাঁচসাত কদম করে জায়গা হবে বাদ দিয়ে পুবের ভিটায় রান্নাঘর। রান্নাঘর অবশ্য কায়দার। দেশ গ্রামের রান্নাঘরের লগে মিলে না। মাথার ওপর টিনের চালা নাই, টালির ছাদ দেওয়া।

এই রান্নাঘরের পিছনেই মাঝারি মাপের একটা জামরুল গাছ। বাড়ি এলে কোনও কোনও সময় জলচৌকি পেতে জামরুল তলায় বসে আরাম পান রাজা মিয়ার মা। শীতকাল, গরমকাল সব সময়ই দেহে তাঁর গরম ভাব। দুই চারকদম হাঁটলেই ঘামে বজবজ করে শরীর। ভিতর থেকে ঠেলে বের হয় গরম। জামরুল তলায় বসলে গরম কমে। জায়গাটা সব সময়ই ঠান্ডা। জামরুলের পাতায় ঝিরিঝিরি হাওয়া সব সময়ই থাকে। আজ সকালে, বেশ খানিকটা বেলা হয়ে যাওয়ার পর কুট্টির কাঁধে ভর দিয়ে জামরুল তলার দিকেই যাচ্ছেন রাজা মিয়ার মা। গাভিন গাইয়ের মতন দেহ বলে তাঁর হাঁটাচলা খুবই ধীর। চোখের পলকে যাওয়া যায় এমন জায়গায় যেতেও সময় লাগে।

AMARBOI.COM

এখনও লাগছে।

তবে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছেন রাজা মিয়ার মা। গলার আওয়াজও তাঁর দেহ মেজাজের মতোই। ভালমন্দ যে কোনও কথা বললেই কলিজা কাঁপে। অনেকদিন ধরে এই বাড়িতে থাকার পরও, এখনও কলিজা কাঁপছে কুট্টির। বুজান বাড়িতে এলে সারাক্ষণই আতঙ্কে থাকে সে। ভিতরে ভিতরে অপেক্ষা করে কবে বাড়ি থেকে যাবেন তিনি, কবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে কুট্টি।

রাজা মিয়ার মা বাড়িতে না থাকলে বাড়ির মালিক কুট্টি। বড়বুজান আছেন, বাঁধা কামলা আছে আলফু। তাতে কিছু যায় আসে না। বড়বুজান বয়সের ভারে পঙ্গু। সারাক্ষণই শুয়ে আছেন বিছানায়। হাঁটাচলা করা তো দূরের কথা, বিছানায় উঠে বসতে পর্যন্ত পারেন না। কথা বলেন হাঁসের ছায়ের মতো চিঁচিঁ করে। আর আলফুকে তো মানুষই মনে হয় না কুট্টির। মনে হয় গাছপালা, মনে হয় ঝোপঝাড়, গিরস্ত বাড়ির সামনে নাড়ার পালা। জ্যাতা (জ্যান্ত) একজন মানুষকে যে কেন এমন মনে হয় কুট্টির! বোধহয় কথা আলফু বলে না বলে। বোধহয় ভালমন্দ সব ব্যাপারেই আলফু নির্বিকার বলে। মুখে ভাষা থাকার পরও আলফু বোবা বলে।

রাজা মিয়ার মা বললেন, বুদ্দিসুদ্দি তর ভালঐ কুট্টি, তারবাদেও সংসার করতে পারলি না ক্যা?

এমনিতেই বুজানের দেহের ভারে কুঁজা হয়ে গেছে কুট্টি, মনে মনে ভাবছে কখন ফুরাবে এইটুকু পথ, কখন বুজানকে জলচৌকিতে বসিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে সে, তার উপর আথকা এরকম একখানা কথা, তাও বাজখাঁই গলায়, কুট্টি ভড়কে গেল। কথাটা যেন বুঝতে পারল না এমন গলায় বলল, কী কইলেন বুজান?

এত কাছে থেকেও তাঁর কথা কেন বুঝতে পারেনি কুট্টি এই ভেবে রাজা মিয়ার মা একটু রাগলেন। গলা চড়ল তাঁর। এই ছেমড়ি (ছুঁড়ি), কানে কম হোনচনি?

না।

তয়?

হুনছি ঠিকঐ।

কথার তাইলে জব দেচ না ক্যা?

ততক্ষণে জামরুল তলায় পৌঁছে গেছে তারা। জায়গা মতো পেতে রাখা জলচৌকিতে রাজা মিয়ার মাকে ধরে বসাল কুট্টি। কুট্টির মতো তিন কুট্টি বসতে পারে যে চৌকিতে সেই চৌকিতে একা বসার পরও চৌকির চারদিক দিয়ে উপচে পড়লেন রাজা মিয়ার মা। ব্যাপারটা খেয়াল করল না কুট্টি। বুজানকে বসিয়ে দেওয়ার পরই ক্লান্তির শ্বাস ফেলল। হাসিমুখে বলল, এমতেই হতিনের সংসার তার মইদ্যে দেয় না ভাত। খিদার কষ্ট আমি সইজ্জ করতে পারি না বুজান।

বাড়ির নামার দিকে অনেকগুলি আমগাছ নিবিড় হয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে রাজা মিয়ার মা বললেন, বেডা করতো কী?

গিরস্তালী করতো। ছোড গিরস্ত। শিমইল্লা বাজারে মদিদোকানও আছিলো।

তয় তো অবস্তা ভাল। ভাত দিতে পারতো না ক্যা?

সংসারডা বড়। আগের ঘরের ছয়ডা পোলাপান। ভাই বেরাদর আছে চাইর পাচজন।

বেডার তো তাইলে বস (বয়স) অনেক।

কুট্টি হাসল। হ আমার বাপের বইস্যা।

এমুন বেডার লগে মা বাপে তরে বিয়া দিল ক্যা?

কী করবো! এতডি বইন আমরা! আমি বেবাকতের বড়। আমার বিয়া না অইলে অন্যডির বিয়া অয় না।

এর লেইগা হতিনের সংসারে মাইয়া দিবো?

কুট্টি কথা বলল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল তারপর আনমনা হয়ে গেল।

রাজা মিয়ার মা বললেন, গরিব মাইনষের ঘরে মাইয়া না অওনঐ ভাল। তর অন্য বইনডির বিয়া অইছে?

দুইজনের অইছে।

আর আছে কয়জন?

অহনও দুইজন আছে।

তর বাপে করে কী?

শীতের দিনে লেপ তোশকের কাম করে। খরালিকালে কামলা খাডে।

এতে সংসার চলে?

না চলে না।

তয়?

খাইয়া না খাইয়া বাইচ্চা আছে মানুষটি।

এতডি মাইয়া না অইয়া দুই একটা পোলা অইলে কাম অইতো। জুয়ান পোলা থাকলে রুজি কইরা সংসার চালাইতো।

পোলার আশায়ই বলে এতডি মাইয়া জন্ম দিছে আমার মা বাপে। বুজছে পোলা অইবো, অইছে মাইয়া।

একটু থেমে রাজা মিয়ার মা বললেন, তুই তগো বাইত্তে যাচ না?

না।

ক্যা?

মা বাপে আমারে দেকতে পারে না। বাইত্তে গেলে ধুর ধুর কইরা খেদাইয়া দেয়।

কচ কী ?

হ।

ক্যা, এমুন করে ক্যা?

ঐ যে জামাই বাইত থিকা পলাইয়া আইয়া পড়ছি, এর লেইগা।

খাইতে পরতে না দিলে আবি না?

খাইতেও দিবো না পরতেও দিবো না, তার উপরে হতিনের সংসার। ওহেনে মানুষ থাকে কেমতে! একখান কাপোড়ে আমি বচ্ছর কাডাইতে পারি বুজান, হতিনের গনজনা সইজ্জ করতে পারি, স্বামী আমার লাগে না, খালি একখান জিনিসের কষ্ট আমার। খিদা।

AMARBOI.COM

খিদার কষ্ট আমি সইজ্জ করতে পারি না। পেড ভইরা খাওন পাইলে আমি আর কিছু চাই না। আমার মা বাপে এইডা বোজে না। হেরা মনে করে আমি তাগো মান ইজ্জত ধুলায় মিশাইয়া দিছি। কন তো বুজান, পেডে খিদা লইয়া মান ইজ্জত দেহন যায়নি!

কথা বলতে বলতে শেষ দিকে গলা বুজে এল কুট্টির। ঠিক তখনই ছনুবুড়িকে দেখা গেল মিয়াবাড়ির দিকে হেঁটে আসছে।

মিয়াদের ভিটায় উঠেই জামরুল তলায় রাজা মিয়ার মাকে দেখতে পেল ছনুবুড়ি। দেখে মনের ভিতর অপূর্ব এক আনন্দ হল। নিজের বাড়িতে, নিজের বউর কাছে হওয়া খানিক আগের অপমান একদম ভুলে গেল। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে কুঁজা শরীর সোজা করবার চেষ্টা করল। তারপর দ্রুত হেঁটে জামরুল তলায় এল। ফোকলা মুখখানা হাসি হাসি করে বলল, আরে বুজানে বাইত্তে আইছে নি? কবে আইলেন? চোক্কে আইজকাইল একফোডাও দেহি না, তাও দূর থিকা আপনেরে দেকছি। আদতে আপনেরে দেহি নাই বুজান, দেকলাম আপনেগো বাড়ির আসপাস তলাডা জোছনা রাইতের লাহান ফকফক করতাছে। দিনে দোফরে জোছনা উটবো কেমতে! বোজলাম এইডা তো জোছনা না, এইডা তো আমার বুজানে। বুজানের শইল্লের রঙখান জোছনার লাহান। আন্দার ঘরে বইয়া থাকলেও ফকফইক্কা অইয়া যায়। কবে আইছেন বুজান?

গলা যতটা নরম করা যায় করলেন রাজা মিয়ার মা। পশশু দিন আইছি।

মাওয়ার লনচে?

হ। মাওয়ার লনচ ছাড়া আমু কেমতে ক? ছিন্নগরের লনচে আইলে এতদূর থিকা আমারে বাইত্তে আনবো কেডা?

রাজা মিয়ার মায়ের অদূরের মাটিতে বসল ছনুবুড়ি। ক্যা আলফু গিয়া আনবো! আপনে তো আইবেন পালকিতে কইরা!

এতদূর থিকা পালকিতে আইলে খরচা অনেক। মাওয়া থিকা আহন ভাল। তয় দিনডা পুরা লাইগ্যা যায়। বিয়ান ছয়ডার লনচে উটলে বিয়াল অইয়া যায়। ছিন্নগর দিয়া আইলে দুইফইরা ভাত বাইত্তে আইয়া খাওন যায়।

ভাতের কথা শুনে পেটের ভিতর ক্ষুধাটা ছনুবুড়ির মোচড় দিয়ে উঠল। বহু বহু বছরের পুরানা নাকে ভেসে এল গরম ভাপ ওঠা ভাতের গন্ধ। অহন যুদি একথাল ভাত পাওয়া যাইতো! লগে সালুন না অইলেও চলতো। খালি ইট্টু নুন, খালি একহান কাচা মরিচ।

নিজের অজান্তেই জিভ নাড়ল ছনুবুড়ি, ঢোক গিলল। রাজা মিয়ার মা এসব খেয়াল

করলেন না। খেয়াল করল কুট্টি। জিজ্ঞাসা করতে চাইল, এমুন কইরা ঢোক গিললা ক্যা বুজি? খিদা লাগছেনি? বেইল অইছে, অহনতরি কিছু খাও নাই!

তার আগেই রাজা মিয়ার মা বললেন, রাস্তাডা অইয়া গেলে এই হগল যনতন্না আর থাকবো না।

ক্ষুধার জ্বালায় আনমনা হয়েছিল ছনুবুড়ি। কথাটা বুঝতে পারল না। বলল, কীয়ের যনতন্না বুজান?

এই যে ঢাকা থিকা লনচে কইরা বাইত্তে আহন! আমি মোডা মানুষ, একলা চলাফিরা করতে পারি না। ঢাকা থিকা চাকর লইয়াহি। বহুত খরচা পইড়া যায়। রাস্তাডা অইয়া গেলে পোলার গাড়ি লইয়া ভো কইরা আইয়া পড়ুম। এক দেড়ঘণ্টা লাগবো বাইত্তে আইতে। দরকার অইলে যেইদিন আমু হেইদিনই ফিরত যাইতে পারুম। রাজা মিয়ায় কইছে বড় সড়ক অইয়া যাওনের পর সড়ক থিকা গাড়ি আইতে পারে এমন একখান আলট (ছোট সড়ক) বাইন্দা দিব বাড়ি তরি (পর্যন্ত)। নিজেগো গাড়ি লইয়া তাইলে বাড়ির উডানে, এই আমরুজ তলায় আইয়া পড়তে পারুম। কুট্টি খালি আমারে ধইরা গাড়ি থিকা নামাইবো। আর কোনও মানুষজন লাগবো না। বুজানে যতদিন বাইচ্চা আছে হেরে তো না দেইক্কা পারুম না! এই বাড়িঘর, জাগাজমিন, খেতখোলা, গাছগাছলা এই হগল তো না দেইক্কা পারুম না!

রাজা মিয়ার মায়ের এত কথার একটা কথা কানে লাগল ছনুবুড়ির। গাছগাছলা। লগে লগে আগের দিনকার কূটবুদ্ধিটা মাথায় এল। দবির গাছির মুখ ভেসে উঠল ছানিপড়া চোখে। বুদ্ধি খাটায়া যদি ভাল মানুষ সাজা যায় বুজানের কাছে তাহলে দুপুরের ভাত এই বাড়িতে খাওয়া যাবে। কোনও না কোনওভাবে বুজানকে খুশি করতে না পারলে ভাত তো দূরের কথা এক গেলাস পানি চাইলেও বুজান বলবেন, তরে অহন পানি দিব কেডা? পুকঐরে গিয়া খাইয়া আয়।

এত টাকা পয়সা থাকলে কী হবে, এত জায়গাজমিন, খেতখোলা থাকলে কী হবে রাজা মিয়ার মা দুনিয়ার কিরপিন (কৃপণ)। স্বার্থ আদায় না হলে কারও মুখের দিকে তাকান না।

ছনুবুড়ি মনে মনে বলল, স্বার্থঐত্তো, বড় স্বার্থ। প্যাচখান লাগাইয়া দেহি। কাম না অইয়া পারবো না।

গলা খাঁকারি দিয়ে কথা মাত্র শুরু করবে ছনুবুড়ি তার আগেই দোতালা ঘর থেকে খুনখুনা গলায় কুট্টিকে ডাকতে লাগলেন বড়বুজান। কুট্টি ও কুট্টি, কই গেলি রে? আমি পেশাব করুম। আমারে উডা। ডহি (এক প্রকারের হাঁড়ি) বাইর কর।

রাজা মিয়ার মা কান খাড়া করে বললেন, ঐ কুট্টি, বুজানে ডাক পারে। তাড়াতাড়ি যা।

মাত্র পা বাড়িয়েছে কুট্টি, বললেন, হোন, বুজানরে পেশাব করাইয়া ভাত চড়া। সালুন রানবি কী?

মাছ আছে।

কী মাছ?

AMARBOI.COM

কই আছে, মজগুর (মাগুর) আছে। আপনে আইবেন হুইন্না পুস্কঐর থিকা ধইরা রাখছে আলফু। কোনডা রান্দুম?

মজগুর রান।

আইচ্ছা।

দ্রুত হেঁটে দোতালা ঘরের দিকে চলে গেল কুট্টি।

এই বাইত্তে আইজ মজগুর মাছ রানবো (রান্না)। গরম ভাতের লগে মজগুর মাছের তেলতেলা সুরা (ঝোল) একটা দুইটা টুকরা আর একথাল ভাত যুদি খাওন যায়! শীতের দিন আইতাছে। এই দিনের জিয়াইন্না (জিয়ল) মাছ বহুত সাদের অয়। ওই রকম মাছ দিয়া একথাল ভাত যুদি খাওন যায়!

মুখের ভিতর জিভটা আবার নড়ল ছনুবুড়ির। আবার একটা ঢোক গিলল সে। তারপর খুবই সরল ভঙ্গিতে কথা শুরু করল। একটা কামলায় আপনেগো অয় বুজান?

কথাটা বুঝতে পারলেন না রাজা মিয়ার মা। ছনুবুড়ির মুখের দিকে তাকালেন। ক্যা অইবো না ক্যা? কাম কাইজ তো আলফু ভালঐ করে।

হ তা তো করেঐ। তয় একলা মানুষ কয়মিহি খ্যাল (খেয়াল) রাকবো! বাড়িঘরের কাম, খেতখোলার কাম, ছাড়া বাইত্তে এতডি গাছগাছলা!

বাড়িঘরের কাম কিছু আছে, খেতখোলায় কোনও কামঐ নাই। অহন তো আর আগের দিন নাই, আমন আউসের চাষ দেশগেরামে অয়ঐ না। অয় খালি ইরি। আমগো বেবাক খেতেই ইরি অয়। তাও বর্গা দেওয়া। বর্গাদাররা ধান উডাইয়া অরদেক (অর্ধেক) ভাগ কইরা দেয়। বছরের খাওনডা রাইখা বাকিডা রাজা মিয়া বেইচ্চা হালায়। খেতখোলার মিহি আলফুর চাইতে অয় না। তয় গাছগাছলার মিহি চায়। ছাড়াবাড়ির মিহি চায়।

হ দোষ তো আলফুর না, দোষ অইলো দউবরার।

রাজা মিয়ার মা ভুরু কুঁচকে বললেন, কোন দউবরা? কিয়ের দোষ?

বুজানের আগ্রহ দেখে ছনুবুড়ি বুঝে গেল, কাজ হবে। পেটের ক্ষুধা পেটে চেপে কথা বলার ভঙ্গি আরও সরল করে ফেলল সে। মুখখান এমন নিষ্পাপ করল যেন এই মুখে কোনও কালেই পড়েনি পাপের ছায়া।

ছনুবুড়ি বলল, ওই দ্যাহো, কথাডা আপনেরে তো কইয়াঐ হালাইলাম। এইডা মনে অয় ঠিক অইলো না। কূটনামি বহুত খারাপ জিনিস।

রাজা মিয়ার মা গম্ভীর গলায় বললেন, কী কবি তাড়াতাড়ি ক ছনু। কূটনামি তর করন লাগবো না। আসল কথা ক।

হ আসল কথাঐ কমু। আপনে আমার থিকা অনেক ছোড তাও আপনেরে আমি বুজান কই। আপনে আমারে কন তুই কইরা। এতে ভালঐ লাগে আমার। আমি আপনেরে বহুত মাইন্য করি। আপনেরে যহন বুজান কইরা ডাক দেই মনে অয় আপনে আমার বড় বইন। আমি আপনের ছোড।

এবার ছনুবুড়িকে জোরে একটা ধমক দিলেন রাজা মিয়ার মা। এত আল্লাইদ্দা প্যাচাইল পারিছ না। আসল কথা ক।

AMARBOI.COM

এই ধমক একদমই কাবু করতে পারল না ছনুবুড়িকে। সে যা চাইছে কাজ সেই মতোই হচ্ছে। রাজা মিয়ার মা যত বেশি রাগবেন তার তত লাভ। কথা শেষ করে ভাতের কথাটা তুললেই হবে।

ছনুবুড়ি উদাসীনতার ভান করল। দউবরারে চিনলেন না? দবির গাছি। গাছ ঝুড়ে। পাড়া বেরাইন্না একখান মাইয়া আছে, নূরজাহান। খালি এই বাইত্তে যায় ঐ বাইত্তে যায়। ডাঙ্গর মাইয়া, বিয়া দিলে বচ্ছরও ঘোরব না, আহুজ পড়বো। নূরজাহানরে অহন খালি বড় সড়কে দেহি। মাইট্টাইলগো কনটেকদার আছে আলী আমজত, খালি হেই বেডার লগে গুজুর গুজুর, ফুসুর ফুসুর। কোনদিন হোনবেন পেটপোট বাজাইয়া হালাইছে।

এবার গলা আরেকটু চড়ালেন রাজা মিয়ার মা। তর এই বেশি প্যাচাইল পাড়নের সবাবটা গেল না ছনু। এক কথা যে কত রকমভাবে ঘুরাইয়া প্যাচাইয়া কচ। দউবরা কী করছে, কীয়ের দোষ তাড়াতাড়ি ক আমারে।

আপনে তো বাইত্তে আইছেন পশশু দিন, দউবরা আপনের লগে দেহা করে নাই?

না।

কন কী?

আমি কি তর লগে মিছাকথা কইনি?

ছি ছি ছি ছি ছি আপনে মিছাকথা কইবেন ক্যা বুজান? আপনে কোনওদিন মিছা-কথা কইছেন? তয় দউবরা আপনের লগে দেহা করলো না? এতবড় সাহস অর?

আরে কী করছে দউবরা?

কাইল বিয়ালে অরে দেখলাম আপনেগো ছাড়াবাইত্তে।

কচ কী! কী করে?

ছনুবুড়ি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, আর কী করবো! অর যা কাম।

খাজুরগাছ ঝোড়ে?

হ।

আমার ছাড়াবাড়ির খাজুরগাছ?

হ।

আমার লগে দেহা না কইরা, আমার লগে কথা না কইয়া তো দউবরা কোনওদিন এমুন কাম করে না! জীবন ভইরা ও আমার গাছ ঝোড়ে! আমি বাইত্তে না থাকলে বুজানের লগে কথা কইয়া যায়। দউবরা তো ইবার আহে নাই! আইলে বুজানে আমারে কইতো!

না আহে নাই। দউবরা নিজ মুখেঐ আমারে কইছে।

কী কইলো?

কইলো যেই কয়দিন পারি বুজানগো ইবার জানামু না। জানাইলেঐ অরদেক রস দেওন লাগবো। পয়লা কয়দিন রসের দাম যায় খুব। কয়ডা আলগা পয়সা কামাইয়া লই। তারবাদে জানামু।

রাজা মিয়ার মা আকাশের দিকে তাকালেন। শেষ হেমন্তের আকাশ প্রতিদিনকার মতো নতুন। দুপুরের মুখে মুখে দেশগ্রামের মাথার উপর রোদে ভেসে যাচ্ছে আকাশ।

AMARBOI.COM

গাছগাছালির বন কাঁপিয়ে হাওয়া বইছে। রাজা মিয়ার মা সেই হাওয়া আঁচ করলেন। হাওয়ায় মৃদু শীতভাব। এসময় রস পড়বার কথা না। গাছেরা রসবতী হয়েছে ঠিকই তবে রস পড়বে আরও সাত আটদিন পর।

ছনুবুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত গলায় রাজা মিয়ার মা বললেন, অহনতরি রস পড়নের কথা না। শীত পড়ে নাই, রস পড়বো কেমতে?

লগে লগে পরনের মাইট্টা (মেটে) রঙের ছেঁড়া কাপড় গায়ে জড়াবার চেষ্টা করল ছুনবুড়ি। কন কি শীত পড়ে নাই? শীতে বলে আমি মইরা যাই! আপনে মোডা মানুষ, বড়লোক, শইল্লের গরম আর টেকার গরম মিল্লা শীত আপনে উদিস পাইবেন কেমতে? হোনেন বুজান, আপনের ছাড়া বাড়ির বেবাকটি খাজুরগাছ কাইল হারাদিন ধইরা ঝোড়ছে দউবরা। আইজ বিয়ানে দউবরারে আমি দেকলাম রসের ভার কান্দে লইয়া হালদার বাইত মিহি যায়। রস কইলাম পড়তাছে। দউবরা কইলাম আপনের বাড়ির রস বেইচ্চা আলগা পয়সা কামাইতাছে।

শীত পড়ল কী পড়ল না, রস সত্য সত্যই পড়ল কী পড়ল না এবার আর ওসব ভাবলেন না রাজা মিয়ার মা। বাজখাঁই গলায় চিৎকার করে উঠলেন। এতবড় সাহস গোলামের পোর! আমারে না জিগাইয়া আমার গাছ ঝোড়ে! ঐ কুট্টি, আলফুরে ডাক দে। ক যেহেন থিকা পারে দউবরারে বিচরাইয়া লইয়াইতে।

বড়বুজানের কাজ সেরে অনেকক্ষণ হল রান্নাঘরে এসে ঢুকেছে কুট্টি। ভাত চড়িয়ে মাগুর মাছ কুটেছে। মাগুর মাছ না ঘষে খান না বুজানে। এখন সেই মাছ ধারাল থানইটের ওপর ফেলে অতিযত্নে ঘষছে কুট্টি। ঘষে ঘষে খয়েরি রঙ সাদা করে ফেলছে। এই ফাঁকে বুজান এবং ছনুবুড়ির সব কথাই শুনেছে। শুনে ছনুবুড়ির ওপর বেদম রাগ হয়েছে। পরিষ্কার বুঝেছে দবির গাছির নামে মিছাকথা বলছে ছনুবুড়ি। নিশ্চয় কোনও মতলব আছে।

তবু বুজান যখন বলেছেন আলফুকে না ডেকে উপায় নাই।

কোটা মাছ মালশায় রাখল কুট্টি। ভারী একখানা সরা দিয়ে ঢাকল। তারপরই বিলাইটার (বিড়াল) কথা মনে হল। চারদিন হল বিয়াইছে (বাচ্চা দিয়েছে)। ফুটফুটা পাঁচটা বাচ্চা। দোতালার এককোণে ফেলে রাখা ভাঙা চাঙারিতে গিয়ে বসেছিল বাচ্চা দিতে, সেখান থেকে আর নামেনি। মেন্দাবাড়ির হোলাটার (হুলো) হাত থেকে বাচ্চাদের রক্ষা করার জন্য তাদের ছেড়ে নড়ছে না। পাহারা দিচ্ছে। পাহারা দিতে দিতে না খেয়ে কাহিল হয়ে গেছে। বিলাইদের নিয়ম নীতি আজব। হোলা বিলাইরা নাকি এই রকম কচিছানা খেয়ে ফেলে। মা বিলাইরা এজন্য ছানা পাহারা দেয়।

বাচ্চা দেওয়ার আগে হোলাটা দিনরাত এই বাড়িতে পড়ে থাকত। দুইটাতে কী ভাব তখন! সময় অসময় নাই রঙ ঢঙ করে। এখন সেই কর্মের ফসল একজনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য না খেয়ে মরে যাচ্ছে আরেকজন। দুনিয়াতে মা জীবদেরই কষ্ট বেশি। পুরুষদের কষ্ট নাই।

এসব ভেবে ফেলে আসা সংসারের কথা মনে হল কুট্টির। স্বামী পুরুষটার কথা মনে হল। তারপরই চমকাল কুট্টি। হোলাটা চারদিন ধরে প্রায়ই আসছে এই বাড়িতে।

AMARBOI.COM

নিজের ঔরসজাতদের সামনে ভিড়তে পারছে না মা বিলাইয়ের ভয়ে। এখন বাড়িতে ঢুকে যদি মাছের গন্ধ পায়, যদি রান্নাঘরে কাউকে না দেখে তাহলে মাছ কোথায় আছে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। যে সরা দিয়ে মাছ ঢেকেছে কুট্টি ওই সরা থাবার ধাক্কায় ফেলে দিতে সময় লাগবে না তার। যদি মাছ সব হোলায় খেয়ে ফেলে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

সরার ওপর একটা থানইট চাপা দিল কুট্টি : সেই ফাঁকে শুনতে পেল জামরুল তলায় বসে মতলবের কথাটা বলছে ছনুবুড়ি। বুজান, এতদিন পর দেশে আইছেন আপনে, আপনেরে আমি বহুত মাইন্য করি, আইজ আপনে আমারে এক ওক্ত খাওয়ান। আপনেরা ধনী মানুষ, আমারে এক ওক্ত খাওয়াইলে আপনেগো ভাত কমবো না! আল্লায় দিলে আরও বাড়বো। খাইয়াইবেন বুজান?

পশ্চিম উত্তরের ভিটার পাটাতন ঘর দুইটার মাঝখান দিয়ে পথ। সেই পথে খানিক দূর আগালে দুই তিনটা বাঁশঝাড়, তিন চারটা আম আর একটা কদমগাছ। সারাদিন আবছা মতন অন্ধকার জায়গাটা। পাটাতন ঘরের চালা আর গাছপালার মাথা ডিঙিয়ে রোদ এসে কখনও এখানকার মাটিতে পড়তে পারে না। যদিও বা পড়ে দুই এক টুকরা, বাঁশঝাড় তলায় জমে থাকা শুকনা বাঁশপাতার উপর রোদের টুকরাগুলিকে দেখা যায় মাটির নতুন হাঁড়ির ভাঙা চারার মতো। রাজা মিয়ার মা যেদিন বাড়িতে এলেন সেদিন থেকে এদিকটায় কাজ করছে আলফু।

বাঁশঝাড় ছাড়িয়ে দূরে, বাড়ির নামার দিকে পায়খানা ঘর। বিক্রমপুর অঞ্চলের বাড়িগুলি তৈরি হয় বাড়ির চারদিক থেকে মাটি তুলে উঁচু ভিটা তৈরি করে তার ওপর। এই ভিটার ওপর আবার ভিটা করে তৈরি হয় ঘর। যদি পাটাতন ঘর হয় তাহলে ভিটা করবার দরকার হয় না। বাড়ির যেদিকটা সবচাইতে দরকারি, বাড়ি থেকে বের হবার জন্য দরকার, সেদিকটাকে বলা হয় বারবাড়ি। বাড়ি তৈরির সময় বারবাড়ির দিক থেকে মাটি তোলার পরও বের হবার সময় খানিকটা নিচের দিকে নামতে হয়, ওঠার সময় ও উঠতে হয় কয়েক কদম। বর্ষাকালে চকমাঠ ভরে পানি যখন বাড়ির ভিটার সমান উঁচু হয়ে ওঠে তখন বাড়িগুলিকে দেখা যায় ছাড়া ছাড়া দ্বীপের মতন। এক বাড়ির লগে আরেক বাড়ির যোগাযোগের উপায় ডিঙিনৌকা, কোষা নৌকা।

বনেদি বাড়িগুলির পায়খানা ঘর থাকে বাড়ির সবচাইতে কম দরকারি, জঙ্গলা মতন দিকটায়। ঘরদুয়ারের পিছনে, অনেকটা দূর এগিয়ে একেবারে নামার দিকে। গাছপালার আড়ালে এমনভাবে থাকবে ঘরখানা যেন দূর থেকে না দেখা যায়।

AMARBOI.COM

এই অঞ্চলের মানুষের রুচির পরীক্ষা হয় পায়খানা ঘর দেখে। মেয়ের বিয়ার সম্বন্ধ আসলে পাত্রপক্ষের কোনও না কোনও মুরব্বি কোনও না কোনও অছিলায় বাড়ির ওই ঘরখানা একবার ঘুরে আসবেন। ওই ঘর দেখে বাড়ির মানুষ আর মেয়ের রুচি বিচার করবেন। এইসব কারণে বড় গিরস্ত আর টাকা পয়সাআলা লোকের বাড়ির পায়খানা ঘরখানা হয় দেখবার মতন। ভাঙনের দিকে চারখানা শালকাঠের মোটা খাম (থাম) পুতে বাড়ির ভিটা বরাবর টংঘরের মতো করে তৈরি করা হবে ঘরখানা। কড়ুই কাঠ দিয়ে পাটাতন করা হবে। মাথার ওপর ঢেউটিনের দো কিংবা একচালা। চারদিকে ঢেউটিনের বেড়া। কখনও কখনও বেড়া চালা রং করা হয়। খামগুলি পোতবার আগে আলকাতরা, মাইট্টাতেলের (মেটেতেল) পোচ দেওয়া হয়। তাতে কাঠে সহজে ঘুণ ধরে না।

বাড়ির ভিটা থেকে পায়খানা ঘরে যাওয়ার জন্য থাকে লঞ্চ স্টিমারে চড়ার সিঁড়ির মতো সিঁড়ি। সিঁড়ির দুইপাশে, পুলের দুইপাশে যেমন থাকে রেলিং, তেমন রেলিং। বাড়ির বউঝিরা যেন পড়ে না যায়।

রাজা মিয়াদের বাড়ির পায়খানা ঘরখানা ঠিক এমন। বাঁশঝাড়তলা ছাড়িয়ে। এই জায়গাটা নিঝুম, ঝরাপাতায় ভর্তি। সারাদিন এই দিকটাতেই কাজ করছে আলফু। বাঁশঝাড় পরিষ্কার করছে, ঝরাপাতা ঝাড়ু দিয়ে এক জায়গায় ভুর দিচ্ছে। আগাছা ওপড়াচ্ছে। সাপখোপের বেদম ভয় রাজা মিয়ার মার। তাঁর পায়খানায় যাওয়ার পথ পরিষ্কার না থাকলে মুশকিল। আলফু সেই পথ পরিষ্কার রাখছে।

কুট্টি এসব জানে। জানে বলেই সোজা এদিকটায় এল। এসে একটু অবাকই হল। আলফু নাই। পরিষ্কার বাঁশঝাড়তলা নিঝুম হয়ে আছে। থেকে থেকে উত্তরের হাওয়া বইছে। সেই হাওয়ায় শন শন করছে বাঁশপাতা।

আলফু গেল কোথায়!

পশ্চিমের ঘরটার পিছন দিয়ে একটুখানি পথ আছে দক্ষিণ দিককার পুকুর ঘাটে যাওয়ার। সেই পথের মাঝ বরাবর পুরানা একটা চালতাগাছ। কুট্টি আনমনা ভঙ্গিতে সেই পথে পা বাড়াল। একটুখানি এগিয়েই আলফুকে দেখতে পেল উদাস হয়ে চালতাতলায় বসে আছে। হাতে বিড়ি জ্বলছে কিন্তু বিড়িতে টান দিচ্ছে না।

কুট্টি অবাক হল। রাজা মিয়ার মা আছেন বাড়িতে তারপরও কাজে ফাঁকি দিয়ে চালতাতলায় বসে আছে আলফু! এতবড় সাহস হল কী করে!

দূর থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলফুকে দেখতে লাগল কুট্টি।

জোঁকের মতো তেলতেলা শরীর আলফুর। মাথার ঘন চুল খাড়া খাড়া, কদমছাট দেওয়া। পিছন থেকে দেখছে বলে আলফুর মুখ কুট্টি দেখতে পাচ্ছে না। পিঠ দেখছে, ঘাড় দেখছে আর দেখছে মাজা। পরনে সবুজ রঙের লুঙ্গি। মাজার কাছে গামছা বাঁধা। গামছাটা এক সময় লাল ছিল, দিনে দিনে রঙ মুছে কালচে হয়ে গেছে।

চালতাপাতার ফাঁক দিয়ে আলফুর তেলতেলা পিঠে, ঘাড়ের কাছাকাছি এসে পড়েছে একটুকরা রোদ। সেই রোদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করেই শরীরের ভিতর অদ্ভুত এক উষ্ণতা টের পেল কুট্টি। অদ্ভুত এক উত্তেজনায় ভরে গেল তার শরীর। মুহূর্তের জন্য মনে পড়ল ফেলে আসা স্বামী মানুষটার কথা। রাত, অন্ধকার ঘর, পুরুষ শরীর,

AMARBOI.COM

শ্বাস প্রশ্বাসের গন্ধ, ভিতরে ভিতরে দিশাহারা হয়ে গেল কুট্টি। ভুলে গেল সে কেন এখানে আসছে, কী কাজে!

মানুষের পিছনে যত নিঃশব্দেই এসে দাঁড়াক মানুষ, কোনও না কোনও সময় নিজের অজান্তেই মানুষ তা টের পায়। বুঝি আলফুও টের পেল। বিড়িতে টান দিয়ে আনমনা ভঙ্গিতেই পিছনে তাকাল সে। তাকিয়ে কুট্টিকে দেখে অবাক হয়ে গেল। কুট্টির দিকে তাকিয়ে রইল।

কুট্টির তখন এমন অবস্থা কিছুতেই আলফুর মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। চোখ মুখ নত হয়ে গেছে গভীর লজ্জায়। এক পায়ে আঁকড়ে ধরেছে আরেক পায়ের আঙুল।

ধীর গম্ভীর গলায় আলফু বলল, কী?

লগে লগে স্বাভাবিক হয়ে গেল কুট্টি। নিজেকে সামলাল। আলফুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, বুজানে কইলো দবির গাছিরে ডাইক্কা আনতে। মনে অয় হালদার বাইত্তে গেছে গাছ ঝোড়তে। যান তাড়াতাড়ি যান।

বিড়িতে শেষটান দিল আলফু তারপর উঠে দাড়াল। আর একবারও কুট্টির মুখের দিকে তাকাল না, একটাও কথা বলল না, বারবাড়ির দিকে চলে গেল।

তারপরও চালতাতলায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল কুট্টি।

AMARBOI.COM

দোতলা ঘরের সামনের দিককার বারান্দায় খেতে বসেছে ছনুবুড়ি। টিনের খাউব্বা (গামলা মতন) থালায় ভাত তরকারি নুন সব এক সঙ্গে দিয়েছে কুট্টি। টিনের মগের একমগ পানি দিয়েছে। তারপর নিজে চলে গেছে মাঝের কামরায়।

মাঝের কামরার একপাশে কালো রঙের কারুকাজ করা উঁচু পালঙ্ক। দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে সেই পালঙ্কে কাত হয়েছেন রাজা মিয়ার মা। কুট্টি তাঁর পা টিপে দিচ্ছে। রাজা মিয়ার মা যতক্ষণ চোখ না বুজবেন, মুখ হাঁ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঙো ঙো করে শব্দ করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ছুট্টি নাই কুট্টির। চোখ বুজে মুখ হাঁ করে ওরকম শব্দ করার মানে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি। বুজান ঘুমালে তবে খেতে যাবে কুট্টি। দুপুর বয়ে যাচ্ছে। ক্ষুধায় পেট পুড়ে যাচ্ছে তার।

বুজানের পা টিপছে আর খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে ছনুবুড়ির খাওয়া দেখছে কুট্টি। কুঁজা হয়ে বসে ফোকলা মুখে হামহাম করে খাচ্ছে। একটার পর একটা লোকমা (নলা) দিচ্ছে মুখে। কোনওদিকে তাকাচ্ছে না।

এই বয়সেও এত খিদা থাকে মানুষের!

কুট্টির ইচ্ছা হল ছনুবুড়িকে জিজ্ঞাসা করে, ও বুজি আট্টু ভাত লইবানি? আট্টু ছালুন!

বুজানের ভয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় না। এখনও ঘুমাননি বুজান। তার পা টিপা ফেলে ছনুবুড়ির খাওয়ার তদারকি করছে কুট্টি এটা তিনি কিছুতেই সহ্য করবেন না। পায়ের কাছে বসে থাকা কুট্টিকে লাথথি মারবেন। ও রকম মোটা পায়ের একখানা লাথথি খেলে পাঁচদিন আর মাজা সোজা করে দাঁড়াতে হবে না কুট্টির।

তবে ছনুবুড়িকে একবারে যতটা ভাত দিয়েছে কুট্টি, তরকারি যতটা দিয়েছে তাতে পেট ভরেও কিছুটা ভাত থেকে যাওয়ার কথা। সেইটুকুও ফেলবে না বুড়ি। জোর করে খেয়ে নিবে।

তাহলে কুট্টির কেন ইচ্ছা হল ছনুবুড়িকে জিজ্ঞাসা করে, আট্টু ভাত লইবানি?

বোধহয় বুড়ির খাওয়ার ভঙ্গি দেখে মনে হয়েছে।

কিন্তু বুজান আজ ঘুমাচ্ছেন না কেন? মুখ হাঁ করে ঙো ঙো শব্দ করছেন না কেন? খিদায় তো পেট পুড়ে যাচ্ছে কুট্টির!

শরীরের সব শক্তি দিয়ে জোরে জোরে বুজানের পা টিপতে লাগল কুট্টি।

ঠিক তখনই দক্ষিণের বারান্দার দিকে কার গলা শোনা গেল। বুজান বলে বাইত্তে আইছেন? বুজান ও বুজান।

এই ডাকে মাত্র বুজে আসা চোখ চমকে খুললেন রাজা মিয়ার মা। মাথা তুলে বারান্দার দিকে তাকালেন। ক্যাডা?

আমি দবির, দবির গাছি।

হাছড় পাছড় করে বিছানায় উঠে বসলেন রাজা মিয়ার মা। দউবরা, খাড়ো।

তারপর কুট্টির কাঁধে ভর দিয়ে পালঙ্ক থেকে নামলেন। কুট্টির একটা হাত ধরে দক্ষিণের বারান্দার দিকে আগালেন। সেই ফাঁকে খেতে বসা ছনুবুড়ির দিকে একবার তাকাল কুট্টি। বুড়ির খাওয়ার গতি এখন আরও বেড়েছে। একটার পর একটা লোকমা যেন নাক মুখ দিয়ে গুঁজছে সে। কুট্টি বুঝে গেল দবির গাছির গলা শুনেই খবর হয়ে গেছে বুড়ির। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভাত শেষ করে পালাবে। কূটনামি ধরা পড়ার আগেই চোখের আঐলে (আড়ালে) চলে যাবে।

দুইমুঠ ভাতের জন্য যে কেন এমন করে মানুষ!

দক্ষিণের বারান্দায় এসে রেলিং ধরে দাঁড়ালেন রাজা মিয়ার মা। কীরে গোলামের পো, এতবড় সাহস তর অইল কেমতে?

রাজা মিয়ার মাকে দেখে মুখটা হাসি হাসি হয়েছিল দবিরের। এখন তাঁর কথায় সেই মুখ চুন হয়ে গেল। কিয়ের সাহস বুজান?

জানচ না কিয়ের সাহস?

সত্যঐ জানি না বুজান। খোলসা কইরা কন।

আমারে না জিগাইয়া আমার বাড়ির গাছ ঝোড়ছস ক্যা? আমার বাড়ির রস আইজ থিকা বেচতে বাইর অইছস!

বুজানের কথা শুনে দবির আকাশ থেকে পড়ল। আপনে এই হগল কী কইতাছেন বুজান! আপনেরে না কইয়া আপনের বাড়ির গাছ ঝুড়ুম আমি! আপনে বাইত্তে না থাকলে বড়বুজানরে কমু না? আর রস বেচুম কেমতে? রস তো অহনতরি পড়েঐ নাই! পড়বো, কেমতে, শীত পড়ছেনি? এই হগল কথা আপনেরে কেডা কইলো?

দবিরের কথায় থতমত খেলেন রাজা মিয়ার মা। তবু গলার জোর কমল না তাঁর। আগের মতোই জোর গলায় বললেন, যেই কউক, কথা সত্য কী না ক?

দবির বুঝে গেল এটা ছনুবুড়ির কাজ। কাল বিকালে মিয়াদের ছাড়া বাড়ির খাজুরতলায় তাকে বসে থাকতে দেখেছে বুড়ি।

দবির বলল, আমি কইলাম বুজছি কথাডা আপনেরে কেডা কইছে। তয় আমার কথা আপনে হোনেন বুজান, দশবারো বচ্ছর ধইরা আপনের বাড়ির গাছ ঝুড়ি আমি, কোনওদিন আপনের লগে কথা না কইয়া আপনের গাছে উডি নাই। আপনে বাইত্তে না থাকলে বড়বুজানরে কইয়া যাই। কাইল থিকা উততইরা বাতাসটা ছাড়ছে। লগে লগে ছ্যান লইয়া, ভার লইয়া বাইত থিকা বাইর অইছি আমি। আপনের ছাড়া বাড়ির খাজুরতলায় আইছি। আটখান হাড়ি রাখছি খাজুরতলায়। রাইক্কা বাইত্তে গেছি গা। আইজ বিয়ানে উইট্টা গেছি হালদার বাড়ি। হেই বাইত্তে আছে চাইরখান গাছ। চাইরখান হাড়ি রাইক্কাইছি গাছতলায়। মরনি বুজির লগে বন্দবস্ত কইরাইছি। তারবাদে আইলাম আপনের কাছে। আপনের লগে কথা কইয়া বাইত্তে গিয়া ভাত খামু তারবাদে যামু আমিনদ্দি সারেঙের বাড়ি। উত্তর মেদিনমন্ডল, দক্ষিণ মেদিনমন্ডল, মাওয়া কালিরখিল এই কয়ডা জাগার যেই কয়ডা বাড়ির গাছ ঝুড়তে পারি ঝুড়ুম। যাগো লগে বন্দবস্ত অইবো তাগো গাছতলায় হাড়ি রাইক্কামু, যাতে গাছতলায় হাড়ি দেইক্কা অন্য গাছিরা ঐ মিহি আর না যায়। আপনের ছাড়া বাইত্তে হাড়ি রাইক্কা গেছি আমি, গাছে অহনতরি উডি নাই, ছ্যানের একখান পোচও দেই নাই। আইজ আপনের লগে কথা কইয়া কাইল থিকা ঝুড়ুম। যুদি আমার কথা বিশ্বাস না অয় আলফুরে পাডান ছাড়া বাইত্তে গিয়া দেইক্কাহুক। যুদি আমি মিছাকথা কইয়া থাকি তাইলে আপনের জুতা আমার গাল।

রাজা মিয়ার মা কথা বলবার আগেই কুট্টি বলল, আলফুর লগে আপনের দেহা অয় নাই?

দবির অবাক গলায় বলল, না।

বুজানে তো আলফুরে পাডাইছে আপনেরে ডাইক্কানতে!

আলফুর লগে আমার দেহা অয় নাই।

রাজা মিয়ার মা বললেন, তাইলে তুই আইলি কেমতে?

আমি তো নিজ থিকাই আইছি আপনের লগে বন্দবস্ত করতে! বুজান, আলফু যহন বাইত নাই তয় কুট্টিরে পাডান। এক দৌড় দিয়া দেইক্কাহুক আমি মিছাকথা কইছি কিনা!

রাজা মিয়ার মা মাথা দুলিয়ে বললেন, না তুই মিছাকথা কচ নাই। যা বোজনের আমি বুঝছি।

কুট্টির দিকে তাকালেন তিনি। ঐ কুট্টি দেকতো কূটনি মাগি আছেনি না ভাত খাইয়া গেছে গা?

কুট্টি গলা বাড়িয়ে সামনের দিককার বারান্দার দিকে তাকাল। তাকিয়ে দেখতে পেল ভয় পাওয়া শিশুর মতো টলোমলো পায়ে যত দ্রুত সম্ভব সিঁড়ি ভেঙে উঠানে নেমে যাওয়ার চেষ্টা করছে ছনুবুড়ি। বারান্দায় পড়ে আছে তার শূন্য থালা। সেখানে ঘুর ঘুর করছে হোলাটা।

AMARBOI.COM

পালিয়ে যাওয়া ছনুবুড়ির দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক মায়ায় মন ভরে গেল কুট্টির। দুইমুঠ ভাতের জন্য এক মানুষের নামে আরেক মানুষের কাছে মিথ্যা কথা বলে বেড়াচ্ছে, অপমানিত হচ্ছে, গালাগাল খাচ্ছে। হায়রে পোড়া পেট, হায়রে পেটের খিদা!

ছনুবুড়িকে বাঁচাবার জন্য ছনুবুড়ির মতো করে ঠাইট না ঠাইট (জলজ্যান্ত) একটা মিথ্যা বলল কুট্টি। না, ছনুবুড়ি নাই বুজান। খাইয়া দাইয়া গেছে গা।

তবু ছনুবুড়িকে বাঁচাতে পারল না কুট্টি। নিজের বাজখাঁই গলা দশগুণ চড়িয়ে গালিগালাজ শুরু করলেন রাজা মিয়ার মা। ঐ রাড়ি মাগি, ঐ কূটনির বাচ্চা, এমনু ভাত তর গলা দিয়া নামলো কেমতে? গলায় ভাত আইটকা তুই মরলি না ক্যা? আয় গলায় পাড়াদা তর ভাত বাইর করি।

কুঁজা শরীর যতটা সম্ভব সোজা করে, দ্রুত পা চালিয়ে মিয়াবাড়ি থেকে নেমে যেতে যেতে বুজানের গালিগালাজ পরিষ্কার শুনতে পেল ছনুবুড়ি। ওসব একটুও গায়ে লাগল না তার। একটুও মন খারাপ হল না। এইসবে কী ক্ষতি হবে ছনুবুড়ির! ভাতটা তো ভরপেট খেয়ে নিয়েছে! পেট ভরা থাকলে গালিগালাজ গায়ে লাগে না।

AMARBOI.COM

নূরজাহান মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, আইজ তুমি আমারে বাইন্দাও রাকতে পারবা না। আইজ আমি বাইর অমুঐ। দুই দিন ধইরা বাইত থনে বাইর অই না। এমুন বন্দি অইয়া মানুষ থাকতে পারে?

দুপুরের খাওয়া সেরে নূরজাহানকে নিয়ে ঘরের ছনছায় (দাওয়া) বসেছে হামিদা। নিজে বসেছে একটা জলচৌকিতে, জলচৌকির সামনে পিঁড়ি পেতে বসিয়েছে নূরজাহানকে। হাতের কাছে ছোট্ট বাটিতে একটুখানি নারকেল তেল, কোলে পুরানা, খানে খানে দাঁত ভাঙা কালো রঙের একখানা কাঁকুই আর লাল রঙের দুইখানা ফিতা। চুলের গোড়ায় গোড়ায় নারকেল তেল ঘষে অনেকক্ষণ ধরে বিলি দিয়ে, আঁচড়ে হামিদা এখন মেয়ের মাথার উকুন মারবে। তারপর লাল ফিতা জড়িয়ে দুইখানা বেণী বেঁধে দেবে। মাসে দুই তিনবার এই কাজটা করে সে। মেয়ে বড় হয়েছে, এই ধরনের যত্ন তার করতে হয়। তাছাড়া নূরজাহান হয়েছে পাড়া বেড়ান, চঞ্চল ধরনের দুরন্ত মেয়ে। সারাদিন এই বাড়ি ওই বাড়ি, সড়ক চকমাঠ ঘুরে যখন বাড়ি ফিরে চেহারায় তার রোদের কালিমা, হাত পায়ে কাদামাটি, মাথার ঘন কালো চুল ধুলায় ধূসর। কয়দিন পর পর এই মেয়েকে বাড়ির লাগোয়া ছোট্ট পুকুরে নিয়ে পুকুরের পানি আর ডাঙ্গার মাঝামাঝি আড়াআড়ি করে ফেলে রাখা মরা খাজুরগাছ দিয়ে তৈরি ঘাটলায় বসিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গোসল করায় হামিদা। ধুন্দুলের ছোবায় (ছোবড়া) বাংলা সাবান মাখিয়ে বিলবাওড়ে

চড়ে বেড়ানো গরু বাছুরকে যেমন খাল বিলের পানিতে নামিয়ে ঘষে ঘষে গোসল করায় রাখালরা ঠিক তেমন করে নূরজাহানকে গোসল করায় হামিদা। অতিযত্নে মায়া মমতায়ই করে কাজটা, তবে করার সময় বকাবাজির তুবড়ি ফোটায় মুখে। নূরজাহানের কিশোরী শরীরে যেমন দ্রুত চলে তার সাবান মাখা ধুন্দুলের ছোবা ঠিক তেমন দ্রুত চলে মুখ। এমুন মাইয়া আল্লার দুইন্নাইতে দেহি নাই। এমুন আজাজিল (আজরাইল) আমার পেডে অইছে! বুইড়া মাগি অইয়া গেছে তাও সবাব (স্বভাব) বদলায় না। ঐ গোলামের ঝি, তুই কী ব্যাডা যে সব জাগায় তর যাওন লাগবো! মাইয়া ছেইলাগো যে অনেক কিছু মাইন্না চলতে অয় এই প্যাচাইল তর লগে কী হারাজীবন পারতে অইবো আমার? আমি মইরা গেলে করবি কী তুই, আ?

আজও নূরজাহানকে গোসল করাবার সময় এই ধরনের কথাই বলেছে হামিদা। যখন অবিরাম কথা বলতে থাকে সে তখন মুখে টু শব্দ থাকে না নূরজাহানের। মুখ ব্যাজার করে সব শোনে। কখনও কখনও রাগের মাথায় এত জোড়ে ধুন্দুলের ছোবা নূরজাহানের বুকে পিঠে ঘষতে থাকে হামিদা, শরীর লাল হয়ে যায় নূরজাহানের, ব্যথা পায়, তবু কথা বলে না।

দুই দিন ধরে বাড়ি থেকে বের হতে পারছে না বলে মন মেজাজ তার খারাপ এজন্য ঘাটলায় বসে হামিদার মুখে মুখে দুই একটা কথা আজ সে বলেছে। হামিদা যখন বলল, আমি মইরা গেলে করবি কী তুই? লগে লগে উৎসাহের গলায় নূরজাহান বলল, কবে মরবা তুমি?

নিজের কথার তালে ছিল বলে মেয়ের কথাটা প্রথমে বুঝতে পারেনি হামিদা। বলল, কী কইলি?

নূরজাহান নির্বিকার গলায় বলল, আমারে নাওয়াইতে (গোসল) বহাইয়া, খাওয়াইতে বহাইয়া তুমি যে সব সময় খালি কও মইরা যাইবা, কবে মরবা?

নূরজাহানের কথায় গা জ্বলে গেল হামিদার। ডানহাতে নূরজাহানের থুতনি বরাবর একটা ঠোকনা (ঠোনা) মারল সে। ক্যা আমি মইরা গেলে তুমি সরাজ (স্বরাজ) পাও! যা ইচ্ছা তাই কইরা বেড়াইতে পারো!

হামিদার ঠোকনায় ব্যথা পেয়েছে নূরজাহান। ব্যথাটা সহ্য করল, করে বলল, হ সরাজ পাই, যেহেনে ইচ্ছা যাইতে পারি। তোমার লাহান বাইত্তে আমারে কেঐ আটকাইয়া রাখবো না। দিনরাইত নিজের ইচ্ছা সাদিন (স্বাধীন) ঘুইরা বেড়ামু। কেঐ কিছু কইবো না।

তরে বিয়া না দিয়া আমি মরুম না। বিয়ার আগে আমার বাইত্তে তরে আটকাইয়া রাখুম, আর বিয়া দিলে জামাই বাইত্তে এমতেঐ তুই আইটকা থাকবি। হেরা তরে ঘর থিকা বাইর অইতে দিব না।

নূরজাহান মুখ ভেংচে বলল, ইহ্ বাইর অইতে দিব না। আমি তাইলে বিয়াই বমু না।

তারপরও বেশ অনেক কথা হয়েছে মা মেয়ের। শেষ পর্যন্ত বাংলা সাবান দিয়ে মাথার চুল পর্যন্ত ধুয়ে দিয়ে নূরজাহানকে নিয়ে বাড়ি ফিরেছে হামিদা। ধোয়া লাল

ANARBOI.COM

পাড়ের সবুজ একখানা শাড়ি পরিয়ে দিয়েছে। শাড়ি পরাবার সময় আজ প্রথম খেয়াল করেছে নূরজাহানকে ব্লাউজ পরানো উচিত, মেয়ে বড় হয়ে গেছে।

ফুল তোলা টিনের বাক্সে নাইওর যাওয়ার শাড়ি ব্লাউজ তোলা আছে হামিদার। বছর দুইবছরের বর্ষাকালে কেরায়া নৌকা করে স্বামী কন্যা নিয়ে বাপের বাড়ির দেশে যায় হামিদা। লৌহজং ছাড়িয়ে আড়াই তিন মাইল পুবে পয়সা গ্রাম, সেই গ্রামে বাপের বাড়ি হামিদার। বাপ মা কেউ আর এখন বেঁচে নাই। আছে একমাত্র ভাই আউয়াল। গিরস্তালি করে। অবস্থা ভালই। নাইওর গেলে বোন বোনজামাই আর ভাগ্নিকে ভালই খাওয়ায়।

আজ দুপুরে মেয়ের জন্য নিজের নাইওর যাওয়ার লাল ব্লাউজখানা বের করেছে হামিদা। মেয়েকে পরিয়ে দিয়েছে। বেশ টাইট হয়ে ব্লাউজ গায়ে লেগেছে নূরজাহানের। সবুজ রঙের লাল পেড়ে শাড়ি আর ব্লাউজে হঠাৎ করেই রূপ যেন তারপর খুলে গেছে নূরজাহানের। এতক্ষণ ধরে বকাবাজি করা মেয়েটাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে হামিদা। সাবান দিয়ে গোসল করাবার ফলে, আসন্ন শীতকাল, মানুষের ত্বকে এমনিতেই লেগে গেছে হাওয়ার টান, নূরজাহানের হাত পা মুখ গলা খসখসা দেখাচ্ছিল। কোথাও কোথাও খড়ি ওঠা। মাথার চুল সাবান ঘষার ফলে উড়াউড়া। বেশ অন্যরকম লাগছে মেয়েটিকে দেখতে।

হামিদা তারপর হাতে পায়ে মুখে গলায় সউষ্যার (সরষার) তেল মেখে দিয়েছে নূরজাহানের। চুলে হাত দেয়নি। বলেছে ভাত খেয়ে উকুন মেরে দেবে, চুল আঁচড়ে বেণী করে দেবে। এখন সেই কাজেই বসেছে।

তবে নূরজাহানকে গোসল করাবার সময় মেজাজ যেমন তিরিক্ষি হয়েছিল এখন আর সেটা নাই। ভাত খাওয়ার ফলে মুখে মেজাজে প্রশান্তির ভাব আসছে। বাটি থেকে আঙুলের ডগায় তেল নিয়ে নূরজাহানের চুলের গোড়ায় গোড়ায় লাগিয়ে দিচ্ছে। সেই ফাঁকে দুই একটা উকুন ধরে এক বুড়া আঙুলের নখের ওপর রেখে অন্য বুড়া আঙুলের নখে চেপে পুটুস করে মারছে। মাঝে মাঝে নূরজাহানকেও মারতে দিচ্ছে একটা দুইটা।

একবার একটা বড় কালো উকুন মারতে মারতে নূরজাহান বলল, ও মা, উকুনের এই হগল নাম দিছে কেডা? বড় উকুনডিরে কয় 'বুইড়া' মাজরোডিরে (মেজ) কয় 'পুজাই' ছোডডিরে কয় 'লিক'।

হামিদা বলল, কইতে পারি না। মনে অয় আগিলা (আগের) দিনের ময়মুরব্বিরা দিয়া গেছে।

আগিলা দিনেও উকুন আছিল?

আছিল না! মাইনষের মাথা যতদিন ধইরা আছে উকুনও হেতদিন ধইরা আছে।

তারপর উকুন নিয়ে আর একটা প্রশ্ন করল নূরজাহান। ও মা, চাইম্মা উকুন কারে কয়?

ততক্ষণে মেয়ের মাথায় তেল দেওয়া শেষ করেছে হামিদা। এখন দাঁতভাঙা কাঁকুই দিয়ে যত্ন করে মাথা আঁচড়ে দিচ্ছে। এই অবস্থায় বলল, কোনও কোনও মাইনষের শইল্লের চামড়ায় এক পদের উকুন অয়। লালটা লালটা (লালচে)। হেইডিরে কয় চাইম্মা

AMARBOI.COM

উকুন। চামড়ার লগে থাকে দেইক্কা এমুন নাম। তয় চাইম্মা উকুন অওন ভাল না। ময়মুরব্বিরা কয় চাইম্মা উকুন অয় বালা মসিবত দেইক্কা। যাগো শইল্লে অয় তাগো কপালে খারাপি থাকে।

আমার শইল্লে মনে অয় চাইম্মা উকুন অইছে।

হামিদা আঁতকে উঠল। নিজের অজান্তে হাত থেমে গেল তার। নূরজাহানের মুখ নিজের দিকে ঘুরিয়ে আর্তগলায় বলল, কী কইলি? চাইম্মা উকুন অইছে?

নূরজাহান মজার মুখ করে হাসল। মনে অয়।

কেমতে মনে অয়, দেকছসনি?

না দেহি নাই।

তয়?

কইলাম যে মনে অয়।

নূরজাহানের মুখ আবার আগের দিকে ঘুরিয়ে দিল হামিদা। জোরে টেনে টেনে বেণী বাঁধতে লাগল। নূরজাহান একবার উহ্ করে শব্দ করল তারপর বলল, এত জোরে বেণী বান্দ ক্যা? দুক্কু পাই না?

হামিদা তবু নিজেকে সংযত করল না। আগের মতোই শক্ত হাতে বেণী বাঁধতে বাঁধতে বলল, আমার লগে অলঐক্কা (অলক্ষুণে) কথা কইলে এমুনঐ করুম।

তুমি যুদি আমারে বাইত থনে আইজ না বাইর অইতে দেও তাইলে আরও বহুত কথা কমু দেইক্কোনে।

যত যাই কচ বাইর অইতে দিমু না।

তখনই মুখ ঝামটা দিয়ে ওই কথাটা বলল নূরজাহান। আইজ তুমি আমারে বাইন্দাও রাকতে পারবা না। আইজ আমি বাইর অমুঐ। দুই দিন ধইরা বাইত থনে বাইর অই না। এমনু বন্দি অইয়া মানুষ থাকতে পারে?

হামিদাও নূরজাহানের মতো মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, পারবো না ক্যা? আমরা পারি কেমতে?

তুমি আর আমি কি এক অইলাম?

একঐ। আমি মা তুই মাইয়া। দুইজনেঐ মাইয়ালোক।

ততক্ষণে লাল ফিতা দিয়ে চমৎকার দুইটা বেণী বেঁধে ফেলেছে হামিদা। এখন তেলের বাটি আর কাঁকুই হাতে উঠে দাঁড়াল। শাসনের গলায় মেয়েকে বলল, বাড়ির বাইরে একহান পাও তুই দিতে পারবি না। তর বাপে হেদিন আমারে কইছে আমি যেমতে তরে চালামু অমতেঐ তর চলন লাগবো।

হামিদা উঠে দাঁড়াবার পরও মুখ ব্যাজার করে বসেছিল নূরজাহান। এবার ঘেরজালে আটকা পড়া নলা মাছের মতো লাফ দিয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, না আমি চলুম না, তোমার ইচ্ছায় আমি চলুম না, আমি আমার ইচ্ছায় চলুম।

এ কথা শুনে মাথায় রক্ত লাফিয়ে উঠল হামিদার। হাতে ধরা কাঁকুই তেলের বাটি ছুঁড়ে ফেলে থাবা দিয়ে নূরজাহানের এটা বেণী ধরল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তর ইচ্ছা মতন তরে আমি চলাইতাছি, বাইত থনে তরে আমি বাইর করতাছি, খাড়ো।

AMARBOI.COM

বেনী ধরে টানতে টানতে নূরজাহানকে রান্নাচালার সামনে নিয়ে এল। রান্নাচালার মাথার কাছে সব সময় থাকে একগাছা দড়ি। একহাতে নূরজাহানের একটা বেণী ধরে রেখেই অন্যহাতে দড়িটা টেনে নামাল সে। সেই দড়ি দিয়ে কষে হাত দুইখানা বাঁধল নূরজাহানের। দড়ির অন্যমাথা বাঁধল রান্নাচালার একটা খুঁটির সঙ্গে। তারপর ধাক্কা দিয়ে নূরজাহানকে বসিয়ে দলি মাটিতে। পারলে অহন বাইর অ বাইত থন, দেহি কেমতে বাইর অছ!

রাগে দুঃখে নূরজাহানের তখন চোখ ফেটে যাচ্ছে। হাত দুইটা বাঁধা, পা ছড়িয়ে রান্নাচালার মাটিতে বসা নূরজাহান তারপর ঙো ঙো করে কাঁদতে লাগল।

দবির গাছি বাড়ি ফিরল বিকালবেলা। শেষ হেমন্তের রোদ তখন গেন্দা (গাঁদা) ফুলের পাপড়ির মতন ছড়িয়েছে চারদিকে। চকমাঠ গাছপালা আকাশ ঝকঝক করছে। থেকে থেকে বইছে উত্তরের হাওয়া। এই হাওয়ায় মনের ভিতর অপূর্ব এক অনুভূতি হচ্ছে দবিরের। গভীর আনন্দে ভরে আছে মন। মৌশুমের প্রথম গাছ ঝুড়ল আজ। খুব সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেছে মিয়াদের ছাড়াবাড়িতে। তারপর থেকে একটানা গাছ ঝুড়েছে। নাওয়া খাওয়ার কথা মনে ছিল না। আটখানা গাছ ঝুড়তে বিকাল হয়ে গেছে। তারপর প্রতিটা গাছে হাঁড়ি ঝুলিয়ে এইমাত্র বাঁশের বাখারির শূন্য ভার কাঁধে বাড়ি ফিরল। হাতের কাজ শেষ হওয়ার পর পরই পেটের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠেছে ক্ষুধা। সেই ক্ষুধা এখন আরও তীব্র হয়েছে। একদিকে মনের আনন্দ অন্যদিকে ক্ষুধা সব মিলিয়ে আশ্চর্য এক অনুভূতি এখন। বাড়িতে উঠে সারেনি চিৎকার করে হামিদাকে ডাকল। ও নূরজাহানের মা, তাড়াতাড়ি ভাত বাড়ো। খিদায় জান বাইর অইয়া গেল।

ঘরের সামনে সেই জলচৌকিতে বসে পুরানা ছেঁড়া মোটা একখানা কাঁথায় তালি দিচ্ছে হামিদা। কাঁথা কোলের ওপর রেখে অতিযত্নে কাজটা করছে আর রান্নাচালার দিকে তাকাচ্ছে। সেখানে দুইহাত বাঁধা নূরজাহান মাটিতে শুয়ে আছে করুণ ভঙ্গিতে। বাঁধা হাত দুইটা রেখেছে বুকের কাছে। অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করে খানিক আগে থেমেছে। এখন চোখ বোজা। যে কেউ দেখে ভাববে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা। কিন্তু হামিদা জানে ঘুমায়নি নূরজাহান। চোখ বুজে পড়ে আছে।

মেয়েকে এভাবে মাটিতে শুয়ে থাকতে দেখে এখন মায়া লাগছে হামিদার। ইচ্ছা করছে হাতের বাঁধন খুলে ছোট্ট শিশুর মতো টেনে কোলে নেয় মেয়েকে। দুইহাতে বুকে চেপে আদর করে।

কিন্তু এই কাজ করতে গেলেই লাই পেয়ে যাবে নূরজাহান। মাকে পটিয়ে পাটিয়ে

AMARBOI.COM

এখনই ছুটে বের হবে বাড়ি থেকে। কোথায় চলে যাবে কে জানে! তারচেয়ে এই ভাল, শাসনের সময় শাসন, আদরের সময় আদর।

তবে বাড়ির উঠানে এসে রান্নাচালায় হাত বাঁধা নূরজাহানকে শুয়ে থাকতে দেখে দবির একেবারে থতমত খেয়ে গেল। একবার নূরজাহানের দিকে তাকাল তারপর তাকাল হামিদার দিকে। ক্ষুধার কথা ভুলে বলল, কী অইছে? মাইয়াডারে বাইন্দা থুইছো ক্যা?

কাঁথাটা ঘরের ভিতর রেখে এসে হামিদা বলল, তয় কী করুম! তোমার মাইয়ায় কথা হোনে না। জোর কইরা বাড়িতথন বাইর অইয়া যাইতে চায়।

এর লেইগা বাইন্দা থুইবা? আমার মাইয়ায় কি গরু বরকি (ছাগল)? হায় হায় করছে কী!

শূন্য ভার কাঁধ থেকে নামিয়ে ছুটে নূরজাহানের কাছে গেল দবির। চটপটা হাতে বাঁধন খুলে দিল। নূরজাহান যেই কে সেই। যেমন শুয়েছিল তেমনই শুয়ে রইল। এমন কী বাঁধা হাত যেভাবে ছিল সেভাবেই রইল, একটুও নড়াল না। যেন গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে সে, অচেতন হয়ে আছে, এই অবস্থায় হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে, উদিসই পায়নি। দেখে হামিদা বলল, ইস কুয়ারা (ঢং) দেইক্কা মইরা যাই। এই ছেমড়ি ওট, অইছে।

দবির বলল, এমুন করতাছ ক্যা মাইয়াডার লগে? মাইয়াডা তো ঘুমাইয়া গেছে।

হ কইছে তোমারে! কিয়ের ঘুম, ও তো জাগনা।

নূরজাহানের দুইহাতে দড়ির মতো ফুটে উঠেছে দড়ির দাগ। সেই দাগ দেখে হায় হায় করে উঠল দবির। হায় হায়রে হাত দুইখান শেষ কইরা হালাইছে মাইয়াডার।

তারপর হাছড় পাছড় করে টেনে কোলে তুলল নূরজাহানকে। ওট মা ওট। আমি দেখতাছি কী অইছে!

নূরজাহান সত্যি সত্যি ঘুমায়নি। বাপের আদরে বুকের ভিতর উথাল দিয়ে উঠল তার অভিমানের কান্না। নাক টেনে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে লাগল সে। কাঁদতে কাঁদতে বলল, হারাদিন বাইত্তে বইয়া থাকতে ভাল্লাগেনি মাইনষের? বাইর অইলে কী হয়? আমি কি ডাঙ্গর অইয়া গেছিনি, আমার কি বিয়া অইয়া গেছেনি যে বাইত থনে বাইর অইতে পারুম না!

হামিদা মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, না ডাঙ্গর অন নাই আপনে, আপনে অহনতরি নাননা (ছোট) বাচ্চা।

এবার হামিদাকে ধমক দিল দবির। এই চুপ করো তুমি। হারাদিন খালি মাইয়াডার লগে লাইগগা রইছে!

তারপর কোল থেকে নামাল নূরজাহানকে। এই আমি তরে ছাইড়া দিলাম মা। যা যেহেনে ইচ্ছা ঘুইরা আয়, দেহি কেডা তরে আটকাইয়া রাখে?

আঁচলে ডলে ডলে চোখ মুছল নূরজাহান। একবার মায়ের দিকে আর একবার বাবার দিকে তাকাল তারপর হি হি করে হেসে বাড়ির নামার দিকে ছুটতে লাগল। চোখের পলকে হিজল ডুমুরে জঙ্গল হয়ে থাকা টেকের ওদিক দিয়ে শস্যের মাঠে চলে গেল। দবির মুগ্ধ চোখে ছুটতে থাকা মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

AMARBOI.COM

উত্তরের হাওয়ায় শাড়ির আঁচল উড়ছে নূরজাহানের, পিঠে দুলছে বেণী, পায়ের তলায় সবুজ শস্যের মাঠ, মাথার ওপর হলুদ রোদে ভেসে যাওয়া বিশাল আকাশ, এই রকম পরিবেশে হরিণীর মতো ছুটতে থাকা নূরজাহানকে বাস্তবের কোনও মানুষ মনে হয় না, মনে হয় স্বপ্নের মানুষ।

এই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে ক্ষুধার কথা ভুলে গেল দবির। আজ প্রথম গাছ ঝুড়েছে, ভুলে গেল। হামিদার দিকে তাকিয়ে বলল, দেহো, চাইয়া দেহো কত সোন্দর দেহা যাইতাছে মাইয়াডারে। এর থিকা সোন্দর কিছু আল্লার দুইন্নাইতে আছে, কও? বনের পাখিরে কোনওদিন খাচায় আটকাইয়া রাকতে অয় না, পাখি যেমতে উইড়া বেড়ায়, বেড়াউক।

হামিদা গম্ভীর গলায় বলল, তোমার আল্লাদে যে কোন ক্ষতিডা একদিন অইবো মাইয়ার, বোজবা। তহন কাইন্দাও কূল পাইবা না।

দেশগ্রামের যে কোনও বাড়িতে ঢোকার আগে নিজেকে একটু পরিপাটি করেন মান্নান মাওলানা। মাথার গোল টুপিখানা খুলে টাক পড়া মাথায় একবার দুইবার হাত বুলান তারপর টুপিখানায় দুই তিনটা ফুঁ দিয়ে মাথায় পরেন। নাদুসনুদুস দেহ তাঁর ঢাকা থাকে হাঁটু ছাড়িয়ে বিঘতখানেক নেমেছে এমন লম্বা পানজাবিতে। লুঙ্গি পরেন গুড়মুড়ার ওপরে। লম্বা পানজাবিতে ঢাকা পড়ে থাকার ফলে পায়ের কাছে লুঙ্গির অল্প দেখা যায়। পানজাবি পরেন ঢোলাঢালাই, হলে হবে কী, দিন যত যাচ্ছে, বয়স যত বাড়ছে ভুঁড়িখানাও ততই বাড়ছে তাঁর। নাভির কাছে গিঁট দিয়ে পরেন লুঙ্গি। এমনিতেই অতিকায় ভুঁড়ি তার ওপর লুঙ্গির গিঁট, পেটের কাছে এসে ঢোলা পানজাবিতেও বেড় পায় না তাঁর দেহ। টাইট হয়ে অনেকটা গেঞ্জির কায়দায় ভুঁড়িতে সেটে থাকে।

মুখাখানা মান্নান মাওলানার মাঝারি মাপের চালকুমড়ার মতন। ছোট্ট খাড়া নাকখানার তলা নিখুঁত করে কামানো। দুই পাশের জুলপি থেকে ঘন হয়ে নেমেছে চাপদাঁড়ি। থুতনির কাছে এসে সেই দাঁড়ি যোগ হয়ে নেমেছে বুক বরাবর। বেশ অনেককাল আগেই পাক ধরেছে দাঁড়িতে। তখন থেকেই নিয়মিত মেন্দি (মেহেদি) লাগাচ্ছেন। ফলে পাকা দাঁড়িগুলিতে লাল রঙ ধরেছে, কাঁচাগুলি হয়েছে গভীর কালো।

চোখ দুইটা মান্নান মাওলানার ষাড়ের মতন, যেদিকে তাকান তাকিয়েই থাকেন, সহজে পলক পড়ে না চোখে। যেন কথা বলবার দরকার নাই, হাত পা ব্যবহার করবার দরকার নাই, দৃষ্টিতেই ভস্ম করে ফেলবেন শত্রুপক্ষ। এইজন্য মান্নান মাওলানার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না কেউ। ভুল করে অচেনা কেউ তাকালেও দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে পলকেই সরিয়ে নেয় চোখ।

AMARBOI.COM

আজ বিকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন মান্নান মাওলানা। চক বরাবর হাঁটতে শুরু করেছেন, শোনেন খাইগো (খানদের) বাড়ির মসজিদে আছরের আজান হচ্ছে। এই মসজিদের আজান শুনলেই বুকের ভিতর মৃদু একটা ক্রোধ টের পান তিনি। খানেরা কী যেন কী কারণে মান্নান মাওলানাকে একদমই দেখতে পারেন না। বাড়ির লাগোয়া লাখ লাখ টাকা খরচা করে মসজিদ করলেন। চারখানা মাইক লাগালেন মিনারের চারদিকে। দেশগ্রামে বিদ্যুৎ নাই, ব্যাটারিতে চলে মাইক, ব্যাপক খরচ। সেই খরচের তোয়াক্কা করেন না তাঁরা। অবশ্য চারমুখি চারখানা মাইক দেওয়াতে আজানের ললিত সুর হাওয়ার টানে পলকে পৌঁছে যায় চারপাশের গ্রামে। এক মসজিদের আজানে কাজ হচ্ছে অনেক গ্রামের। এ এক বিরাট ছোয়াবের কাজ।

কিন্তু মসজিদ করতে গিয়ে কেন যে নিজ গ্রামের লোকের দিকে তাকালেন না তাঁরা, কেন যে মান্নান মাওলানাকে মসজিদের ইমাম না করে ইমাম আনালেন নোয়াখালী থেকে, এই রহস্য মাথায় ঢোকে না মান্নান মাওলানার। মসজিদ তৈরি হওয়ার সময় সারাদিন ঘুরঘুর করেছেন খান বাড়িতে। মন দিয়ে তদারক করেছেন মসজিদের কাজের, আজানের সময় আজান দিয়েছেন, মসজিদের কাজ করছে যেসব ওস্তাগার জোগালু সেই সব ওস্তাগার জোগালুদের নিয়ে নামাজ পড়েছেন, ইমামতি করেছেন। কিন্তু মসজিদ হয়ে যাওয়ার পর তাঁর আর ডাক পড়ল না। ক্রোধটা সেই থেকে তৈরি হয়ে আছে মান্নান মাওলানার বুকে। যদিও তিনি বোঝেন ইমাম সাহেবের কোনও দোষ নাই, তাঁকে আনা হয়েছে বলেই এসেছেন, চাকরিও করছেন ধর্মের কাজও করছেন, তাঁর জায়গায় মান্নান মাওলানা হলেও একই কাজই করতেন, তবু ক্রোধটা হয়। পাঁচ ওয়াক্তের আজানে পাঁচবার মনে পড়ে তাঁর ইমামতি আরেকজনকে দিয়ে দিয়েছেন খান বাড়ির কর্তারা। তাঁর ক্ষমতা চলে গেছে আরেকজনের হাতে। তবু আজান আজানই, যেই দেউক, আজান হলেই নামাজ পড়তে হবে, ধর্মের বিধান।

মান্নান মাওলানা নামাজ পড়তে বসলেন। চকের কয়েকটা খেতে কলুই (মটর) বোনা হয়েছে, সরিষা বোনা হয়েছে, কোনও কোনও খেত ফাঁকা, আগাছা পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে শস্য দেওয়ার জন্য। কোনও কোনওটায় গজিয়েছে গাঢ় সবুজ দূর্বাঘাস। এরকম এক দূর্বাঘাসের জমিতে নামাজ পড়তে বসেছেন তিনি। হু হু করে বইছে উত্তরের হাওয়া। হাওয়ায় শীত শীত ভাব। তবে হেমন্তের রোদ কম তেজাল না, রোদে বসে নামাজ পড়ছেন বলে শীতভাব টের পেলেন না মান্নান মাওলানা। মোনাজাত শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ল মেন্দাবাড়ির বড়সারেঙের বড়মেয়ের বড়ছেলে এনামুল ঢাকার টাউনে থান কাপড়ের ব্যবসা করে, কনট্রাক্টরি করে অঢেল টাকা পয়সার মালিক হয়েছে। ধর্মপ্রাণ নরম স্বভাবের যুবক। মান্নান মাওলানা কয়েকবার তাকে দেখেছেন। বিধবা খালা দেলোয়ারা থাকে বাড়িতে। তাকে দেখতে আসে। খালার জন্য বেদম টান এনামুলের। খালার কথায় ওঠে বসে।

আছরের নামাজ শেষ করার পর মান্নান মাওলানার আজ মনে হল দেলোয়ারার কাছে গেলে কেমন হয়! তাকে যদি বলা যায়, বাড়ির লগে একখান ছাড়াবাড়ি পইড়া রইছে তোমগো, কোনও ভাই বেরাদর নাই, দুই বইন তোমরা, বড় বইন থাকে টাউনে

AMARBOI.COM

তুমি থাক দ্যাশে, বইনপোর (বোনের ছেলে) এতবড় অবস্থা, তারে কও ছাড়া বাইত্তে একখান মজজিদ (মসজিদ) কইরা দিতে। আল্লার কাম তো অইবোঐ, দ্যাশ গেরামে নামও অইব। ইমাম লইয়া চিন্তা করতে অইবো না, আমিঐ ইমামতি করুম। টেকা পয়সা বেশি লাগবো না।

এসব কথা ভেবে মনের ভিতর বেশ একটা আনন্দ টের পেলেন মান্নান মাওলানা। দ্রুত হেঁটে মেন্দাবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। নিজেকে যেভাবে পরিপাটি করার করলেন, সব শেষে পানজাবির পকেট থেকে বের করলেন গোলাপি রঙের ছোট্ট একখানা চিরুনি। চিরুনির দাঁতের ফাঁকে কালো তেলতেলে ময়লা জমে পুর (পুরু) হয়ে আছে। এক হাতে ফরফর করে চিরুনি পরিষ্কার করলেন তারপর মন দিয়ে দাঁড়ি আঁচড়াতে লাগলেন।

হঠাৎ করেই মান্নান মাওলানাকে দেখতে পেল নূরজাহান। দুই দিন পর ছাড়া পেয়ে পাগলের মতো ছুটছিল সে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমে ভেবেছে সড়কে যাবে, দেখবে কত উঁচু হল সড়ক, কত দূর আগাল। তারপরই সেই চিন্তা বাতিল করে দিয়েছে। এক দুইদিনে এতবড় সড়ক উঁচু একটু হতে পারে, আগাবে আর কতটুকু! অল্প একটু যা আগায় খেয়াল করে না দেখলে বোঝা যায় না। তারচেয়ে সড়ক দেখতে যাওয়া উচিত কয়েকদিন পর পর, ওইভাবে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় কতটা আগালো।

মাঠ ভেঙে ছুটতে ছুটতে এই ভেবে আজ সড়কের দিকে যায়নি নূরজাহান। তার মনে পড়েছে মজনুর কথা। চারমাস হল মজনু চলে গেছে টাউনে। সেখানে খলিফাগিরি শিখছে। তিন চারদিন হল বাড়িতে আসছে। হয়তো দুই একদিনের মধ্যে আবার চলে যাবে। আজ হালদার বাড়িতেই যাবে সে, মজনুকে দেখে আসবে। চারমাসে কতটা বদলেছে মজনু, কেমন হয়েছে দেখতে।

টাউনে থাকলে চেহারা অন্যরকম হয়ে যায় মানুষের। মজনুর কেমন হয়েছে!

মেন্দাবাড়ির সামনে দিয়ে ছুটে যেতে যেতে মজনুর চেহারা কল্পনা করছিল নূরজাহান এজন্য মান্নান মাওলানাকে প্রথমে দেখতে পায়নি। দেখল একেবারে কাছাকাছি এসে, আথকা। দেখে চমকাল সে, নিজের অজান্তে থেমে গেল পা। তবে পলকের জন্য, তারপরই আবার ছুটতে যাবে, মান্নান মাওলানা গম্ভীর গলায় বললেন, ঐ ছেমড়ি, খাড়ো।

নূরজাহান দাঁড়াল, মান্নান মাওলানার মুখের দিকে তাকাল।

AMARBOI.COM

দাঁড়ি আঁচড়ানো শেষ করে মান্নান মাওলানা তখন চিরুনি পরিষ্কার করছেন। সেই ফাঁকে নূরজাহানের চোখের দিকে তাকালেন। দউবরার মাইয়া না তুই?

দবিরকে কেউ দউবরা বললে রাগে গা জ্বলে যায় নূরজাহানের, সে যেই হোক। এখনও তেমন হল। মান্নান মাওলানার চোখের দিকে ভয়ে কখনও তাকায় না নূরজাহান। তাকালে বুকের ভিতর ভয়ার্ত অনুভূতি হয়। এখন আর তেমন হল না। চোখ তুলে মান্নান মাওলানার চোখের দিকে তাকাল। চাপা রাগি গলায় বলল, আমার বাপের নাম দউবরা না, দবির, দবির গাছি।

চিরুনি পকেটে রাখলেন মান্নান মাওলানা কিন্তু নূরজাহানের চোখ থেকে চোখ সরালেন না। গলা আরেকটু গম্ভীর করে বললেন, কচ কী!

ঠিকঐ কই। আমার বাপরে কোনওদিন দউবরা কইবেন না।

কইলে কী অইবো?

নূরজাহানের প্রায় মুখে এসে গিয়েছিল, কইলে দাড়ি টাইন্না ছিড়া হালামু। কী ভেবে কথাটা সে চেপে রাখল। তবে গলার ঝাঁঝ কমাল না, বলল, আমারে খাড়ঐতে কইলেন ক্যা?

আগের মতোই নূরজাহানের চোখের দিকে তাকিয়ে মান্নান মাওলানা বললেন, কথার কাম আছে।

কী কথা?

এতবড় মাইয়া এত ফরফর কইরা ঘোরচ ক্যা? যেহেনে যাই ওহেনেঐ দেহি তরে!

দেকছেন কী অইছে? আমার ইচ্ছা আমি যাই।

আর যাইতে পারবি না।

লগে লগে ঠোঁট বাঁকাল নূরজাহান। তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, ইহ্ যাইতে পারবো না। আপনে আমার বাপ লাগেন যে আপনের কথা হোনন লাগবো?

নূরজাহানের কথায় রক্ত মাথায় লাফিয়ে উঠল মান্নান মাওলানার। রাগে দিশাহারা হয়ে গেলেন। চিৎকার করে বললেন, কচ কী, আরে কচ কী তুই! আমার মুখের উপরে এতবড় কথা! তরে তো আমি জবেহ কইরা ফালামু। তরে তো কেঐ বাচাইতে পারবো না। মজজিদের ইমাম অইলে অহনঐ সাল্লিশ (সালিশ) ডাকাইতাম আমি, ল্যাংটা কইরা তর পাছায় দোররা মারতাম। বেপরদা বেহাইইয়া মাইয়াছেইলা, মাওলানা ছাহেবের মুখে মুখে কথা কয়! খাড়ো মজজিদখান বানাইয়া লই, এই গেরামের বিচার সাল্লিশ বেবাক করুম আমি। শরিয়ত মোতাবেক করুম, তর লাহান মাইয়ারা বরকা (বোরখা) না ফিনদা বাইতথন বাইর অইতে পারবো না। চুদুর বুদুর (এদিকজ ওদিক, ইতরামো ফাজলামো অর্থে) করলে গদে (গর্তে) ভইরা একশো একহান পাথথর ফিক্কা (ছুঁড়ে) মারুম।

ডানহাতের বুড়া আঙুল মান্নান মাওলানার দিকে উঁচিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে নূরজাহান বলল, আপনে আমার এইডা করবেন। পচা মলবি, কিচ্ছু জানে না খালি বড় বড় কথা! জানলে তো খাইগোরা (খানেরা) আপনেরেঐ ইমাম বানাইতো, অন্যদেশ থিকা ইমাম আনেনি! মাওলানা কারে কয়, ইমাম কারে কয় খাইগো বাড়ি মজজিদের হুজুররে দেখলে

AMARBOI.COM

বোজবেন। দেখলেঐ ছেলাম করতে ইচ্ছা করে। ফেরেশতার লাহান মানুষ। আর আপনে, আপনেরে দেখলে মনে অয় খাডাস (খাটাস), রাজাকার।

রাজাকার কথাটা আথকা মুখে এসে গেল নূরজাহানের। কথাটা সে কোথায়, কার কাছে শুনেছে মনে নাই, অর্থ কী তাও জানে না, তবু বলল। বলে আরাম পেল।

তারপর মান্নান মাওলানার সামনে আর দাঁড়াল না নূরজাহান। হালদার বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে মনে হল বাপকে দউবরা বলার শোধটা ভালই নিয়েছে। ময়মুরব্বির মুখে মুখে কথা বলা, তাঁদের সঙ্গে বেয়াদবি করার পর মনের ভিতর এক ধরনের অপরাধবোধ হয়, হয়তো মা বাবার কাছ বিচার যাবে, হয়তো মারধোর করবে মা বাবা সেই ভয়ে ধুগবুগ ধুগবুগ করে বুক, কিন্তু নূরজাহানের তেমন কিছুই হল না। উৎফুল্ল মনে ছুটতে লাগল সে।

নিমতলার চুলায় ভাত চড়িয়েছে রাবি। নাড়ার আগুনে তেজ বেশি বলে চুলায় হাঁড়ি বসাতে না বসাতেই বলক ওঠে ভাতে। রাবির হাঁড়িতেও উঠেছে। সেদিকে খেয়াল নাই রাবির। সারাদিন বাড়া বানছে (ভেনেছে) বেপারিবাড়িতে, খানিক আগে বাড়ি ফিরেই নিমতলায় বসেছে, একহাতে ভাত চড়িয়েছে চুলায় অন্যহাতে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছে দশ বছরের ছেলে বাদলাকে। এখন ভাতের দিকে মন নাই, মন বাদলার দিকে। এতবড় হয়েছে ছেলে তবু বুকের দুধ ছাড়তে পারেনি। মাকে দেখলেই নেশাটা বাদলার চেপে বসে। দুইতিন বছর বয়সী শিশুর মতো ভঙ্গি করে মায়ের কোলে প্রথমে মুখ গোঁজে তারপর নিজ হাতে কাপড় সরিয়ে বুকে মুখ দেয়। রাবি একটুও বিরক্ত হয় না। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। মেদিনীমণ্ডল, কুমারভোগ, মাওয়া, দোগাছি যে গ্রামের যে বাড়িতে ডাক পড়ে, বিয়াইন্না রাইত্রে (ভোর রাতে) উঠে কাজ করতে চলে যায়। ধান বানে, ধান সিদ্ধ করে। যে বাড়িতে কাজ করে সকাল দুপুর দুইবেলা খাবার পায় সেই বাড়িতে, ফিরার সময় পায় দেড় দুইসের চাউল। সেই চাউল টোপরে করে বাড়ি ফিরার পরই অন্যমানুষ হয়ে যায় সে। তখন আর রাবি কাজের মানুষ না, তখন রাবি মা। বাদলাকে বুকে চেপে উদাস হয়ে বসে থাকে। বাদলা দুধ খায়, রাবি নির্বিকার।

আজ বিকালে নির্বিকার ছিল না রাবি। রাগে ক্রোধে রোদে পোড়া পরিশ্রমী মুখ তার ফেটে পড়ছে। রাবির স্বভাব হচ্ছে নিচু স্বরে কথা বলা, রাগ করুক আর যাই করুক গলা রাবির কখনও চড়ে না।

এখনও চড়েনি। বুকে মুখ দেওয়া বাদলার মাথায় পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে চাপা রাগি স্বরে বলল, কুনসুম মারছে?

AMARBOI.COM

মায়ের বুক থেকে মুখ সরাল না বাদলা, ঠোঁট আলগা করে জড়ানো গলায় বলল, দুইফরে।

কীর লেইগা মারলো?

এমতেঐ।

এমতেঐ কেঐ কাঐরে মারে না। তুই কী করছস ক!

কিচ্ছু করি নাই।

তরে হেয় পাইলো কই?

আমি তাগ ঐমিহি গেছিলাম।

কীর লেইগা গেছিলি?

কইতর (কবুতর) দেকতে।

কইতর কোনওদিন দেহচ নাই! আইজ নতুন কইরা দেহনের কী অইলো?

একথায় মায়ের বুক থেকে মুখ আলগা করে ফেলল বাদলা। তবে কোল থেকে মুখ সরাল না। যেন এখান থেকে মুখ সরালেই তার সম্পদ ছিনিয়ে নিবে অন্য কেউ, তার খাদ্যে ভাগ বসাবে অন্য কেউ। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বাদলা বলল, এই কইতর দেহি নাই মা। তুমিও দেহো নাই। আইজঐ গোয়ালিমান্দ্রার হাট থিকা কিন্না আনছে। লোটন (নোটন) কইতর। দুধের লাহান ফকফইক্কা। পাখ (পাখনা) দুইডা আর ঠ্যাং দুইডা এক হাতদা ধইরা, ঠোট দুইডা ইট্টু টান দিয়া কতক্ষুণ ঝাইক্কা (ঝাঁকুনি দিয়ে) মাডিতে ছাইড়া দিলে জব (জবাই) করা মুরগির লাহান দাপড়াইতে থাকে। খুব সোন্দর লাগে দেকতে।

রাবি বলল, কী দিয়া মারছে?

বাদলা কথা বলল না। খানিক থেমে মায়ের সঙ্গে কথা বলেছে এখন সেই সময় আর এই সময়ের খাদ্যটা একবারে উসিল (উসুল) করে নিচ্ছে।

রাবি বলল, ঐ ছেমড়া কথা কচ না ক্যা?

পলকের জন্য ঠোঁট আলগা করল বাদলা। খাড়ও কইতাছি।

তাড়াতাড়ি ক।

ক্যা?

আমার কাম আছে।

কী কাম?

বুজিরে কমু না?

কী কইবা?

মোতালেইব্বা যে তরে মারছে!

কইয়া কাম অইবো না। মোতালেব কাকায় কইছে আমি কেঐরে ডরাই না। এই বাড়ি আমার। আমার উপরেদা কেঐ কথা কইলে তারা এই বাইত্তে থাকতে পারবো না। দেলরা বুজিরেঐ থাকতে দিমু না, আর তরা তো চউরা, দেলরা বুজির ঘরে থাকচ।

একথা শোনার লগে লগে বাদলাকে ঠেলা দিয়ে কোল থেকে তুলে দিল রাবি। ওট, ম্যালা খাইছস। লাগলে ইট্টু পরে আবার খাইচ। অহন ল আমার লগে।

AMARBOI.COM

বাদলা হরতরাইস্যা (হকচকানো) ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। কই যামু?

বুজির কাছে।

বাদলা হি হি করে হাসল। বুজির কাছে যাইবা কী, ঐ যে বুজি।

বাড়ির দক্ষিণ দিককার পালানে (বাগানে) আনমনা ভঙ্গিতে পায়চারি করছেন দেলোয়ারা। কোনও কোনও বিকালে কী যেন কী কারণে উদাস হয়ে যান তিনি। বিশাল পালানে নরম পায়ে পায়চারি করেন, আকাশের দিকে তাকান আর ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। দেখে যে কেউ ভাববে গভীর কোনও দুঃখ বেদনায় যেন ডুবে আছেন মানুষটা।

দেলোয়ারা সব সময় সাদা থান পরেন। মাথার চুলও বেশিরভাগই পরনের থানের মতো। মোটাগাটা শরীর, গোলগাল ধপধপা মুখ, চোখে চশমা, পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল, সব মিলিয়ে দেলোয়ারা যে দীর্ঘকাল ধরে বিধবা এটা বোঝা যায়। কোনও কোনও বিকালের বিষণ্ন আলোয় পালানে পায়চারি করা মানুষটাকে দেখে বুকের ভিতর অব্যক্ত এক কষ্ট মোচড় দিয়ে ওঠে রাবির। দেলোয়ারা তার কেউ না, তারা এই অঞ্চলের মানুষই না, পদ্মাচরের মানুষ। চরে কাজকাম নাই, দুইবেলার ভাত জোটে না। এজন্য চরের অন্যান্য মানুষের মতো রাবিও স্বামী সন্তান নিয়ে পদ্মা পাড়ি দিয়ে এপারে এসেছে। এপারে বিক্রমপুর, যুগ যুগ ধরে ধনী অঞ্চল। পদ্মা চরের মানুষেরা, চউরারা চিরকাল এপারেরটা খেয়ে পরে বাঁচে। রাবিও বাঁচছে। স্বামী সন্তান নিয়ে বাঁচছে।

এই অঞ্চলের পয়সাঅলা লোক বেশিরভাগই থাকে ঢাকায়। গ্রামে বড় বড় বাড়ি খালি পড়ে থাকে। ছোট সংসারের চউরা পরিবার পেলে বাড়িতে আশ্রয় দেয়। কাজ কাম দিয়ে সাহায্য করে, টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করে। দিনে দিনে অদ্ভুত এক আত্মীয়তা গড়ে ওঠে।

রাবিরও তেমন এক আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে দেলোয়ারার সঙ্গে। বোধহয় দেলোয়ারার উদাসীনতা দেখে বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে এজন্যই।

এই বাড়ির হদিস রাবিদেরকে দিয়েছিল মিয়াবাড়ির বাঁধা কামলা আলফু। একই চরের মানুষ তারা। দীর্ঘদিন এই অঞ্চলে যাতায়াত আলফুর। এলাকার প্রায় সবাইকে চিনে, সবাই তাকে চিনে। আলফুর কথায় এই বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে তারা।

বাড়িটা তিন শরিকের। দেলোয়ারা বড় শরিকের মেয়ে। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন বলে শ্বশুরবাড়ি আর যাননি। একমাত্র মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে এসেছিলেন। মা বাবা গত হয়েছেন বহুকাল আগে। কোনও ভাই নাই, দুইটি মাত্র বোন তাঁরা। বড়বোনের বড় অবস্থা। ঢাকায় বাড়ি গাড়ি সবই আছে। ছেলেরা ব্যবসাবাণিজ্য করে কেউ, কেউ বিদেশে থাকে। দেলোয়ারার মেয়েটাও ছিল ঢাকায়, খালার কাছে। পড়াশুনা শিখিয়ে, ম্যালা টাকা পয়সা খরচা করে সেই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে দেলোয়ারার বোনপোরা। জামাই কাপড়ের ব্যবসা করে। অবস্থা ভাল। দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের সংসার।

মেয়ে জামাই কিছুতেই চায় না গ্রামে পড়ে থাকেন দেলোয়ারা। তাদের কাছে গিয়ে থাকেন। যান দেলোয়ারা, তবে দুইচার দিনের জন্য। বেড়াতে। টাউনে বেশিদিন মন টিকে না বলে চলে আসেন। বাপের বাড়ির সম্পত্তি দেলোয়ারা না থাকলে গিলে খাবে

AMARBOI.COM

লোকে। রাবিদের নিয়ে বাড়ি আলগান (আগলান) তিনি, ঘর দুয়ার জায়গা সম্পত্তি আলগান। এই করতে করতে অদ্ভুত এক মায়া পড়ে গেছে সবকিছুর ওপর। দুইচার দিনের জন্য ফেলে গেলেও মন খুঁত খুঁত করে।

বাড়ির অন্য দুই শরিকের ঘরে ম্যালা ছেলেমেয়ে। কর্তারা কেউ বেঁচে নাই, তাদের ছেলেমেয়েরা আছে। মেয়েদের সবারই বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেরা যে যার মতো সংসার করছে কেউ ঢাকায়, কেউ গ্রামে। কেউ আবার দুই জায়গায়ই। বউ ছেলেমেয়ে গ্রামে, নিজে থাকছে ঢাকায়। শুধু ছোট শরিকের চার নম্বর ছেলে মোতালেব থাকে বাড়িতে। গৃহস্থালী করে আর গ্রামে মাতাব্বরি সর্দারি করার চেষ্টা করে। দেশ গ্রামে তার দুই পয়সার দাম নাই। লোভী আর ছ্যাঁচড়া ধরনের লোক বলে মোতালেবকে কেউ পাত্তা দেয় না। গ্রামের কোথাও তার কথা টিকে না বলে নিজের ক্ষমতা সে দেখায় বাড়িতে। বাড়িরও সবার সঙ্গে না, দেলোয়ারাদের ঘরে আশ্রিত রাবি, রাবির ছেলে বাদলা স্বামী মতলেব হচ্ছে তার ক্ষমতা দেখাবার জায়গা। সুযোগ পেলেই নানা রকমভাবে এদেরকে সে উৎপীড়ন করে। আজ যেমন মেরেছে বাদলাকে।

নিজে দুই চারটা খারাপ কথা শুনতে রাজি আছে রাবি, স্বামীকেও কেউ ছোটখাট অপমান করলে রাও করে না কিন্তু ছেলের গায়ে হাত দিলে তাকে রাবি কিছুতেই ছাড়বে না, সে যেই হোক।

মোতালেবকেও রাবি আজ ছাড়বে না। প্রথমে দেলোয়ারা বুজিকে সব বলবে, বুজি যদি বিচার না করে সে নিজে গিয়েই দাঁড়াবে মোতালেবের সামনে। মুখে যা আসে তাই বলে বকাবাজি করবে। বউ পোলাপানের সামনে যতদূর অপমান করার করবে। মোতালেব তো আর মারতে পারবে না তাকে! অন্যের বউঝির গায়ে হাত তোলা এত সোজা না। দেশ গ্রামে বিচার সালিস আছে।

ছেলের হাত ধরে দেলোয়ারার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রাবি। বুজি, ও বুজি।

দেলোয়ারা তাকিয়েছিলেন আকাশের দিকে। রাবির ডাকে তার দিকে মুখ ফিরালেন। কী রে?

আপনের লগে কথার কাম আছে।

ক।

এই বিচার আপনের আইজঐ করন লাগবো, অহনঐ করন লাগব। না করলে এই বাইত্তে আমি থাকুম না। এই বাইত থিকা যামু গা।

চোখ থেকে মোটা কাচের চশমা খুলে শাড়ির আঁচলে মুছতে লাগলেন দেলোয়ারা। শান্ত গলায় বললেন, কী অইছে ক।

আমার পোলারে মারছে।

কে?

আপনের ভাইয়ে।

কোন ভাইয়ে?

এই বাইত্তে আর কোন ভাই আছে আপনের! মোতালেব।

কীর লেইগা মারছে?

AMARBOI.COM

কইতর দেকতে গেছিলো।

বাদলার দিকে তাকাল রাবি। ঐ ছেমড়া কী দিয়া মারছে তরে, ক, বুজিরে ক।

বাদলা বলল, কিছু দিয়া মারে নাই। ঠাস কইরা পিডে একটা থাবর দিছে। তারবাদে গলা ধইরা ধাক্কা দিয়া খেদাইয়া দিছে।

কাচ মোছা শেষ করে চশমাটা আবার চোখে পরলেন দেলোয়ারা। নির্বিকার গলায় বললেন, আইচ্ছা, মোতালেবরে আমি কমুনে।

দেলোয়ারার এই আচরণ ভাল লাগল না রাবির। সে যে ধরনের মন নিয়ে বিচার দিতে এল তার ধারকাছ দিয়েও গেলেন না দেলোয়ারা। ছেলেটাকে মেরেছে এটা যেন পাত্তাই দিলেন না।

ভিতরে ভিতরে রেগে গেল রাবি। চাপা গলায় বলল, আপনের কাছে আইলাম বিচার দিতে আর আপনে কথাডা গায় লাগাইলেন না, এইডা ঠিক করলেন না বুজি!

রাবির মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন দেলোয়ারা। তুই তাইলে কী করতে কচ? আমি গিয়া বইক্কামু (বকে আসব) মোতালেইব্বারে, না মাইরামু (মেরে আসব)?

হেইডা আপনে পারবেন না। হেই ক্ষমতা আপনের নাই। মোতালেইব্বা তো কইছেঐ অর লগে কাইজ্জা করলে আপনেরে সুদ্দা বাড়িত থন বাইর কইরা দিবো।

কথাটা দেলোয়ারার খুবই গায়ে লাগল। ভুরু কোঁচকালেন তিনি। কী কইলি?

হ। বিশ্বাস না অইলে বাদলারে জিগান।

ছেলের দিকে তাকাল রাবি। কীরে বাদলা, কয় নাই?

বাদলা বলল, হ কইছে।

কো মোতালেইব্বা কো ? ল তো আমার লগে।

তিন বয়সী তিনজন মানুষ যখন পা বাড়িয়েছে মান্নান মাওলানা এসে দাঁড়ালেন পালানে। বইন আছোনি বাইত্তে?

মান্নান মাওলানাকে দেখে বেতিব্যস্ত হল তিনজন মানুষ। দেলোয়ারা রাবি মাথায় ঘোমটা দিল।

দেলোয়ারা কথা বলবার আগেই রাবি বলল, এহেনেঐ বইবেন না ঘরে যাইবেন হুজুর?

মান্নান মাওলানা রাবির দিকে তাকালেন না। দেলোয়ারার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, ঘরেঐ বহি, কী কও বইন! তোমার লগে কথার কাম আছে।

দেলোয়ারা বললেন, লন তাইলে ঘরে লন।

দেলোয়ারা আর মান্নান মাওলানা ঘরে ঢোকার আগেই প্রায় ছুটে এসে বড়ঘরে ঢুকল রাবি। উত্তরমুখি কামরায় রাখা হাতলআলা চেয়ারগুলির একটা আঁচলে মুছে পরিষ্কার করল। দেলোয়ারার সঙ্গে মান্নান মাওলানা এসে এই কামরায় ঢোকার লগে লগে বলল, বহেন হুজুর। বহেন।

মান্নান মাওলানা তবু রাবির দিকে তাকালেন না। দাঁড়ি হাতাতে হাতাতে তাকালেন দেলোয়ারার দিকে। বহো বইন।

AMARBOI.COM

মাথায় ঘোমটা দেওয়া দেলোয়ারাকে এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে। বয়সের তুলনায় বেশি বয়স্ক, বেশি ভারিক্কি। গুছিয়ে নরম ভঙ্গিতে একটা চেয়ারে বসলেন তিনি। চশমার ভিতর থেকে মান্নান মাওলানার দিকে তাকালেন। তিনি কথা বলবার আগেই রাবি বলল, চা বানামু বুজি?

এবার রাবির দিকে তাকালেন মান্নান মাওলানা। বানাও, ভাল কইরা চা বানাও। দুদ দিবা না। লাল চা। আদা তেজপাতা দিবা। গলাডা দুইদিন ধইরা খুসখুস করতাছে।

রাবি দেলোয়ারার দিকে তাকাল। আপনেরেও দিমু বুজি?

দেলোয়ারা বললেন, না। চা আমার ভাল্লাগে না।

রাবি যতক্ষণ বাড়িতে থাকে বাদলা আছে তার লগে লগে। মায়ের আঁচলটা ধরেই থাকে। এখনও আছে। চায়ের কথা শুনে রাবির আঁচল ধরে একটা টান দিল। রাবি বিরক্ত হয়ে ছেলের দিকে তাকাল। কী রে, এমন করচ ক্যা?

বাদলা ফিসফিস করে বলল, আমারেও ইট্টু চা দিও মা। বাডিতে কইরা দিও। ফু দিয়া দিয়া খামুনে। চা খাইতে বহুত মজা।

দেলোয়ারা বললেন, ওই ছেমড়া কী কচ হাকিহুকি (ফিসফিস) কইরা?

রাবি হাসিমুখে বলল, না কিছু না। অন্যকথা।

তারপর ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে গেল।

দেলোয়ারা বললেন, কন মাওলানা সাব, কী কথা, হুনি।

মান্নান মাওলানা একটু গলা খাঁকারি দিলেন। মুখখানা অমায়িক করে বললেন, তোমার বইনপো বাইত্তে আইবো না?

কে এনামুল?

হ।

আইবো।

কবে?

সঠিক কইতে পারি না। তয় তাড়াতাড়িঐ আইবো। বহুতদিন বাইত্তে আহে না।

এইবার আইলে আমারে ইট্টু খবর দিও। তার লগে কথার কাম আছে।

আইচ্ছা দিমুনে।

মান্নান মাওলানা হাসলেন। কী কথার কাম জিগাইলা না?

দেলোয়ারাও হাসলেন। যেই কথা এনামুলরে কইবেন হেই কথা আমার কাছে কইবেন কিনা জানি না তো!

না কওনের কিছু নাই।

তাইলে কন।

তোমার বইনপোর তো টেকা পয়সার আকাল নাই! আল্লায় দিলে বহুত টেকা পয়সার মালিক হইছে। এখন তার উচিত আল্লার কাম করা।

সেইটা এনামুল করে মাওলানা সাব। আটরশি হুজুরের মুরিদ অইছে। কয়দিন পর পরঐ হুজুরের লগে দেহা করতে যায়। জাকাত ফেতরা ঠিক মতন দেয়, গেরামের গরিব মিসকিনগো কাপোড় লুঙ্গি দেয়, টেকা পয়সা দিয়া সাহাইয্য করে। কথায় কথায় মিলাদ

AMARBOI.COM

শরিফ পড়ায়, মাদ্রাসার ছাত্রগো দিয়া কোরআন খতম দেওয়ায়। রোজার মাসে রোজঐ চাইর পাচজন কইরা রোজদাররে ইসতারি (ইফতার) করায়। আল্লার কাম অনেক করে এনামুল।

দেলোয়ারার কথা শুনে খুবই খুশি হলেন মান্নান মাওলানা। উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন, ভাল কথা, খুব ভাল কথা। আল্লার কাম করলে আল্লায়ও তাগো দেয়। তোমার বইনপোরেও আল্লায় দিছে এর লেগাইঐ। তয় অহন আরেকখান বড়কাম এনামুলের করন উচিত।

কী কাম?

তোমগো এই পাড়ায় কোনও মজজিদ নাই। পুব পাড়ায় আমিন মুন্সির বাড়ির লগে ছোড একখান মজজিদ আছে। খাইগো বাইত্তে আছে বিরাট মজজিদ। তোমগো এই পাড়ায়ও একখান মজজিদ থাকন দরকার। এনামুলরে কও একখান মজজিদ কইরা দিতে। তুমি কইলে তোমার কথা হেয় না রাইক্কা পারবো না।

একটুখানি চুপ করে থেকে দেলোয়ারা বললেন, কথাডা মন্দ কন নাই। দেশে একখান মজজিদ কইরা দিলে নাম অইবো। বেবাকতে কইবো দেলরার বইনপোয় মজজিদ কইরা দিছে।

নামও অইবো আল্লার কামও অইবো। মচজিদ করন যে কত বড় ছোয়াবের কাম হেইডা কেঐরে কইয়া বুজান যাইবো না। আল্লায় কইছে, হে মমিন মোসলমান, হে আমার পেয়ারে বান্দা, রসুলের উম্মত, তোমাদের মইদ্যে যাহাদিগকে আমি ব্যাপক ধন সম্পদ দান করিয়াছি সেই ধন সম্পদের কিয়দাংশ তোমরা আমার কাজে ব্যয় করো। বলো সোবহানআল্লাহ।

দেলোয়ারা বিড়বিড় করে বললেন, সোবহানআল্লাহ।

মান্নান মাওলানার জন্য আদা চা বানিয়ে, পুরানা আমলের বড় একটা কাপে করে নিয়া আসছে রাবি। দরজার কাছে এসে শোনে ওয়াজ করছেন তিনি। ভয়ে তাঁকে আর ডাকেনি সে। ওয়াজরত মাওলানার মনোযোগ নষ্ট করলে আল্লাহ ব্যাজার হবেন। তবে ওয়াজ শেষ হওয়ার লগে লগে অত্যন্ত বিনীতভাবে চায়ের কাপটা সে মান্নান মাওলানার হাতে দিল। নেন হুজুর। মুখেদা দেহেন ঠিক আছেনি!

মান্নান মাওলানা চায়ে চুমুক দিলেন। বেশ গরম চা তবে সেই গরম চা তাঁর ঠোঁট জিভে তেমন কোনও আলোড়ন তুলতে পারল না। শব্দ করে চা খান তিনি। চুমুকে চুমুকে লুইপস লুইপস করে শব্দ হতে লাগল। এই ধরনের শব্দ দেলোয়ারা অপছন্দ করেন। বনেদী বংশের মেয়ে। জন্মের পর থেকেই নানাবিধ সহবত তাঁদের শিখানো হয়েছে। সেইসব সহবতের একটা হচ্ছে পানি, দুধ চা যাই খাবে ঠোঁটে গলায় শব্দ হবে না। দুধভাত ডালভাত যাই খাবে, প্লেটে চুমুক দিয়ে খাবে ঠিকই শব্দ হবে না। ফলে ছোটবেলা থেকেই এই ধরনের শব্দ শুনলে গা রি রি করে দেলোয়ারার।

এখনও করছিল। অন্য কেউ হলে বেশ একটা ধমক তাকে দিতেন দেলোয়ারা। মান্নান মাওলানা মরুব্বি মানুষ, তাঁকে তো আর ধমক দেওয়া যায় না!

বিরক্তি চেপে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন দেলোয়ারা।

AMARBOI.COM

রাবির হয়েছে অন্য অবস্থা। গভীর আগ্রহ নিয়ে মান্নান মাওলানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সে। চা ঠিক হয়েছে কী না বুঝতে পারছে না। ঠিক না হলে মাওলানা সাহেবের অদিশাপ (অভিশাপ) এসে লাগবে তার ওপর। জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে।

চা শেষ করে কাপটা রাবির হাতে ফিরত দিলেন মান্নান মাওলানা।

রাবি ভয়ে ভয়ে বলল, কিছু দিহি কইলেন না?

মান্নান মাওলানা রাবির দিকে তাকিয়ে হাসলেন। কী কমু?

চা কেমুন অইছে? খাইয়া আরাম পাইছেননি?

ভাল অইছে। আরাম পাইছি।

লগে লগে মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল রাবির। তাইলে আমার পোলাডারে একটা ফু দিয়া দেন।

কী অইছে তোমার পোলার?

হারাদিন খালি বানরামি (বাদড়ামো) করে।

কো?

চুলারপাড় বইয়া চা খাইতাছে।

ভুরু কুঁচকে রাবির দিকে তাকালেন দেলোয়ারা। চা খাইতাছে?

হ। বাডিতে কইরা এই এতডু চা লইছে, লইয়া ফু দিয়া ফু দিয়া খাইতাছে।

পোলাপানের চা খাওন ভাল না। শইল কইয়্যা (কষে) যাইবো। আদা চা শইল কষাইয়া হালায়।

রাবি একথা পাত্তা দিল না। পিছনের দরজার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ছেলেকে ডাকল। ঐ বাদলা হবিরে (তাড়াতাড়ি) আয়। হবিরে।

চোখের পলকে ছুটে এল বাদলা। কীর লেইগা বোলাও (ডাক)!

আয়।

বাদলার হাত ধরে মান্নান মাওলানার সামনে এনে দাঁড় করাল রাবি। দেন, ফু দেন। ও যেন আর কইতর দেকতে যাইতে না পারে, মোতালেইব্বা যেন অরে আর না মারতে পারে আর চা যেন ও আর কোনওদিন না খাইতে চায়।

রাবির কথা শুনে বেদম হাসি পাচ্ছিল দেলোয়ারার। অন্যদিকে তাকিয়ে হাসি চাপছিলেন তিনি। তবে মান্নান মাওলানা নির্বিকার। বিড়বিড় করে দোয়া পড়ছেন। পড়ে ফুস ফুস করে তিনটা ফুঁ দিলেন বাদলার মাথায়। যা।

রাবির দিকে তাকিয়ে বললেন, কোনও অসুবিদা অইলে আমার বাইত্তে লইয়া যাইয়ো। ফু দিয়া দিমুনে। লাগলে পানি পড়াও দিমুনে।

আইচ্ছা।

রাবি গদগদ হয়ে ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে গেল।

রাবি বেরিয়ে যাওয়ার পর মান্নান মাওলানা বললেন, বইনপোরে তুমি খবর দেও বইন, আমি নিজে হের লগে কথা কই। তুমি তো কইবাঐ, লগে যুদি আমিও কই, কথাডায় জোর অইবো।

দেলোয়ারা বললেন, আইচ্ছা খবর পাডামুনে।

AMARBOI.COM

কাম কাইজ শুরু করনের পর হের কোনও চিন্তা ভাবনা করন লাগবো না। মজজিদের বেবাক কাম আমি কইরা দিমু। দিনরাইত খাইট্টা মজজিদ বানাই দিমু। ইমামতিও করুম। বইনপোর কোনও ব্যাপারেঐ চিন্তা করন লাগবো না।

মজজিদটা করবেন কই?

ক্যা তোমগো ছাড়ায়!

ঐ ডা তো আমার বাপের জাগা।

বাপের জাগা অইছে কী অইছে? অহন মালিক তুমি আর তোমার বইনে।

হ।

বেরাদারি হক (যে লোকের ছেলে সন্তান না থাকে, শুধু মেয়ে থাকে তার জায়গা সম্পত্তির সামান্য একটি অংশ ওই লোকের ভাই বোনরা পায়। এই ব্যাপারটিকে বোঝানো হচ্ছে) তো তোমার চাচা ফুবুগো কাছ থিকা তোমরা কিন্না লইছো!

হ অনেক আগেঐ লইছি।

তাইলে আর কোনও ঝামেলা নাই। তোমগো কাছ থনে তোমার বইনপোয় ঐ বাড়ি কিন্না লইবো।

এইডা ঠিক অইব না। যেই বইনপোরডা খাইয়া বাচতাছি তার কাছে কেমতে কমু আমগো ছাড়াবাড়ি কিন্না মজজিদ বানা।

তাইলে বইনপোর নামে বাড়িডা লেইক্কা দেও। আর নাইলে মজজিদের নামে ওয়াকফা কইরা দেও।

ঠিক আছে। এনামুলরে খবর দেই, আসুক, তারবাদে যা করনের করুম।

তয় আমি মনে করি মজজিদটা তোমগো করন উচিত।

আপনে চিন্তা কইরেন না। করুম।

এ কথায় আনন্দে একেবারে দিশাহারা হয়ে গেলেন মান্নান মাওলানা। কাঁচাপাকা দাঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে থাকা মুখ হাসিতে ভরে গেল। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। আমি জানতাম তুমি আমার কথা না হুইন্না পারবা না। বড় ঘরের মাইয়া তোমরা, বড় বংশের মাইয়া, তোমগো আদব লেহাজঐ অন্যরকম। ময়মুরুব্বিগ মানতে শিখছো। আল্লায় তোমার বইনপোরে আরও বড় করুক।

একটু থেমে বললেন, তাইলে আমি অহন যাই বইন। বইনপোয় আইলে খবর দিও।

দেলোয়ারাও তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। মান্নান মাওলানার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, আইচ্ছা।

মান্নান মাওলানা বেরিয়ে যাওয়ার পর উঠানে মোতালেবকে দেখতে পেলেন দেলোয়ারা। হাতে ছালার একটা ব্যাগ। ব্যাগের পেট বেশ ফোলা।

ঘর থেকে বেরিয়ে মোতালেবকে ডাকলেন দেলোয়ারা। এই মোতালেব, হোন।

হাতের ব্যাগ ঘরের পিড়ার কাছে রাখল মোতালেব। বেশ একটা ভাব ধরে দেলোয়ারার দিকে এগিয়ে এল। কিন্তু দেলোয়ারার দিকে তাকাল না। পশ্চিমের ভিটিতে মোতালেবদের বাংলাঘর। সেই ঘরের সামনে ঝাপড়ানো একটা হাসনাহেনার ঝাড়।

AMARBOI.COM

হাসনাহেনা ঝাড়ের পাশ দিয়ে বাংলাঘরের সামনের দিককার দুইপাশ বেয়ে উঠেছে কুঞ্জলতা, উঠে চালের (চালার) উপর গিয়ে ছড়িয়েছে। ঘরের পিছনে বিশাল একখানা তেঁতুল গাছ। তেঁতুলের ঝাপড়ানো ডালা এসে নত হয়েছে চালের ওপর। বিকালবেলার রোদ যত্ন করে আটকে দেয় এই ডালখানা। ফলে বিকালের মুখে মুখে মোতালেবদের বাংলাঘরের চালে বেশ একটা ছায়া ছায়া ভাব। শীতকাল এসে গেল বলে, উত্তরের হাওয়া বইতে শুরু করেছে বলে আজ এসময় বেশ একটা শীত শীত ভাব। এজন্যই কী না কে জানে, বাংলাঘরের চালের ওপর তেঁতুলের ডালার দিকে তাকিয়ে রইল মোতালেব। সেই অবস্থায় দেলোয়ার লগে কথা বলতে লাগল। কী?

মোতালেব তাঁর দিকে তাকিয়ে কথা বলছে না দেখে বিরক্ত হলেন দেলোয়ারা। গলা একটু রুক্ষ হল তাঁর। বললেন, বাদলারে তুই মারছস ক্যা?

মোতালেব তবু দেলোয়ারার দিকে তাকাল না। আগের মতোই তেঁতুলের ডালার দিকে তাকিয়ে বলল, মারছি কী অইছে?

কী কইলি?

এবার তেঁতুলের ডালা থেকে চোখ ফিরাল মোতালেব। দেলোয়ারার দিকে তাকাল। নির্বিকার গলায় বলল, কইলাম, মারছি কী অইছে?

মোতালেবের কথার ভঙ্গিতে পিত্তি জ্বলে গেল দেলোয়ারার। কপালে তিনটা ভাঁজ পড়ল। গলা আরেকটু রুক্ষ হল। পরের পোলারে কীয় লেইগা মারবি তুই?

শয়তানি করছে দেইক্কা মারছি।

কী শয়তানি করছে তর লগে?

কী করছে হেইডা আপনেরে কওন লাগবনি?

কওন লাগবো। বাদলারা আমগো ঘরে থাকে। আমগো মানুষ।

আপনেগো সব সময় ছোডজাতের লগে খাতির। আগে আছিলো হাজামগো লগে, অহন অইছে চউরাগো লগে।

ঘাড় বাঁকা করে দেলোয়ারা বললেন, দেখ মোতালেইব্বা কথাবার্তা ঠিক মতন ক। ডাক দিলেই হাজামগো আমরা পাইতাম। অগো দিয়া আমগো কাম অইতো। অহন হেই কাম চউরাগো দিয়া করাই। এই হগল লইয়া কোনও রকমের বাড়াবাড়ি তুই করিচ না।

বাড়াবাড়ি করলে কী অইবো? কী করবেন আপনে?

দেখবি কী করুম?

হ দেহুম।

কাউলকাঐ (কালই) ঢাকায় খবর পাডামু। এনামুলরে বাইত্তে আইতে কমু।

একথা শুনে মোতালেব নাক ফুলিয়ে বলল, এনামুলের ডর দেহাননি আমারে? এনামুলরে জমাখরচ দিয়া চলি আমি, এ্যা?

জমাখরচ দিয়া চলছ না? ভাত না জোটলেঐত্তো ঢাকায় এনামুলগো বাসায় গিয়া উডছ। আমার বইনের পায়ে ধইরা, এনামুলের পায়ে ধইরা টেকা পয়সা সাহাইয্য আইন্না খাচ। সাহাইয্য চাওনের সময় এত বড় বড় কথা কই থাকে? এনামুল বাইত্তে আইলে তো দেহি চাকরের লাহান তার পিছে পিছে ঘোরছ। বড়খেত বরগা লওনের

AMARBOI.COM

লেইগা মামু মামু কইরা পাগল অইয়া যাচ। বাইত্তে মাডি উডাইবো এনামুল, হেই কামও তো তুই করছ। আমগো বাড়ির কামের উপরে দিয়া টেকা কামাছ, তারবাদেও আমগো লগে বড় বড় কথা! জীবনভর তগো অইত্যাচার সইজ্জ করছি। আমগো কোনও আপনা ভাই বেরাদর আছিলো না দেইক্কা জীবনভর তরা আমগো অইত্যাচার করছস। তারবাদেও জীবনভর তগো আমরা উপকার করছি। কইলকাত্তা থিকা আইয়া পড়নের পর, জাহাজের চাকরি শেষ অইয়া যাওনের পর তর বাপে ঢাকা গিয়া আমার দুলাভাইয়ের হাত প্যাচাইয়া ধরলো। এতডি পোলাপান লইয়া না খাইয়া মইরা যামু জামাই, আপনে আমার একটা বেবস্থা কইরা দেন। দুলাভাই তারে মিনসিপালটিতে (মিউনিসিপ্যালিটিতে) কনটেকটারি কামে লাগাইয়া দিলো। তর মাজারো ভাইরে কাপড়ের দোকানের কামে লাগাইয়া দিলো। তরে দিলো জুতার দোকানের কামে। দুলাভাই মইরা যাওনের পর বুজির কাছ থিকা ছয় হাজার টেকা নিছস, হেই টেকার এক পয়সাও শোদ করছ নাই। মাইরা খাইছস। তারবাদেও আমগো লগে এত বড় কথা? নরম পাইছস আমগো? হেইদিন আর নাই। অহন বেশি বাড়াবাড়ি করবি খারাপ অইয়া যাইবো। আহুক এনামুল। ও যুদি তর বিচার না করে তাইলে আমি আমার মাজারো বইনপোরে খবর দিমু। অরে তো চিনস না, আইয়া তরে কোনও কথা জিগাইবো না। বাড়ির উডানে হালাইয়া বউ পোলাপানের সামনে তর গলায় পাড়া দিয়া ধরবো। এতবড় সাহস তর, বাদলারে তুই কচ, লাগলে আমারেও এই বাইত থিকা বাইর কইরা দিবি। বাড়িডা তর বাপের?

বেশি রেগে গেলে কথা দ্রুত বলেন দেলোয়ারা। এখনও সেভাবেই বলছিলেন। ফলে মোতালেব আর কথা বলবার সুযোগ পাচ্ছিল না। এদিকে দেলোয়ারার গলা শুনে বাড়ির প্রতিটা ঘর থেকে লোকজন বের হয়ে উঠানে ভিড় করেছে। রাবি আর বাদলা এসে দাঁড়িয়েছে দেলোয়ারার পিছুনে কিন্তু কথা বলছে না। মোতালেবকে কেউ শায়েস্তা করলে বাড়ির অন্যান্য লোকজন খুশি হয়। সেই খুশির ছাপ লেগেছে কাইজ্জা শুনতে আসা প্রতিটি মানুষের মুখে।

মোতালেবের বউ দাঁড়িয়ে ছিল কবুতরের খোঁয়াড়ের সামনে। কাইজ্জায় স্বামী সুবিধা করতে পারছে না দেখে, কথা বলবারই সুযোগ পাচ্ছে না দেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে মোতালেবের হাত ধরল সে। বাদ দেও এই হগল। ঘরে আইসা পড়।

লগে লগে দেলোয়ারার ওপরকার রাগ বউর ওপর ঝেড়ে দিল মোতালেব। জোরে হাত ঝটকা মারল। কাহিল বউটা প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল দূরে। মোতালেব চিৎকার করে বলল, তুই আমারে থামাইতে আহচ ক্যা মাগী? আমি কি কেঐরে ডরাই? কেঐরডা খাই না ফিন্দি?

মোতালেবের বউ কথা বলল না। উঠে কাপড় থেকে ধুলা ঝাড়তে লাগল। স্বামীর এই ধরনের ঠেলাধাক্কা প্রায়ই খায় সে। যে কোনও কাজের ব্যর্থতার ঝাল মোতালেব তার বউর ওপর ঝাড়ে। বউটা এই সব ব্যাপারে অভ্যস্ত। বাড়ির লোকজন তাকিয়ে তাকিয়ে তার উড়ে গিয়ে পড়াটা দেখল তবু সে কিছুই মনে করল না। আবার এসে স্বামীর সামনে দাঁড়াল।

AMARBOI.COM

দেলোয়ারা তখন বলছে, কথা কইতে কইতে গলা বইল্লা (বড় হয়ে) গেছে, না? যার তার শইল্লে হাত তোলতে তোলতে হাত বইল্লা গেছে। এর লেইগাইত্তো মন্না দাদার পোলায় ধইরা খালে চুবাইয়া দিছিলো। এইবার আর চুবান না, বেশি বাড়াবাড়ি করবি জেল খাডাইয়া ছাড়ুম। মনে নাই? ভুইল্লা গেছস বেবাক কথা? মাজারো কাকার পোলারা আর তরা মিল্লা যে বড়খেতের ধান কাইট্টা নিছিলি, তারবাদে যহন দরগা পুলিশ আইয়া গুষ্টিসুদ্দা বানছিলো, রাইত দুইফরে ছালাভরা ধান মাথায় কইরা আমগো ঘরে দিয়াইছিলি। গুষ্টিসুদ্দা কাইন্দা কুল পাছ নাই। বেবাকতে মিল্লা আমার দুলাভাইয়ের পাও প্যাচাইয়া ধরছিলি। ভুইল্লা গেছস? দুলাভাই মইরা গেছে কী অইছে? তার পোলারা নাই? এনামুল না পারলে মাজরো বইনপোরে খবর দিমু আমি। আইয়া কইলজা (কলিজা) গালাইয়া হালাইবো তর।

এবারও মোতালেব কোনও কথা বলতে পারল না। তার আগেই মন অন্যদিকে চলে গেল তার। বউ এসে আবার হাত ধরেছে। অন্যদিকে দেলোয়ারার হাত ধরেছে তার মেজো চাচার আগের পক্ষের ছেলে হাফেজের বউ। বাদ দেন বুজি। অনেক অইছে। লন ঘরে লন।

হাত ধরে টানতে টানতে দেলোয়ারাকে ঘরে নিয়ে গেল হাফেজের বউ। তখনও রাগ কমেনি দেলোয়ারার। আগের মতোই রাগে গো গো করছেন তিনি। ওদিকে মোতালেবের তখন সব রাগ গিয়ে পড়েছে বউর উপর। প্রথমে গলা ধরে প্রচণ্ড জোরে বউকে একটা ধাক্কা দিল সে। তারপর গুমগুম করে তিন চারটা কিল মারল পিঠে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, চুতমারানী মাগী খালি আমার লগে লাইগ্যা থাকে। অর লেইগা মাইনষের লগে কাইজ্জাও করতে পারি না।

বউ কোনও প্রতিবাদ করল না, কাঁদল না। দুঃখি মুখ করে স্বামীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মোতালেবের মেয়ে ময়না ছিল ঘরের ভিতর। ছয় সাত বছর বয়স মেয়ের। ডানপা খোঁড়া। হাঁটুর নিচ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত শুধুই হাড়। হাড়ের ওপর লেগে আছে টিকটিকির চামড়ার মতো ফ্যাকাশে চামড়া। এক ছটাক মাংস নাই। এই পা নিয়ে দাঁড়াতে পারে না মেয়েটা, হাঁটতে পারে না। সারাক্ষণ বসে থাকে, কোথাও যেতে হলে হেউচড়াইয়া (ছেঁচড়ে) যায়।

ঘরের ভিতর থেকে মাকে মার খেতে দেখে হাঠড় পাছড় করে বের হল ময়না। হেউচড়াইয়া হেউচড়াইয়া মার কাছে গেল। দুইহাতে মার শাড়ি খামছে ধরে বলতে লাগল, দুঃকু পাইছ মা? দুঃকু পাইছ! বহো আমি তোমারে আদর কইরা দেই। আমি আদর করলে দুঃকু তোমার থাকবো না।

এতক্ষণ কিচ্ছু হয়নি বউর, মেয়ের কথা শুনে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। চোখের পানি গাল বেয়ে দরদর করে নামল।

মার মুখের দিকে তাকিয়ে ময়না বলল, কাইন্দো না মা, কাইন্দো না। বহো, আমি তোমারে আদর কইরা দেই।

এক পলক বউকে দেখল মোতালেব, মেয়েকে দেখল। তারপর বড়ঘরের পিড়ায়

AMARBOI.COM

গিয়ে বসল। ছালার ব্যাগ থেকে একমুঠ গম নিয়ে উঠানে ছিটিয়ে দিল। ঘরের চাল থেকে, গাছের ডাল খোঁয়াড় থেকে উঠানে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল অনেকগুলি কবুতর। গম খেতে লাগল।

হাফেজের বউ তখন দেলোয়ারাকে একটা চেয়ারে বসিয়েছে। চেয়ারে বসে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলছেন দেলোয়ারা। একটানা এতক্ষণ চিৎকার করে কথা বলার ফলে ক্লান্ত হয়েছেন। দেলোয়ারার স্বভাব হল কোথাও বসলে প্রথমেই চশমা খোলেন, খুলে শাড়ির আঁচলে যত্ন করে কাচ মোছেন। যেন রাজ্যের সব ধুলাবালি জমে আছে কাচে। এখনও তাই করতে গেলেন। চোখ থেকে মাত্র চশমাটা খুলবেন, চোখ গেল উঠানের দিকে। উঠানে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদছে মোতালেবের বউ, ময়না তার শাড়ি খামছে ধরে টানছে। অদূরে পিড়ার ওপর বসে নির্বিকার মুখে কবুতরদের গম খাওয়াচ্ছে মোতালেব। সব দেখে বউটার ওপর অদ্ভুত এক মমতায় মন ভরে গেল দেলোয়ারার। আহা তার জন্য মাঝখান থেকে মার খেল নিরীহ বউটা।

দেলোয়ারার তারপর ইচ্ছা হল আবার উঠে গিয়ে মোতালেবের সামনে দাঁড়ান। আগে কী বকাবাজি করেছেন তার দ্বিগুণ করেন এখন। মরদামি (মরদগিরি) দেহাচ ঘরের বউর লগে? মন্নাফ দাদার অতডু (অত ছোট) পোলায় যে ধইরা চুবাইয়া দিলো, তারে তো কিছু কইতে পারলি না। সাহস থাকলে যা, তারে মাইরা আয়, দেহি!

ইচ্ছা ইচ্ছাই, সব ইচ্ছা কাজে লাগে না।

উঠানে দাঁড়ানো মোতালেবের বউর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দেলোয়ারা। চশমা খুলে শাড়ির আঁচলে কাচ মুছতে লাগলেন।

AMARBOI.COM

এই অঞ্চলের বাড়ি থেকে নামার সময় গতি বেড়ে যায় মানুষের। উঁচু ভিটা থেকে নেমে আসতে হয় সমতল চকেমাঠে। ফলে নামার দিকে পা ফেলা অর্থ হচ্ছে পা দুইটা আপনা আপনি দৌড়াতে থাকবে, যার পা সে টের পাবে না।

আজ বিকালে মজনুরও এই অবস্থা হল। বাড়ির উত্তর পশ্চিম কোণ দিয়ে নামতে গেছে, একটু আনমনা ছিল, ফলে পা এত জোরে দৌড়াল, নিচে নেমে একজন মানুষের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

মানুষটা তখন দুইহাতে জড়িয়ে ধরেছে মজনুকে। আস্তে আস্তে। আছাড় খাইবেন তো!

লজ্জা পেয়ে নিজেকে সামলাল মজনু। মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। নূরজাহান দাঁড়িয়ে আছে তাকে ধরে। নাকে নথ পরা মিষ্টি মুখখানা উজ্জ্বল হাসিতে ঝকঝক করছে।

মজনুকে এভাবে তাকাতে দেখে জীবনে এই প্রথম শরীরের খুব ভিতরে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ হল নূরজাহানের। অদ্ভুত এক লজ্জায় চোখ মুখ নত হয়ে গেল। চট করে মজনুকে ছেড়ে দিল সে। চোখ তুলে কিছুতেই আর মজনুর দিকে তাকাতে পারল না।

মজনু তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নূরজাহানকে দেখছে। চারমাসে যেন অনেক বড় হয়ে গেছে নূরজাহান। মুখটা ঢলঢল করছে অপূর্ব এক লাবণ্যে। চোখে আশ্চর্য এক লাজুকতা। পিঠের ওপর ফেলে রাখা বেণী দুইখানা যেন হঠাৎ করেই তার চপলতা হরণ করেছে।

নূরজাহান তো এমন ছিল না! কোন ফাঁকে এমন হয়ে গেছে!

মজনুর ইচ্ছা হল নূরজাহানকে জিজ্ঞাসা করে, কীরে নূরজাহান তুই দিহি বিয়ার লাইক (লায়েক) অইয়া গেছস! চাইর মাসে এতবড় অইলি কেমতে?

কী ভেবে কথাটা মজনু বলল না। বলল অন্যকথা। কই যাইতাছিলি নূরজাহান?

নূরজাহান মুখ তুলে মজনুর দিকে তাকাল। হাসল। আপনেগ বাইত্তে।

ক্যা?

একথায় রাগল নূরজাহান। ক্যা আবার, এমতেঐ। মাইনষের বাইত্তে মাইনষে যায় ক্যা?

নূরজাহানের এই রাগি ভাব সব সময়ই ভাল লাগে মজনুর। এখনও লাগল। ইচ্ছা হল রাগটা আরেকটু বাড়িয়ে দেয় তার। কিন্তু বাড়াল না। বলল, এতদিন বাদে আমগো বাইত্তে আহনের কথা মনে অইলো তর?

এতদিন বাদে কো? কয়দিন আগেও তো আইয়া গেলাম!

তয় আমি দিহি (দেখি) তরে দেকলাম না!

নূরজাহান অপূর্ব মুখভঙ্গি করে হাসল। আপনে দেকবেন কেমতে! আপনে তহন বাইত্তে আছিলেননি?

এবার মজনুও হাসল। আমি বাইত্তে আইছি পাচদিন অইল।

তার আগে আইছি আমি।

তাইলে তো আমার কথা ঠিকঐ আছে।

মজনুর কথাটা বুঝতে পারল না নূরজাহান। সরল মুখ করে মজনুর দিকে তাকাল। কী ঠিক আছে?

ওই যে কইলাম এতদিন বাদে আমগো বাইত্তে আহনের কথা মনে অইলো তর। পাচদিন কী কম দিন? আগে তো রোজঐ আমগো বাইত্তে আইতি!

নূরজাহানের ইচ্ছা হল বলে, আগে যে আপনে বাইত্তে আছিলেন এর লেইগা রোজঐ আইতাম। অহন তো আর আপনে নাই, কীর লেইগা আমু! আপনের খালার লগে প্যাচাইল পাড়তে আমার ভাল্লাগে না। বুড়া মাইনষের লগে কথা কইয়া জুইত (জুত) পাই না।

কথাটা বলল না নূরজাহান। জীবনে এই প্রথম মুখে আসা কথা আটকে রাখল। কী রকম লজ্জা হল।

মজনু বলল, আমগো কথা তর মনে অয় অহন আর মনে থাকে না।

AMARBOI.COM

নূরজাহান বলল, কে কেইছে?

কে আবার কইবো! আমি কই।

আপনে কইলেঐ অইবোনি? মনে না থাকলে আইজ আইলাম ক্যা?

মনে হয় এই মিহি কোনও কাম আছিলো, কাম সাইরা এক ফাকে মনে অইছে আমগো বাইত ঘুইরা যাবি, এর লেইগা আইলি!

নূরজাহান আবার হাসল। টাউনে থাইক্কা দিহি বহুত ঘুরাইন্না প্যাচাইন্না কথা হিগছেন আপনে! আগে এমুন আছিলেন না!

আগে তুইও এমুন আছিলি না।

তয় কেমুন আছিলাম আমি?

অন্যরকম।

কেমুন হেইডা কইতে পারেন না?

এত সোন্দর আছিলি না। পচা আছিলি।

ঠোঁট বাঁকিয়ে মজাদার ভঙ্গি করল নূরজাহান। ইস পচা আছিলো! আমি কোনদিনও পচা আছিলাম না। পচা আছিলেন আপনে।

নূরজাহানের দিকে সামান্য ঝুঁকে ঠোঁট টিপে হাসল মজনু। আর অহন?

অহনও পচা। তয় আগের থিকা ইট্টু কম।

একথায় মজনু থতমত খেল। তারপরই ঠিক হয়ে গেল। নূরজাহান তো এরকমই। যা মুখে আসে ঠাস ঠাস বলে ফেলে। কে কী ভাবল ভেবে দেখে না।

তবে নূরজাহান চোরাচোখে তখন মজনুকে দেখছে।

মজনু পরে আছে আকাশি রঙের ফুলহাতা শার্ট। হাতা বেশ সুন্দর করে ভাঁজ দিয়ে গোটান। লুঙ্গি পরে আছে বেগুনি চেকের। মাথার চুলে বুঝি আজই সাবান দিয়েছে। রুক্ষ উড়ু উড়ু চুল। মুখটা চারমাস আগের তুলনায় অনেক ফর্সা, অনেক সুন্দর হয়েছে।

এখন পরিপূর্ণ বিকাল। আসন্ন শীতের রোদ আদুরে ভঙ্গিতে ছড়িয়ে আছে চারদিকে। গাছপালা আর মানুষের বাড়িঘর যেন উচ্ছাস আনন্দে ভরা। এরকম বিকালে মজনু যা না তারচেয়ে যেন অনেক বেশি সুন্দর।

নূরজাহান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে দেখতে থাকে।

মজনুদের বাড়ির পশ্চিম দিকে সরু একখানা হালট। এই হালটের দক্ষিণে কালিরখিল, মাওয়া। উত্তরে খানবাড়ি হাতের বাঁদিকে রেখে হালট ঘুরে গেছে সীতারামপুরের দিকে। গিয়েই মাঝপথে থেমে গেছে। এই হালট মুছে ফেলে তার উপর দিয়ে উত্তরে দক্ষিণে ধা ধা করে আসছে সেই মহাসড়ক। সড়কের কাজে ওদিকটায় দিনরাত লেগে আছে লোকজনের চিল্লাচিল্লি কিন্তু মজনুদের বাড়ির দিকটা একেবারেই নির্জন। হালটের ওপাশ থেকে শুরু হয়েছে বিল। পশ্চিমে মাইল দেড়েক, উত্তরে দুই আড়াই মাইল, দক্ষিণে অল্প, তারপরই গ্রাম, নয়াকান্দা। পশ্চিমে কান্দিপাড়া, জশিলদিয়া। উত্তরে কবুতরখোলা, কোলাপাড়া, রাড়িখাল। এই বিশাল বিলের মাঝখানে খুব কাছাকাছি সামনে পিছনে দুইটা বাড়ি। একটা বাড়িতে গোরস্থান। কয়েকটা বাঁশঝাড় আর মানুষের কবর ছাড়া আর কিছু নাই। পিছনের বাড়িটার নাম বিলেরবাড়ি।

AMARBOI.COM

বিশাল একটা শিমুল গাছ আছে বাড়িতে, দূর থেকে এই গাছ দেখে দিক চিনে নেয় পথিকেরা।

এই বিলে এক সময় আমন আউশের ব্যাপক চাষ হতো। বর্ষার পানিতে প্রান্তরব্যাপী মাথা তুলে থাকত ধানডগা। ঋতুর সঙ্গে বদলাত বিলের চেহারা, রঙ। এই সময়, শেষ হেমন্তের বিকালে বিল ঝকমক ঝকমক করত ছড়ার ভারে নত হওয়া সোনালি ধানে। ধানকাটা শুরু হতো। ভোরবেলা, সূর্য ওঠার আগে কিষাণরা কাচি (কাস্তে) হাতে নামত বিলে। দিনভর ধানকাটা চলত। বিকালে দেখা যেত কাটা ধানের বোঝা বাঁধছে কিষাণরা। এখন ধানের বোঝা মাথায় নিয়ে বাড়ি ফেরার সময়। বাড়ির উঠানে নিয়ে ভুর (টাল) দিয়ে রাখবে ধান। বিয়ানরাতে উঠে পাড়াতে (মলন দেয়া। বিক্রমপুর অঞ্চলে সাধারণত গরু দিয়ে ধান মলন দেওয়া হয় না। কিষাণরা পা দিয়ে ডলে ডলে ডগা থেকে ধান ছাড়ায়। এই ব্যাপারটাকে বলে 'ধান পাড়ানো') শুরু করবে। গতদিনের কাটাধান সূর্য ওঠার আগে আগে পাড়িয়ে শেষ করে কাচি হাতে আবার যাবে বিলে। আবার ধান কাটবে। দেশ গ্রাম ম ম করবে ধানের গন্ধে। চারদিকে ভারী একটা উৎসব আনন্দের ভাব।

বেশ কয়েক বছর হল এই চেহারাটা আর নাই বিলের। সেই দিনও আর নাই দেশ গ্রামের। এখন বিক্রমপুরে শুধু ইরির চাষ। কোথাও কোথাও বোরো হয়, তবে এই দিকটায় না। শ্রীনগর থেকে ষোলঘর হয়ে আলমপুর যাওয়ার পথে পড়ে আড়িয়ল বিল। বোরোর চাষটা আড়িয়ল বিলে ভাল হয়। এই বিলে শুধু ইরি। শীতকালে বোনা শুরু হয়। বর্ষার আগে আগে, বৃষ্টি বাদলার আগে আগে ধান উঠে যায়। তারপর সারাবর্ষা ফাঁকা বিল। অঞ্চলটা নিচু বলে বর্ষায় এই বিলে পানি হয় অগাধ। দশ বারো হাতি (হাত) লগ্গিও ঠাই (থই) পায় না ভরাবর্ষায়। এখন ধান নাই বিলে, পুরা বিল বর্ষার পানিতে টইটুম্বর, মজনুদের বাড়ি থেকে বিলের দিকে তাকালে মনে হয় এটা কোনও বিল না, এটা আরেক পদ্মা, এপার ওপার দেখা যায় না তার। অথবা এ এক অচেনা অকূল দরিয়া। 'অকূল দরিয়ার বুঝি কূল নাই রে।'

আজ বিকালে নূরজাহানের সামনা সামনি দাঁড়িয়ে কোন ফাঁকে যেন মজনুর চোখ চলে গেছে বিলের দিকে। ফাঁকা বিলে এখন হা হা করছে উত্তরের হাওয়া আর ডুবতে বসা সূর্যের বিপন্ন রোদ। দূরে, বিলেরবাড়ির শিমুল গাছ বরাবর উড়ে যাচ্ছে সারধরা তিনটা পাখি। সেই পাখির দিকে তাকিয়ে গভীর এক আনন্দে মন ভরে গেল মজনুর। এতক্ষণ নূরজাহানের সঙ্গে কী কথা বলছিল ভুলে গেল। নূরজাহান যে চোরাচোখে তাকে দেখছে একবারও সে তা দেখতে পেল না। আনন্দভরা গলায় বলল, ঐ যে তিনডা পইখ উইড়া যাইতাছে, দেক নূরজাহান, কী সোন্দর!

খুবই তাচ্ছিল্যের চোখে বিলেরবাড়ির দিকে তাকাল নূরজাহান। যেন দয়া করে পাখি তিনটা দেখল কিন্তু একদমই পাত্তা দিল না। বলল, এই হগল জিনিস আপনেঐ দেহেন। থাকেন টাউনে, এই হগল টাউনে পাইবেন কই, দেকবেন কই থিকা!

মজনু মুগ্ধ গলায় বলল, টাউন থিকা গেরাম অনেক সোন্দর রে!

তাইলে টাউনে থাকেন ক্যা?

থাকি ঠেইক্কা। গেরামে থাকলে খামু কী! আর আমার খালায় চায় না আমি গেরামে থাকি।

আমিও চাই না।

কথাটা বলেই লজ্জা পেয়ে গেল নূরজাহান। লগে লগে অন্যদিকে ঘুরাল কথা। পুরুষপোলারা গেরামে পইড়া থাকব কী করতে? গেরামে কোনও ভাল কাম আছেনি! মাইয়া না অইলে কবে আমি টাউনে যাইতাম গা! এহেনে থাকতামনি? সড়কটা অউক, বাস চালু অউক, পলাইয়া অইলেও একদিন টাউনে যামু গা।

তারপরই ছটফট করে উঠল নূরজাহান। যাইগা, হাজ অইয়াইলো।

মজনু খুবই অবাক হল। কীয়ের হাজ অইয়াইলো! আমগো বাইত্তে বলে যাবি? ল।

না, আইজ আর যামু না।

ক্যা?

আপনেরে দেহনের লেইগা যাইতে চাইছিলাম। দেহা তো আপনের লগে অইলোঐ। ও মজনু দাদা, কয়দিন বাইত্তে থাকবেন আপনে?

আছি আর দুই তিনদিন।

তাইলে যাওনের আগে আর একদিন আমুনে।

চোখ সরু করে নূরজাহানের দিকে তাকাল মজনু। অহন কি তুই সত্যঐ বাইত্তে যাইতাছস?

নূরজাহান হাসল। কী মনে অয় আপনের?

আমার মনে অয় না। মনে অয় অন্য কোনহানে যাবি তুই।

হ সড়কে যামু। দেইক্কাহি কতাহানি আউগ্গাইলো সড়ক। আপনে যাইতাছেন কই?

খাইগো বাড়ির মাডে যামু। মাডে বলে আইজ ফুডবল নামবো। পিডাইয়াহি (পিটিয়ে আসি)।

কাম নাই ঐ মিহি যাওনের। আমার লগে লন, সড়ক দেইক্কাহি।

ল তাইলে।

ওরা দুইজন পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে ফাঁকে আনমনা হয়ে গেল নূরজাহান। ভুলেই গেল লগে মজনু আছে।

ব্যাপারটা খেয়াল করল মজনু। করে পিছন থেকে নূরজাহানের বেণী ধরে টান দিল। কীরে নূরজাহান, কী অইলো?

চমকে মজনুর দিকে তাকাল নূরজাহান। ডর করতাছে আমার।

কীয়ের ডর?

মন্নান মাওলানারে বকছি।

কুনসুম?

আইজঐ। আপনেগো বাইত্তে আহনের আগে।

ক্যা?

আমার বাপেরে কয় দউবরা। আমার বাপের নাম কি দউবরা কন? ক্যা, দবির

AMARBOI.COM

কইতে পারে না? কইছি আরেকদিন দউবরা কইলে দাড়ি টাইন্না ছিড়া হালামু। আপনে একটা পচা মলবি। আপনে একটা রাজাকার।

মজনু চিন্তিত গলায় বলল, ভাল করচ নাই। মন্নান মাওলানা বহুত খারাপ মানুষ। এইডা লইয়া দেকবি তর বাপের কাছে বিচার দিব। মাইর খাওয়াইবো তরে।

নূরজাহান ঝাঁঝাল গলায় বলল, খাওয়াইলে খাওয়াইবো। আমার বাপের নাম পচা কইরা কইবো, আমি তারে ছাইড়া দিমুনি? আপনের বাপের নাম কেঐ অমুন কইরা কইলে আপনে তারে ছাইড়া দিবেন?

বাপের কথায় মন খারাপ হয়ে গেল মজনুর। বাপ বলতে কোনও মানুষের কথা মনেই পড়ে না তার। কেমন দেখতে মানুষটা, সে যখন জন্মায় তখন কেমন ছিল দেখতে, এই এতকাল পর আজ কেমন হয়েছে এসব কিছুই সে জানে না। বেঁচে যে আছে তা জানে। নামও যে একটা আছে, তা জানে। আদিলদ্দি।

মনে মনে আদিলদ্দি শব্দটা উচ্চারণ করেই লজ্জা পেল মজনু। নাম তো আদিলদ্দি না, আদিলউদ্দিন। সে কেন আদিলদ্দি বলল! লোকমুখে এই নাম শুনে আসছে বলে! নাকি মা মারা যাওয়ায় বাপ তার দেখভাল করে নাই, ভরণপোষণ করে নাই, এই রাগে! যদি সে বাপের সংসারে থাকত তাহলে কি কখনও বিকৃত করে বাপের নাম বলত! অন্য কেউ বিকৃত করে বললে কি সেও নূরজাহানের মত রেগে যেত না!

তারপর মজনু ভাবল, বাপ বাপই। ভরণপোষণ করুক না করুক, ছেলেকে চিনুক না চিনুক, জন্ম যে দিয়েছে এটাই কম কী? বাপ না থাকলে কি এ সুন্দর দুনিয়া তার কখনও দেখা হতো! খালার এমন আদর স্নেহ ভালবাসা কোথায় পেত সে? এই যে এইরকম এক বিকালে নূরজাহানের সঙ্গে হাঁটছে, মন ভরে আছে গভীর আনন্দে, এই আনন্দ তাকে কে দিত!

বাপ ব্যাপারটা বোঝার পর থেকেই বাপের ওপর ভারি একটা রাগ মজনুর। তার মা মারা যাওয়ার পর পরই আরেকটা বিয়া করছে। আগের বউর কথা ভুলে সংসার করতে শুরু করছে। নিজের সন্তান চলে গেছে আরেকজনের কোলে, ফিরেও সেদিকে তাকায়নি। এই যে এতগুলি বছর কেটে গেছে একবারও ছেলের খোঁজ নিতে আসে নাই। অন্য ছেলেমেয়ের মুখ দেখে প্রথমটার কথা ভুলে গেছে। যদি এমন সে না করত! যদি বউ মারা যাওয়ার পর ওই অতটুকু মজনুকে রেখে দিত তার সংসারে তাহলে কি জীবন এরকম হতো মজনুর! হতো না। সৎমা কিছুতেই মেনে নিতো না মজনুকে। জীবন ছাড়খাড় করে ফেলত মজনুর। বাপের সংসারে থেকেও মজনু হয়ে যেত অসহায়। শহরে খলিফাগিরি করতে যাওয়া হতো না, নাবালক বয়সেই গিরস্ত বাড়িতে কামলা দিতে হতো।

এই হিসাবে বাপ তো মজনুর সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে ভালই করেছে! মজনুর জীবন সুন্দর করে দিয়েছে!

আজ বিকালে এই সব ভেবে বাপের ওপর জমে থাকা রাগ হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেল মজনুর। কোনও কারণ ছাড়াই নূরজাহানকে সে বলল, আমার বাপের নাম জানচ নূরজাহান, আদিলউদ্দিন।

AMARBOI.COM

ছাপড়া ঘরের সামনে খয়েরি চাদর পরা মানুষটা জবুথুবু হয়ে বসে আছে। আলী আমজাদ তার দিকে তাকাল না। মাওয়ার বাজার থেকে আনা পাউরুটি আর ছোট সাইজের কয়েকটা কবরি কলা এই মাত্র খেয়েছে। এখন ম্যাচের কাঠির মাথা চোখা করে দাঁত খিলাল করছে। সড়কের পাশে একটু নামার দিকে জাহিদ খাঁর বাড়ির সঙ্গে একটা ছাপড়া ঘর কয়দিন হল তুলেছে সে। মাথার ওপর ছয়খান জংধরা টিন ফেলে, চারদিকে বুকাবাঁশের বেড়া, ছাপড়া ঘরটা সে করেছে নিজের আরামের জন্য। সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা দুইখান ধরে যায়। কখনও কখনও জাহিদ খাঁর বাড়ি থেকে গোবদা মতো হাতলআলা চেয়ার এনে বসে। সড়কের পাশের হিজল গাছটার তলায় সারাক্ষণই ঝিরিঝিরি হাওয়া। চেয়ার নিয়ে বসলেই ঘুমে চোখ ভেঙে আসে। শরীরের অজান্তেই ছেড়ে দেয় শরীর। এই সব কারণেই ছাপড়া ঘরখান করেছে আলী আমজাদ। নিজের একটু আরাম হল, দরকারী জিনিসপত্র কিছু রাখাও গেল ঘরটায়, এক কাজে দুই কাজ।

ঘর করার জন্য পুরানা ঢেউ টিনগুলি যেমন বাড়ি থেকে এনেছে আলী আমজাদ তেমন এনেছে পুরানা একখান চকি। গোয়ালিমান্দার হাট থেকে নতুন একখান পাটি কিনে এনে বিছিয়েছে চকির উপর। আর আছে দুইখান ল্যাড়ল্যাড়া বালিশ। অল্প কিছু পয়সা এই কাজে খরচা হয়েছে আলী আমজাদের তবে সেই খরচা গায়ে লাগছে না। ঘর তোলার পর থেকে নিজের লক্কর ঝক্কর মোটর সাইকেল এই ঘরের সামনে দাঁড় করিয়ে মাটিয়ালদের কাজের তদারক করে। তবে সেটা পাঁচ দশমিনিট। তারপরই ছটফট করে ছাপড়া ঘরে গিয়ে ঢুকে। ঘর তোলার পর থেকে রোদ জিনিসটা যেন আর সহ্যই করতে পারে না আলী আমজাদ। পাঁচ দশ মিনিট দাঁড়ালে এ রকম শীতের মুখে মুখেও ঘামে ভিজে জ্যাবজ্যাবা হয়ে যায়। ডাঙায় তোলা বড় সাইজের কাতলা মাছের মতো হাঁ করে শ্বাস টানতে থাকে, মোটকা শরীর নিয়ে হাসফাস করতে থাকে। সড়ক যত আগাচ্ছে ততই মোটা হচ্ছে সে, শরীরে, টাকায়। শরীর এবং টাকা যে কারও কারও একটা আরেকটার লগে পাল্লা দিয়া বাড়ে আলী আমজাদকে দেখলে তা বোঝা যায়। ফলে আগের আলী আমজাদ আর নাই। আগে যেমন সারাদিন খাড়া রোদে দাঁড়িয়ে মাটিয়ালদের কাজ দেখত, ভাল একখান ছাতি (ছাতা) পর্যন্ত ছিল না, যেটা ছিল সেটা ছেঁড়া, তালিমারা, খুলতে গেলে বেজায় হাঙ্গামা, বন্ধ করতে গেলে ছাতির কালা কাপড় ফুটা করে শিক (শলাকা) বেরিয়ে যেত এদিক ওদিক। বিরক্ত হয়ে ছাতিটা আলী আমজাদ ব্যবহারই করত না, রোদেই দাঁড়িয়ে থাকত। কোনও মাটিয়ালের য়োড়ায় মাটি

AMARBOI.COM

কম দেখলে কাজে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে ভেবে মুখে বকাবাজির তুবড়ি ছোটাত, সেই মাটিয়ালের সাতপুরুষ কবর থেকে টেনে তুলত। সাতপুরুষের পুরুষগুলি দৈহিক কারণে রেহাই পেত কিন্তু মহিলাদের গতি ছিল না। যত রকমভাবে উৎপীড়ন তাদের করা যায় মুখে মুখে তা করে ফেলত আলী আমজাদ। কোনও মাটিয়ালের য়োড়া উপচে হয়তো এক চাকা (ঢেলা) মাটি পড়ে গেল নিচে, ছুটে গিয়ে আলী আমজাদ তা তুলে দিত। কেটে তোলা মাটি সব সময়ই একটু ভিজা ভিজা হয়। চাপড়ে চাপড়ে পরে যাওয়া চাকাটা য়োড়ার অন্য মাটির সঙ্গে বসিয়ে য়োড়া তুলে পর্যন্ত দিত। সেই আলী আমজাদ এখন মাটিয়ালদের কাজের তদারক করার জন্য একজন সরদার রেখেছে। লোকটার নাম হেকমত। পাটাভোগের লোক। কাজে লাগবার লগে লগেই শ্রীনগর বাজার থেকে নতুন একখান শরীফ ছাতি কিনেছে হেকমত। আলী আমজাদের মোটর সাইকেলের শব্দ পেলেই মাটিয়ালদের ফেলে সেই শব্দের দিকে মন দেয়। মাথায় দেওয়া ছাতি বন্ধ করে ফেলে। আলী আমজাদ সাইটে আসার লগে লগে বন্ধ ছাতি হাতে ছুটে যায় তার কাছে। অতি যত্নে ছাতিখান আলী আমজাদের মাথার উপর মেলে ধরে। আলী আমজাদ যেদিকে যায় হেকমতও যায় লগে লগে। এই সব কারণে হেকমতকে পছন্দ করেছে আলী আমজাদ। টাকা পয়সা হয়ে গেলে, বড় মানুষদের দুই চারটা ট্যাগুল (চামচা অর্থে) লাগে। উত্তর দক্ষিণ মেদিনীমণ্ডল মিলিয়ে চারটা ট্যাগুল এখানে কাজ পাওয়ার লগে লগে বানিয়ে ফেলেছে আলী আমজাদ। তারা নাম করা লোকের পোলাপান। একজন আছে আতাহার, মান্নান মাওলানার মেজোছেলে। আর তিনজনের একজন মেন্দাবাড়ির আলমগির, হালদার বাড়ির সুরুজ, গোঁসাই বাড়ির নিখিল। এরা আছে বলে এলাকায় কাজ করতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না আলী আমজাদের। ওয়াজের চাঁন্দা, ধরাছি (হাডুডু) খেলার চাঁন্দা চাইতে কেউ আসে না আলী আমজাদের কাছে। যারা আসবে তারা জানে তাদের খাদ্য চার ট্যাগুলে অনেকদিন ধরেই খাচ্ছে। নতুন করে তারা আর কী খাবে!

তবে ট্যাগুল আতাহাররা হলেও ট্যাগুলের মতো আচরণ তাদের লগে করে না আলী আমজাদ। করে বন্ধুর মতন আচরণ। বয়সে অনেক ছোট হওয়ার পরও আতাহররা এখন আলী আমজাদের ইয়ার দোস্ত। আলী আমজাদ যতবার সিগ্রেট খায় লগে থাকলে ততবারই তাদেরকেও সিগ্রেট দেয়। এমন কী ম্যাচ জ্বেলে আঙ্গাইয়া তরি (ধরিয়ে পর্যন্ত) দেয়। প্রথম প্রথম আতাহারদের বাড়িতে তাদের বাংলাঘরে বসে লৌহজং থেকে আনা কেরু কোম্পানীর মাল চালাত। ছাপড়া ঘর তোলার পর থেকে সেই বাড়িতে আর যেতে হয় না। এই ঘরে বসেই চালায়। দিনে দোফরে, সন্ধ্যার পর। কোনও কোনওদিন রাত গভীর হয়ে গেলে আলী আমজাদ আর বাড়িই ফিরে না। মাওয়ার বাজার থেকে তিন চারটা কুকরা কিনে পাঠিয়ে দেয় নিখিলদের বাড়ি। নিখিলের বিধবা বোন ফুলমতি সেই কুকরা কষিয়ে দেয়। ইয়ার দোস্তদের নিয়ে কুকরার গোস্ত আর কেরু কোম্পানী মাল কোৎ কোৎ করে চালিয়ে যায় আলী আমজাদ। ট্যাগুল হওয়ার পরও প্রকৃত ট্যাগুলের স্বাদ আতাহারদের কাছ থেকে পায়নি আলী আমজাদ। হেকমতকে রাখার পর তার কাছ থেকে পাচ্ছে। ফলে সাইটে আসার লগে লগে হেকমত যখন ছাতি খুলে দিশাহারা

AMARBOI.COM

ভঙ্গিতে তার কাছে ছুটে আসে তখন অকারণেই আলী আমজাদ একটু গম্ভীর হয়ে যায়। চালচলন রাশভারি হয়ে যায় তার, গলার স্বর মোটা হয়ে যায়। অর্থাৎ বেশ একটা বড় দরের কনটাক্টর কনট্রাক্টর ভাব আসে। ভিতরে ভিতরে ব্যাপারটা উপভোগ করে সে। কথা খুব কম বলে। বেশির ভাগই হুঁ হাঁ না ইত্যাদি। আর কোনও মাটিয়ালের তো নাইই, হেকমতের মুখের দিকে পর্যন্ত তাকায় না। আকাশের দিকে তাকিয়ে, গ্রামের গাছপালা বাড়িঘরের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। যেন এই সবই তার দেখার ব্যাপার, মাটিয়ালরা না, সড়কের কাজ না। তারপরই ছাপড়া ঘরটায় গিয়ে ঢোকে। ঢুকে ল্যাড়ল্যাড়া বালিশ দুইখান মাথার নিচে দিয়ে চকিতে গা এলিয়ে দেয়।

আজ সাইটে এসেছে আলী আমজাদ দুপুরের ভাত খেয়ে। এসেই দেখে ছাপড়া ঘরের সামনে খয়েরি চাদর পরা একটা লোক বসে আছে। ভাঙাচোরা মুখখান দাঁড়িমোচে একাকার। দাঁড়িমোচ যেমন কাঁচাপাকা মাথার চুলও তেমন। বুড়া না, মাঝ বয়সী। তবে শরীরের ওপর দিয়ে যে ম্যালা ধকল অনাহার গেছে, যে কেউ দেখে বুঝে যাবে।

লোকটাকে দেখে হেকমতকে আলী আমজাদ জিজ্ঞাসা করেছে, এইডা কে?

হেকমত লগে লগে বলেছে, কেঐ না।

কী চায়?

কাম।

শইল্লের দশা তো ভাল না। মাইট্টালগিরি করতে পারবো?

কয় তো পারবো।

তাইলে লাগায় দেও।

হেকমত বিনীত গলায় বলল, আপনের লেইগা লাগাই নাই। বহায় থুইছি। কইছি সাবে আহুক। তার লগে কথা কইয়া লই।

আলী আমজাদ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার কামের নিয়ম কানন (কানুন), রোজ কত, এই হগল কইছো?

না।

ক্যা?

আপনের লেইগা। এহেনকার সরদার অওনের পর কোনও নতুন মাইট্টাল কামে লই নাই। আপনের পারমিশন ছাড়া লই কেমতে! এই যে অহন আপনে কইলেন, দেহেন অহনঐ আমি কথা ফাইনাল কইরা হালাইতাছি। কাইল বিয়ান থিকাঐ কামে লাগাইয়া দিমু।

কী ভেবে আলী আমজাদ বলল, থাউক তোমার কথা কওনের কাম নাই। বইয়া থাউক, আমিঐ কথা কমুনে। হাদাইয়া (ক্লান্ত হওয়া) গেছি। ইট্টু জিরাইয়া লই। তয় কথা কওনের সময় তুমি সামনে থাইক্কো। নতুন মাইট্টাল কামে লওনের সময় কী কী কথা তাগো লগে কইতে অয় হিগগা যাইবা। তারবাদে আমারে আর লাগবো না, তুমি নিজেঐ কথা কইয়া বেবাক ঠিক করতে পারবা। তয় মাইট্টাল কইলাম আমার আরও লাগবো। কাম তাড়াতাড়ি শেষ করন লাগবো। এরশাদ সাবে অডার দিছে দুই তিনমাসের মইদ্যে রাস্তার কাম শেষ করন লাগবো। দুই তিনমাসের মইদ্যে এই রাস্তা দিয়া বাস টেরাক চলবো।

AMARBOI.COM

তারপর প্রায় সন্ধ্যা হতে চলল, লোকটা বসেই আছে, তার লগে কথা বলা তো দূরের কথা তাকিয়েও দেখছে না আলী আমজাদ। দুপুরের পর পরই ঘণ্টা দেড়েকের একটা ঘুম দিয়েছে। সে যখন ঘুমে তখন আতাহাররা চারজন এসেছে, এসে ডেকে তুলেছে। কত ঘুমান মিয়া? বিয়াল অইয়া গেল। এই দিনে দোফরে ঘুমাইলে শইল ম্যাজ ম্যাজ করে। ওডেন।

উঠেছে আলী আমজাদ। উঠে অল্প বয়সী মাটিয়াল বদরকে মাওয়ার বাজারে পাঠিয়েছে পাউরুটি কলা আনতে। সিলবরের (এলুমিনিয়ামের) একটা কেতলি আছে ঘরে, সেই কেতলি দিয়েছে চা আনতে। পাউরুটি কলা খাওয়া শেষ। এখন মরাপাতা জ্বেলে তার উপর কেতলি বসিয়ে চা গরম করছে বদর। কোনাকানি ভাঙ্গা তিন চারটা কাপ আছে। গরম চা সেই কাপে করে আতাহারদের নিয়ে এখনই খাবে আলী আমজাদ, তার আগে দাঁতটা খিলাল করে নিচ্ছে। পাউরুটি কলা দুইটাই ভেজাইল্লা জিনিস। খেতে আরাম কিন্তু ফাঁকআলা পোকে খাওয়া দাঁত থাকলে সেই দাঁতের গর্তে এমন করে ঢোকে, খিলাল না করলে বের হতে চায় না। সেই কাজটাই আলী আমজাদ এখন করছে। এক পায়ের ওপর আরেক পা ভাঁজ করে বসেছে চকির উপর, দুয়ারটা মুখ বরাবর, ফলে সামনে বসা লোকটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। তবে দেখছে না। ঘরে বসেই দেখছে নীল রঙের আলোকিত আকাশ, দূরের ছায়া ছায়া গাছপালা, বাড়িঘর।

এইসময় কাপে করে চা নিয়ে এল বদর।

কাপ হাতে নিয়ে আলী আমজাদ বলল, আতাহরগো দে।

বদর হাসিমাখা গলায় বলল, দিতাছি। কাপ তো চারইখান। এক লগে চা দিলে একজন বাদ থাকবো।

তাইলে আমারে পরে দে।

আতাহার বলল, না না আপনে খান। নিখিলা পরে খাইবো নে।

আলী আমজাদ কথা বলল না। ঠোঁটে সরু একখানা হাসি ফুঠে উঠল তার।

নিজেদের দলের মানুষ হওয়ার পরও, ছেলেবেলা থেকে একলগে বড় হওয়ার পরও, গভীর বন্ধুত্ব থাকার পরও আতাহাররা তিনজন নিখিলকে একটু অবজ্ঞা করে। লগে রাখে ঠিকই, সঠিক মর্যাদাটা দেয় না। কখনও কখনও চাকর বাকরের মতো খাটায়। হিন্দু বলে এই অবজ্ঞাটা যে নিখিলকে ওরা করছে পরিচয়ের পর পরই আলী আমজাদ তা বুঝে গেছে। তবে মুখে কখনও এই সব নিয়া কথা বলে নাই। নিখিলকে খেয়াল করে দেখেছে আতাহারদের অবজ্ঞা টের পায় সে। মুখটা বিষণ্ন হয়ে যায়।

এখনও হল। সামান্য আনমনা দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল নিখিল।

আড়চোখে নিখিলকে একবার দেখল আলী আমজাদ। চায়ে চুমুক দেওয়ার আগে বুক পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে নিজে প্রথমে ধরাল তারপর প্যাকেটটা ফেলে রাখল সামনে, ইচ্ছা হলে যে কেউ যেন ধরাতে পারে। কিন্তু নিখিল ছাড়া কেউ সিগ্রেট ধরাল না।

নিখিলের সিগ্রেট ধরান দেখে আলী আমজাদ বুঝে গেল মুখের বিষণ্নতা কাটাবার জন্য সিগ্রেটটা এখন ধরিয়েছে সে। না হলে বন্ধুদের মতো চা খাওয়ার পরই ধরাত।

AMARBOI.COM

চায়ে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে ঠোঁটে সরু হাসিটা আরেকবার ফুটল আলী আমজাদের। নিখিলকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে সে বলল, মালাউন আইছস ক্যা বেডা? মোসলমান অইতে পারলি না? এইডা মোসলমানগো দ্যাশ। অহনতরি (এখন পর্যন্ত) যে তগো থাকতে দিছি এইডাঐত্তো বেশি। আবার যদি একখান রায়ট লাগে, যেই কয়জন মালাউন অহনতরি এই দ্যাশে আছে বেবাকটির গলা কাইট্টা হালামু। মাইয়াডিরে করুম গণধর্ষণ আর পুরুষডিরে কচু কাডা। মালাউনের জাত ফিনিশ। এই দ্যাশ মোসলমানগো দ্যাশ, এই দ্যাশে কোনও মালাউন রাখুম না। আমার লাহান ম্যালা মোসলমান আছে যারা হিন্দুগো দুই চোক্ষে দেকতে পারে না। উপরে উপরে খাতির দেহায় ঠিকঐ ভিতরে ভিতরে হিন্দুগো উপরে মহাখাপ্পা (ক্ষেপে থাকা)। চানস পাইলেঐ ফিনিশ কইরা দিব।

আলী আমজাদ অনেকক্ষণ চুপচাপ আছে দেখে আতাহার বলল, কী চিন্তা করেন কনটেকদার সাব?

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে সামনে কেতলি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা বদরের হাতে কাপটা দিল আলী আমজাদ। নিখিলরে চা দে।

নিখিল বলল, আমি চা খামু না দাদা।

আলী আমজাদ কথা বলবার আগেই সুরুজ বলল, ক্যা?

এমতেঐ। সিগরেট ধরাই হালাইছি। অহন আর চা খাইতে ইচ্ছা করতাছে না।

আলমগির ছেলেটা ফুর্তিবাজ ধরনের। সারাক্ষণই গভীর আনন্দে আছে। তার কোনও দুঃখ বেদনা নাই। এই দলের মধ্যে দেখতে সবচেয়ে সুন্দর। গায়ের রঙ পাকা গয়ার (পেয়ারা) মতো। খাড়া নাক, টানা চোখ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। সুন্দর গলা গানের। একটা শিল্পী শিল্পী ভাব আছে। কাজির পাগলা হাইস্কুলে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছে।

নিখিল চা খাচ্ছে না দেখে সে বলল, খা বেডা। সিগরেডের লগে চা বহুত মজা।

নিখিল তবু চা নিল না।

আলী আমজাদ বলল, আরে খাও মিয়া। কীর লেইগা খাইতে চাইতাছো না বুঝি তো!

আতাহার তীক্ষ্ণচোখে আলী আমজাদের দিকে তাকাল। কীর লেইগা কন তো!

ঐযে তুমি কইলা নিখিলা পরে খাইবো।

কইছি কী অইছে? সব সময়ঐত্তো কই!

না তেমন কিছু অয় নাই। নিখিল মনে করছে ও হিন্দু দেইক্কা অরে তুমি সব সময় পিছে রাখো। আলমগির সুরুজ অগো লাহান দাম দেও না।

একথা শুনে হা হা করে উঠল নিখিল। ধুর দাদা কী কন? এই হগল ফালতু কথা আমি ভাবি না। অরা আমার ছোডকালের দোস্ত।

ভাবো ভাবো। আতাহার না বোজলে কী অইবো? আমি বুজি।

সুরুজ একটু থলথলা শরীরের। দেহে কথায় বোকা বোকা একটা ভাব আছে। আলী আমজাদের কথা শুনে সরল গলায় বলল, আতাহার বোজবো না এমুন জিনিস দুইন্নাইতে নাই। পলেটিসক করা পোলা। সিরাজ সিকদার পারটি করতো। বহুত রক্ষিবাহিনী মারছে।

AMARBOI.COM

আতাহার সম্পর্কে এই কথাটা একেবারেই নতুন শুনল আলী আমজাদ। অবাক হয়ে আতাহারের দিকে তাকাল। মুখটা দুইকান পর্যন্ত ছড়িয়ে হাসল। নিকি (তাই নাকি অর্থে)? ভাইয়ে তাইলে পলটিনেসিয়ান (পলিটিসিয়ান)? বা বা বা। জানতাম না তো!

আতাহার লাজুক গলায় বলল, আরে ধুর। কবে ছাইড়া দিছি ঐসব। তয় আমি যহন সর্বহারা পারটি করতাম তহন বিক্রমপুরে আমার বস্বের (বয়সের) ম্যালা পোলাপান ঐ পারটি করতো। শেক মজিবের মাথা আমরা খারাপ কইরা হালাইছিলাম। হাজার হাজার রক্ষিবাহিনী দিছিল বিক্রমপুরে। অরা তো আর আমগো ধরতে পারতো না, ধরতো দেশ গেরামের নিরীহ মানুষটিরে। ম্যালা অইত্যাচার রক্ষিবাহিনী বিক্রমপুরে করছে। তয় আমরাও ছাড়ি নাই। রক্ষিবাহিনী মাইরা বাজারের বটগাছের লগে উপরের দিকে ঠ্যাং দিয়া ঝুলাইয়া রাকছি। আপনেরা যাঐ কন, শেক মজিবররে আমি দেকতে পারি না। তার একটা হিন্দু হিন্দু ভাব আছিলো।

আলমগির সাধারণত রাগে না। রাগলে মুখ লাল হয়ে যায়, আর যার ওপর রাগে প্রথমে বেশ খানিকক্ষণ কটোমটো চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর রাগ ঝারে। আতাহারের কথা শুনে বেদম রাগল সে। মুখ লাল করে কটোমটো চোখে মাত্র আতাহারের দিকে তাকিয়েছে, আতাহার বলল, চক্কু গোরাচ (রাঙান) ক্যা বেডা? শেক মজিবের নামে মিছাকথা কইছিনি?

আতাহারের কথা শেষ হওয়ার লগে লগে বেশ জোরে তাকে একটা ধমক দিল আলমগির। নাম ঠিক মতন ক ব্যাডা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। হিন্দু হিন্দু ভাব আছিল তাঁর, না? বেবাক ভুইল্লা গেছ? স্বাধীনতা যুইদ্ধের সময় মেলেটারিগো ঠেলা খাইয়া যহন ইণ্ডিয়ায় গেছেলা তহন এই হিন্দুরাই তোমগো জাগা দিছে। খাওয়াইয়া বাঁচাইছে। ইণ্ডিয়ার মোসলমানরা তোমগো জাগা দেয় নাই। বাংলাদেশ স্বাধীন হউক ইণ্ডিয়ান মোসলমানরা ওইডা চায় নাই। অরা চাইছে এইডা পূর্ব পাকিস্তান আছে পূর্ব পাকিস্তানঐ থাকুক। আর যেই মুক্তিযুইদ্ধ অইছে, মুক্তিযোদ্ধাগো টেরনিং অইছে কই রে বেডা? ইণ্ডিয়ায় অয় নাই? ইণ্ডিয়ান আর্মি হেলপ না করলে খালি আমগো মুক্তিযোদ্ধারা মাত্র নয় মাসে দেশ স্বাধীন করতে পারতো? বহুত সময় লাগতো স্বাধীন অইতে। আর বঙ্গবন্ধুর কাছে তো তগো লাহান মাইনষেরঐ বেশি রিনি (ঋণী) থাকনের কথা।

কথাটা বুঝতে পারল না আতাহার। বলল, ক্যা?

বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা না করলে তর বাপে বাইচ্চা থাকে না। রাজাকাররা বাইচ্চা থাকে না। মুক্তিযোদ্ধারা বেবাকটিরে ঢওয়াইয়া (ধ্বংস করা অর্থে) হালাইতো।

আলমগিরের কথা শুনে হাসল আতাহার। ওই অর্থে ধরলে তো জিয়াউর রহমানের কাছেও রিনি আমরা। বঙ্গবন্ধু রাজাকারগো বাঁচাইয়া দিছে, জিয়াউর রহমান রাজনীতি করবার পারমিশন দিছে। আর এরশাদ আইয়া রাজাকারগো খালি মিনিস্টার বানাইছে, খালি মিনিস্টার বানাইছে।

সুরুজ মুখ বিকৃত করে বলল, এই হগল প্যাচাইল বাদ দে তো। আমার ভাল্লাগে না। পলেটিসক বহুত খারাপ জিনিস।

আলী আমজাদ তাকিয়েছিল আলমগিরের দিকে। সুরুজের কথা শেষ হওয়ার পর বলল, ভাইয়ে মনে অয় আওয়ামী লীগ করে!

আলমগির লাজুক হাসল। আরে না মিয়া, আমি কোনও লীগঐ করি না। তয় বঙ্গবন্ধুর খুব ভক্ত আমি। বঙ্গবন্ধুর নামে কেঐ কোনও খারাপ কথা কইলে সইজ্জ করতে পারি না। মিজাজ খারাপ অইয়া যায়।

আতাহার বলল, ও আসলে আওয়ামী লীগঐ করে। ইলেকশনের টাইমে দেকবেন আওয়ামী লীগের লাইগা কেমুন ফালান ফালায় (লাফানো অর্থে)। আলইম্মারে তহন হারিকেন দিয়া বিচড়াইয়াও (খুঁজে) পাইবেন না।

আর তুমি যে ফালাইবা বিএনপির লেইগা!

আমি বিএনপি সাপোট করি এইডা বেবাকতে জানে। বিএনপির লেইগা তো ফালামুঐ। সাপোটাররা না ফালাইলে কারা ফালাইবো!

আলী আমজাদ বলল, এরশাদ সাবের তো তাইলে খুব খারাপ দশা দেকতাছি। এহেনে আওয়ামী লীগ আছে, বিএনপি আছে, জাতীয় পারটি তো দেকতাছি না! জাতীয় পারটি অহন ক্ষমতায়। বিক্রমপুরের দুই বাঘা নেতা আছে জাতীয় পারটিতে। কোরবান আলী, শাহ মোয়াজ্জেম। আর তোমগো মইদ্যে কোনও জাতীয় পারটি নাই?

সুরুজ কেলানো একখানা হাসি দিয়ে বলল, কে কইলো নাই? আমি আছি। আমি জাতীয় পারটি। এরশাদ সাব জিন্দাবাদ।

সাব্বাস। তাইলে নিখিল কী?

আতাহার বলল, হিন্দু তো, সিউর আওয়ামী লীগ।

বাদ রইল খালি জামাতটা। ঠিক আছে আমি জামাত অইয়া যামুনে। তাইলে এই ঘরে যহন আমরা পাচজন একলগে রহুম ঘরডা ছোট্ট একখান বাংলাদেশ অইয়া যাইবো।

জামাত করতে অইলে আমার বাপের লগে দুস্তি করেন। ঐ লাইনের লোক।

আলী আমজাদ চিন্তিত গলায় বলল, এই এলাকায় আর কে কে রাজাকার আছিলো?

সুরুজ এবার বেশ বিরক্ত হল। আরে এই প্যাচাইলডা বাদ দিতাছেন না ক্যা? কইলাম যে ভাল্লাগে না।

আইচ্ছা বাদ দিলাম। অহন অন্যকথা কই।

আলমগির চোখ সরু করে আলী আমজাদের দিকে তাকাল। আপনে কইলাম মহা ত্যান্দর মানুষ ভাই। শইল মোডা অইলে কী অইবো, বুদ্ধি বহুত চিকন আপনের। আমি আপনেরে বুইজ্জা হালাইছি। নিখিলারে পরে চা দেওনের কথা থিকা আপনে বাইর করলেন ও হিন্দু দেইখা অরে আমরা আমগো লাহান দাম দেই না। ছোড কইরা রাখি। এইডা কইলাম আমগো মাথায় আছিলো না। আমরা কোনওদিন এই লাইনে চিন্তা করি নাই। আইজ থিকা দুস্তির মইদ্যেও হিন্দু মুসলমানের প্যাচখান আপনে লাগাইয়া দিলেন। এই ফাকে আমরা কে কেমুন হেইডাও ইট্টু বাজাইয়া দেকলেন। বহুত চালাক মানুষ ভাই আপনে। তয় সোজা একখান কথা আপনেরে আমি কইয়া রাখি, আমরা কেঐ আওয়ামী লীগ সাপোট করি কেঐ বিএনপি নাইলে জাতীয় পারটি কিন্তু দোস্ত যে এইডা ভুইলা যাওন ঠিক অইবো না। একজনরে খোচা দিয়া দেহেন বেবাকতে মিল্লা আপনেরে খাইয়া হালাইবো।

AMARBOI.COM

তারপর মুচকি হেসে আলমগির বলল, আপনে তো জামাতী। জামাতীরা বেবাকতেরঐ শত্রু।

আলী আমজাদ মনে মনে বলল, দেহা যাইবনে। টাইম আহুক। দুস্তি কেমতে ভাইঙ্গা দিতে অয় হেইডা আমি জানি। মুখে বলল, এই হগল প্যাচাইল বাদ। অন্য প্যাচাইল পাড়ি। এই দিকে 'ইউ টু' পাওয়া যায় না?

শব্দটা জীবনে শোনেনি আতাহাররা। চারজন একলগে আলী আমজাদের মুখের দিকে তাকাল।

নিখিল বলল, ইউ টু কী?

ইউ টু অইলো 'উধাবা ঠুল্লি'।

আতাহার বলল, অর্থ কী?

আলী আমজাদ হাসল। তারপর সিগ্রেট ধরিয়ে মুখভর্তি করে ধুমা ছাড়ল। উধাবা ঠুল্লি কথাটার অর্থ কইতে পারুম না, জিনিসটা কী হেইডা বুজাইয়া দিতাছি। পাকিস্তান আমলে ঢাকার নিউ মার্কেটে থান কাপোড়ের দোকানের কর্মচারি আছিলাম আমি। ঐ টাইমে নিউ মার্কেটে এক ধরনের মাইয়াছেইলা ঘুইরা বেড়াইতো। হাতে ভ্যানেটি ব্যাগ, চোক্কে কালো গগস (গগলস)। পরনে রঙচঙা শাড়ি। কিচ্ছু কিনতো না খালি ঘুইরা বেড়াইতো। তারবাদে যার তার লগে রিকশায় উইট্টা যাইতো গা। পয়লা পরথম ঘটনাডা কী বোঝতে পারতাম না। পরে অন্য কর্মচারিরা বুজাইয়া দিল। অগো নাম উধাবা ঠুল্লি। এই নাম কে দিছে, ক্যা দিছে জানতাম না। সংক্ষেপে আমরা বানাইয়া লইছিলাম ইউ টু। পরে কত ইউ টু নিজেগো মেসে লইয়াইছি আমরা!

আতাহার হেসে বলল, বুজছি।

তারপর সামনে ফেলে রাখা সিগ্রেটের প্যাকেট থেকে সিগ্রেট ধরাল। আতাহারের দেখাদেখি প্রত্যেকেই সিগ্রেট ধরাল।

বাইরে খয়েরি চাদর পরা লোকটা তখনও একই ভঙ্গিতে বসে আছে। একবার লোকটার দিকে তাকাল আতাহার। বলল, আমগো এইদিকে ঐসব জিনিস নাই। চউরাণী মউরাণী দুই একখান পাওয়া যায়। জিনিস ভাল না।

আলী আমজাদ কিছু একটা বলতে যাবে, কী ভেবে বাইরে তাকিয়েছে, দূরে সড়কের পশ্চিমপাড় থেকে সড়কে উঠতে দেখল একজোড়া ছেলেমেয়েকে। মেয়েটা ভাঙন থেকে আগে উঠল, উঠে ছেলেটাকে হাত ধরে টেনে তুলল। এতদূর থেকেও আলী আমজাদ বুঝতে পারল দুইজনেই পাখির মতো ছটছট করছে।

খানিক তাকিয়ে থেকেই মেয়েটাকে সে চিনতে পারল। নূরজাহান।

কিন্তু ছেলেটি কে? আগে কখনও দেখেনি তো!

আলী আমজাদ আর আশপাশে তাকাল না, নূরজাহানের দিকে তাকিয়ে রইল। সন্ধ্যার মুখে মুখে এই এতটা দূর থেকেও অপূর্ব লাগছে মেয়েটাকে।

আলমগির বলল, কী দেকতাছেন কনটেকদার সাব?

আলী আমজাদ আগের মতোই নূরজাহানের দিকে তাকিয়ে বলল, কিছু দেহি না। চিন্তা করতাছি।

AMARBOI.COM

কী চিন্তা করেন?

টেকা পয়সা অইছে অহন আরেকখান বিয়া করন দরকার। একটা বউ দিয়া চলে না। ধ্যারধ্যারা অইয়া গেছে। লগে হুইয়া থাকলে মনে অয় ভিজা কেথার (কাঁথার) লগে হুইয়া রইছি।

আলী আমজাদের কথা শুনে আতাহাররা চারজনই হেসে উঠল।

হাঁটতে হাঁটতে নূরজাহান আর সেই ছেলেটা তখন আলী আমজাদের ঘর বরাবর সড়কে এসে দাঁড়িয়েছে। কী কথায় নূরজাহান শিশুর মতো দুলে দুলে হাসছে। আলী আমজাদ মুগ্ধ হয়ে নূরজাহানের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুরুজ ঠাট্টার গলায় বলল, মনে যহন চাইছে, বিয়া তাইলে আর একখান কইরা হালান। অসুবিদা নাই। মোসলমানরা চাইরখান বিয়া করতে পারে।

আতাহার বলল, কারে করবেন চিন্তা করছেন?

আলী আমজাদ আঙুল তুলে নূরজাহানকে দেখাল। ঐ অরে।

আতাহাররা সড়কের দিকে তাকাল।

আলমগির ভুরু কুঁচকে বলল, নূরজাহানরে! কন কী? ও তো আপনের মাইয়ার লাহান।

আলী আমজাদ নিঃশব্দে হাসল। দুই নম্বর বউ মাইয়ার লাহান অওনঐ ভাল।

তারপর চিন্তিত গলায় বলল, নূরজাহানের লগে ছেমড়াডা কে?

নিখিল বলল, হালদার বাড়ির মজনু। ঢাকায় থাকে। খলিফাগিরি হিগতাছে।

আলী আমজাদ তারপর চকি থেকে নামল। তোমরা বহ, আমি ইট্টু ঘুইরাহি।

AMARBOI.COM

বদ্ধ ছাতি হাতে সড়কের মুখে দাঁড়িয়ে আছে হেকমত। শখানেক মাটিয়ালের কেউ কোদাল দিয়ে মাটি কেটে কোদালের আগায় তুলে কায়দা করে ভরে দিচ্ছে য়োড়ায়। তারপর হুমহাম শব্দে সেই য়োড়া তুলে দিচ্ছে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, লুঙ্গি কাছা মারা, মাজা বরাবর শক্ত গিটঠু (গিঁট) দিয়ে বাঁন্ধা গামছা, মাথায় নাড়ার তৈরি বিড়া, বিড়াখানার দুই দিকে আছে সরু শক্ত দড়ি, সেই দড়ি দুই কানের পাশ দিয়ে বাঁন্ধা যাতে হাঁটাচলা করার সময়, মাটি ভর্তি য়োড়া মাথায় তোলার সময় বিড়াখান সরে না যায়, পড়ে না যায়, এমন মাটিয়ালের মাথায়। কেউ কেউ মাটি ভর্তি য়োড়া মাথায় সড়কের নামা থেকে উঠছে উপরে, জায়গা মতো য়োড়া উপুড় করে মাটি ফেলছে কেউ, কেউ খালি য়োড়া নিয়ে নেমে আসছে নামার দিকে। সব মিলিয়ে এলাহি কারবার। হেকমতকে রাখা হয়েছে এই সবের তদারক করতে। কিন্তু আলী আমজাদ যতক্ষণ এখানে এসে থাকে

ততক্ষণ হেকমত কিছুতেই কাজে মন দিতে পারে না। মিলেমিশে দাঁড়িয়ে থাকে মাটিয়ালদের মাঝখানে, নজর থাকে ছাপড়া ঘরটার দিকে। কখন আলী আমজাদ বের হবে, কখন ছাতি খোলার সুযোগ পাবে সে।

এখনও তেমন একটা ভাবের মধ্যেই ছিল হেকমত। মাটিয়ালদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকেও তাদের কাজকর্ম কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। চঞ্চল চোখে বার বার তাকাচ্ছিল ছাপড়া ঘরটার দিকে। ফলে আলী আমজাদকে বের হতে দেখে ব্যাকুল হয়ে গেল সে, ফটাস করে ছাতি মেলল, দিশাহারা ভঙ্গিতে ছুটে এল আলী আমজাদের সামনে। দুই হাতে অতিশয় বিনয়ে খোলা ছাতি ধরল তার মাথার উপর।

এখন প্রায় সন্ধ্যা। পশ্চিমে, বহুদূরের গ্রামপ্রান্তে সিন্দুইরা (সিঁদুরে) আমের মতো বোঁটা আলগা হতে শুরু করেছে সূর্যখানার। যে কোনও সময় টুপ করে খসে যাবে। তার আগে কোন ফাঁকে যেন বাড়ির আঙিনায় শুকাতে দেওয়া শাড়ি যেমন তুলে নেয় গিরস্থ বউ তেমন করে তুলে নিয়েছে দিনভর ফেলে রাখা রোদ। ছায়া ছায়া মায়াবি একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে চারদিকে। উত্তরের হাওয়া আরও জোরে বইছে। বেপারি বাড়ির আথালে (গোহালে) হাম্বা স্বরে ডাকছে একটা আবাল (তরুণ ষাড়)। সারাদিন ইচ্ছা স্বাধীন চড়েছে চকেমাঠে। এখন বাড়ি ফিরে আথালের পরাধীনতা মানতে চাইছে না। পদ্মার নির্জন চরে শস্যদানা খুঁটতে গিয়েছিল যেসব পাখি এখন তাদের ফিরার পালা। মাথার অনেক উপর দিয়ে সাং সাং শব্দে উড়ে যাচ্ছে সেই সব দিনশেষের পাখি। ঠাকুর চদরি বাড়ির দেবদারু তেঁতুলের অন্ধকার থেকে, বাঁশঝাড়ের ডগা থেকে পা খসাতে শুরু করেছে বাদুড়েরা। আকাশ কালো করে এখনই ওড়াউড়ি শুরু করবে তারা। আর এসময় কী না রোদ আড়াল করবার জন্য একজন মানুষ ছাতি মেলে ধরেছে আরেকজনের মাথায়!

দৃশ্যটা দেখে খিলখিল করে হাসতে লাগল নূরজাহান।

নূরজাহানের পাশাপাশি ধীর পায়ে হাঁটছে মজনু। সড়কে এসে ওঠার পর থেকেই সে কেমন আনমনা। কোনও কারণ নাই তবু মন উদাস উদাস লাগছে। এই এক অদ্ভুত জিনিস মানুষের দেহে ঢুকিয়ে দিয়েছেন আল্লাহপাক, মন। কখন খারাপ হবে তা, কখন ভাল, কখন না ভাল না খারাপ, কখন উদাস বিষণ্ন অনেক সময়ই মানুষ তা বুঝতে পারে না। এখন যেমন পারছে না মজনু।

নূরজাহানের বাবার কথায় নিজের বাবার কথা মনে পড়েছিল বলেই কী মন এমন খারাপ হয়েছে তার!

কে জানে!

নূরজাহানকে হাসতে দেখে তার মুখের দিকে তাকাল মজনু। কী অইছে রে? এমতে হাসছ ক্যা?

নূরজাহানের স্বভাব হচ্ছে তার হাসির সময় সেই বিষয় নিয়ে কেউ কথা বললে হাসি আরও বেড়ে যায়। এত জোরে হাসতে শুরু করে সে, হাসির চোটে চোখে পানি আসে।

এখনও তেমন হল। হাসতে হাসতে চোখ পানিতে ভরে গেল। হাসির চোটে ফেটে যেতে যেতে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছল।

AMARBOI.COM

মজনু আবার বলল, কী অইছে? হাসতে হাসতে মইরা যাইতাছস দিহি!

হাসির চোটে তখনও কথা বলতে পারছে না নূরজাহান। আঙুল তুলে ছাপড়া ঘরের ওদিকটা দেখাল। মজনু তাকাল ঠিকই কিছুই বুঝতে পারল না। বিরক্ত হয়ে বলল, ওই মিহি কী দেহাচ? ওহেনে হাসনের কী দেকলি?

খয়েরি চাদর পরা লোকটা তখনও একই ভঙ্গিতে বসে আছে আগের জায়গায়। মজনু ভাবল ওই লোকটাকে দেখে বুঝি হাসছে নূরজাহান। এমন করে বসে থাকা একটা লোককে দেখে হাসার কী হল! যে ভঙ্গিতে বসে আছে, দেখেই বোঝা যায় অসহায় মানুষ। একে দেখে হাসি পাওয়ার কথা না, মায়া লাগার কথা।

নূরজাহানকে ধমক দেওয়ার জন্য তৈরি হল মজনু। ঠিক তখনই নূরজাহান বলল, আপনে অহনতরি বোজেন নাই আমি কীর লেইগা হাসতাছি?

মজনু গম্ভীর গলায় বলল, না।

কনটেকদারের মিহি চান।

মজনু আবার তাকাল, এবারও কিছু বুঝতে পারল না।

নূরজাহান বলল, অহনও বোঝেন নাই?

না।

ধুরো আপনে একখান বলদ (বোকা অর্থে), দেকতাছেন না কনটেকদারের মাথার উপরে ছাতি মেইল্লা (মেলে) ধরছে এক বেডায়।

হ দেকতাছি।

অহন কি রইদ আছে না ম্যাগ অইতাছে যে ছাতি লাগবো!

এবার ব্যাপারটা বুঝল মজনু। বুঝে হাসল। ও এর লেইগা হাসতাছস?

হাসুম না? এইডা তো হাসনের ঐ জিনিস।

আর আমি মনে করছি ঐ যে চাইদ্দর গায়দা (গায়ে দিয়ে) বইয়া রইছে ঐ বেডারে দেইক্কা হাসতাছস।

ভুরুর অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে মজনুর দিকে তাকাল নূরজাহান। ঐ বেডারে দেইক্কা হাসুম ক্যা? ঐ বেডা কি হাসনের জিনিস! দেকলে তো মায়া লাগে!

মজনু আনমনা গলায় বলল, হ।

লন ঐ ঘরডার সামনে যাই, ঐ বেডারে দেইক্কাহি আর হাজের সময়ায় ছাতি মাথায় দেওয়া কনটেকদাররে ইট্টু খোচাইয়াহি (খুঁচিয়ে আসি)।

মজনু গম্ভীর গলায় বলল, না।

নূরজাহানের উৎসাহে ভাটা পড়ল। ক্যা?

চিনাজানা নাই এমুন মাইনষের লগে খোচাখুচি করতে যাওন ঠিক না। কাইজ্জা কিত্তন লাইগ্গা যাইবো। এমতেঐ আউজকা মান্নান মাওলানারে চেতাইয়া দিছস। অহন আবার লাগাইতে চাইতাছস আরেক ভেজাল। আমি যামু না।

নূরজাহান হাসল। কনটেকদার সাবরে আমি চিনি। বহুত খাতির আমার লগে। হের লগে কত ফাইজলামি করি। হেয়ও করে। মুখের ভিতরে সোনায় বানদাইন্না দাত আছে হের। একদিন হাসতে দেইক্কা কইছিলাম আপনে যহন হাসেন মনে অয় ব্যাটারি লাগাইয়া হাসতাছেন।

AMARBOI.COM

বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল নূরজাহান। মুখের ভিতরে কেউ চান্দা ব্যাটারি লাগাইতে পারে, কন?

এবার মজনুও হাসল। ইস তুই যে কী মাইয়ারে!

লগে লগে নূরজাহান বলল, তয় অহন লন।

মজনু অবাক হল, কই?

কনটেকদারের ঘরের ওহেনে।

তারপর মজনুকে আর কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে তার হাত ধরে হঠাৎ করেই নামার দিকে দৌড় দিল নূরজাহান। এমন আচমকা দৌড়, তাল সামলাতে না পেরে মজনুও দৌড় দিল। খাড়া ঢাল বেয়ে চলে এল ছাপড়াঘরটার সামনে। তবে তাল সামলাতে খুব একটা বেগ পেতে হল না। যেমন আচমকা মজনুর হাত ধরে দৌড় দিয়েছিল নূরজাহান ঠিক তেমন আচমকাই দৌড় থামিয়ে স্থির হল। কী করে যে পারল, কে জানে। বোধহয় এরকম দৌড়াদৌড়ির অভ্যাস তার অনেক দিনের। অভ্যাসে সব হয়।

নূরজাহানকে দেখবার জন্যই, নূরজাহানের সঙ্গে কথা বলবার জন্যই ছাপড়াঘর থেকে বেরিয়েছে আলী আমজাদ। বেরিয়ে বেকায়দায় পড়ে গেছে। সেই বেকায়দার নাম হেকমত। এমন ভঙ্গিতে আলী আমজাদের মাথার উপর ছাতি মেলে আছে, এমন উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে আলী আমজাদের মুখের দিকে, একটা কথাও পড়তে দেবে না তার আগেই কথা মতো কাজটা করে ফেলবে। ট্যাওরা যে বিরক্তির কারণও হয় এই প্রথম আলী আমজাদ তা বুঝতে পারল। বুঝেও তার এখন কিছু করার নাই। অকারণে গম্ভীর হয়ে থাকতে হল। আড়চোখে নূরজাহান এবং মজনুর দিকে একবার তাকিয়ে জবুথুবু হয়ে বসে থাকা লোকটার সামনে এসে দাঁড়াল। পেটের অনেক ভিতর থেকে শব্দ করে করে বলল, বাড়ি কবে?

প্রশ্নটা যে তাকে করা হয়েছে লোকটা প্রথমে বুঝতে পারল না। পেটের অনেক ভিতর থেকে শব্দ বের করেছে বলে আলী আমজাদের স্বর হয়ে গেছে জলদগম্ভীর। একে ওরকম শব্দ তার ওপর কোথায়কে বলছে কবে, আলী আমজাদের কায়দা কানুনের সঙ্গে যারা পরিচিত না, কথাবার্তার সঙ্গে যারা পরিচিত না তাদের পক্ষে এসব বোঝা মুশকিল। তবে কনট্রাক্টর সাহেবকে নিজের সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে লোকটা ভড়কে গেছে। চোখে মুখে বেশ একটা চাঞ্চল্য। দিশাহারা গলায় বলল, আমারে জিগাইলেন?

আলী আমজাদ কথা বলবার আগেই হেকমত বলল, তয় আবার কারে? এহেনে তুমি ছড়া আর আছে কে?

লোকটা কাঁচুমাচু গলায় বলল, কথাডা বোজতে পারি নাই। কী জানি জিগাইলেন?

ঠিক আগের মতো করেই আলী আমজাদ বলল, বাড়ি কবে?

লগে লগে হেকমত বলল, বাড়ি কই?

জ্বে কামারগাও সাহেব।

হেকমত ধমকের গলায় বলল, কামারগাওর মানুষরা কি আদব লেহাজ (কায়দা) জানে না? সাবের সামনে যে বইয়া বইয়া কথা কইতাছো? উডো, উইট্টা খাড়ও।

AMARBOI.COM

লোকটা জড়সড় হয়ে উঠে দাঁড়াল। ভুল হইয়া গেছে সাব, মাফ কইরা দিয়েন।

লোকটার দিকে আর তাকাল না আলী আমজাদ তাকাল নূরজাহান এবং মজনুর দিকে। মুখে বেশ একটা প্রশান্তির ভাব। লোকটার ওপর হেকমতের হামতাম (হম্বিতম্বি) বেশ পছন্দ করেছে সে। ট্যাগুলদের এরকমই হওয়া উচিত। সাহেবরা যা ভাববেই না আগ বাড়িয়ে সেই ধরনের কিছু একটা করে সাহেবদের মন জিততে না পারলে সে আবার কিসের ট্যাগুল! লোকটাকে আদব কায়দা শিখিয়ে ঠিক এই কাজই করেছে হেকমত। তবে আলী আমজাদ যখন নূরজাহানের দিকে মন দিয়েছে, মাত্র কথা শুরু করবে, হেকমত বলল, সাব, কথাডা কন।

ভিতরে ভিতরে খুবই বিরক্ত হল আলী আমজাদ কিন্তু প্রকাশ করল না। নির্বিকার চোখে তাকাল হেকমতের দিকে। কোন কথা?

নতুন মাইট্টাল কামে লওনের কথা।

ও।

তারপর আবার লোকটার দিকে তাকাল। গম্ভীর গলায় বলল, মাইট্টাল অইবা?

জ্বে সাহেব। এর লেইগাঐ বইয়া রইছি।

য়োড়া আছে?

না।

তয়?

য়োড়া যোগার কইরা লমুনে।

কেমতে? য়োড়া আনতে আবার কামারগাঁও যাইবা?

না। এই গেরামে আতিয় (আত্মীয়) বাড়ি আছে। তাগো কাছ থিকা আনুম।

থাকবা কই?

থাকনের বেবস্তা অইবনে। কইয়া বুইল্লা (বলে কয়ে) ঐ আতিয় বাইতঐ থাকতে পারুম। নাইলে ভিনদেশি মাইট্টাইলরা যেমতে থাকে, তাগো লগে থাকুম। ছাড়া বাইত্তে, ইসকুলে।

এবার আসল কথাটা বলল আলী আমজাদ। আমার কামের রোজ জানো?

না সাহেব, তয় অন্যরে যা দেন আমারেও তাই দিয়েন।

না হেইডা দিমু না।

ক্যা?

আমার এহেনকার এহেক মাইট্টালের এহেক রকম রোজ। কেঐর পনচাইশ কেঐর চল্লিশ। সইত্তর আশিও আছে। মাইট্টাল বুইজ্জা রোজ। শইল বুইজ্জা রোজ। তোমার যা শইল, চল্লিশ টেকার বেশি পাইবা না। করলে কাইল বিয়ানে য়োড়া লইয়া আইয়ো। ফয়জরের আয়জানের লগে লগে কামে লাগবা, দুইফরে আধাঘণ্টা টিবিন (টিফিন) তারবাদে মাগরিবের আয়জান পইরযন্ত কাম। সপতায় একদিন টেকা পাইবা। শুক্কুরবার।

কথাগুলি বলে লোকটার দিকে আর তাকাল না আলী আমজাদ, তাকাল হেকমতের দিকে। কেমতে কথা কইলাম খ্যাল করছো?

হেকমত বিগলিত ভঙ্গিতে হাসল। করছি সাব। এরবাদে আমিই পারুম। আপনেরে আর লাগবো না।

AMARBOI.COM

লোকটা তখন কাতর চোখে তাকিয়ে আছে আলী আমজাদের দিকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে যখন দেখল আলী আমজাদ আর তার দিকে তাকাচ্ছেই না বাধ্য হয়ে বলল, আমার একখান কথা আছিলো সাহেব।

তবু লোকটার দিকে তাকাল না আলী আমজাদ। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি কও। কাম আছে।

পয়লা সপতাডা রোজকার পয়সা রোজ দেওন লাগবো।

ক্যা?

আমার কাছে একখান পয়সাও নাই। রোজ না পাইলে খামু কী? তয় পয়লা সপতার পর আর কোনওদিন লাগবো না।

আলী আমজাদ হেকমতের দিকে তাকাল। হেকমত, কইয়া দেও, অইবো না, নিয়ম নাই।

তারপর বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথার ওপর মেলে ধরা ছাতি একহাত দিয়ে সরিয়ে দিল। অদূরে দাঁড়ান নূরজাহান খিলখিল করে হেসে উঠল। কয়েক পা হেঁটে আলী আমজাদ এসে নূরজাহানের সামনে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, হাসো ক্যা?

নূরজাহান হাসতে হাসতে বলল, আপনেরে ছাতি মাথায় দেইক্কা। রইদ নাই ম্যাগ নাই মাথায় ছাতি দিয়া আছেন ক্যা?

আমি দেই নাই। মাথার উপরে ছাতি ধরছে আমার ম্যানাজারে। অগো কামঐ এমুন। রইদ ম্যাগ বোজে না। মালিক দেখলেই তার মাথায় ছাতি মেইল্লা ধরে।

ঐ বেডায় আপনের ম্যানাজার?

হ। বড় কনটেকদার অইলে একজন ম্যানাজার লাগে। আমি অহন বড় কনটেকদার। ম্যানজার রাখছি।

মজনু দাঁড়িয়ে আছে নূরজাহানের পাশে কিন্তু আলী আমজাদ একবারও তাকাচ্ছে না তার দিকে। নূরজাহানকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। চোখের দৃষ্টি ভাল না লোকটার। খানিক আলী আমজাদকে দেখেই বিরক্ত হয়ে গেল মজনু। সেই বিরক্তি কাটাবার জন্য নূরজাহানকে কিছু না বলে হেকমত আর চাদরপরা লোকটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। হেকমত কী বলছে, লোকটা মন দিয়ে শুনছে। মজনু গিয়ে সামনে দাঁড়াবার পর হেকমতকে যেন ভুলে গেল সে, হেকমতকে যেন আর চিনতেই পারল না। ঘোরলাগা চোখে মজনুর দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রথমে দুই একবার চোখ সরিয়ে নিল মজনু তারপর সেও কেমন তাকিয়ে রইল। চোখ সরাতে পারল না।

ওদিকে নূরজাহান তখন আলী আমজাদকে বলছে, অনেকক্ষুণ ধইরা খাড়ইয়া রইছি ছাতির কথাডা আপনেরে কমু, এমুন প্যাচাইল আপনে ঐ বেডার লগে আরম্ব করলেন আর শেষঐ অয় না। কথাও কইতে পারি না যাইতেও পারি না।

নূরজাহানের কথা শুনে আলী আমজাদ যেন আকাশ থেকে পড়ল। কও কী? তুমি আমার লগে কথা কওনের লেইগা খাড়ইয়া রইছো? হায় হায় আমি তো বুঝি নাই। লও ঘরে লও। ঘরে বইয়া কথা কই। আমারও কথা আছে তোমার লগে।

ঘরে যে আতাহাররা বসে আছে সেই কথা যেন মনেই রইল না আলী আমজাদের, একদম ভুলে গেল।

AMARBOI.COM

কিন্তু আলী আমজাদের কথা পাত্তা দিল না নূরজাহান। বলল, ধুরো, ঐ ঘরে মানুষ যায়নি। রাইত অইয়াইলো। আমি অহন বাইত যামু।

মজনুকে ডাকল নূরজাহান। ও মজনু দাদা, তাড়াতাড়ি আহেন। রাইত অইয়াইলো। বাইত্তে যামু না?

নূরজাহানের ডাকে চমক ভাঙল মজনুর। লোকটার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে দ্রুত নূরজাহানের দিকে পা বাড়াবে, লোকটা বলল, খাড়াও বাজান। তোমার নাম মজনু?

হ।

এই গেরামেঐ বাড়ি?

হ।

কোন বাড়ি?

হালদার বাড়ি।

লোকটা আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাবে তার আগেই নূরজাহান রাগি ভঙ্গিতে এসে হাত ধরল মজনুর। কানে বাতাস যায় না? কইলাম যে রাইত হইয়া যাইতাছে। লন।

মজনুর হাত ধরে টানতে টানতে তাকে নিয়ে সড়কে উঠল নূরজাহান। পিছন দিকে আর ফিরেও তাকাল না।

কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে মজনু বার বারই পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল। লোকটাকে দেখছিল। সন্ধ্যার ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে দূর থেকে লোকটার চোখ দেখা যায় না, পরিষ্কার দেখা যায় না মুখ। তবে সে যে তখনও ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে আছে মজনুর দিকে এটা বোঝা যায়।

কে, লোকটা কে?

এই সড়কে যে মাটিয়ালের কাজ করতে এসেছে এটা আলী আমজাদ হেকমত এবং লোকটার কথা শুনে বুঝেছে মজনু। কিন্তু সে গিয়ে সামনে দাঁড়াবার পর সব ভুলে এমন করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কেন? চলে আসার সময় নাম ধামই বা জিজ্ঞাসা করল কেন? এখন এই যে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে মজনু এসময় কেন তার বার বার ফিরে তাকাতে ইচ্ছা করছে লোকটার দিকে।

মজনু মনে মনে বলল, আপনে কে?

মাটির গাছাটা (কুপিদানি) কতকালের পুরানা কে জানে! জন্মের পর থেকে এই একটা মাত্র গাছাই দেখে আসছে মজনু। এক সময় বিলাতিগাবের মতো রঙ ছিল। দিনে দিনে সেই রঙ মুছে গেছে। এখন চুলার ভিতরকার পোড়ামাটির মত রঙ। মাটির তৈরি একখান জিনিস কী করে এতকাল টিকে থাকে? তাও প্রতিদিন ব্যবহার করার পর!

AMARBOI.COM

আসলে গরিব মানুষের সংসারের কোনও জিনিসই সহজে নষ্ট হয় না। অভাবের সংসারে প্রতিটি জিনিসই দামি। যত্নে ব্যবহার করার ফলে ভঙ্গুর জিনিসও বছরের পর বছর টিকে থাকে। মজনুদের সংসারে যেমন করে টিকে আছে গাছাটা।

সেই গাছার ওপর এখন জ্বলছে পিতলের কুপি। কুপির বয়স গাছার চেয়েও বেশি। প্রায়ই ছাই দিয়ে মেজে পরিষ্কার করে মরনি, ফলে এখনও ঝকঝক করে। পুরানা মনে হয় না।

চকিতে শুয়ে আনমনা চোখে কুপির দিকে তাকিয়ে আছে মজনু। মাঝারি ধরনের পাটাতন ঘরের পুরাটা আলোকিত হয়নি একখান কুপির আলোয়। অর্ধেকের কিছু বেশি হয়েছে। বাকিটা আবছা মতন অন্ধকার। সেই অন্ধকারে পা ছড়িয়ে বসে পান চাবাচ্ছে মরনি। খানিক আগে মজনুকে খাইয়ে নিজেও খেয়েছে রাতের ভাত, তারপর টুকটাক কাজ সেরে পান মুখে দিয়ে বসেছে। এখন কিছুটা সময় উদাস হয়ে বসে পান চাবাবে। গত চারমাসে চুপচাপ বসে পান খাওয়ার এই অভ্যাসটা হয়েছে তার। পান সে আগেও খেত তবে চুপচাপ থাকত না। মজনু ছিল, সারাদিনের জমে থাকা সবকথা খালা বোনপোয় এসময় বলত। চারমাস ধরে মজনু বাড়িতে নাই, কথা সে কার সঙ্গে বলবে! তবে মজনু বাড়িতে আসার পর এসময় চুপচাপ থাকা হয় না তার। আজ হচ্ছে। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরেই মজনু আনমনা হয়ে আছে। ভাত খাওয়ার সময় তেমন কোনও কথা বলল না। খেয়েই চকিতে শুয়ে পড়ল। এখন উদাস হয়ে তাকিয়ে আছে কুপির দিকে।

পান চাবাতে চাবাতে মজনুর দিকে তাকাল মরনি। ঘুমাইছস নি বাজান?

মজনু নরম গলায় বলল, না।

তয় চুপ কইরা রইছস ক্যা? কথাবার্তা ক।

সড়কের সেই লোকটার কথা মনে পড়ল মজনুর। সে একটু উত্তেজিত হল। চঞ্চল ভঙ্গিতে উঠে বসল। আরে তোমারে তো একখানা কথা কই নাই খালা। নূরজাহানের লগে সড়ক দেকতে গেছিলাম। ওহেনে কনটেকদারের ছাপড়া ঘরের সামনে একজন মাইনষের লগে দেহা অইলো।

মরনি আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কার লগে?

চিনি না।

তয়?

ঘটনাডা হোনো। বলেই লোকটা কেমন করে তার দিকে তাকিয়েছিল, কী কী কথা জিজ্ঞাসা করল সব বলল মজনু। চলে আসার সময়ও যে তাকে যতক্ষণ দেখা যায় তাকিয়েছিল লোকটা, মজনুর বুকের ভিতর কেমন করছিল এবং সেও যে বার বার ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছিল, সব বলল। শুনে পান চাবাতে ভুলে গেল মরনি। চিন্তিত গলায় বলল, বাড়ি কই?

কামারগাও।

কামারগাও শুনে বুকটা ধ্বক করে উঠল মরনির। দিশাহারা গলায় বলল, কামারগাও?

হ অমুনঐত্তো হোনলাম।

তর লগে কথা কইলো আর তুই ঠিক মতন হুনলি না?

আমার লগে কয় নাই। কনটেকদারের লগে কইতাছিল, আমি দূর থিকা হুনছি।

তয় তর লগে বলে কথা কইলো? তুই জিগাচ নাই বাড়ি কই?

না।

নাম জিগাইছস? নাম কী?

আমি তারে কিছুই জিগাই নাই। সে আমারে দুইখান কথা জিগাইছে। রাইত অইয়া যায় দেইক্কা নূরজাহান আমারে টাইন্না লইয়াছে।

দেখতে কেমুন?

ভাল না! কাহিল।

বয়স কত?

গাছি মামার লাহান। মোখে দাড়িমোচ আছে। চুল আর দাড়িমোচে পাকনও ধরছে। খয়রি রঙ্গের চাইদ্দর গায়দা রইছে। মুখহান দেইক্কা আমার কেমুন জানি মায়া লাগলো।

মরনি চিন্তিত গলায় বলল, এহেনে আইছে কীর লেইগা?

মাডি কাটতে।

লগে লগে বুক হালকা হয়ে গেল মরনির। যা অনুমান করেছিল তা না। সেই মানুষের মাটি কাটতে আসবার কথা না। অবস্থা ভাল তার। সচ্ছল গিরস্থ। সে কেন আসবে মাটিয়াল হতে! এটা অন্য কেউ।

প্রশান্ত মুখে আবার পান চাবাতে লাগল মরনি।

মজনু বলল, মানুষটা কে অইতে পারে কও তো খালা? এমুন কইরা চাইয়া রইলো আমার মিহি!

মরনি নির্বিকার গলায় বলল, কী জানি?

আমগো আততিয় স্বজন না তো?

কেমতে কমু? না মনে অয়। আমগো অমুন আততিয় নাই।

তারপরই চিন্তিত গলায় মজনু বলল, ও খালা, আমগ বাড়ি কামারগাও না?

কথাটা যেন বুঝতে পারল না মরনি। থতমত খেয়ে বলল, কী কইলি?

কইলাম আমার বাপ চাচারা থাকে না কামারগাওয়ে?

মরনি গম্ভীর গলায় বলল, হ থাকে। তয় তর বাড়ি কামারগাও না। তর বাড়ি এইডা। তর ঘর এইডা। তরে যে জন্ম দিছে তার বাড়ি কামারগাও।

তারপর মন খারাপ করা গলায় বলল, মাইনষের নিয়মঐ এইডা, জন্মদাতারে বহুত বড় মনে করে তারা। যেই বাপে আহুজ ঘর থিকা ঠ্যাং ধইরা ফিক্কা হালায় দেয় পোলারে, জীবনে পোলার মিহি ফিরা চায় না, পোলার খবর লয় না, চিনে না, পোলার খাওন পরন দেয় না, একদিন হেই পোলায়ঐ বাপ বাপ কইরা পাগল অইয়া যায়।

খালার কথার ভিতরকার অর্থটা বুঝল মজনু। বুঝে হাসল। আমি কইলাম বাপ বাপ কইরা পাগল অই না। আমার কাছে জন্মদাতা বড় না, বড় তুমি, যে আমারে বাচাইয়া রাখছে, পাইল্লা বড় করছে। আমি বাপ বুঝি না, বুঝি তোমারে।

কথা শেষ করার পর কেন যে আবার সেই লোকটার কথা মনে পড়ল মজনুর! কেন যে সেই লোকটার মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে! আর বুকের ভিতর কেন যে হল আশ্চর্য এক অনুভূতি, মজনু বুঝতে পারল না।

AMARBOI.COM

শিশুর মতো শুয়ে আছে নূরজাহান। শাড়ি উঠে আছে ডানপায়ের গুড়মুরা ছাড়িয়ে একটুখানি উপরে। বিকালের বেণী করা চুল ঘুমাবার আগে আলগা করে দিয়েছে। খোলা চুল তেল চিটচিটা বালিশের পিছন দিকে লুটাচ্ছে। গভীর ঘুমে ডুবে থাকার ফলে শ্বাস পড়ছে ভারী হয়ে। মা বাবা কেউ তা খেয়াল করছে না। তারা আছে যে যার কাজে।

ঘরে জ্বলছে হারিকেন। চিমনির মাজার কাছটায় চিকন সাদা সুতার মতন ফাটল। রঙ চটে যাওয়া কাটার একপাশে 'বায়েজিদ' ছাপ মারা। বহুদিনের পুরানা হওয়ার পরও কোম্পানির ছাপ গা থেকে মুছে যায়নি হারিকেনের।

সন্ধ্যাবেলা হারিকেন আজ খুবই যত্নে পরিষ্কার করেছিল হামিদা। ফাটা কাচ সাবধানে মুছে, কেরোসিন ঢালার মুখে ছোট্ট চোঙা বসিয়ে, বোতল থেকে পরিমাণ মতো কেরোসিন ঢেলে হারিকেন যখন জ্বেলেছে, লগে লগে উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল তাদের গরিব ঘর। নূরজাহান তখনও ফিরেনি। দবির ফিরেছিল। ফিরে হামিদাকে হারিকেন জ্বালাতে দেখে অবাক হয়েছিল।

এই বাড়িতে বিশেষ কোনও দরকার না হলে হারিকেন জ্বালান হয় না। অন্ধকারে জ্বলে শুধু কুপি। বাড়িতে মেজবান (মেহমান অতিথি) এলে রাতের বেলায় সেই মেজবানরা যদি থাকে, মেজবানদের সামনে তো আর টিন পিতলের কুপি দেওয়া যায় না! গরিব হলেই বা কী, মানইজ্জত কি গরিব মানুষদের থাকবে না! তাও না হয় বাড়িতে যদি হারিকেন না থাকত! না থাকা ভিন্নকথা। থাকবার পরও মেজবানের সামনে দিবে না এত কিরপিন (কৃপণ) কি কোনও গিরস্ত হতে পারে! নাকি হওয়া উচিত! তবে বান তুফানের (ঝড় বাদলার) রাতে, বৈশাখ যষ্ঠি মাসে, আষাঢ় শাওন মাসে হারিকেন জিনিসটা দরকারী। দমকা হাওয়ায় টিকতে পারে না কুপি। সলতা (সলিতা) যতই বাড়ানো থাকুক সো সো করা বাতাস ছাড়লে লগে লগে ঘরবাড়ি আন্ধার। দবির গাছির তুলনায় গরিব গিরস্ত ঘরেও তখন জ্বলতে দেখা যায় হারিকেন। একবেলা ভাত না খেয়ে থাকতে পারে মানুষ বান তুফানের রাতে আন্ধারে থাকতে পারে না। ভয় পায়। মনে হয় আন্ধারে যখন তখন সামনে এসে দাঁড়াবে মৃত্যু। মানুষ দেখতে পাবে না কিন্তু তার ঢোর (টুটি) টিপে ধরবে আজরাইল। জান কবচ করবে।

সন্ধ্যাবেলা হামিদাকে আজ হারিকেন জ্বালাতে দেখে দবির অবাক হয়ে ভেবেছিল, বাড়িতে কোনও মেজবান আসেনি, দিনও বান তুফানের না তাহলে হারিকেনের দরকার কী!

AMARBOI.COM

হামিদা বলেছিল, কাম আছে। কী কাম তা বলেনি। দবির জানতে চায়নি। খাওয়া দাওয়ার পর, নূরজাহান শুয়ে পড়ার পর, তামাক সাজিয়ে স্বামীর হাতে হুকা ধরিয়ে দেওয়ার পর হামিদা তার কাম নিয়ে বসেছে। ঘরের মেঝেতে হোগলা একখান বিছানোই থাকে। এই হোগলায় বসে খাওয়া দাওয়া করে তিনজন মানুষ। রাতেরবেলা তিনজন মানুষের দুইজন, মা মেয়ে উঠে যায় চকিতে আর দবির একখান বালিশ মাথায় দিয়া এই হোগলায়ই টান টান।

আজকের ব্যাপারটা হয়েছে অন্যরকম। রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে মেয়ে একা উঠে গেছে চকিতে আর পুরানা মোটা একখান কাঁথা বের করে, সুঁই সুতা নিয়া, হাতের কাছে হারিকেন, হামিদা বসেছে কাঁথা সিলাই করতে, তালি দিতে। হুকা হাতে দবির গিয়ে বসেছে দুয়ারের সামনে। বসে হুকায় প্রথম টান দিয়েই বলল, ও তাইলে এই কাম! এই কামের লেইগা হারিকেন আঙ্গান (জ্বালান) লাগে!

পুরানা, ছিঁড়ে ত্যানা ত্যানা হয়ে গেছে এমন সুতি শাড়ির পাইড় (পাড়) থেকে টেনে টেনে বের করা সুতা ফেলে দেওয়া ম্যাচের বাক্সে সযতনে প্যাঁচিয়ে রাখে গিরস্ত বাড়ির বউঝিরা। কাঁথা সেলাইয়ের কাজ করে এই সুতা দিয়ে। সে কাঁথা ছেলে বুড়া যারই হোক না কেন। হামিদাও তেমন করে কাঠিম (ম্যাচ বাক্সে সুতা প্যাঁচিয়ে রাখার পদ্ধতি) বানিয়ে রেখেছ হলুদ রঙের সুতা। এখন সুতা দুই ঠোঁটের ভিতর কায়দা করে নিয়ে, ঠোঁটে লেগে থাকা আঠাল ছ্যাপে শক্ত করে কাঁথা সিলাবার জংধরা একখান সুইয়ের পিছনে ঢুকাবার চেষ্টা করছে। জ্যোতি কমে আসা চোখে এই কাজ করা কঠিন। সুতা ঢুকলো কী ঢুকলো না বুঝাই যায় না। আসল জায়গায় না ঢুকে পাশ দিয়ে চলে যায় সুতা। লোকে মনে করে ঠিক জায়গায়ই ঢুকেছে। খুশি মনে সুতার আগায় টান দিতে গিয়ে বেকুব হয়ে যায়। হামিদাও দুই তিনবার হল। ফলে মেজাজটা খারাপ, ঠিক তখনই দবিরের কথা।

রুক্ষ গলায় হামিদা বলল, হারিকেন না আঙ্গাইয়া কেতা সিলাইতে বহন যায়নি!

দবির অবাক হল। ক্যা, বহন যাইবো না ক্যা?

জায়গা মতন সুতার অগা ঠিক তখনই ঢুকাল হামিদা। কাজটা করতে পেরে মেজাজ ভাল হল। কাঠিম থেকে অনেকখানি সুতা বের করে দাঁতে সেই সুতা কেটে হারিকেনের পাশে কাঁথা ফেলে মন দিয়ে তালি দিতে লাগল। স্বামীর দিকে তাকাল না। সরল গলায় বলল, কুপি আঙ্গাইয়া কেতা সিলাইতে বইলে কুনসুম না কুনসুম কেতায় আগুন লাইগ্যা যায়। কেতা সিলানের সময় অন্যমিহি খ্যাল থাকে না মাইনষের।

তামাক টানতে টানতে মাথা নাড়ল দবির। হ ঠিক কথা।

তারপরই যেন চকিতে শোয়া মেয়েটার কথা মনে পড়ল দবিরের। শুয়ে পড়ার পর থেকেই সাড়া নাই। এত তাড়াতাড়ি ঘুমাইয়া গেল!

গলা উঁচু করে নূরজাহানের দিকে একবার তাকাল দবির। তাকিয়েই বুঝে গেল ঘুমে কাদা হয়ে গেছে মেয়ে। দুনিয়াদারির খবর নাই।

দবিরের গলা উঁচু করাটা হঠাৎ করেই দেখতে পেল হামিদা। কাঁথায় আর একটা ফোর (সুঁচ ঢুকিয়ে টেনে বের করা) দিতে গেছে, না দিয়ে বলল, কী দেখলা?

AMARBOI.COM

নূরজাহানরে দেখলাম। হোয়নের লগে লগে ঘুমাইয়া গেছো!

ঘুমাইবো না! যেই দৌড়াদৌড়ি করে হারাদিন! মাইয়াডা যত ডাঙ্গর অইতাছে হেত বেবাইন্না (বেয়াড়া) অইতাছে। এই মাইয়ার কপালে দুক্কু আছে।

দবির একটু রাগল। রোজ রোজ এক প্যাচাইল পাইড়ো না তো! দুক্কু কপালে থাকলে কেঐ খনডাইতে পারবো না।

চোখ তুলে স্বামীর দিকে তাকাল হামিদা। মাইয়া লইয়া কোনও কথা কইলে এমুন ছ্যাত কইরা ওডো ক্যা?

উডুম না? একটা মাত্র মাইয়া আমার!

এক মাইয়া যার বারো ভেজাল তার। ডাকের (প্রচলিত) কথা।

থোও তোমার ডাকের কথা। ভেজাল অইলে অইবো। আমার মাইয়া আমি বুজুম।

তারপর কেউ কোনও কথা বলে না। হামিদা কাঁথা সেলাই করে, তালি দেয় আর দবির তামাক টানতে টানতে উদাস হয়ে তাকায় বাইরের দিকে।

দুয়ার বরাবর, বাড়ির পুবদিকে, রান্নাচালা আর ছাপড়া ঘরটার পিছনে বাঁশঝাড়। বাঁশঝাড়ের মাথায় কখন উঠেছে কুমড়ার ফালির মতন চাঁদ। আসি আসি করা শীতের কুয়াশা শেষ বিকাল থেকেই নাড়ার ধুমার মতো জমেছিল চারদিকে। সন্ধ্যার অন্ধকারে অনেকক্ষণ দেখা যায় নাই সেই কুয়াশা। এখন চাঁদের মৃদু আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। শিউলি ফুলের পাপড়ির মতো কোমল জ্যোৎস্না আর মাকড়শার জালের মতো মোলায়েম কুয়াশার মিশেলে তৈরি হয়েছে অপার্থিব এক আলো। এই আলো ছুঁয়ে বইছে উত্তরের হাওয়া। গভীর দুঃখ বেদনায় দীর্ণ হওয়া মানুষের নিঃশব্দ কান্নার মতো প্রকৃতির গাল চুইয়ে পড়ছে শিশির।

হাওয়া মৃদু হলেও বাঁশের পাতা এবং ডগায় শন শন শব্দ হচ্ছিল। সেই শব্দ কেন যে শুনতে পায় না দবির! তামাক টানতে টানতে বাইরে তাকিয়ে হঠাৎ করেই তার মনে হল এই সুন্দর নিঝুম প্রকৃতিকে বিরক্ত করছে তার হুকার শব্দ। প্রকৃতির মাধুর্য নষ্ট করে দিচ্ছে। ভেঙে খান খান করছে মূল্যবান নৈশব্দ। লগে লগে হুকা থেকে মুখ সরাল দবির। এক হাতে হুকা ধরে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইল বাঁশঝাড়ের দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনের ভিতরটা কেমন যেন হয়ে গেল তার, কানের ভিতরটা কেমন যেন হয়ে গেল। বাঁশঝাড়ের মাথা ছুঁয়ে বয়ে যাওয়া উত্তরের হাওয়ায় দবির গাছি শুনতে পেল ঝোড়া খাজুরগাছের মাথা বরাবর তার পেতে আসা হাঁড়িতে টুপ টুপ করে ঝরছে প্রকৃতির অন্তর থেকে টেনে তোলা রস।

এই রস কি খাজুরের নাকি প্রকৃতির বুক নিংড়ানো অলৌকিক কোনও তৃষ্ণার! এই রস কি খাজুরের নাকি দূর নক্ষত্রলোক থেকে পৃথিবীর মতো বিশাল, উন্মুখ একখানা হাঁড়িতে এসে পড়ছে সৃষ্টিকর্তার মহান করুণাধারা! সেই ধারায় চিরকালের তরে তৃষ্ণা মিটছে এই পৃথিবীর তৃষ্ণার্ত, অভাজন মানুষের!

দবির গাছি কোন রস পতনের শব্দ পায়!

অনেকক্ষণ নিঝুম হয়ে আছে দবির, তার হুকার শব্দ পাওয়া যায় না দেখে কাঁথা সিলাতে সিলাতে স্বামীর দিকে তাকাল হামিদা। তাকিয়ে অবাক হল। একহাতে হুকা ধরে এমন করে বাইরের দিকে তাকিয়ে কী দেখছে দবির!

AMARBOI.COM

হামিদা বলল, ও নূরজাহানের বাপ কী দেহো বাইরে?

থতমত খেয়ে হামিদার দিকে মুখ ফিরাল দবির। ফ্যাল ফ্যাল করে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কথা বলল না।

হামিদার ভুরু কুঁচকে গেল। কী অইছে?

এবার যেন কথা কানে গেল দবিরের। বলল, কী কও?

তুমি হোনো নাই কী কইছি?

না।

ক্যা?

কইতে পারি না!

কইতে পারবা না ক্যা? কী অইছে তোমার? এত কাছে বইয়াও আমার কথা হোনতাছো না! কী দেখতাছিলা বাইরে?

কিছু না।

তয়?

ঝোড়া খাজুরের রস ঝরছে হাঁড়িতে, তার টুপ টুপ শব্দ, সেই শব্দের সূত্র ধরে দূর কোনও অচিনলোকের ইঙ্গিত, এসব হামিদাকে খুলে বলল দবির। শুনে দিশাহারা হয়ে গেল হামিদা। কাঁথা সেলাই শেষ না করেই উঠল। দাঁতে সুতা কেটে কাঁথা থেকে সরিয়ে আনল সুই। কাঁথায় বেশ একটা ঝাড়া দিয়ে সেই কাঁথা যত্নে মেলে দিল ঘুমন্ত নূরজাহানের গায়ে। দবিরের দিকে তাকিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি দুয়ার দেও। রাইত অইছে। হুইয়া পড়ো।

দরজার একপাশে হুকা রেখে দরজা বন্ধ করল দবির, হোগলায় এসে বসল।

চকি থেকে নামিয়ে দবিরের বালিশ হোগলায় রেখেছে হামিদা। একখান কাঁথাও রেখেছে। রাতে একটু একটু শীত পড়ছে দুইদিন ধরে। কাঁথা না হলে চলে না।

কিন্তু দবির এমন চুপচাপ হয়ে আছে কেন? কথা বলছে না, শুয়ে পড়ছে না! কেমন বিহ্বল হয়ে বসে আছে! ব্যাপার কী?

হামিদার কী রকম ভয় ভয় করতে লাগল। হারিকেন নিভিয়ে নূরজাহানের পাশে শুয়ে পড়ল সে। শুয়েই বলল, নূরজাহানের বাপ হুইছো?

অন্ধকার মেঝে থেকে দবির বলল, না।

ক্যা?

ঘুম আহে না। খালি খাজুরগাছের কথা মনে অয়, রসের কথা মনে অয়। কানে হোনতাছি খালি রস পড়নের আওজ। টুপ টুপ, টুপ টুপ।

শীতের দিন আইলেঐ এমুন অয় তোমার। এইডা কইলাম ভাল না। খাজুরগাছ, রস এই হগল কইলাম জোয়াইরা বোয়ালের লাহান। রাইত দুইফরে লোভ দেহাইয়া ডাইক্কা বিলে লইয়া যায় মাইনষেরে। পাইনতে ডুবাইয়া মারে। হেই মাছের ডাক মনের ভিতরে থিকা হোনে যেই মাইনষে হেয় কইলাম রাইত দোফরে ঘর থিকা বাইর অইয়া দেহে বিয়ান অইয়া গেছে। আসলে মাইট্টা জোচনায় রাইত দোফররে বিয়ান মনে অয়। তোমার নমুনা কইলাম অমুন দেকতাছি। রসের আশায় রাইত দুইফরে কইলাম ঘর থিকা

AMARBOI.COM

বাইর অইয়া যাইয়ো না! ফয়জরের আয়জান অইবো, আমারে ডাক দিবা তারবাদে ঘর থিকা বাইর অইবা। মিয়ার ছাড়াডা কইলাম ভাল না। গলায় টিবিদা (টিপ দিয়ে) মাইরা খাজুর গাছের আগায় উডাইয়া রাখবো। সাবদান।

হামিদার কথা কিছুই কানে যাচ্ছে না দবিরের। অন্ধকার ঘরে তখনও হোগলায় বসে আছে সে। মেয়ের পাশে শুয়ে কথা বলে যাচ্ছে হামিদা আর দবির গাছি শুনছে টুপ টুপ শব্দে চারপাশের গ্রামের প্রতিটি খাজুরগাছ থেকে মাটির হাড়িতে ঝরছে রস। ঝরে ঝরে পূর্ণ করে তুলছে হাড়ি। ভোরবেলার একলা তৃষ্ণার্ত শালিখ পাখি হাড়ির মুখে বসে ঠোঁট ডুবাচ্ছে রসে। তৃষ্ণা নিবারণ করছে।

ছনুবুড়ির ঘুম ভাঙল রাত দুপুরে।

চাঁদ তখন ম্লান হতে শুরু করেছে। গ্রামের গাছপালা চকমাঠ খাল পুকুর আর মানুষের বসতভিটায় অলস ভঙ্গিতে পড়েছে দুধের সরের মতো কুয়াশা। জ্যোৎস্নার রঙ হয়েছে টাটকিনি মাছের মতো, কুয়াশার রঙ যেন বহুদিন থানবন্দি থাকা কাফনের কাপড়। রাত দুপুরের নির্জন প্রকৃতি, মেদিনীমণ্ডল গ্রামখানি ধরেছে অলৌকিক এক রূপ। শীত রাত্রির বুকপিঠ ছুঁয়ে হু হু, হু হু করে বইছে উত্তরের হাওয়া। উত্তরের কোন অচিনলোকে জন্ম এই হাওয়ার, মানুষের কল্যাণে কে পাঠায় হাওয়াখানি মানুষ তা জানে না।

রাত দুপুরের এই হাওয়ায় ছনুবুড়ির গা কাঁটা দিল না, প্রবল শীতে শরীরের অজান্তে কুঁকড়ে এল না শরীর। বুকটা কেমন আইঢাই করে উঠল, তৃষ্ণায় ফেটে যেতে চাইল গলা।

এরকম শীতের রাতে কার পায় এমন তৃষ্ণা! ঘুম ভাঙার পর কার বুক করে এমন আইঢাই!

ছনুবুড়ি বুঝতে পারল না এমন লাগছে কেন তার। ছানিপড়া ঘোলা চোখে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক তাকাতে লাগল।

ঘরের ভিতর গাঢ় হতে পারেনি অন্ধকার। চারদিকে আছে বাঁশের বেড়া। ঘর তোলার পর ছইয়াল (বাঁশের কাজ করে যারা) ডেকে কখনও সারাই করা হয়নি। বৃষ্টি বাদলায় খেয়েছে যা, গোপনে সময় নামের খাদক খেয়েছে তারচেয়ে বেশি। ফলে বেড়াগুলি এত জীর্ণ, এত নড়বড়া, না রোদ জ্যোৎস্না আটকাতে পারে, না বৃষ্টি বাতাস।

আজ রাতে জ্যোৎস্না ঢুকেছে চারদিক দিয়ে আর হাওয়া ঢুকছে শুধু উত্তর দিক দিয়ে। ছনুবুড়ি শুয়েছে উত্তরের বেড়া বরাবর মুখ করে। হাওয়ার ঝাপটা সরাসরি এসে লাগছে তার মুখে।

ছনুবুড়ির পিঠের তলায়, মাটিতে পাতলা করে বিছানো আছে ডাটি। (ধানের ছড়া কেটে নেওয়ার পর দুটো অংশ হয় খড়ের। আকাশ বরাবর দাঁড়িয়ে থাকে যে অংশ তাকে বলে ডাটি। ডগা অর্থে। আর কাদা মাটিতে লেপটে থাকে যে অংশ তা হচ্ছে নাড়া। নাড়া ব্যবহার করা হয় রান্নার কাজে। ডাটি দিয়ে গরিব গৃহস্তরা ঘর গোহালের বেড়া তৈরি করে। শীতকালে পিঠের তলায় বিছিয়ে শোয়) তার উপর পুরানা ছেঁড়া একখানা হোগলা। হোগলার উপর মোটা ভারী, বেশ বড় একটা কাঁথা। কত জায়গায় যে ছিঁড়ে ঝুল বেরিয়েছে কাঁথার, ইয়ত্তা নাই। এই কাঁথাখানা দুইভাগে ভাঁজ করে শোয়ার সময় ভিতরে ঢুকে যায় ছনুবুড়ি। এক কাজে দুইকাজ হয়। যে কাঁথা গায়ে সেই কাঁথাই বিছানায়। তাতেই কী শীত মানে (নিবারণ)? মানে না। ডাটি হোগলা কাঁথা এই তিন শত্রু কাবু করে পাতাল থেকে ঠেলে ওঠে অদ্ভুত এক হিমভাব। উঠে সুঁচ ফুটাবার মতো ফুটা করে রোমকূপ। শরীরের ভিতর দখল নেয়। এদিকে শূন্যে আছে উত্তরের হাওয়া, কুয়াশা শিশির। সব মিলিয়ে শীতকালটা বড় কষ্টের। যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয়। বয়সের ভারে নত হওয়া মানুষ কত পারে যুদ্ধ করতে! ফলে মৃত্যুটা তাদের শীতকালেই হয় বেশি। শীতের মুখে মুখে গ্রামাঞ্চলের বুড়ারা তাই প্রমাদ গোনে। এই শীতটা পার করতে পারলে আর একটা বছর বেঁচে থাকা যাবে। বুড়াদের জন্য শীত যেন এক মৃত্যুদূত। আজরাইল ফেরেশতা। ঘাড়ের ওপর এসে দাঁড়িয়েই থাকে। এদিক ওদিক হলেই জান কবচ করবে, উদিস পাওয়া যাবে না।

ছনুবুড়ির হচ্ছে উল্টা। না মাটির হিমভাব না উত্তরের হাওয়া, আজকের এই রাত দুপুরে কোনওটাই গায়ে লাগল না তার। বুকের ভিতর অচেনা অনুভূতি তো আছেই, কলিজা আর কণ্ঠনালী ফেটে যাচ্ছে প্রবল তৃষ্ণায়। তার ওপর হচ্ছে ভয়াবহ এক উষ্ণভাব। যেন পাতাল থেকে উঠে তার দীর্ঘকাল অতিক্রম করে আসা দেহে রোমকূপ ফুটা করে ঢুকছে অচেনা এক তুষের আগুন। উত্তরের হাওয়ায় একটুও নাই শীতভাব। খরালিকালের কোনও কোনও দুপুরে দূর প্রান্তর অতিক্রম করে আসে এক ধরনের উষ্ণ হাওয়া, সেই হাওয়ায় গায়ের কাপড় ফেলে দিতে ইচ্ছা করে মানুষের, লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে পুকুরের পানিতে, উত্তরের হাওয়াটা এখন তেমন লাগছে ছনুবুড়ির। মাটির গর্তে বদনার নল দিয়ে গরম পানি ঢেলে দেওয়ার পর যেমন ছটফট করে বেরিয়ে আসে তুরখোলা ঠিক তেমন করে কাঁথা থেকে বের হল সে। কাঁথার সঙ্গে শরীর থেকে যে খসে গেছে চামড়ার মতো লেগে থাকা মাটি রঙের থান, ছনুবুড়ি তা টের পেল না। শরীরে এমন এক উষ্ণভাব, ছনুবুড়ির ইচ্ছা করে শীতনিদ্রা থেকে বেরিয়ে আসার পর সাপ যেমন করে তার ছুলুম (খোলস) বদলায় তেমন করে শরীর থেকে খুলে ফেলে বহু বর্ষা বসন্তের সাক্ষী ঝুলঝুলা চামড়া। শরীর শীতল করে। আর একটা আশ্চর্য কাণ্ড আজকের এই রাত দুপুরে নিজের অজান্তেই করে ফেলে ছনুবুড়ি। শিরদাঁড়া সোজা করে যৌবনবতী কন্যার মতো মাথা তুলে দাঁড়ায়। কতকাল আগে দেহ তার বেঁকে গিয়েছিল মাটির দিকে, সেই দেহ আর সোজা হয়নি। দেহ হয়েছিল নরমকঞ্চির ছিপ। সেই ছিপের অদৃশ্য বড়শিতে গাঁথা পড়েছিল মাটির তলায় লুকিয়ে থাকা বিরাট এক মাছ। বহুকাল ধরে সেই মাছ ছনুবুড়িকে টেনে রেখেছিল মাটির দিকে। সোজা হতে দেয়নি। আজ বুঝি মাছ গেছে

AMARBOI.COM

আনমনা হয়ে গেছে। সেই ফাঁকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে ছনুবুড়ি। দাঁড়াবার পর বহুকালের চেনা এই ঘর হঠাৎ করেই অচেনা লাগে তার চোখে। ছানিপড়া চোখে পরিষ্কার দেখা যায় না সবকিছু। ছনুবুড়ির চারপাশে ছড়ানো আছে গিরস্থের কত না দীনহীন স্থাবর, দরকারে অদরকারে এই ঘরে এসে জড় হয়েছে কত না হাঁড়িকুড়ি, কত ঘটিবাটি। একপাশে লোটে মুখ ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছনুবুড়ির বয়সের কাছাকাছি বয়সের ঢেঁকি। ঢেঁকির পায়ের কাছে দুইজন মানুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পাড় দিতে পারে এমন একটা ভিত। ভিতের ঠিক উপরে বাতার সঙ্গে ঝুলছে মোটা দড়ির আংটা। ধানবানার সময় এই আংটা ধ(া দাঁড়ায় বাড়ির বউঝিরা। তালে তালে ধান বানে, মনের সুখে গান গায় 'ও ধান বানি ঢেঁকিতে পাহার দিয়া, ঢেঁকি নাচে আমি নাচি হেলিয়া দুলিয়া।'

ঢেঁকির দিকে তাকিয়ে ঘরের ভিতরকার এই একটা মাত্র জিনিস পরিষ্কার চিনতে পারল ছনুবুড়ি। আশ্চর্য এক অনুভূতি হল। ছনুবুড়ি টের পেল তার দেহ আর মানুষের দেহ নাই, দেহ তার মরা কাঠের ঢেঁকি হয়ে গেছে। কারা যেন দুইজন অদৃশ্যে থেকে তার দেহঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে। ধুপ ধুপ, ধুপ ধুপ। পাড়ে পাড়ে লোটে মুখ থুবড়ে পড়ছে সে। সেই লোটে ধানের মতো খোলসমুক্ত হচ্ছে ছনুবুড়ির জীবন।

তারপর আবার সেই কলিজাফাটা তৃষ্ণা টের পেল ছনুবুড়ি। মনে হল কোনও পুকুরে নেমে উবু হয়ে, আঁজলা ভরে পানি তুলে জীবন ভর খেলেও এই তৃষ্ণা মিটবে না। পানি খেতে হবে পুকুরে মুখ ডুবিয়ে। এমন চুমুক দিবে পানিতে, এক চুমুকে পুকুর হবে পানিশূন্য তবু তৃষ্ণা মিটবে না ছনুবুড়ির।

ছনুবুড়ি তারপর পাগলের মতো হাঁড়ি মালসা হাতাতে লাগল, ঘটিবাটি হাতাতে লাগল। একটু পানি, একটু পানি কি নাই কোথাও! ভুল করেও কি কেউ একটু পানি রাখে নাই কোনও হাঁড়িতে!

ছনুবুড়ির ইচ্ছা হল গলার সবটুকু জোর একত্র করে চিৎকারে চিৎকারে দুনিয়াদারি কাঁপিয়ে তোলে, পানি দেও, আমারে ইট্টু পানি দেও। আমার বড় তিয়াস লাগছে।

এক সময় একটা হাড়িতে সামান্য একটু পানি ছনুবুড়ি পেল। দুইহাতে সেই হাঁড়ি তুলে মুখে উপুড় করল সে! দিকপাশ ভাবল না।

কিন্তু এ কেমন পানি? এ কোন দুনিয়ার পানি? পানি কি এমন হয়! গলা দিয়ে যে নামতেই চায় না! এ কেমন পানি!

ঠিক তখনই মাটির তলায় লুকিয়ে থাকা অদৃশ্য আনমনা মাছ মনস্ক হয়। প্রবল বেগে দিকবিদিক ছুটতে শুরু করে। ফলে আচমকা এমন টান লাগলো ছনুবুড়ির দেহে, বহুকাল মাটিমুখি ঝুঁকে থাকা দেহ তার কঞ্চির ছিপের মতো ভেঙে যায়।

ছনুবুড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে।

আকাশের চাঁদ তখন মাত্র হাঁটতে শিখেছে এমন শিশুর মতো অতিক্রম করেছে কয়েক পা, জ্যোৎস্না হয়েছে আরেকটু ম্লান। কুয়াশা যেন মুর্দারের কাফন। থান খুলে সেই কাফনে কে যেন ঢেকে দিয়েছে দুনিয়া, ছনুবুড়ির পর্ণকুটির। এই কাফন পেরিয়ে বয়ে যাওয়ার সাধ্য নাই হাওয়ার। ফলে হাওয়া হয়েছে স্তব্ধ।

AMARBOI.COM

গাছের পাতায় পাতায়, লতাগুল্ম এবং ঘাসের ডগায় ডগায় তখন ঝরছিল নিশিবেলার অবোধ শিশির। গ্রাম গিরস্থের খাজুরগাছ হাঁড়ি পূর্ণ করছিল বুক নিংড়ানো মধুর রসে।

মিয়াদের ছাড়াবাড়ির কাচির (কাস্তে) মতো বেঁকা খেজুরগাছটার গলার কাছে তাবিচের মতো বাঁধা হাঁড়ির মুখে বসে একটা বুলবুলি পাখি ঠোঁট ডুবাচ্ছে রসে। শীত সকালের সূর্য পুব আকাশ উজ্জ্বল করেছে খানিক আগে। এখন গাছপালার বনে, শস্যের চকমাঠ আর খাল পুকুরে, ঘাসের ডগায় আর মানুষের উঠান পালানে ছড়িয়ে যাচ্ছে রোদ। কুয়াশা উধাও হয়েছে কোন ফাঁকে। প্রকৃতির নিঃশব্দ কান্নার মতো ঝরেছে যে শিশির, সেই শিশির এখনও সিক্ত করে রেখেছে চারদিক। সারারাত আশ্চর্য এক শীতলতা উঠেছে মাটি থেকে, ঘাসবন আর গাছপালা থেকে, খাল পুকুর আর মানুষের ঘরবাড়ি থেকে। পাখির ডানার তলায় লুকিয়ে থাকার মতো রোদের উষ্ণতা এখনও ছড়াতে পারেনি চারদিকে। তবে শিশিরসিক্ত গ্রামখানি রোদে আলোয় ঝকমক ঝকমক করছে। যেন বা এই মাত্র স্বামীর সংসার থেকে পালকি চড়ে বাপের বাড়ি আসছে কোনও গৃহস্থ বউ, পালকি থেকে নেমে বহুকাল পর মা-বাবা ভাই বোনকে দেখে গভীর আনন্দে হাসছে, তার সেই হাসির দ্যুতি মোহময় এক আলো ছড়াচ্ছে চারদিকে।

ভার কাঁধে দবির গাছি বাড়ি থেকে বেরিয়েছে ফজরের আজানের পর। ভারের দুই দিকে দুইটা দুইটা করে চারটা মাটির ঠিলা। এক ঠিলার মুখে এলুমিনিয়ামের বড় একটা মগ। যে যে বাড়িতে গাছ ঝুড়েছে দবির সেই সেই বাড়িতে গিয়ে গাছের গলা থেকে খুলবে হাঁড়ি। হাঁড়ির অর্ধেক রস দিবে গিরস্তকে বাকি অর্ধেক ঢালবে নিজের ঠিলায়। এই ভাবে এক সময় কানায় কানায় ভরবে চারটা ঠিলা, দবির রস বেচতে বের হবে।

আজ প্রথম দিন। বাড়ি থেকে বেরিয়েই দবির গেছে হালদার বাড়িতে। মজনুদের চারটা গাছ ঝুড়েছে, সেই সব গাছের রস নামিয়েছে। রস তেমন পড়ে নাই। কোনও হাঁড়িরই বুক ছাড়িয়ে ওঠেনি। তবু সেই রস নিয়ে মজনুর খালা মরনির কী আগ্রহ। দবির পৌছাবার আগেই ঘুম থেকে উঠে বালতি হাতে খাজুরতলায় এসে দাঁড়িয়েছে। ভাগের রস বুঝে নেওয়ার পর ডাকাডাকি করে তুলেছে মজনুকে। ও মজনু মজনু, ওট বাজান, রস খা। দেখ কেমুন রস পড়ছে! কেমুন মিডা রস!

নিজে তখনও মুখে দেয়নি রস তবু বলছে মিষ্টি রস। শুনে হেসেছে দবির। ঠাট্টার গলায় বলেছে, ও মরনি বুজি, তুমি তো অহনতরি রস মুখে দেও নাই, মুখে না দিয়া কেমতে কইতাছো মিডা রস?

AMARBOI.COM

দবিরের দিকে তাকিয়ে মরনিও হেসেছে। আমগো গাছের রস মিডাই অয় গাছি। আমি জানি।

সব বচ্ছর রস কইলাম এক রকম মিডা অয় না। এহেক বচ্ছর এহেক রকম অয়। এইডা অইলো মাডির খেইল। মাডি যেই বচ্ছর আমোদে থাকে, খাজুরের রস, আউখের রস হেই বচ্ছর খুব মিডা অয়। আর মাডি যদি ব্যাজার থাকে তাইলে রস অয় চুকা (টক)।

একটু থেমে হাতের কাজ করতে করতেই দবির বলেছে, তুমি ইট্টু মুখেদা দেহ না বুজি রস এই বচ্ছর কেমুন মিডা!

মরনি লাজুক হেসে বলল, না। পোলা আছে বাইত্তে, অরে আগে না খাওয়াইয়া গাছের রস আমি মুখে দিতে পারি না।

শুনে এত মুগ্ধ হল দবির, কয়েক পলক মরনির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হাসিমুখে প্রত্যেকটা গাছের গলায় হাঁড়ি ঝুলাল, যত্ন করে ভার তুলল কাঁধে। যাই বুজি, বিয়ালে তো দেহা অইবোঐ।

মরনি বলল, যাওন নাই। তয় আমার বাড়ির রস আপনে ইট্টু মুখে দিলে পারতেন। রসটা কেমুন পড়ল বোজতাম।

ঠিক তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে এল মজনু। চোখে ঘুম লেগে আছে। এক হাতে চোখ ডলছে। মজনুর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে দবির বলল, ঐ যে তোমার বইনপো উটছে। অরে খাওয়াও। আমি একজন মাইনষেরে কথা দিছি, তারে রস না খাওয়াইয়া নিজে মুখে দিমু না।

কারে কথা দিছেন? মাইয়ারে?

না গো বুজি, আছে আরেকজন। বিয়ালে কমুনে তোমারে।

ভার কাঁধে দ্রুত হেঁটে দবির তারপর চকে নেমেছে। এই সময় হাঁটার গতি এত বাড়ে দবির গাছির, যেন হাঁটে না সে, দৌড়ায়। কাঁধে রসের ভার থাকার ফলে পালকির বেহারাদের মতো মুখ দিয়ে তার হুমহাম শব্দ বের হয়। তীব্র শীতের সকালেও গায়ে থাকে না সুতার তেনাটি (জামা অর্থে)। গা ভিজা থাকে জ্যাবজ্যাবা ঘামে। এই বছরের শীতের প্রথম দিন আজ। রসের প্রথম দিন। পরিশ্রমটা আজ বেশিই যাবে দবির গাছির। কয়েক দিন গেলে এই পরিশ্রম আর গায়ে লাগবে না। সয়ে যাবে। শরীরের নাম মহাশয়, যাহা সহাবেন তাহাই সয়।

ভোরবেলার দেশ গ্রাম তখনও জেগে ওঠেনি। চারদিক ডুবে আছে কুয়াশায়। খোলা চকমাঠ, ছাড়াবাড়ির গাছপালার আড়াল আর গিরস্তবাড়ির কোণাকানছিতে (আনাচ কানাচে) লুকিয়ে থাকা অন্ধকার একটু একটু করে সরছে। পায়ের তলার মাটি আড়মোড় ভাঙছে। এই মাটির ওপর দিয়ে ভার কাঁধে ছুটে যায় এক মাটির সন্তান। এইবাড়ি যায় ওইবাড়ি যায়, রসের নেশায় মাতাল হয়ে খাজুরগাছে চড়ে, হাঁড়ি নামায়। দুনিয়ার আর কোনওদিকে খেয়াল থাকে না তার।

মিয়াদের ছাড়াবাড়ির কাছাকাছি আসতেই রোদ উঠে গেল। রোদের আলোয় দূর থেকে বেঁকা গাছটার হাঁড়িতে বুলবুলি পাখিটাকে রসে ঠোঁট ডুবাতে দেখল দবির। দেখে গভীর আনন্দে বুক ভরে গেল। পয়লা দিনই এত রস পড়ছে! গলা তরি ভরছে ঠিল্লা! এই গাছের পা ছুঁয়ে যে দয়া চেয়েছিল দবির গাছ তা হলে সেই দয়া করেছে

AMARBOI.COM

বুক ভরে শ্বাস নিল দবির। গাছটাকে বলল, মা মাগো, আল্লায় তোমারে বাচাইয়া রাখুক মা। রোজ কিয়ামতের আগতরি বাইচ্চা থাকো তুমি।

দ্রুত হেঁটে খাজুরতলায় এল দবির। এসেই আলফুকে দেখতে পেল খাজুরতলায় বসে বিড়ি টানছে। পায়ের কাছে কাত হয়ে পড়ে আছে পিতলের বড় কলসি। দবিরকে দেখে হাসল। এত দেরি করলা ক্যা গাছি?

কাঁধের ভার নামিয়ে দবির বলল, বেবাক কাম সাইরা তার বাদে আইলাম। তুই আইছস কুনসুম?

আর কইয়ো না, বিয়াইন্না রাইত্রে কুত্তিরে দিয়া ডাক পারন শুরু করছে বুজানে। রসের চিন্তায় রাইত্রে মনে অয় ঘুমাইতে পারে নাই।

বুজান অহনতরি ঢাকা যায় নাই?

না। রস না খাইয়া যাইবো নি?

এত রস কাচা খাইবো?

পাগল অইছো! দুনিয়ার কিরপিন মানুষ। নিজে একলা আদা (আধা) গেলাস খাইয়া বেবাক রস কুত্তিরে দিয়া জ্বাল দেওয়াইবো। তোয়াক (গুড় করার আগের অবস্থাটিকে বলা হয়। আসলে তরল গুড়) কইরা রাখবো। পয়লা পয়লা কহেক বতল তোয়াক বানাইবো তার বাদে বানাইবো খালি মিডাই। শীতের দিনে কুত্তির খালি এই কামঐ। আর আমার আইয়া কলস লইয়া বইয়া থাকতে অইবো খাজুরতলায়।

দবির আর কথা বলল না। বেঁকা গাছটার পায়ের কাছে হাত দিয়ে সালাম করল তারপর তড়তড় করে উঠে গেল গাছে। বুলবুলি পাখিটা তখন আর নাই। কোন ফাঁকে উড়ে গেছে।

এই বাড়ির কাজ সারতে সারতে বেলা আরও খানিকটা বাড়ল। প্রথম দিন হিসাবে রস ভালই পড়েছে। আলফুর কলসি প্রায় ভরে গেছে। দবিরের চারখান ঠিলা পুরা ভরেনি। তবু মন প্রফুল্ল তার। মনে মনে গাছগুলিকে শুকরিয়া জানিয়ে ভার কাঁধে তুলল।

আলফু বেশ কায়দা করে নিজের কলসিটা কাঁধে নিয়েছে। বাড়িমুখি হাঁটতে হাঁটতে বলল, কই যাইবা গাছি?

দবির বলল, যামু এক জাগায়। পয়লা দিনের রস একজন মানুষরে খাওয়ান লাগবো।

বড় ঘরের সামনে, মাটিতে হাত পা ছড়িয়ে বসে বিলাপ করছে বানেছা। এভাবে ছড়িয়ে বসার ফলে তার সাত সোয়াসাত মাসের পেট ডিমআলা বোয়াল মাছের পেটের মতো বেঢপ হয়ে আছে। থেকে থেকে বুক চাপড়াচ্ছে সে, মাটি চাপড়াচ্ছে। প্রায়ই তার

ANARBOI.COM

বুক থেকে, পেট থেকে সরে যাচ্ছে শাড়ি। ইচ্ছা করেই যেন তা খেয়াল করছে না সে। বিলাপ করে কাঁদছে ঠিকই তবে চোখে একফোটা পানি নাই।

অদূরে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে আজিজ, চোখে নিঃশব্দ কান্না। তার হাতের কাছে রাখা আছে তামা পিতলের ভার। ভার কাঁধে সকালবেলা ঘর থেকে বেরিয়েছিল, রোজকার মতো গাওয়ালে যাবে, যাওয়া হয়নি। তার আগেই হামেদ দৌড়ে এসে বলল, বাবা ও বাবা, দাদী দিহি ল্যাংটা অইয়া পইড়া রইছে।

শুনে চমকে উঠেছে আজিজ। কোনহানে?

ঐ ঘরে, মুখের সামনে কাইত অইয়া রইছে মাইট্টা তেলের হাড়ি।

কচ কী?

হ।

ল তো দেহি।

উঠানের কোণে ভার নামিয়ে ঢেঁকিঘরে গিয়ে ঢুকেছে আজিজ। ঢুকে দেখে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে ছনুবুড়ি। গায়ে কাপড় নাই। একপাশে পড়ে আছে তার বিছানা আর ছেঁড়াকাঁথা। ছনুবুড়ির মুখের কাছে কাত হয়ে পড়ে আছে মাইট্টাতেলের হাঁড়িটা। একফোটা তেলও নাই হাঁড়িতে। বড় ঘরের পশ্চিম উত্তর কোণার খাম ঘুণে ধরছে। একদিন গাওয়ালে না গিয়া খামে মাইট্টাতেল লাগাবে আজিজ এই ভেবে কোলাপাড়া বাজার থেকে দুই তিনদিন আগে তেলটা কিনে এনেছিল। সেই তেল ফেলে দিয়েছে ছনুবুড়ি ভেবে প্রথমে খুব রেগে গেল আজিজ। রেগে গেলে দাঁতে কটমট শব্দ হয় তার। সেই শব্দ করে চাপা গলায় বলল, ওমা, কেমন ঘুমান ঘুমাও? শইল্লে কাপোড় থাকে না, পোলাপানে আইয়া ল্যাংটা দেহে, শরম করে না তোমার! তেলের হাড়িডা হালায় দিছো! পাশ্‌সিকার (পাঁচসিকা) মাইট্টাতেল কিন্না আনলাম পশশু, বেবাকটি হালায় দিলা! কেমুন ঘুমান ঘুমাও!

ছনুবুড়ি কথা বলে না। নড়ে না।

আজিজের এতকথা শুনেও কথা বলছে না ছনুবুড়ি এরচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা হতে পারে না। আজিজ খুবই অবাক হল। এই প্রথম মনের ভিতর কামড়টা দিল তার। হাঁটু ভেঙে ছনুবুড়ির সামনে বসল। মায়ের খোলা পিঠে হাত ছোঁয়াল। ছুঁইয়ে চমকে উঠল। যেন শীতকালের কচুরিভরা পুকুরের পানিতে হাত দিয়েছে।

ছনুবুড়ির ঘরের সামনে ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে বানেছা। কোলে লেপটে আছে ছোট বাচ্চাটা। দুইহাত দিয়ে ধরে মায়ের বাদিককার বুক চুষছে। অন্য ছেলেমেয়েগুলি আছে তার দুইপাশে।

ছনুবুড়িকে ছুঁয়ে দিয়েই ফ্যাল ফ্যাল করে বানেছার মুখের দিকে তাকাল আজিজ। বানেছা খসখসা গলায় বলল, কী অইছে?

শইলডা মাছের লাহান ঠাণ্ডা!

শীত পড়ছে, হুইয়া রইছে ল্যাংটা অইয়া, শইল তো ঠাণ্ডা অইবোই। ডাক দেও।

ছনুবুড়িকে তারপর ধাক্কাতে লাগল আজিজ। মা ওমা, মা। ওড ওড, বেইল উইট্টা গেছে।

AMARBOI.COM

বুড়ির কোনও সাড়া নাই।

এবার গলা একটু চড়াল বানেছা। শইলডা আগে কাপোড় দিয়া ঢাইক্কা দেও। ল্যাংটা মার সামনে বইয়া রইছো শরম করে না তোমার!

শুনে আজিজের বাচ্চাকাচ্চারা হি হি করে হাসতে লাগল। দিশাহারা ভঙ্গিতে কাঁথার তলা থেকে ছুনুবুড়ির কাপড় বের করে তার শরীর ঢেকে দিল আজিজ। বানেছার দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত গলায় বলল, আমার কেমুন জানি ডর করতাছে।

এবার বানেছাও ভুরু কুঁচকাল। মইরা গেছেনি?

হেমুনঐত্তো লাগে।

নাকি ভ্যাক ধরছে!

একথায় মেউন্না আজিজও একটু রাগল। ছোটখাট একটা ধমক দিল বানেছাকে। কী কও তুমি! ভ্যাক ধরব ক্যা! ভ্যাক ধরনের কী অইছে! শীতের দিনে খালি গায়ে হুইয়া কেঐ ভ্যাক ধরে!

আবার ছনুবুড়িকে ধাক্কাতে লাগল আজিজ। মা ওমা, মা।

স্বামীর কাণ্ড দেখে খুবই বিরক্ত হল বানেছা। আগের চেয়েও গলা চড়াল। এমুন শুরু করলা ক্যা তুমি! টাইন্না উডাও না ক্যা!

এবার দুইহাতে ছনুবুড়িকে টেনে তুলতে গেল আজিজ। তুলতে গিয়ে ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ল। ছেলেবেলায় আজিজের স্বভাব ছিল উপুড় হয়ে শোয়া। সকালবেলা উপুড় হয়ে শোয়া ছেলের দুই হাতের তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মা তাকে চিৎ করত। আদরের গলায় বলত, ওট বাজান, ওট। বেইল উইট্টা গেছে। আর কত ঘুমাবি! আজ সেই কাজটা করছে আজিজ। আজ যেন সে মা আর মা হয়ে গেছে ছেলেবেলার আজিজ।

AMARBOI.COM

ছনুবুড়ির মুখখানা নিজের দিকে ঘুরিয়েই আঁতকে উঠল আজিজ। মুখ মাখামাখি হয়ে আছে মাইট্টাতেলে। মুখের ভিতর মাইট্টাতেল, কষ বেয়ে নেমেছে মাইট্টাতেল।

দৃশ্যটা বানেছাও দেখল। দেখে চোখ সরু করে বলল, মাইট্টাতেল খাইছেনি? পানি মনে কইরা মাইট্টাতেল খাইছে? হায় হায় করছে কী? মাইট্টাতেল খাইলে তো মানুষ বাঁচে না!

মাইট্টাতেলে মাখামাখি মুখখানা বিকৃত হয়ে আছে ছনুবুড়ির। ছানি পড়া ঘোলা চোখ কোটর থেকে ঠিকরে বের হতে গিয়েও বের হতে পারেনি, তার আগেই থেমে গেছে। এই চোখের দিকে তাকিয়ে যা বোঝার বুঝে গেল আজিজ। প্রথম চিৎকারটা তারপর আজিজই দিল। হায় হায় আমার মায় তো নাই, আমার মায় তো মইরা গেছে!

স্বামীর চিৎকার শুনে খানিক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বানেছা। তারপর নিজেও বিলাপ শুরু করল। এইডা কেমতে অইলো গো, আল্লাগো আমার! কোন ফাকে গেল গো, আল্লা গো আমার।

বাড়িতে এই ধরনের কাণ্ড প্রথম। বাড়ির শিশুরা কোনও মৃত্যু দেখেনি। মা বাবার মিলিত বিলাপ শুনে তারা বেশ মজা পেল। হি হি হি হি করে হাসতে লাগল। বানেছার কোলের বাচ্চাটা দুধ খাওয়া ভুলে ড্যাব ড্যাব করে তাকাতে লাগল। হামেদ ভাবল দাদীর

কায়কারবার দেখে তার মা বাবা কি একলগে কোনও গান ধরল! দাদীর মতো গভীর ঘুমে ডুবে থাকা মানুষকে কি গান গেয়ে জাগাতে হয়? কয়দিন আগে গোঁসাই বাড়িতে হয়ে যাওয়া বেহুলা লখিন্দর পালায় ঘুমিয়ে থাকা লখিন্দরকে কাঁদতে কাঁদতে গান গেয়ে যেমন করে জাগাতে চেয়েছিল বেহুলা, ব্যাপারটা কি তেমন কিছু! এসব ভেবে মা বাবার সঙ্গে সেও প্রায় গলা মিলাতে গিয়েছিল, বড়বোন পরি চোখ গোরাইয়া (পাকিয়ে) তার দিকে তাকাল। হামেদের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, দাদী মইরা গেছে এর লেইগা মায় আর বাবার এমুন করতাছে। এইডা গান না, কান্দন।

হামেদ নাকমুখ কুঁচকে বলল, দাদী মইরা গেছে, মার কী? মায় কান্দে ক্যা? মায় তো দাদীরে দুই চোক্কে দেখতে পারে না। হেদিন বউয়া খাইতে চাইছিল, দেয় নাই। দাদী মরছে মার তো তাইলে আমদ। মায় কান্দে ক্যা?

আজিজের বড়ছেলের নাম নাদের। সে বলল, মায় কান্দে আল্লাদে। দেহচ না চোক্কে পানি নাই। মাইনষেরে দেহানের লেইগা কান্দে।

শুনে বিলাপ ভুলে দুই ছেলেকে একলগে ধমক দিল বানেছা। চুপ কর। প্যাচাইল পাড়লে কিলাইয়া সিদা কইরা হালামু। মাইনষেরে দেহানের লেইগা কান্দি ক্যামি, না?

তারপর পরির দিকে তাকিয়েছে বানেছা। আইজ রান্দন বাড়ন যাইবো না। জের থিকা মুড়ি মিডাই বাইর কইরা বেবাক ভাই বইনে মিল্লা খা গা। যা।

শুনে আনন্দে নেচে উঠেছে শিশুরা। যে যেমন করে পারে পরির পিছন পিছন গেছে বড়ঘরে। ওদিকে ছেলেমেয়েদের লগে কথা শেষ করে আবার বিলাপ শুরু করেছে বানেছা। মাকে জড়িয়ে ধরে আজিজের বিলাপ তো ছিলই, শীত সকালের এই বিলাপ দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছিল চারদিকে। শুনে চারপাশের বাড়িঘর থেকে গিরস্থালি ফেলে একজন দুইজন করে মানুষ আসতে লাগল এই বাড়িতে। মিয়াবাড়ি মেন্দাবাড়ি হালদারবাড়ি হাজামবাড়ি জাহিদ খাঁর বাড়ি বেপারীবাড়ি, আস্তে ধীরে প্রতিটি বাড়ির লোক এল। আজিজের বাড়ির উঠান ভরে গল।

মেন্দাবাড়ির মোতালেবের স্বভাব হচ্ছে গ্রামের যে কোনও বাড়ির যে কোনও কাজে মাতাব্বরিটা সে তার হাতে রাখতে চায়। আজও তাই চাইল। প্রথমেই মুর্দার যে ঘরে আছে সেই ঘরে ঢুকে গেল। বিলাপ করতে থাকা আজিজকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বাইরে নিয়ে এল। কাইন্দো না কাইন্দো না! মা বাপ কেঐর চিরদিন বাইচ্চা থাকে না। আল্লার মাল আল্লায় নিছে। কাইন্দা কী আর তারে ফিরাইয়া আনতে পারবা?

উঠানে এনে তামা পিতলের ভারের সামনে আজিজকে বসিয়ে দিয়েছে মোতালেব। আবার বলেছে, কাইন্দো না কাইন্দো না। আল্লার মাল আল্লায় নিছে। অহন টেকা পয়সা দেও কোলাপাড়া বাজারে যাইগা। কাফোনের কাপোড় লইয়াহি।

রাবির জামাই মতলেবের দিকে তাকাল মোতালেব। ঐ মতলা, তুই চদরি বাড়ি যা। বাশ কাইট্টা আন।

ভিড়ের মধ্যে বাদলাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাবি। মানুষজন দেখে বাদলা গেছে আল্লাইদ্দা (আহ্লাদি) হয়ে। মায়ের কোলে চড়ে বসেছে। যেদিকের কোলে চড়েছে সেদিকটা রাবির বেঁকে গেছে। ব্যাপারটা বিন্দুমাত্র পাত্তা দিচ্ছে না রাবি। মোতালেবের

দিকে তাকিয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, হেয় যাইতে পারবো না, হের কাম আছে।

মোতালেব একটু থতমত খেল। তারপর নিজেকে সামাল দিয়ে বলল, মানুষ মইরা গেছে হেরে মাডি দেওনডাই অহন বড়কাম। মতলা, তুই যা তো! বাশ কাইট্টা দিয়া তার বাদে কামে যাইচ।

এসময় হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে এল তছি পাগলনী। মামানী বলে মইরা গেছে? কেমতে মরল, এ্যা? কেমতে মরল! হায় হায় সব্বনাশ অইছে তো!

কুট্টি বলল, মাইট্টাতেল খাইয়া মরছে।

দৌড়ে ছনুবুড়ির ঘরে ঢুকল তছি। হাউমাউ করে খানিক কাঁদল তারপর বড়ঘরের সামনে বসা বানেছার সামনে এসে দাঁড়াল। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলল, মাইট্টা তেল তো ইচ্ছা কইরা খায় নাই, পানির পিয়াস লাগছিল, পানি মনে কইরা মাইট্টাতেল খাইছে। মরনের সময় বহুত পিয়াস লাগে মাইনষের। আহা রে মরনের সময় ইট্টু পানিও মুখে দিতে পারলো না!

তছির কথা শেষ হওয়ার লগে লগে দুইহাতে বুক চাপড়ে বিলাপ করে উঠল বানেছা। ইট্টু পানিও মুখেদা মরতে পারলো না গো, আল্লা গো আমার।

বানেছার বিলাপ শুনে কান্না ভুলে তছি একেবারে তেড়ে উঠল। অহন এত বিলাপ করচ ক্যা মাগী, বাইচ্চা থাকতে তো একওক্ত খাওন দেচ নাই। দূর দূর কইরা খেদাই দিছচ। তোর অইত্যাচারে চোর অইয়া গেছিলো মামানী। মাইনষের বাড়ি বাড়ি গিয়া ঘোরছে খাওনের লেইগা। অহন আল্লাদ দেহাইয়া কান্দচ তুই, না? চুপ কর, চুপ কর তুই। তোর কান্দন হোনলে শইল জ্বলে।

তছির কথা শুনে বানেছা আর লোকজন যারা এসেছে তারা সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। কুট্টি মুখে আঁচল চেপে হাসতে লাগল। এখনই বানেছা আর তছির চুলাচুলি লেগে যাবে ভেবে এইদিকে একটা ধমক দিল মোতালেব। ঐ তছি চুপ কর। এত প্যাচাইল পারিচ না।

তছির দুইভাই মজিদ আর হাফিজদ্দির দিকে তাকাল মোতালেব। বলল, তরা দুইজন আলফুরে লইয়া গোরস্তানে যা। কবর খোদ। মজনু যাইয়া মান্নান মাওলানারে লইয়াহুক। আলার মারে ক নাওয়াইতে (গোসল)। কাফোন খলফা আমি লইয়াইতাছি। দুইফরের আগেঐ দাফন কইরা হালামুনে। যা, দেরি করিচ না।

আজিজের দিকে তাকাল মোতালেব। দেও আজিজ, টেকা পয়সা দেও। কাপোড় খলফা লইয়াহি।

দুইহাতে চোখ মুছে আজিজ বলল, তুমি কষ্ট করবা ক্যা, আমিঐ যাই।

শুনে মোতালেব একেবারে হা হা করে উঠল। আরে না মিয়া, তুমি যাইবা ক্যা? মা মরছে তোমার আর তুমিই যাইবা তার কাফোনের কাপোড় কিনতে, মাইনষে কইবো কী! আমরা কি মইরা গেছিনি? আমরা কি নাই? দেও টেকা দেও।

কাফনের কাপড় কিনার ব্যাপারে মোতালেবের আগ্রহ দেখে অনেকেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করল, ঠোঁট টিপে হাসল। রবার বাপ অখিলদ্দি তার পাশে দাঁড়ানো ইদ্রিসকে ফিসফিস করে বলল, কাফোনের কাপোড় থিকাও চুরি করনের তাল করতাছে

AMARBOI.COM

মোতালেইব্বা। মানুষ এমুন অয় কেমতে? একটা মানুষ মইরা গেছে আর তার উপরে দিয়া চুরির তাল!

ইদ্রিসও অখিলদ্দির মতোই নিচু গলায় বলল, চোরের সবার কোনওদিন বদলায় না। সুযুগ পাইলে মার নাকের ফুলও চুরি করে চোরে।

মোতালেবের উদ্দেশ্যটা যে আজিজও না বুঝেছে তা না। এজন্যই দোনোমনোটা সে করছে। কিন্তু মোতালেব নাছোরবান্দা। আতুড় (লুলা অর্থে) মেয়েটা কোলে নিয়ে তার বউও যে এসেছে এই বাড়িতে, স্বামীর স্বভাব নিয়ে লোকের কানাকানি সেও যে শুনছে, লজ্জায় মুখখানা যে অনেক আগেই নত করে রেখেছে, সেদিকে একদমই খেয়াল নাই মোতালেবের। একটা মৃত্যুর সুযোগে তার পকেটে যে আসবে কয়েকটা টাকা সেই স্বপ্নেই বিভোর হয়ে আছে সে। বারবারই তাগিদ দিচ্ছে আজিজকে। দেরি কইরো না মিয়া। বেইল অইতাছে। কোলাপাড়া যাইতে আইতে সমায় লাগবো।

শেষ পর্যন্ত না পেরে অসহায়ের মতো মোতালেবের দিকে তাকাল আজিজ। কত লাগবো?

দেড় দুইশো টেকা দেও। কাপোড় খলফা গোলাপ পানি আগরবাত্তি, এমুনঐ লাগবো। বাচলে তো হেই টেকা তোমারে ফিরতঐ দিমু। এত চিন্তা করতাছো ক্যা?

আজিজ কাতর গলায় বলল, এত টেকা লাগবো!

তয় লাগবো না? মুদ্দারের খরচা কী কম?

অখিলদ্দি বিরক্ত হয়ে বলল, দিয়া দেও আজিজ। অরে বিদায় করো।

অখিলদ্দির খোঁচাটা বুঝল মোতালেব, গায়ে মাখল না। এই সব খোঁচা গায়ে মাখলে পকেটে পয়সা আসবে কেমনে!

লজ্জা যা পাওয়ার পেল মোতালেবের বউ। মেয়েকে এককোল থেকে আরেক কোলে এনে কোনওদিকে না তাকিয়ে, কেউ যেন দেখতে না পায় এমন ভঙ্গিতে বাড়ির নামার দিকে চলে গেল। রসের ভার কাঁধে ঠিক তখনই দবির এসে উঠছিল এই বাড়িতে। গাছিকে দেখে মায়ের কোলে বসা মেয়েটা বলল, রস খামু মা।

শুনে স্বামীর ওপরকার রাগ মেয়ের ওপর ঝাড়ল মোতালেবের বউ। তীক্ষ্ণ গলায় ধমক দিল মেয়েকে। চুপ কর চোরের ঝি। রস খাইবো!

কথাটা শুনে হা হা করে উঠল দবির। ধমকায়েন না, ধমকায়েন না। রস দেকলে পোলাপান মানুষ তো খাইতে চাইবঐ।

তারপর মেয়েটার দিকে তাকাল সে। তুমি বাইত্তে যাও মা। আমি তোমগো বাইত্তে আইতাছি। রস খাওয়ামুনে তোমারে। অহনঐ খাওয়াইতাম, ইট্টু অসুবিধা আছে দেইক্কা খাওয়াইতে পারলাম না। তুমি যাও, আমি আইতাছি।

দবির প্রায় দৌড়ে উঠল আজিজদের বাড়িতে। উচ্ছল গলায় বলল, কো ছনুবুজি কো? ও বুজি, এই যে দেহো পয়লা দিনের রস তোমারে খাওয়াইতে লইয়াইছি। তোমারে না খাওয়াইয়া একফোডা রসও আমি বেচুম না। এই রসের লেইগা মিয়াবাড়ির বুজির কাছে তুমি আমারে চোর বানাইছিলা, হেই কথা আমি মনে রাখি নাই।

তারপরই উঠানে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের দিকে চোখ পড়ল দবির গাছির,

AMARBOI.COM

উঠানের মাটিতে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা বানেছা, আজিজের দিকে চোখ পড়ল। দবির হতভম্ব হয়ে গেল। কী অইছে, আ, কী অইছে? বাইত্তে এত মানুষ ক্যা? ছনুবুজি কো?

দবিরের কথা শুনে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল তছি। মামানী তো নাই, মামানী তো মইরা গেছে! তোমার রস হেয় কেমতে খাইবো গাছিদাদা! মইরা যাওনের সময় একফোডা পানিও খাইতে পারে নাই। পানি মনে কইরা খাইছে মাইট্টাতেল।

যে উজ্জ্বল মুখ নিয়ে এই বাড়িতে ঢুকেছিল দবির সেই মুখ ম্লান হয়ে গেল তার। গভীর দুঃখে বুকটা যেন ভেঙে গেল। নিজের অজান্তে কাঁধ থেকে রসের ভার নামাল। বিড়বিড় করে বলল, মইরা গেছে, ছনুবুজি মইরা গেছে! আমারে যে কইছিলো পয়লা দিনের রস যেন তারে খাওয়াই, আমি যে তারে কথা দিছিলাম খাওয়ামু, অহন, অহন আমি কেমতে আমার কথা রাখুম!

দৌড় দিয়া ছনুবুড়ির ঘরে ঢুকল দবির। নিজের কাপড়ে গলা পর্যন্ত ঢাকা ছনুবুড়ি শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। মুখ এখনও মাখামাখি হয়ে আছে মাইট্টাতেলে, চোখ ঠিকরে বের হতে চাইছে কোটর থেকে। মনে করে মুখটা কেউ মোছাইয়া (মুছিয়ে) দেয় নাই, মনে করে চোখ দুইটা কেউ বন্ধ করে দেয় নাই।

ছনুবুড়ির সামনে মাটিতে বসল দবির। মাজায় বান্ধা গামছা খুলে গভীর মমতায় তার মুখখানি মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, বুজি ও বুজি, আর একটা দিন বাইচ্চা থাকতে পারলা না তুমি! আমি যে তোমারে কথা দিছিলাম পয়লা দিনের রস তোমারে না খাওয়াইয়া কেঐরে খাওয়ামু না, তুমি তো আমারে আমার কথা রাখতে দিলা না। এই রস আমি অহনে কারে খাওয়ামু!

কথা বলতে বলতে চোখ ভরে পানি এল দবির গাছির। আস্তে করে হাত বুলিয়ে ছনুবুড়ির খোলা চোখ বন্ধ করে দিল। তারপর যে গামছায় ছনুবুড়ির মুখ মুছিয়েছিল সেই গামছায় চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

উঠানে তখন পুরুষপোলা তেমন নাই। আজিজের কাছ থেকে টাকা নিয়া মোতালেব চলে গেছে কোলাপাড়া বাজারে। মতলেব গেছে বাঁশ কাটতে। আলফু মজিদ আর হাফিজদ্দি গোরস্থানে গেছে কবর খুঁড়তে। মজনু গেছে মান্নান মাওলানাকে খবর দিতে। জানাজা তিনিই পড়াবেন।

উঠানে নেমে আর কোনওদিকে তাকাল না দবির। ভার কাঁধে দুঃখি পায়ে বাড়ির নামার দিকে চলে গেল। সেখানে একটা বউন্না গাছে পা ঝুলিয়ে বসে তখন চিৎকার করে গান গাইছে হামেদ। আবদুল আলিমের গান। 'কাঁচা বাঁশের পালকি করে মাগো আমারে নিয়ো।'

গানের কথা কানে লাগে দবির গাছির। কাঁচা বাঁশের পালকি করেই তো গোরস্থানে নেওয়া হবে ছনুবুজিকে। চদরি বাড়িতে বাঁশ কাটতে গেছে মতলেব। এই এতদূর থেকেও তার বাঁশ কাটার ঠুক ঠুক আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আজকের পর ছনুবুড়ির সঙ্গে আর কারও দেখা হবে না কোনওদিন। কাঁচা বাঁশের পালকি চড়ে এমন এক দেশে চলে যাবে সে, মানুষের সাধ্য নাই সেই দেশ থেকে ফিরত আসার।

AMARBOI.COM

রান্নাচালার পিছন দিককার গয়াগাছ থেকে চিঁ চিঁ স্বরের করুণ একখান ডাক ভেসে এল। দুইবারের বার ডাকটা খেয়াল করল মরনি। চঞ্চল হল। কীয়ে ডাকে এমুন কইরা! সাপে ব্যাঙ ধরলো নি! এই বাড়িতে সাপ একখান আছে, শানকি। সাপের রাজা হল এই শানকি। গয়না (যাত্রীবাহী বড় নৌকা), গস্তিনাও (মালবাহী নৌকা) বাঁধবার কাছির মতন মোটা। পাঁচ ছয়হাত তরি লম্বা হয়। ধূসর বর্ণের দেহে গাঢ় কালো রঙের ডোরা। দেখতে রাজকীয়। এই সাপের মুখ দুইখান। মাথার কাছে আসল মুখখান তো আছেই, লেজের কাছে আছে ছোট্ট আরেকখান মুখ। দুইমুখ একত্র করে যদি কামড় দেয় কাউকে, সে যেই হোক, হাতি নাইলে মানুষ, ভবলীলা সাঙ্গ হতে সময় লাগবে না। তবে এই সাপ সাধারণত কামড়ায় না, গিরস্তের ক্ষতি করে না। যেটুকু করে সেটা ভাল কাজ। দয়া করে যে বাড়িতে বাস গাড়ে (বসবাস করা অর্থে) সেই বাড়ির ত্রিসীমানায় কোনও বিষধর সাপ থাকতে পারে না। যদি থাকে কখনও না কখনও শানকির সামনে তাকে পড়তেই হবে। আর পড়ছে তো মরছে। বিষধর সাপ দেখেই বড় মুখখান হাঁ করবে শানকি। যদি তখন বিড়া বান্ধা (বৃত্তাকারে শরীর প্যাঁচিয়ে রাখা) থাকে, বিড়া খুলে টানটান করবে দেহখান আর বিষধর সাপ আপনা থেকেই নিজের লেজখান এনে ঢুকিয়ে দিবে শানকির হাঁ করা মুখে। শানকি আস্তে আস্তে গিলতে থাকবে। গিলতে গিলতে যখন মাথা তার মুখের কাছে আসবে তখন কট করে বিষধরে মাথাটা কেটে ফেলে দেবে।

শানকির চলাচলও রাজকীয়। ধীর স্থির। দিন দুপুরে বাড়ির উঠান পালানে চলে আসে কখনও, কখনও ঘরের খামের লগে প্যাচ দিয়া থাকে, গাছপালা ঝোপঝাড়ের ছায়ায় বিড়া বেন্ধে থাকে। মানুষজনের সামনে দিয়েই হয়তো মন্থর গতিতে চলতে শুরু করল। বাঁচবে কী মরবে তোয়াক্কা করল না। শানকি সাপ ভুলেও কোনও গিরস্তে কখনও মারবে না। তাতে দোষ (অকল্যাণ) হয়। বিষধর সাপে দংশে বিনাশ করবে চৌদ্দগোষ্ঠী। এসব জানে বলেই বোধহয় শানকির চরিত্র এমন। গৃহপালিত জীবের মতো আয়েশি ভঙ্গিতে বসবাস করে গিরস্ত বাড়িতে। যখন যেভাবে ইচ্ছা চলাচল করে।

কিন্তু শীত পড়ে গেছে এসময় তো গর্তের ওম, ছাই আর তুষ কুড়ার হাঁড়ি থেকে বের হবার কথা না শানকির! শীতকালটা সে অন্ধকার নির্জনে গভীর উষ্ণতায় কাটাবে। বের হয়ে আসবে খরালিকালে। তারপর ছুলুম বদলে নতুন করে শুরু করবে জীবন। তাহলে এসময় কোন সাপে ধরল ব্যাঙ!

মরনি চিন্তিত হল।

AMARBOI.COM

সে বসে আছে পাটাতন ঘরের সামনে যে দুইখান বাড়তি তক্তা দেওয়া সেই তক্তায়। গিরস্তের আয়েশের জন্য পাটাতন ঘরের সামনে এরকম এক দুইখান তক্তা দেওয়া থাকে। সংসারকর্মের ফাঁকে কয়েক দণ্ডের জন্যে এই তক্তায় বসে বাড়ির লোক। পান তামাক খায়। বাড়িতে হঠাৎ করে কোনও অতিথি এলেও এই তক্তাতেই বসে। কিন্তু মরনি আজ বসে আছে তার মনটা ভাল নাই বলে। ঘণ্টাখানিক আগে খবর পেয়েছে ছনুবুড়ি মারা গেছে। কাঁচা রসে মুড়ি ভিজিয়ে মাত্র সকালের নাস্তা তখন শেষ করেছে মজনু, মরনি কিছু মুখেই দেয় নাই, পাশের বাড়ির ইন্নত এসে বলল, চাচী ও চাচী হোনছনি, চুন্নিবুড়ি বলে মইরা গেছে। এমতে মরে নাই, মাইট্টাতেল খাইয়া মরছে।

বলেই খিট খিট করে হাসল। ইন্নতের সেই হাসিতে গা জ্বলে গেল মরনির। একজন মানুষ মইরা গেছে ওইটা লইয়াও ঠাট্টা! আল্লার দুনিয়াতে যে কত পদের মানুষ আছে!

এই কথাটা ইন্নতকে সে বলেনি। বলেছে অন্যকথা। তুই হুনলি কই?

ইন্নত বলল, মরনের খবর এমতেঐ ভাইস্সাহে। এক বাড়ির মানুষ মরলে তাগো চিইক্কঐর বাইক্কঐর হুইন্না বোজে লগের বাড়ির মাইনষে। তাগো কাছ থিকা হোনে আরেক বাড়ির মাইনষে, আবার তাগো কাছ থিকা হোনে আরেক বাড়ির মাইনষে, এমতে দেহা যায় পাচ মিনিটের মইদ্যে পুরা গেরাম হুইন্নালাইছে।

মজনুর দিকে তাকাল ইন্নত। ঐ মউজনা, যাবিনি? ল যাই, চুন্নিবুড়িরে শেষ দেহা দেইক্কাহি।

এবার আর ইন্নতের কথা সহ্য হল না মরনির। বেশ রাগল সে। ঝাঁঝাল গলায় বলল, চুন্নি চুন্নি করতাছস ক্যা? তগো কিছু কোনওদিন চুরি করছে? বাইচ্চা থাকতে যাঐ থাকুক মইরা যাওনের পর মানুষ আর চোর ধাউর থাকে না।

শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ইন্নত। মাথা দুলিয়ে বলল, দামী কথা কইছো চাচী, বহুত দামী কথা কইছো।

শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে মজনু তখন ঘর থেকে বেরিয়েছে। ইন্নত বলল, ল যাই।

তারপর থেকে ঘরের সামনের তক্তপায় বসেই আছে মরনি। একটুও লড়েচড়ে নাই। শুধুই মনে হয়েছে মৃত্যুর কথা। কত মানুষজন ছিল এক সময় চারপাশে, মৃত্যু কোথায় নিয়ে গেছে তাদের! মৃত্যু এমন এক নিয়তি, মানুষের সাধ্য নাই তাকে ঠেকিয়ে রাখে। কত চেষ্টা কত রকমভাবে করে মানুষ, তবু ঠেকাতে পারে না মৃত্যু।

একে একে মরনির তারপর মা বাবার কথা মনে হয়েছে, বোনদের কথা মনে হয়েছে, শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছে এই বাড়ির সেই মানুষটার কথা। একজন আরেকজনকে জড়িয়ে বেঁচেছিল এক সময়, মৃত্যু কেমন করে আলাদা করে দিয়েছে তাদের! ছনুবুড়ির মৃত্যুর কথা শুনে আজ সকালে সেই মানুষটার কথা তারপর থেকে মনে পড়ছে মরনির। কত সুখ দুঃখের স্মৃতি, কত আনন্দ বেদনার স্মৃতি রয়ে গেছে সেই মানুষ ঘিরে। যেন মরনির মন একখান কচি কলাপাতা, সেই কলাপাতায় ইরল চিরল দাগে লেখা ছিল প্রিয়তম সেই মানুষের কত কথা, বহু শীত বসন্তের হাওয়া দূর দূরান্ত থেকে বয়ে এনে সেই কলাপাতার ওপর ফেলে গেছে ধুলার ধূসর আস্তরণ, নিজে কিছুই টের পায়নি

AMARBOI.COM

মরনি, স্মৃতির আড়ালে চাপা পড়ে গেছে সেই মানুষ। আজ অন্য এক মৃত্যু সংবাদ এল, যেন অনেকদিন পরে চারদিক থেকে ঝেঁপে এল বৃষ্টি। বৃষ্টি ধারায় কচি কলাপাতা ধুলামুক্ত হল, জেগে উঠল স্মৃতিলেখা। মরনি মগ্ন হয়েছিল সেই লেখায়। তখনই এক সময় রান্নাচালার পিছন দিককার গয়াগাছের কাছে ওই চিঁ চিঁ শব্দ। মগ্নতা ভেঙে গেল মরনির। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তক্তা থেকে নামল। দ্রুত পায়ে হেঁটে গেল রান্নাচালার পিছনে, গয়াগাছ তলায়।

কই গাছতলায় তো কিছু নাই! সাদা মাটির গাছতলা খা খা করছে।

দিশাহারা ভঙ্গিতে মরনি তারপর গাছটার দিকে তাকিয়েছে, তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। গয়ার ডালে একটা দাঁড়কাক বসে আছে। দুইপায়ে খামছে ধরা একটা কুকরার ছাও (ছানা)। বড়সড় ছাও। দুইচারটা ঠোকর ছাওটাকে দিয়েছে দাঁড়কাক, তবে সুবিধা করতে পারছে না। ছাওটা তার ছোট্ট ডানা, মাথা ও পা দাপড়িয়ে চিঁ চিঁ ডাকে দিশাহারা করে তুলেছে দাঁড়কাকটাকে। কাকটা এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। জোর ঠোকরে ছাওটাকে কাবু করতে যেন সাহস পাচ্ছে না।

কয়েক পলক এই দৃশ্য দেখে বুক তোলপাড় করে উঠল মরনির। নিশ্চয় মা ভাই বোনদের লগে গিরস্তর উঠান পাথালে চড়তে বেরিয়েছিল ছাওটা। গাছের ডালে আততায়ী দাঁড়কাক ছিল ঘাপটি মেরে, সুযোগ বুঝে ছো মেরে তুলে এনেছে। চোখের পলকে চিরকালের তরে আলাদা করে দিয়েছে আপনজনদের থেকে। এও তো এক রকমের মৃত্যু। দাঁড়কাক নিয়েছে আজরাইলের ভূমিকা।

আর কিছু না ভেবে পায়ের কাছ থেকে চাকা (মাটির ঢেলা) তুলে কাকটার দিকে ছুড়ে মেরেছে মরনি। ধুর কাওয়া ধুর, যা যা।

শিকার নিয়ে এমনিতেই বিব্রত ছিল কাক তার ওপর এই আক্রমণ, ভয়ে শিকার ফেলে কা কা রবে আকাশ পাথালে উড়াল দিয়েছে দাঁড়কাক আর মুরগির ছাওটা ধপ করে পড়েছে গাছতলায়। পড়ে উঠে যে দৌড় দিবে সেই ক্ষমতা ছিল না। ঠোকরে ঠোকরে বুকের কাছটায় বেশ একটা গর্ত করে দিয়েছে দাঁড়কাক। দুইহাতে ছাওটাকে তুলে উঠানে নিয়া আসছে মরনি। হলুদ বাটার সঙ্গে চুন মিশিয়ে অতি যত্নে যখন ছাওটার ক্ষতের ওপর লাগাচ্ছে, খয়েরি চাদর পরা একজন মানুষ এসে দাঁড়াল অদূরে। মানুষটাকে মরনি খেয়াল করল না। ছাওটার যত্ন শেষ করে, পলোতে আটকে উদাস হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল। কেন যে তার তখন মজনুর কথা মনে পড়ল! কেন যে বুকটা হা হা করতে লাগল!

আস্তে করে গলা খাঁকারি দিল লোকটা। চমকে লোকটার মুখের দিকে তাকাল মরনি। কেডা, কেডা আপনে?

লোকটা কাঁচুমাচু গলায় বলল, এইডা নুরু হালদারের বাড়ি না?

মানুষটার যে নাম ছিল নুরু হালদার সেকথা যেন মনেই ছিল না মরনির। আজ অচেনা একজন মানুষের কথায় মনে পড়ল। বুকটা আবার তোলপাড় করে উঠল। বলল, হ। আপনে কে?

মরনির মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। আমারে কি তুমি আর অহন

চিনবা! তয় তোমারে আমি দেইক্কাঐ চিনছি। কোনও কোনও মানুষ থাকে চেহারা তাগো সহাজে বদলায় না। তোমার চেহারা অমুন। আঠরো উন্নিশ বচ্ছরেও বদলায় নাই। আগের লাহানঐ আছে।

লোকটাকে তবু চিনতে পারল না মরনি। তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সে বলল, ভাল আছ বইন?

এবার বিব্রত হল মরনি। আছি ভালঐ তয় আপনেরে তো চিনতে পারি না।

দাঁড়িমোচে ভরা ভাঙাচোরা মুখে হাসল সে। কেমতে চিনবা! এতদিন বাদে দেখলা! আমার নাম আদিলউদ্দিন। বাড়ি কামাড়গাও।

হঠাৎ হঠাৎ কত যে আশ্চর্য ঘটনা ঘটে মানুষের জীবনে! সময়ের চাপে কাছের মানুষ যায় পর হয়ে, বহুদূর পথ ঘুরে একদার আপনজন ফিরে আসে আপনজনের কাছে। তবে সময় অতিক্রম করে যত কাছেই আসুক তারা, সেই সময়ের দূরত্বটা অতিক্রম করতে পারে না। আদিলউদ্দিনকে চিনার পরও মরনি তা পারছিল না, আগের মতোই তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে।

আদিলউদ্দিন বলল, অহনও চিনো নাই বইন? আমি তোমার বইনজামাই। মজনুর বাপ।

মজনুর বাপ কথাটা শুনে কেঁপে উঠল মরনি। মনে হল এ কোনও মানুষ না, এ যেন এক আততায়ী দাঁড়কাক। হালদার বাড়ির আঙিনায় এসে ঘাপটি মেরে বসেছে, মা কুকরার মতো মজনুকে নিয়ে যখন ঘর থেকে বের হবে মরনি তখনই সাঁ করে এসে দুই পায়ের ধারাল নখে খামছে ধরবে মজনুকে, আকাশ পাথালে উড়াল দিয়ে মজনুকে নিয়ে চলে যাবে দূর অজানায়।

মুখখানা হাসি হাসি করে আদিলউদ্দিন বলল, তোমার বইনের নাম আছিল অজুফা, মজনুর জন্মের কয়দিন বাদেঐ চইলা গেল। মজনুরে কুলে লইয়া বইয়া রইছিলা তুমি। এই হগল তোমার মনে নাই বইন? ভুইল্লা গেছ?

ঝাঁঝাল গলায় মরনি বলল, বেবাক মনে আছে, কোনও কিছু ভুলি নাই। আপনের মনে না থাকতে পারে, আমার আছে।

পলোয় আটকানো ছাওটার দিকে তাকিয়ে রইল মরনি। এখনও কাত হয়ে পড়ে আছে। চোখ ঢুলু ঢুলু। ঘাড়টা জোর করে সোজা রাখতে চাইছে, পারছে না। প্রায়ই মাটিতে ঠেকে যাচ্ছে ঠোঁট। হলুদ চুন কতটা কাজ করছে কে জানে! বাঁচিয়ে রাখা যাবে তো ছাওটাকে!

মরনির রাগি মুখ দেখে,ঝাঁঝাল গলা শুনে আদিলউদ্দিন একটু দমে গেছে। হাসি হাসি মুখ ম্লান হয়েছে। মরনি সেসব পাত্তা দিল না। অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, আপনের লগেঐ তাইলে মজনুর কাইল দেহা অইছিলো?

হ। তুমি বোজলা কেমতে?

মজনু আমারে কইছে।

কী কইছে?

মজনুরে দেইক্কা কেমুন করছেন আপনে, এই হগল।

AMARBOI.COM

চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়াল আদিলউদ্দিন। উৎসাহি গলায় বলল, আর, আর কী কইলো? আমি যে অর বাপ এইডা তো আমি অরে কই নাই!

না, ওইডা জানে না।

তয়?

তয় আবার কী! আমারে কইলো এমুন এমুন ঘটনা। আপনেগো বাড়ি কামাড়গোও এইডা হুইন্না আমার ইট্টু চিন্তা লাগছিল। তয় বিশ্বাস অয় নাই। আপনে মাইট্টাল অইবেন ক্যা? আপনে তো ভাল গিরস্ত আছিলেন!

আদিলউদ্দিন আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হ আছিলাম। অহনও আছি।

তয় মাইট্টাল অইতে আইছেন ক্যা?

কপালে টাইন্না আনছে।

কেমতে?

পরের ঘরে তিনডা পোলা আমার। মার লাহানঐ অইছে তিনজনে। সাই (মহা) পাজি। বড়ডার বয়স ষোল্ল সতরো। জাগা জমিন খেতখোলা বেবাক বুইজ্জা লইছে। তিন ভাইয়ে মিল্লা চোয় (চষে)। আমারে কামলার লাহান খাডায়। কথা কইলে পোলাপানের মায় ওডে পিছা (ঝাড়ু) লইয়া। তিন পোলায় গরুর লাডি দিয়া বাইড়ায়। মাইর ধইর খাইয়াও রইছিলাম। যামু কই! শেষতরি আর পারলাম না। তিন চাইরদিন আগে এমুন বাইড়ান বাইড়াইলো, এই চাইদ্দরডা গায় আছিলো, এই লুঙ্গিডা ফিন্দন, ঘেডি ধাক্কাইতে ধাক্কাইতে তিন পোলায় বাইর্তখন বাইর কইরা দিল।

কথা বলতে বলতে শেষদিকে গলা ধরে এল আদিলউদ্দিনের। তবে এসব পাত্তা দিল না মরনি। মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, তহন আরেক পোলার কথা মনে অইছে, না? তহন বাইর হইছেন আরেক পোলা বিচড়াইতে (খুঁজতে)!

মরনির কথায় একেবারেই কাতর হয়ে গেল আদিলউদ্দিন। চোখ ছলছল করে উঠল। না না পোলা বিচড়াইতে বাইর অই নাই। এই গেরামে আইছি মাইট্টাল অইতে। শইল্লে খাইট্টা যেই কয়দিন পারুম বাইচ্চা থাকুম। নিজের গেরামে, নিজের বাইত্তে, ঐ সংসারে আর ফিরত যামু না।

কথা বলতে বলতে পানিতে চোখ ভরে গেল মানুষটার। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চাদরের খুঁটে চোখ মুছল সে। মুছতে মুছতে বলল, সত্য কথাডা তোমারে আমি কই বইন। এই গেরামে আহনের আগে তোমগো কথা আমার মনেই অয় নাই। মনে অইছে এহেনে আইয়া। কাইল বিয়ালে। মজনুর লগে কথা আমি ঠিকঐ কইছি, তারে চিনছি, চিন্না বুকটা আমার ভাইঙ্গা গেছে, ইচ্ছা করলে তারে আমি বেবাক কথা কইতে পারতাম, নিজের পরিচয় দিতে পারতাম, দেই নাই। ক্যান দেই নাই জানো? পোলাপানের উপরে মন উইট্টা গেছে আমার। খালি মনে অয় আমার কোনও পোলাপান নাই।

চোখের পানি দরদর করে গাল বেয়ে পড়তে লাগল আদিলউদ্দিনের। কাঁদতে কাঁদতে গায়ের চাদর ফেলে দিল সে। বলল, দেহো বইন দেহো, পোলারা যদি এমতে পিডায়....।

AMARBOI.COM

কথা শেষ করতে পারল না আদিলউদ্দিন, বুক ঠেলে ওঠা কান্না ঠেকাবার জন্য ছটফট করতে লাগল।

লাঠির বাড়িতে তার সারা শরীরে দড়ির মতন দাগ পড়েছে। সেই দাগ দেখে বুকটা হু হু করে উঠল মরনির। এই মানুষটার ওপর সতেরো আঠারো বছর ধরে যে রাগ জমেছিল সেই রাগ উধাও হয়ে গেল। গভীর আবেগে দুইহাতে মানুষটাকে সে জড়িয়ে ধরল। আহেন আপনে, আহেন। বহেন। বইয়া কথা কন।

ধরে ধরে আদিলউদ্দিনকে এনে পাটাতন ঘরের সামনের তক্তায় বসিয়ে দিল মরনি। পোলা অইয়া বাপরে মারে, কেমুন পোলা জন্ম দিছেন?

আদিলউদ্দিন কোনও কথা বলল না। চাদরের খুঁটে চোখ মুছতে লাগল।

মরনি বলল, একই বাপের পোলা একজন অয় ডাকাইত একজন অয় ফেরেস্তা। মজনুরে দেখলে, তার লগে কথা কইলে আপনে এইডা বুজবেন।

আদিলউদ্দিন বলল, এইডা আমি বুজছি বইন।

লগে লগে বুকটা ধ্বক করে উঠল মরনির। তবে কী মজনুর উপর দখল নিতে, সব খোঁজ খবর নিয়ে এই বাড়িতে এসেছে আদিলউদ্দিন! শুনেছে মজনু খলিফা হয়েছে। ভবিষ্যতে ভাল টাকা পয়সা রোজগার করবে। নিজের সংসারে আর ফিরতে পারবে না আদিলউদ্দিন, মজনুই হবে তার একমাত্র ভরসা, এই রকম চিন্তা! মজনুর কাঁধে চড়ে শেষ জীবনটা সে কাটিয়ে দিবে!

এই সব ভেবে ভিতরে ভিতরে খুবই রাগ হল মরনির। খানিক আগের মায়া মমতা হাওয়া হয়ে গেল। আহুজঘর থেকে যে ছেলেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, মরনি যাকে বুকে তুলে নিয়ে এসেছিল, এতগুলি বছর কেটে গেছে যে ছেলের কোনও খোঁজ নেয়নি বাপ, আজ তার অবস্থা ভাল দেখে তার কাঁধে এসে সওয়ার হবে, মরনি বেঁচে থাকতে কিছুতেই তা হতে দেবে না।

এই সব নিয়ে কথা বলবার জন্য তৈরি হল মরনি। লোকটাকে এখনই বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার জন্য তৈরি হল। তার আগেই আদিলউদ্দিন বলল, তুমি আমারে কী বোজতাছো কে জানে, তয় আমি কইলাম মজনুর লেইগা এই বাইত্তে আহি নাই। অর লেইগা আমি কোনওদিন কিছু করি নাই। বাপ অইয়াও বাপের দায়িত্ব পালন করি নাই। পোলায় জানেই না তার বাপ বাইচ্চা আছে না মইরা গেছে। এতকাল পর অমুন পোলার সামনে আইয়া খাড়ন যায় না। পোলাগো কাছ থিকা বহুত অপমান জিন্দেগিতে অইছি, আর অইতে চাই না। আমার একটা পোলা অন্তত থাউক যার কাছ থিকা আমি কোনওদিন অপমান অমু না। দরকার অইলে সারাজীবন তারে বাপের পরিচয় দিমু না, তাও ভাল।

এ কথায় আগের রাগ ক্রোধ ভুলে গেল মরনি। মজনুকে নিয়ে অন্যরকম একটা অহংকার হল। গলায় জোর নিয়ে বলল, বাপেরে পিডান তো দূরের কথা, তারে অপমান কইরা কথা কওনের মতন পোলা মরনি বানায় নাই। বাপ যত ইচ্ছা খারাপ অইবো, পোলা খারাপ বানামু ক্যা!

একটু থেমে মরনি বলল, মজনুর লেইগা যহন আহেন নাই তাইলে এই বাইত্তে আহনের কাম আছিলো কী?

AMARBOI.COM

মরনির মুখের দিকে তাকিয়ে অসহায় গলায় আদিলউদ্দিন বলল, আমি আইছি একখান য়োড়ার লেইগা।

য়োড়ার লেইগা?

হ। য়োড়া ছাড়া মাইট্টাল অওন যাইবো না। য়োড়া কিননের পয়সা আমার কাছে নাই। একখান য়োড়া যদি দেও বইন, বড় উপকার অয়।

য়োড়া আপনেরে দিমুনে। কাম করবেন সড়কে, থাকবেন কই?

কইতে পারি না।

শীতের দিন যেহেনে ওহে তো পইড়াও থাকতে পারবেন না। কেতা (কাঁথা) কাপোড় আছেনি?

না, কিছু নাই।

তয়?

আদিলউদ্দিন কথা বলল না।

মরনি বলল, মজনু বাইত্তে থাকে না। ইচ্ছা করলে আমগো বাইত্তে আপনে থাকতে পারেন। তয় একখান কথা মানন লাগব। আপনে যে মজনুর বাপ এইডা মজনুরে কোনওদিন কইতে পারবেন না।

একথা শুনে মরনির চোখের দিকে তাকিয়ে রইল আদিলউদ্দিন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কমু না, কোনওদিনও মজনুরে কমু না, বাজান রে, আমি তর বাপ।

পলোর ভিতর মুরগির ছাওটা তখন কোনও রকমে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। উঠে এক সময় দাঁড়াবে ঠিকই, বেঁচেও যাবে কিন্তু তার চারপাশে থাকবে পলোর বেড়া। পলো তুলে নেওয়ার পর বেড়া একটু বড় হবে। এই বাড়ির উঠান পালানই হবে তখন আর একটা পলো। সেই পলোর বৃত্ত ভেঙে একমাত্র মৃত্যুই পারবে তাকে মুক্তি দিতে।

AMARBOI.COM

বারবাড়ির সামনে বিশাল একখান নাড়ার পালা। যে লম্বা বাঁশের চারপাশ ঘিরে ছোট ছোট আঁটি বেঁধে পালা দেওয়া হয়েছে সেই বাঁশের মাথায় ঘোর কালো বর্ণের একখান হাড়ি বসান। হাড়ির সামনের দিকে খড়িমাটি দিয়ে আঁকা হয়েছে দুইখান চোখ। ফলে দূর থেকে নাড়ার পালাটাকে দেখায় পেটমোটা কাকতাড়ুয়ার মতো। কাক চিল, ইঁদুর বাদুর না, এই কাকতাড়ুয়াটি যেন মানুষকেই ভয় দেখায়। ম্যাটম্যাটা জ্যোৎস্না রাতে অচেনা পথিক যখন এই বাড়ির সামনে দিয়া যায়, হঠাৎ করে নাড়ার পালার দিকে তাকিয়ে কলিজা কেঁপে ওঠে তাদের। মনে হয় এটা নাড়ার পালা না, এটা তেনাদের একজন। পরহেজগার মানুষের বাড়ি দেখে বাড়ির ভিতর ঢুকতে পারছে না। বারবাড়ির

সামনে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুকি মারছে ভিতর বাড়ির দিকে। যেন পা বাড়ালেই সেই পা বেঁধে ফেলবে মান্নান মাওলানার বাড়ি বন্ধের দোয়া। সেই বন্ধন মুক্ত করবার সাধ্য তেনাদের নাই।

নাড়ার পালার পুব দক্ষিণ কোণে গরুর আথাল (গোয়ালঘর)। লম্বা মতন এক চালাটায় দামড়া দামড়ি (এঁড়ে বকনা) নিয়ে এগারোটা গরু। এই বাড়ির অনেকদিনের বাসিন্দা তারা, বাড়ির খুঁটিনাটি সবই জানে, তবু কোনও কোনও রাতে আথাল থেকে গলা বাড়িয়ে কেউ কেউ নাড়ার পালার দিকে তাকায়। তাকিয়ে লেজ খাড়া করে তারপর হাম্বা রবে গিরস্তকে সাবধান করে। যে রূপেই থাকে গৃহপালিত পশুরা নাকি এক পলক দেখেই তেনাদের চিনতে পারে। চিনতে পারার লগে লগে ভয়ে লেজ খাড়া হয়ে যায় তাদের। হাম্বা রবে দশদিক মুখরিত করে। তেনাদের চিনতে যে গরুরাও ভুল করে মান্নান মাওলানার বাড়ির সামনের নাড়ার পালা তার প্রমাণ।

আজ সকালে এই নাড়ার পালার তলায় উদাস হয়ে বসে আছে আতাহার। পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেরুয়া রঙের চাদর। এমন জবুথুবু হয়ে বসেছে, দেখে মনে হয় শীতে মরে যাচ্ছে, এখানে বসেছে রোদ পোহাবার জন্য। খানিক আগে ঘুম থেকে উঠেই এখানে চলে এসেছে। চোখ দুইটা লাল টকটকা হয়ে আছে, যেন চোখ উঠেছে আতাহারের। বাড়ির গোমস্তা কাশেম টুকটাক কাজ করছে আথালে। ফুর্তিবাজ মানুষ কাশেম। কাজ করবার সময় মাঝারি স্বরে গান গাওয়ার অভ্যাস আছে। এখনও গান গাইছে সে।

আগে জানি না রে দয়াল
তর পিরিতে এ পরান যাবে

কাশেমের গান শুনে চোখ তুলে আথালের দিকে তাকাল আতাহার। খ্যারখ্যারা গলায় ডাকল, ঐ কাইশ্যা।

গান থামিয়ে সাড়া দিল কাশেম। কন।

এমিহি আয়।

কাজ ফেলে একদৌড়ে নাড়ার পালার সামনে এসে দাঁড়াল কাশেম। ছেঁড়া লুঙ্গি হাঁটুর কাছ পর্যন্ত তুলে পরা। লুঙ্গির ওপর মাজায় গিঁট দিয়ে বান্ধা গামছা। ডান বাহুতে কালো কাইতানের (এক ধরনের মোটা সুতা) লগে বান্ধা রূপার বড় একখান মাদলি। এছাড়া শরীরে আর কিছু নাই কাশেমের। খালি গায়ের কাশেম দেখতে অদ্ভুত। গায়ের রঙ বাইল্লা (বেলে) মাছের মতো ফ্যাকাশে। বুকে পিঠে কোথাও একখান পশম নাই। ভাঙা মুখে, নাকের তলায় আছে গলাছিলা কুকরার গর্দানের কাছে ভুল করে গজানো দুইচারটা পশমের মতন দুইচারটা মোচ, থুতনির কাছে আছে মোচের মতন কয়েকখান দাড়ি। দাড়িমোচের রঙ কাশেমের মাথার চুল মোচ ভুরু আর চোখের পাপড়ির মতোই লালচে ধরনের। এই দাড়িমোচ কাজির পাগলা বাজারে গিয়ে প্রায়ই কামিয়ে আসে সে। গায়ে পশম নাই, মুখে দাড়িমোচ নাই দেখে দুষ্টু লোকেরা কাশেমের নাম দিয়েছে 'মাকুন্দা কাশেম'। এই নাম শুনে প্রথম প্রথম খুব ক্ষেপত কাশেম, আজকাল আর ক্ষেপে না। সয়ে গেছে।

আরেকখানা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তার মুখের হাঁ বেশ বড়। হাসলে দুইকান তরি ছড়িয়ে যায় হাসি এবং প্রত্যেক কথায় হাসে কাশেম।

AMARBOI.COM

এই যেমন এখন, নাড়ার পালার তলায় বসা আতাহারের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

লালচোখ তুলে কাশেমের দিকে তাকাল আতাহার। নাক ফুলিয়ে বলল, হাসছ ক্যা?

কাশেম লগে লগে বলল, কো, হাসি না তো!

বলেও হাঁ করা মুখ হাসি হাসি করে রাখল।

আতাহার বলল, মুক বন্দ কর।

প্রথমে একটা ঢোক গিলল কাশেম তারপর মুখ বন্ধ করল। দেখে খুশি হল আতাহার। গম্ভীর গলায় বলল, বাবায় কো?

পুবের ঘরে।

কী করে?

মউলকা (চাপটি। চল, খুদ সারারাত পানিতে ভিজিয়ে রেখে, সকালবেলা বেটে, পানি মিশিয়ে তরল করে মাটির খোলায় রুটির আকারে লেপটে দিতে হয়। ভাজা হলে খেতে বেশ স্বাদ) খায়।

মায় আইজ মউলকা বানাইছেনি? কীয়ের মউলকা?

খুদের।

কচ কী! কনটেকদার সাবে আছে বাইত্তে, বিয়ানে তারে খুদের মউলকা খাওয়ামুনি?

তয় কী খাওয়াইবেন?

হেইডাই চিন্তা করতাছি।

খানিক চুপ করে কী ভাবল আতাহার তারপর বলল, তর কামকাইজ শেষ?

নিজের অজান্তেই হাসল কাশেম। আসল কাম শেষ। রইদ ওডনের আগেই বেবাকটি গাই চকে নিয়া গোছর। হাতখানেক লম্বা খুঁটিতে দড়ি বেঁধে, সেই দড়ির আরেক প্রান্ত গরুর পা, গলায় বেঁধে খুঁটিটা মাঠে পুতে দেওয়া। এই খুটি ওপড়ান বেশ কঠিন। দড়ি যতটা লম্বা সেই অনুযায়ি খুঁটির চারপাশ ঘুরে ঘুরে ঘাস খেতে হয় গরু ছাগলের) দিয়াইছি। অহন আথাল সাফ করতাছি।

শেষ অইছে?

না। তয় পরে করলেও অইবো। আপনের কী কাম কন, কইরা দেই।

কনটেকদার সাবে অহনতরি ঘুমাইতাছে। উইট্টা হাতমুখ ধুইবো, পায়খানায় যাইবো। তুই এক কাম কর, এক বালতি পানি আইন্না রাখ বাংলাঘরের সামনে আর পিতলের বড় বদনাডা। একহান তোয়াইল্লা রাকিছ জানলার লগে, সাবান রাকিছ। মেজবানের লেইগা যা যা করন লাগে আর কি, বুজলি না!

হ বুজছি।

তারপরই যেন আতাহারের চোখ দুইটা দেখতে পেল কাশেম। দেখে আঁতকে উঠল। ও মিয়াবাই চোক্কে কী অইছে আপনের? চক্কু উদাইছেনি (উঠেছে কিনা)?

আতাহার গম্ভীর গলায় বলল, না।

তয় চক্কু দিহি পানিকাউর (পানকৌড়ির) চক্কুর লাহান অইয়া রইছে।

হারা রাইত অরঘুমা (নির্ঘুম) আছিলাম।

AMARBOI.COM

ক্যা?

মদ খাইছি।

কাশেম থতমত খেয়ে বলল, তোবা, তোবা।

লগে লগে খেঁকিয়ে উঠল আতাহার। ঐ বেডা তোবা তোবা করচ ক্যা? আমি যে মদ খাই তুই জানচ না? আইজ থিকা খাইনি? খাই তো ছোডকাল থিকা।

ধমক খেয়ে হাসল কাশেম। বিনীত গলায় বলল, হেইডা তো খানই।

তয়?

খাইলেও এই হগল কথা কইতে অয় না। আপনে একজন আলেমের পোলা।

আতাহার হাসল। আলেমের ঘরেঐ জালেম অয়।

তোবা তোবা, এই হগল কী কইতাছেন মিয়াবাই। হুজুরে হোনলে জব কইরা হালাইবো।

থো ডো, জব কইরা হালাইবো! আমার বাপে আমার থিকাও বড় জালেম। তুই বুজবি না, আমি বুজি। অহন যা, যা যা কইলাম কইরা আয়। তারবাদে আমার মাথাডা ইট্টু বানাই দিবি। বেদনা করতাছে। মদ খাইয়া অরঘুমা আছিলাম তো, এর লেইগা।

আপনে অরঘুমা আছিলেন আর আপনের লগে বইয়া খাইলো কনটেকদার সাবে হেয় দিহি ঘুমাইতাছে?

হেয় আর আমি এক না। আমি ইট্টু বেশি খাই। কেঐ মদ খায় ঘুমানের লেইগা কেঐ খায় জাইগগা থাকনের লেইগা, প্যাচাইল পারনের লেইগা। আমি খাইয়া দাইয়া ইট্টু জাইগগা থাকি, ইট্টু প্যাচাইল পোচাইল পারি।

নিঃশব্দে হাসল আতাহার।

তাকে হাসতে দেখে কাশেমও হাসল। হ এইডা আইজ বোজলাম। এত প্যাচাইল আমার লগে কোনওদিন পারেন নাই আপনে। অহনতরি মনে অয় নিশা কাডে নাই আপনের।

আতাহার কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই হন হন করে হেঁটে মজনু এসে উঠল বাড়িতে। আতাহারের সামনে এসে দাঁড়াল। হুজুর বাইত্তে আছে না?

চোখ ঢুলু ঢুলু করে মজনুর দিকে তাকাল আতাহার। হুজুরডা জানি কেডা?

মজনু থতমত খেল তারপর হেসে ফেলল। ফাইজলামি কইরেন না দাদা। আছেনি কন, বহুত দরকার।

আছে।

কো?

নিজেকে দেখিয়ে আতাহার বলল, এই যে!

মজনু কথা বলবার আগেই কাশেম বলল, কী শুরু করলেন মিয়াবাই! মাইনষে কইবো কী!

কাশেমের দিকে তাকিয়ে মজনু বলল, হুজুর যুদি বাইত্তে থাকে তারে আপনে ইট্টু খবর দেন। কন ছনুবুড়ি মইরা গেছে তার জানাজা পড়তে যাওন লাগবো। আমি তারে নিতে আইছি।

AMARBOI.COM

হঠাৎ করে মৃত্যু সংবাদ আশা করেনি কেউ। কাশেম এবং আতাহার দুজনেই থতমত খেয়ে গেল। আতাহার তাকিয়ে রইল মজনুর মুখের দিকে আর কাশেম দিশাহারা গলায় বলল, কও কী! কুনসুম মরলো?

মজনু কথা বলবার আগেই খরমে চটর পটর শব্দ তুলে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন মান্নান মাওলানা। বিনীতভাবে তাকে সালাম দিল মজনু। আসসালামালাইকুম।

সালামের জবাব দিলেন না তিনি। গম্ভীর গলায় বললেন, কেডা মরছে?

ছনুবুড়ি।

মান্নান মাওলানা ভুরু কুঁচকালেন। ঐ চুন্নি! ভাল অইছে। একটা খারাপ জিনিস গেছে।

এতক্ষণ ধরে বসে থাকা আতাহার উঠে দাঁড়িয়েছে কিন্তু মান্নান মাওলানার মুখের দিকে তাকাচ্ছে না। যেন তাকালেই তার লালচোখ দেখে যা বোঝার বুঝে যাবেন বাবা। কথা বললে মুখের গন্ধে উদিস পেয়ে যাবেন তার নেশার কথা। কায়দা করে মুখ লুকিয়ে বাংলাঘরের দিকে চলে গেল আতাহার। যাওয়ার আগে ইশারা করে গেল কাশেমকে। সেই ইশারা পাত্তা দিল না কাশেম। হঠাৎ করেই বাড়ির নামার দিকে দৌড় দিল। দৌড়াতে দৌড়াতে বলল, ছনুবুজি মইরা গেছে, যাই তারে ইট্টু শেষ দেহা দেইক্কাহি।

কাশেমের দৌড় দেখে রাগে গা জ্বলে গেল আতাহারের। ঘরে মেজবান আছে, এখনই ঘুম ভাঙবে তার। তারপর কত কাজ, এসব এখন কে করবে!

দাঁতে দাঁত চেপে কাশেমকে একটা বকা দিল আতাহার। বাইত আহো বউয়ার পো, শেষ দেহা তোমারে দেহামু নে।

কিন্তু কাশেম আতাহার কারও দিকেই তখন মন নাই মান্নান মাওলানার। মজনুর দিকেও তাকালেন না তিনি। কোন ফাঁকে পানজাবির জেব থেকে ছোট্ট কাঁকুই বের করেছেন। এখন কাঁকুই দিয়ে দাড়ি আঁচড়াচ্ছেন। চোখে বদদৃষ্টি। সেই দৃষ্টি নাড়ার পালার দিকে ফেলে বললেন, কেমতে মরলো?

মজনু বিনীত গলায় ঘটনা বলল। শুনে শিয়ালের মতো খ্যাঁক করে উঠলেন তিনি। কী আত্মহত্যা করছে? মাইট্টাতেল খাইছে?

মজনু বলল, মনে অয় ইচ্ছা কইরা খায় নাই। তিয়াস লাগছিল, পানি মনে কইরা খাইছে।

যেমতেই খাউক, খাইছে তো! এইডা আত্মহত্যাঐ। ঐ বাইত্তে আমি যামু না। একে চোর দুইয়ে আত্মহত্যা, এই রকম মুদ্দারের জানাজা অয় না।

কথাটা বুঝতে পারল না মজনু। অবাক হয়ে মান্নান মাওলানার মুখের দিকে তাকাল। তয়?

তয় আবার কী? জানাজা অইবো না।

জানাজা না অইলে মাডি দিবো কেমতে?

মাডি দিবো না।

কন কী!

AMARBOI.COM

হ।

মুদ্দার লইয়া তইলে কী করবো?

কাথা কাপড়ে প্যাচাইয়া মড়কখোলায় (গৃহপালিত মৃত জীব যে স্থানে ফেলে) হালাইয়া দিবো! গরু বরকি (ছাগল) মরলে যেমতে হালায়! কাউয়া চিলে ঠোকরাইয়া ঠোকরাইয়া খাইবো, হকুনে খাইবো, শিয়াল কুত্তায়ও খাইতে পারে। আর নাইলে গাঙ্গে হালায় দিবো। মাছে খাইবো, কাউট্টা কাছিমে খাইবো। এই মুদ্দার মাডিতে লইবো না। গোড় দিলে হায় হায় রব করবো মাডি। যেই মাওলানা জানাজা পড়বো তার গুণা অইবো। সইত্তর হাজার বচ্ছর জ্বলন লাগবো দোজকের আগুনে। জাইন্না হুইন্না এই কাম আমি করতে পারুম না।

কোনও মুর্দারের যে মাটি হয় না, জানাজা হয় না একথা জীবনে প্রথম শুনল মজনু। আগামাথা কিছুই বুঝল না, আগের মতোই অবাক হয়ে মান্নান মাওলানার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আড়চোখে মজনুকে একবার দেখে দাড়ি আঁচড়ানোর কাঁকুই জেবে রেখে অন্য জেব থেকে জামরুল রঙের তসবি বের করলেন মান্নান মাওলানা, তসবি জপতে জপতে কেরাতের সুরে বললেন, আল্লাপাক বলেছেন, হে আমার পেয়ারে বান্দা, হে মোমিন মোসলমান, তোমরা চুরি করিও না, জেনা করিও না। যুদি করো আমার কোনও মুসল্লি, কোনও পরহেজগার বান্দা তোমার জানাজা পড়াইবে না, জানাজায় শরিক হইবে না। আমার দুইন্নাইতে তোমার জইন্য কোনও কবর নাই। আমার মাডি তোমারে জাগা দিবো না। ক সোবানাল্লা, সোবানাল্লা।

সোবাহানআল্লাহ বলল না মজনু। চিন্তিত গলায় বলল, মোতালেব কাকায় যে তাইলে কাফোন আনতে গেল, মতলা গেল বাঁশ কাঁটতে, আলফু গেল কবর খোদতে। হেরা কি এই হগল জানে না?

না জানে না। নাদান, নাদান। আর মোতালেইব্বা তো দৌড়াইতাছে চুরি চামারি করনের লেইগা। কাফোনের কাপোড় থিকাও চুরি করবো।

একটু থেমে বললেন, আমি যা যা কইলাম তুই গিয়া আইজ্জারে এইডি ক। সাফ কথা অইলো অর মায় চোর আছিলো, চোরের জানাজা অইবো না, কবর অইবো না। লাশ মড়কখোলায় হালাইয়া দিতে ক, নাইলে গাঙ্গে। যা।

মজনু আর কথা বলল না। শুকনা, চিন্তিত মুখে মান্নান মাওলানার বাড়ি থেকে নেমে এল। আনমনা ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে মনে হল যেসব কথা বলেছেন মান্নান মাওলানা এইগুলি ঠিক তো! নাকি কথার মধ্যে আছে অন্যরকমের চালাকি! ছনুবুড়িকে অপছন্দ করে বলে ইচ্ছা করেই কি তার জানাজা পড়াতে চাইছেন না মান্নান মাওলানা! কোনও দিনকার কোনও অপমানের শোধ কি এই ভাবে নিচ্ছেন ছনুবুড়ির ওপর! মুর্দারের ওপর কি শোধ নেওয়া যায়! মান্নান মাওলানা তো তাহলে মানুষ না। সাপ, কালজাইত সাপ। উড়ে এসে গায়ে পড়লে শুকনা পাতাকেও যে ছাড়ে না, ছোবল দেয়।

কিছু না ভেবে মজনু তারপর খান বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। খান বাড়ির মসজিদের হুজুরকে গিয়ে খুলে বলবে সব। মান্নান মাওলানা যা যা বলেছেন ওসব ঠিক কিনা জানতে চাইবে। যদি ঠিক না হয় তাহলে কি তিনি পড়াবেন ছনুবুড়ির জানাজা!

AMARBOI.COM

নূরজাহান মধুর স্বরে ডাকল, মা হামিদা, ও মা হামিদা।

রান্নাচালায় বসে কাজিরভাত (বিক্রমপুর অঞ্চলের গৃহস্থ বাড়ির রান্নাঘরে চুলার পাড়ে মাটির একখানা হাঁড়ি রাখা থাকে। যখনই ভাত রান্না হয় তখনই সদ্য চুলায় বসান ভাতের হাঁড়ি থেকে হাতায় করে একহাতা চালপানি তুলে ওই হাঁড়িটায় রাখা হয়। এই ভাবে দিনে দিনে ভরে ওঠে হাঁড়ি। চালপানি পচে টক টক একটা গন্ধ বে য়। এই চালপানি দিয়ে যে ভাত রান্না করা হয় তাকে বলে কাজিরভাত। চালটাকে বলা হয় কাজিরচাল। এই চাল দিয়ে যাই তৈরি করা হয় তার সঙ্গে কাজি শব্দটা থাকে। যেমন কাজিরজাউ, কাজিরবউয়া, কাজিরপিঠা ইত্যাদি) রাঁধছে হামিদা। মাটির হাঁড়িতে ভাত বসিয়ে, লগে তিন চারটা গোলালু, শিংমাছের মতো রঙের একখান সরা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। এখনও বলক ওঠেনি ভাতে, চোকলা (খোসা) পার করে তাপ পৌছায়নি গোললালুতে। নাড়ার আগুনে মাত্র লাড়াচাড়া পড়েছে হাঁড়ির চাউলপানিতে। সেদিকে একেবারেই মন নাই হামিদার। সে জানে ভাত উতরালে (বলক দিয়ে ফেনা ওঠা) শো শো শব্দ হবে। হাঁড়ির ভিতর থেকে সরা ধাক্কাতে শুরু করবে ফুটন্ত চাউলপানি। হ'মিদা তাই ব্যস্ত হয়ে আছে পাটা পুতা (শিল নোড়া) নিয়ে। তার হাতের কাছে, চুলার মুখে রাখা আছে একপাঁজা নাড়া, চুলার দিকে না তাকিয়েই মাঝে মাঝে চুলার মুখে সেই নাড়া গুঁজে দিচ্ছে সে। পাটার এক পাশে দুই তিনটা ছোট্ট টিনের পট, টিন এলুমিনিয়ামের দুই তিনটা বাটি, মাটির দুইখান খোড়া। ভাত চড়াবার আগে কয়েকটা শুকনা মরিচ মাটির খোলায় টেলে একটা খোড়ায় রেখেছে। অন্য খোড়ায় একটু পানি। এখন একটা পট থেকে একমুঠ কালিজিরা নিয়ে পাটার ওপর রেখে, বড় একখান টালা মরিচ নিয়ে, মাটির খোড়া থেকে আঙুলের ডগায় করে কয়েক ফোটা পানি তুলে কালিজিরা আর মরিচের সঙ্গে মিশিয়ে পুতা দিয়ে বেটে মাত্র ভর্তা বানাতে যাবে, অদূরে বসা নূরজাহান তখনই এই ভাবে ডাকল। শুনে কাজ ভুলে ভুরু কুঁচকে মেয়ের দিকে তাকাল হামিদা। এইডা আবার কেমুন ডাক, আ?

নূরজাহান গম্ভীর মুখ করে বলল, ক্যা তোমার নাম হামিদা না?

হ ভাল নাম হামিদা। ডাক নাম হামি।

তয়?

তয় কী? মাইয়া অইয়া নাম ধইরা ডাকবিনি মারে?

নাম ধইরা ডাকি নাই তো!

তয় কী ধইরা ডাকছস?

তুমি হোন নাই কী ধইরা ডাকছি?

হুনছি হুনছি। মা হামিদা।

মিষ্টি মুখখানা হাসিতে আরও মিষ্টি করে তুলল নূরজাহান। নামের আগে তো মা কইছি!

মেয়ের এরকম হাসিমুখ দেখে আশ্চর্য এক অনুভূতি হল হামিদার। চোখ নরম করে নূরজাহানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দুইহাতে পুতা ধরে কালিজিরা পিষতে লাগল। কালিজিরা আর টালা মরিচের ধকধকে গন্ধ উঠে ছড়িয়ে গেল চারদিকে। সেই গন্ধে আকুল হল নূরজাহান। মধুর গলায় আবার ডাকল, মা হামিদা।

এবার আর মেয়ের মুখের দিকে তাকাল না হামিদা। কালিজিরা ভর্তা বানাতে বানাতে বলল, আথকা (হঠাৎ) এমুন আল্লাদ অইলো ক্যা! কী চাচ?

কিচ্ছু না।

তয়?

তোমারে এমতে ডাকতে বহুত ভাল লাগতাছে।

তুই একখান পাগল। এত ডাঙ্গর অইছস অহনতরি পোলাপাইন্নামি (ছেলেমানুষি, মেয়েমানুষি) গেল না। কবে যে যাইবো!

কোনওদিনও যাইবো না। আমি হারাজীবন এমুন থাকুম।

হারাজীবন এমুন থাকন যায় না মা।

ক্যা যায় না?

অহন বুজবি না। বিয়াশাদি অইলে বুজবি।

না আমি অহনঐ বুজতে চাই। তুমি আমারে বুজাও।

এবার একটু বিরক্ত হল হামিদা। জ্বালাইতাছস ক্যা? দেহচ না কত কাম আমার!

শিশুর মতো অবুঝ গলায় নূরজাহান বলল, কী কাম?

হামিদার ইচ্ছা হল ধমক দেয় মেয়েকে। ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়, না হলে উঠিয়ে দেয় এখান থেকে। তারপরই ভাবল সেটা ঠিক হবে না। ধমক খেলে রেগে যাবে নূরজাহান পাড়া বেড়াতে বের হবে। দুপুরের আগে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না তাকে। সারাটা বিয়ান না খেয়ে থাকবে। রসের প্রথম দিনে কেন অযথা কষ্ট দিবে মেয়েটাকে! তাছাড়া এত আদরের গলায় যখন ডাকছে, টুকটাক কথা বলে সময়টা ভালই কাটান যাবে। কাজের কাজও হবে মেয়েকেও আটকে রাখা যাবে বাড়িতে।

চোখ তুলে একবার নূরজাহানের দিকে তাকাল হামিদা। তারপর কালিজিরা বাটতে বাটতে বলল, শীতের পয়লা দিন আইজ। তর বাপে গেছে রস বেচতে। বিয়াইন্না রাইত্রে উইট্টা গেছে। ফিরা আইতে আইতে বেইল উইট্টা যাইবো। বাঘের লাহান খিদা লাগবো আইজ। হের লেইগা কাজিরভাত রানতাছি।

বাবায় কাজিরভাত রানতে কইয়া গেছে?

না কয় নাই। আমি নিজে থিকাঐ রানতাছি।

ক্যা?

AMARBOI.COM

তর বাপে কাজিরভাত পছন্দ করে। নানান পদের ভর্তা দিয়া কাজিরভাত খাইতে পারলে মনডা ভাল থাকে তার। আইজ পয়লা দিন তো, বহুত খাটনি যাইবো কামে। বাইত্তে আইয়া কাজিরভাত দেকলে খুশি অইবো। খাটনির কথা ভুইল্লা যাইবো।

কয় পদের ভর্তা বানাইবা?

তিন চাইর পদের।

কী কী?

চুলার হাড়িতে তখন বলক এসেছে। উতড়াতে শুরু করেছে ভাত। শো শো শব্দে নাচছে সরা। কালিজিরা ভর্তাটাও ততক্ষণে তৈরি হয়ে গেছে। হাত দিয়ে কেচে পাটা থেকে ভর্তা তুলল হামিদা। টিনের একটা বাটিতে রাখল। লুছনি (যে ন্যাকড়া দিয়ে গরম হাড়ি কড়াই ধরতে হয়) দিয়ে ধরে সরা সরিয়ে নারকেলের আইচা দিয়ে তৈরি হাতায় হাঁড়ির ভাত দুই তিনবার উলট পালট করে দিল। একটা দুইটা ভাত দুই আঙুলের ডগায় নিয়ে টিপে দেখল ফুটেছে কি না। তারপর হাঁড়ির মুখে আবার সরার ঢাকনা দিয়ে বলল, এই যে কালিজিরা ভর্তা বানাইলাম, একপদ তো অইয়াই গেলো। ভাতের লগে গোলালু সিদ্ধ দিছি। টালা মরিচ আর সউষ্যার (সরিষার) তেল দিয়া মইত্তা (মথে) আলুভর্তা বানামু। শেষমেষ বানামু চ্যাবা সুটকির (পুঁটি মাছের বিশেষ এক প্রকার সুটকি) ভর্তা।

এই তিনপদঐ?

হ।

ইলশা মাছের কানসা, ছোবা (ইলিশ মাছের কানকোর ভেতর যে লালচে জিনিসটা থাকে) এই হগলের ভর্তা বানাইবা না?

হামিদা হাসল। পামু কই?

নূরজাহান ঠোঁট উল্টে বলল, কাজিরভাতের লগে ইলশা মাছের কিছু একখান না থাকলে খাইয়া সাদ নাই। হয় কানসা ছোবার ভর্তা, নাইলে কড়কড়া ইলশা মাছ ভাজা, ইলশা মাছের আণ্ডা ভাজা, লুকা (নাড়িভুঁড়ি) ভাজা। ধ্যুৎ আউজকা কাজিরভাত খাইয়া সাদ পামু না।

হামিদা বুঝে গেল মেয়ের ইলিশ মাছ খাওয়ার সাধ হয়েছে। মাওয়ার বাজারে গেলেই পদ্মার তাজা ইলিশ, চকচকে সাদা রঙের উপর নীলচে আভা। গাছিকে বলতে হবে কাজিরভাত খেয়েই যেন বাজারে যায়। প্রথম দিনের রস বেচা পয়সায় যেন একখান ইলিশ মাছ কিনে আনে। মেয়ের সাধটা যেন পূরণ করে।

নূরজাহানের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে হামিদা বলল, তর বাপে আহুক, তারে আমি কমুনে।

নূরজাহান অবাক হল। কী কইবা?

তুই যে ইলশা মাছ খাইতে চাইছস হেইডা। আইজঐ বাজারে পাডামুনে। আইজঐ ইলশা মাছ আইন্না খাওয়ামুনে তরে।

শুনে আবার মিষ্টি করে হাসল নূরজাহান। তুমি যে আমারে এত আদর করো এইডা কইলাম অনেক সময়ঐ বুজি না আমি।

ক্যা?

AMARBOI.COM

আদরের থিকা রাগ যে বেশি করো! কোনওহানে যাইতে দিতে চাও না। যাইতে চাইলে গাইল দেও, মারো। একদিন তো বাইন্দাও থুইছিলা। বাবায় আইয়া ছাড়ছে। তুমি আমার লগে এমুন করো ক্যা মা?

সরা সরিয়ে ভাতের হাঁড়িতে হাতা ঢুকাল হামিদা। আন্দাজ করে করে ভাতের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সিদ্ধ গোলআলু তুলতে লাগল : তুলে একটা খোড়ায় রাখতে রাখতে বলল, কেন যে করি হেইডা তুই বুজবি না।

নূরজাহান মুখ ঝামটাল। সব সময়ায় এককথা কইবা না। বুজুম না ক্যা, আমি কি পোলাপান?

নূরজাহানের মুখ ঝামটা শুনে পলকের জন্য তার দিকে তাকাল হামিদা। তারপর দুইহাতে দুইটা লুছনি নিয়ে হাঁড়ির কানা ধরে নামিয়ে চুলার ওপাশে রাখা ছাই রঙের খাদায় ভাত ঠিকনা দিল। দিয়ে ধীর নরম গলায় বলল, তুই যে একখান মাইয়া, তুই যে ডাঙ্গর অইছস এইডা তুই বোজচ?

বুজি।

ডাঙ্গর মাইয়াগো কী কী নিয়ম মাইন্না চলতে অয় বোজছ?

বুজি।

এবার মুখ ঘুরিয়ে নূরজাহানের চোখের দিকে তাকাল হামিদা। না বোজচ না।

কে কইছে বুজি না! তুমি আমারে বেবাক বুজাইছো না?

বেবাক না খালি একখান জিনিস বুজাইছি। মাইয়া মাইনষের শইল বড় ভেজাইল্লা জিনিস। নানান পদের ভেজাল আছে এই শইল্লে। হেই হগল ভেজালের একখান তরে বুজাইছি। যেইদিন বুজাইছি ঐদিনঐ তুই ডাঙ্গর অইলি। আর ঐদিন থিকাঐ বিপদটা তর শুরু অইছে।

কথাটার আগামাথা কিছুই বুঝল না নূরজাহান। বলল, কিয়ের বিপদ?

চুলায় মাটির খোলা বসাল হামিদা। টিনের ছোট্ট একখান পট থেকে চারটা চ্যাপা সুটকি বের করে তপ্ত খোলায় টালতে টালতে বলল, বিপদটার নাম অইলো পুরুষপোলা। একখান মাইয়া যহন ডাঙ্গর অয় আপনা বাপ ভাই ছাড়া দুইন্নাইর বেবাক পুরুষপোলাঐ তহন হেই মাইয়াডার মিহি কুদিষ্টি দিয়া চায়। নানান উছিলায় আতালি পাতালি কথা কইয়া, লোভ দেহাইয়া, ডর দেহাইয়া নাইলে জোর কইরা মাইয়াডার শইলডারে নষ্ট করতে চায়। আর মাইয়া মাইনষের শইল এমুন, একবার নষ্ট অইলো তো সব্বনাশ, বেবাক গেল। হেই শইল আর স্বামীরে দেওন যায় না। দিলে শুনা অয়, জনম ভইরা দোযকের আগুনে জ্বলতে অয়। হিন্দুরা যহন পূজা করে, দেবদেবীরে পূজা দেয়, তহন ফুল লাগে। তাজা ভাল ফুল। বাসি পচা ফুল অইলে পূজা অয় না। দেবতায় অদিশাপ দেয়। মাইয়ামানুষ অইল পূজার ফুলের লাহান। একবার বাসি অইয়া গেলে হেই ফুলে স্বামী দেবতার পূজা অয় না। ডাঙ্গর অওনের লগে লগে এর লেইগাঐ সাবদান অইতে অয় মাইয়ামাইনষের। আলায় বালায় (যত্রতত্র) ঘুইরা বেড়ান যায় না। কুনসুম কোন বিপদে পড়বো কে জানে!

মায়ের কথা শুনতে শুনতে চোখের উপর দুইজন মানুষের মুখ ভেসে উঠতে দেখল

AMARBOI.COM

নূরজাহান, একজন আলী আমজাদ আরেকজন মজনু। আলী আমজাদের মুখ দেখে ভয়ে শরীরের খুব ভিতরে কেমন একটা কাঁপন লাগল আর মজনুর কথা ভেবে আশ্চর্য এক শিহরণে, আশ্চর্য এক লজ্জায় ডালিম ফুলের আভার মতো মুখখানা তার আলোকিত হল। হামিদা এসবের কিছুই খেয়াল করল না, আগের কথার রেশ ধরে বলল, এর লেইগাঐ তর লগে আমি অমুন করি। একলা একলা কোনওহানে যাইতে দিতে চাই না। তুই তো আমার কথা হোনচ না, এই না হোননের লেইগা একদিন বহুত কানবি। তয় কাইন্দাও হেদিন কোনও লাব অইবো না। যা খোয়াবি তা আর ফিরত পাবি না।

মজনুর কথা ভেবে অন্যরকম হয়ে যাওয়া মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নূরজাহান বলল, আইজ তোমার কথা আমি পুরাপুরি বোজলাম মা। এমুন কইরা তো তুমি আমারে কোনওদিন কও নাই, তাও কমবেশি এই হগল কইলাম আমি বুজি। বেডাগো মুখেরমিহি চাইলে বোজতে পারি, চক্কের মিহি চাইলে বোজতে পারি। তুমি আমারে এক্কেরে (একেবারে) পোলাপান মনে কইরো না।

বোজলে ভাল না বোজলে মরণ। আইজ তরে আমি বেবাক কথা খুইল্লা কইলাম। অহন তুই বাচবি না মরবি এইডা তর চিন্তা। মাইয়া ডাঙ্গর অইয়া গেলে বাপ মায় যত পাহারা দেউক, ঘরে আটকাইয়া রাখুক, পায়ে ছিকল বাইন্দা রাখুক, মাইয়ায় যুদি নিজে না চায় তাইলে হেয় ভাল থাকতে পারবো না। ভাল থাকনডা নিজের কাছে।

একটু থেমে হামিদা বলল, তয় আমার শেষ কথাডা তুই মনে রাখিচ। স্বামীর ঘরে একদিন যাইতে অইবো, শইলডা বাচায় রাখিচ। নষ্ট শইল স্বামীরে দেওনের থিকা বড় গুনা এই দুইন্নাইতে নাই। ঐ গুনাডা কোনওদিন করিচ না।

ঠিক তখনই দবিরকে দেখা গেল খুবই ক্লান্ত ভঙ্গিতে ভার কাঁধে বাড়ির দিকে আসছে। ভার কাঁধে থাকলে দবিরের হাঁটাচলা হয় পালকি কাঁধে থাকা বেহারাদের মতো। যেন হাঁটে না সে, দৌড়ায়। কিন্তু এখন তার হাঁটা একেবারেই ধীর, নরম। কী রকম এক বিষণ্নতা যেন পা দুইটাকে তার চলতে দিতে চাইছে না। এতটা দূর থেকে তার মুখ চোখ পরিষ্কার দেয়া যায় না তবে বোঝা যায় মুখ ম্লান হয়ে আছে বিষণ্নতায়, চোখ উদাস হয়ে আছে উদাসীনতায়।

দবিরকে প্রথম দেখল নূরজাহান। দেখে উৎফুল্ল গলায় বলল, মা ওমা, ঐত্তো বাবায় আইয়া পড়ছে।

হাতের কাজ ফেলে হামিদাও তাকাল মানুষটার দিকে। অবাক গলায় বলল, এত তাড়াতাড়ি আইলো কেমতে? যতডি গাছে হাড়ি পাতছে ঐডি নামাইয়া উডাইয়া, গিরস্তের রস গিরস্তরে বুজাইয়া দিয়া নিজের ভাগের রস বেইচ্চা বাইত্তে আইতে তো আরও বেইল (বেলা) অওনের কথা!

নূরজাহান তখন তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে আছে বাবার দিকে। তাকিয়ে তার অবস্থাটা বুঝে গেল। মায়ের দিকে মুখ ফিরাল নূরজাহান। চিন্তিত গলায় বলল, দেহো মা, বাবারে জানি কেমুন দেহা যাইতাছে। মরার লাহান আটতাছে, চাইয়া রইছে অন্যমিহি। রসের ঠিল্লা দেইক্কা বুজা যায় ঠিল্লা খালি অয় নাই। রস না বেইচ্চা বাইত্তে আইলো ক্যা বাবায়?

নূরজাহানের কথা শুনে চিন্তিত হল হামিদা। চারপাশে ছড়ান ছিটান কাজের কথা

AMARBOI.COM

ভুলে, খোলায় পুড়ছে চ্যাপা সুটকি, সেই সুটকির গন্ধ ভাসছে সারাবাড়িতে, সেসব ভুলে দূর থেকে হেঁটে আসা গাছির দিকে তাকিয়ে রইল সে।

নূরজাহান বলল, লও তো আউগগাইয়া গিয়া দেহি কী অইছে বাবার!

লগে লগে উঠে দাঁড়াল হামিদা। ল।

দুইজন মানুষ তারপর বাড়িতে ওঠা নামার মুখে এসে দাঁড়াল। কাছাকাছি আসতেই দৌড়ে গিয়ে দবিরের একটা হাত ধরল নূরজাহান। ও বাবা, বাবা কী অইছে তোমার? কী অইছে? এত তাড়াতাড়ি ফিরত আইলা?

দবির কোনও কথা বলল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। উঠানে এসে কাঁধের ভার নামাল বড়ঘরের ছনছায়। (চৌচালা দোচালা একচালা টিনের ঘরের চালা, ঘরের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে যেটুকু বেড়ে থাকে, ঘরের বাইরে যেটুকু জায়গার রোদ বৃষ্টি আটকে রাখে সেই জায়গাটাকে বলা হয় 'ছনছা'। শব্দটা বোধহয় 'সানশেড' থেকে এসেছে)। ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসল পিড়ায়।

একটা রসের ঠিলার মুখ থেকে ঢাকনা সরিয়ে ঠিলার ভিতর উঁকি দিল নূরজাহান। ঠিলায় অর্ধেক পরিমান রস। দেখে চমকে উঠল সে। দবিরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, রস বেচো নাই বাবা?

দবির উদাস গলায় বলল, না।

শুনে আঁতকে উঠল হামিদা। ক্যা?

পরে কমুনে। আগে মাইয়াডারে কও ইট্টু রস খাইতে, তুমিও ইট্টু খাও।

দুইতিন পলক বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দৌড়ে গিয়ে রান্নাচালা থেকে টিনের একটা মগ নিয়ে এল নূরজাহান। নিজেই রস ঢালল মগে। মাত্র চুমুক দিতে যাবে, দবির মন খারাপ করা গলায় বলল, ছনুবুজিরে কইছিলাম বচ্ছরের পয়লা রসটা তারে খাওয়ামু। তারে না খাওয়াইয়া রস বেচুম না। গেছি খাওয়াইতে, গিয়া দেহি ছনুবুজি নাই। মইরা গেছে। মরণের সময় পানির তিয়াস লাগছিল। পানি মনে কইরা মাইট্টাতেল খাইয়া হালাইছে।

বাবার কথা শুনে দিশাহারা হয়ে গেল নূরজাহান। মুখের সামনে থেকে রসভর্তি মগ উঠানে ছুড়ে ফেলে দিল। তারপর কোনওদিকে না তাকিয়ে পাগলের মতো বাড়ির নামার দিকে ছুটে গেল।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিআল্লাহুআনহু হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত রাসুলুল্লাহু আলায়হেওয়াসাল্লাম গাধায় আরোহণ করিয়া বনু নাজ্জারের একটি উদ্যানের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। আমরাও তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ গাধাটি ভীত

হইয়া তাঁহাকে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিল। সেই স্থানে পাঁচ ছয়টি কবর ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কবরের অধিবাসীদের সম্বন্ধে তোমরা কেহ কিছু জান কি না? একজন বলিল, আমি জানি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কী অবস্থায় তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে? সে বলিল, শিরকীর মধ্যে। তিনি বলিলেন, ইহাদের কবরে ভীষণ আযাব হইতেছে। তোমরা সহ্য করতে পারিবে না বলিয়া আশংকা না থাকিলে আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতাম যে, আমি যেমন তাহাদের কবরের আযাব শুনিতে পাইতেছি তোমরা যেন সেইরূপ শুনিতে পাও।

খান বাড়ির মসজিদের বারান্দার এককোণে, দেওয়ালে ঢেলান (হেলান) দিয়ে বসে আছেন মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব। অল্প দূরত্ব রেখে তাঁর মুখোমুখি বসে আছে বড় মেন্দাবাড়ির লম্বা সোনা মিয়া। মাথায় সাদা টুপি সোনা মিয়ার, গায়ে গেরুয়া রঙের ধোয়া পানজাবি। বুক থেকে গলা তরি চারখান বোতাম পানজাবির। একটা বোতাম খসে গেছে। বাকি তিনটা যত্নে লাগান। পরনের লুঙ্গি বেগুনি রঙের। পানজাবিটা পুরানা হয়ে গেছে, দুই এক জায়গায় গেছে ফেঁসে। তবে পানজাবি লম্বা বলে লুঙ্গি পানজাবির আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে। পায়ে স্পঞ্জের একজোড়া স্যান্ডেল ছিল সোনা মিয়ার। স্যান্ডেল দুইটা খুলে একটার গায়ে আরেকটা লাগিয়ে বাঁ দিককার উরুর তলায় রেখেছে। জুতা স্যান্ডেল সবচেয়ে বেশি চুরি হয় মসজিদে। নামাজ পড়তে এসেও তাই নামাজের চেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে কেউ কেউ জুতা স্যান্ডেল নিয়ে। মসজিদে ঢোকার আগে বগলে চেপে যেখানে নামাজ পড়ে তার পাশেই রেখে দেয়। সালাম ফিরাবার সময় আড়চোখে দেখে নেয় জায়গা মতন আছে কি না জিনিস দুইটা, নাকি সেজদা দেওয়ার ফাঁকে চুরি হয়ে গেছে।

আল্লাহর ঘরে এসেও চুরি করে কোনও কোনও মানুষ। ছি!

তবে এখন চুরির ভয় নাই। এই সকালবেলা মসজিদের ধারে কাছে আসবে না কেউ। তবু সাবধানের মার নাই বলে স্যান্ডেল দুইটা ওইভাবে রেখেছে সোনা মিয়া, নয়তো মন দিয়ে মাওলানা সাহেবের কথা শোনা যেত না। মন পড়ে থাকত স্যান্ডেলের দিকে। বরাবরই মুখ নিখুঁত করে কামানোর অভ্যাস সোনা মিয়ার। কিছুদিন হল সেই অভ্যাস বাদ দিয়েছে। হঠাৎ করেই মন তার ধর্মের দিকে ঝুঁকেছে। মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব এই মসজিদের ইমাম হয়ে আসার পর, তাঁকে দেখে, তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর মনটা কী রকম যেন হয়ে গেছে। জীবনে আল্লাহ খোদার নাম নেয় নাই, মসজিদে ঢুকে নামাজ পড়ে নাই, সবাই পড়ে বলে ঈদের নামাজটা পড়েছে, তাও সব সময় না, বিশেষ করে কোরবানি ঈদের নামাজ। বাড়িতে গরু বরকি কোরবানি হবে বলে কোরবানি ঈদের সকাল থেকে গরু বরকি নিয়াই ব্যস্ত থাকত। সেই মানুষ হঠাৎ করে বদলে গেল! একজন মানুষ যে কত সহজে আরেকজন মানুষকে নিয়া আসতে পারে ধর্মের দিকে মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব আর সোনা মিয়া তার প্রমাণ। যে সোনা মিয়া মেতে থাকত গান বাজনা নিয়ে, গ্রামের মাতাব্বরি সর্দারি, আমোদফুর্তি আর খেলাধুলা নিয়া, সেই সোনা মিয়া এখন সময়ে অসময়ে এসে মসজিদে বসে থাকে। ইমাম সাহেবের কাছ থেকে ধর্মের কথা শোনে। মুখ কামানো ছেড়ে দিয়েছে। নিখুঁত করে কামানো মুখ আর

AMARBOI.COM

নাই। এখন শুধু মোচটা কামায়, গাল থুতনি কামায় না। সেখানে কাঁচাপাকা দাঁড়ি দিনকে দিন লম্বা হচ্ছে।

এই বয়সে দাঁড়ি পাকবার কথা না সোনা মিয়ার। কিন্তু বেশ কিছু পেকেছে। দাঁড়ি মোচ ঠিক মতো গজাবার আগ থেকেই ক্ষুর ব্লেড লাগিয়েছিল গালে, অতিরিক্ত চাছাচাছি করেছে, ফলে জাগ দিয়ে বিচ্চাকলা (বিচিকলা) পাকাবার মতো নিজেই নিজের দাঁড়ি মোচ পাকিয়ে ফেলেছে। তবে ওই নিয়া সোনা মিয়ার কোনও মাথাব্যথা নাই। সে এখন অন্যমানুষ। এই যে সকালবেলা ইমাম সাহেব কবর আযাবের কথা বলছেন সে গভীর মনোযোগে দিয়ে শুনছে। শীত পড়ে গেছে। গায়ে পাতলা পানজাবি তবু শীত লাগছে না। অবশ্য মসজিদের বারান্দা পুবদিকে বলে সকালবেলার রোদ এসে পড়েছে সোনা মিয়ার পিঠে। সেই রোদে বেশ উষ্ণতা। শীত না টের পাওয়ার এটাও একটা কারণ।

মসজিদের বারান্দা ছাড়িয়ে খানিকটা খোলা জায়গা তারপর দুই পাশে ইট রঙের বেঞ্চ দেওয়া বাঁধান ঘাটলা। ঘাটলার অনেকগুলি সিঁড়ি নেমে গেছে পানির দিকে। পানির উপরেরগুলির খবর আছে, গনা যায়, তলারগুলির খবর নাই। পুকুরটা বেশ গভীর। পুকুরের দক্ষিণে মাঠ, এই মাঠের নাম খাইগো বাড়ির মাঠ। পশ্চিম দিকে মসজিদ, মসজিদের উত্তরে ঝাপড়ানো আমগাছের তলায় দোচালা লম্বা টিনের ঘরে প্রাইমারি স্কুল। খাইগো বাড়ির স্কুল। স্কুল ঘরটার সামনে সবুজ ঘাসের অনেকখানি খোলা জায়গা। তারপর ভিতরবাড়ি। দালান আছে, বড় বড় টিনের ঘর আছে। এলাকার সবচেয়ে বড় বাড়ি, সবচেয়ে বনেদী বাড়ি। বংশ পরম্পরায় চেয়ারম্যান হচ্ছে এই বাড়ির লোক। যে কোনও সরকারের আমলেই মন্ত্রী এমপি হচ্ছে। সারা বিক্রমপুরে এই বাড়ির নাম, সম্মান।

বাঁধান ঘাটলার পুবে আর উত্তরে আছে আরও দুইখান ঘাটলা। সেই ঘাটলা কাঠের। বাড়ির মেয়েরা ব্যবহার করে বলে ওই দুইটা ঘাটলার তিনপাশে পানিতে খুঁটি পুতে সুন্দর করে বেড়া দেওয়া হয়েছে। এই বেড়া দেখেও বাড়ির আভিজাত্য টের পাওয়া যায়।

আর আছে গাছপালা। বিশেষ করে পুকুরের পুবপারে বড় বড় আমগাছ, জাম বকুলগাছ। সকালবেলার রোদ বেশ খানিকক্ষণ আটকে রাখে এই সব গাছপালা।

আজও রেখেছিল। তবে বেলা হওয়ার পর আর পারেনি। ফলে সোনা মিয়ার পিঠে এসে পড়েছে রোদ, মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেবের পায়ের কাছে এসে পড়েছে। দেওয়ালে ঢেলান দিয়ে আছেন বলে তাঁর পবিত্র শরীরের অন্যত্র পৌঁছাতে পারেনি রোদ।

প্রাইমারি স্কুল বন্ধ বলে কোথাও কোনও শব্দ নাই। আমগাছের পাতার আড়ালে বসে ডাকছে একটা কাক। দুইটা ভাত শালিক চরছে বাঁধান ঘাটলার কাছে। শীত সকালের রোদে ঝকমক ঝকমক করছে চারদিক। এরকম পরিবেশে মসজিদের বারান্দায়, দেওয়ালে ঢেলান দিয়ে বসা মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেবকে ফেরেশতার মতো লাগে। এতক্ষণ কথা বলছিলেন তিনি, এখন চুপচাপ হয়ে আছেন। পরনে সাদা চেকলুঙ্গি আর পানজাবি, মাথায় সাদাটুপি, বুক পর্যন্ত নেমেছে শুভ্রদাঁড়ি। মুখখানাও মাওলানা সাহেবের ধবধবে ফর্সা। ছিটাফোটা চর্বিও যেন নাই গায়ে, একহারা গড়ন। কথা বলেন

ANARBOI.COM

ধীর, নরম স্বরে। সেই স্বর শুনে মনেই হয় না এ কোনও মানুষের স্বর, মনে হয় সরাসরি আল্লাহতালার দরবার থেকে আসছে মানুষের জন্য কোনও বাণী।

এরকম মানুষকে কে না শ্রদ্ধা করবে! কে না চাইবে তাঁর কথা শুনতে!

কিন্তু তিনি এমন চুপচাপ হয়ে আছেন কেন? তিনি কেন কথা বলছেন না! সোনা মিয়া তো আসেই তার কথা শুনতে!

সোনা মিয়া আস্তে করে ডাকল, হুজুর।

মাওলানা সাহেব ধীর গলায় সাড়া দিলেন।

সোনা মিয়া অতিরিক্ত বিনয়ের গলায় বলল, অনেকদিন ধইরা ভাবতাছি আপনেরে দুই একখান কথা জিগামু। সাহস পাইতাছি না।

মাওলানা সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। পবিত্র মুখ উজ্জ্বল করে হাসলেন। কোনও অসুবিধা নেই। বলুন।

আপনে তো নোয়াখালীর লোক, এত সোন্দর কইরা কথা কন কেমতে?

মাওলানা সাহেব আবার হাসলেন। শিখে নিয়েছি। আমি যদি নোয়াখালীর ভাষায় কথা বলতাম আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারতেন?

জ্বে না হুজুর।

আমার কাজ হচ্ছে ইমামতি করা। মানুষকে আল্লাহ রাসুলের কথা বলা। আমার ভাষাই যদি লোকে বুঝতে না পারে তাহলে সেই কাজ আমি সুন্দরভাবে করব কী করে! আমি যখন নোয়াখালীতে ছিলাম, সেখানকার মসজিদে ইমামতি করেছি, তখন সেই অঞ্চলের ভাষায় কথা বলেছি। নোয়াখালীর বাইরে আসার পর থেকে এখন আপনার সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলছি এই ভাষায়ই কথা বলি। কারণ বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের ভাষা তো আমি জানি না। শুদ্ধ ভাষাটা জানি, এ ভাষায় কথা বললে সব লোকই তা বুঝবে।

সোনা মিয়া গদগদ গলায় বলল, ঠিকঐ কইছেন হুজুর। আরেকখান কথা, আপনে যখন কোরান হাদিসের কথা কন তহন দেহি বইয়ে যেমুন লেখা থাকে অমুন কইরাঐ কন, এইডার অর্থ কী?

ওভাবে বলতে আমার ভাল লাগে। মনে হয় যারা শুনছে তাদেরও শুনতে ভাল লাগছে।

সোনা মিয়া মাথা নাড়ল। জ্বে জ্বে। হোনতে ভাল্লাগে। কন, কবর আযাবের কথা আর কিছু কন হুজুর।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব আবার নড়েচড়ে বসলেন। অপার্থিব গলায় বলতে লাগলেন, তিরমিযী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহুআনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লেল্লাহুআলায়হেওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মৃতকে কবরস্থ করিবার পর দুইজন কৃষ্ণকায় নীলচক্ষু বিশিষ্ট ফেরেশতা তাহার নিকট আগমন করেন। তাঁহাদের একজনের নাম মুনকির ও অন্যজনের নাম নাকীর। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বল? মৃতব্যক্তি বলিবে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে,

আল্লাহ ছাড়া কোনও মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ সাল্লেল্লাহুআলায়হেওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রাসুল। ফেরেশতারা বলিবে, আমরা জানিতাম তুমি এই কথাই বলিবে। অতঃপর তাহার কবরকে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সত্তরগজ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে। পরে তাহার কবরকে আলোকিত করিয়া দিয়া বলা হইবে এবার ঘুমাও। মৃত লোকটি বলিবে, আমার পরিবারের নিকট যাইয়া আমি তাহাদিগকে আমার বর্তমান অবস্থা জানাইতে চাই। ফেরশতাদ্বয় বলিবে, বাসর রাত্রির ন্যায় শয্যা গ্রহণ কর, যেখানে প্রিয়তম ছাড়া অন্যকেহ নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারে না। রাসুলুল্লাহ বলেন, এই কবর হইতেই কিয়ামত দিবসে আল্লাহতাআলা তাহাকে উঠাইবেন। আর যদি মৃতব্যক্তি মুনাফিক হয়, সে ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তরে বলিবে, লোকেরা যাহা বলিত তাহা শুনিয়া আমিও তাহাদের ন্যায় বলিতাম, আমি জানি না ইনি কে। ফেরেশতাদ্বয় বলিবে, তুমি যে ইহা বলিবে তাহা আমরা পূর্বেই জানিতাম। অতঃপর কবরকে বলা হইবে, সংকুচিত হও। ফলে তাহা এমনভাবে সংকুচিত হইবে যে মৃতের মেরুদণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। এই কবর হইতে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাহাকে উত্থিত না করা পর্যন্ত সে এইভাবে আযাব পাইতে থাকিব।

মাওলানা সাহেবের কথা শেষ হওয়ার বারান্দার অদূরে এসে দাঁড়াল মজনু। মসজিদের বারান্দায় মাওলানা সাহেবকে বসে থাকতে দেখবে ভাবেনি। সে একটু থতমত খেল, বিব্রত হল। মান্নান মাওলানার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এ বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল ঠিকই, মাওলানা সাহেবকে কী কী কথা বলবে তাও ভেবে রেখেছিল, এখন হঠাৎ করেই সবকিছু গুলিয়ে গেল। মাওলানা সাহেবকে যে সালাম দিতে হবে সেকথা পর্যন্ত মন হল না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মাওলানা সাহেবের সামনে যে আরেকজন মানুষ বসে আছে, মানুষটা যে মজনুর পরিচিত সেকথাও মনে হল না।

AMARBOI.COM

একপলক মজনুকে দেখেই মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব তাকে সালাম দিলেন। আসসালামোআলাইকুম। কী চান বাবা?

মাওলানা সাহেব কাকে সালাম দিচ্ছেন দেখবার জন্যে পিছন দিকে মুখ ফিরাল সোনা মিয়া। মজনুকে দেখে খ্যাক খ্যাক করে উঠল। কী রে বেডা, এত বেদ্দপ অইছস ক্যা? হুজুরের সামনে আইয়া খাড়াইছস ছেলামালাইকুম দিলি না? উল্টা হুজুর তরে দিল!

মাওলানা সাহেব হাসিমুখে বললেন, তাতে কোনও অন্যায় হয়নি। সালাম যে কেউ যে কাউকে দিতে পারে, আগে পরের কোনও ব্যাপার নেই।

সোনা মিয়া রাগে গো গো করতে করতে বলল, না হুজর, এইডা ও ঠিক করে নাই। ঐ মউজনা, মাপ চা হুজরের কাছে। পাও ধইরা ক আমার ভুল অইয়া গেছে, আমারে আপনে মাপ কইরা দেন। তাড়াতাড়ি।

মজনুর ততক্ষণে গলা শুকিয়ে গেছে। মুখ গেছে ফ্যাকাশে হয়ে। বুকও দুরদুর করে কাঁপছে। এ কেমন ভুল সে করল আজ! এই ধরনের ভুল তো সে কখনও করেনি! আজ কেন এমন হল!

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব তখন তীক্ষ্ণচোখে মজনুকে দেখছেন। সোনা মিয়াও

দেখছে। তবে দুইজনের চোখ দুইরকম। একজন দেখছেন মজনুর মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া অন্যজন দেখছে বেয়াদবি। সে বলার পরও হুজুরের পা ধরে কেন মাফ চাইছে না মজনু!

সোনা মিয়া ভাবল বড় রকমের একটা ধমক দিবে মজনুকে। তার আগে মাওলানা সাহেব তাঁর মনোমুগ্ধকর কণ্ঠে বললেন, কী হয়েছে বাবা? আপনাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। আমার সামনে এসে বসুন। বলুন কী হয়েছে?

এবার মজনু একটু নড়েচড়ে উঠল। ঢোক গিলে কাতর গলায় বলল, একজন মানুষ ইন্তিকাল করছে হুজুর।

ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তাঁর দেখাদেখি সোনা মিয়াও বিড়বিড় করে পড়ল দোয়াটা। তবে খুবই দ্রুত পড়ল, পড়েই মজনুর দিকে তাকাল। কেডা ইন্তিকাল করছে?

ছনুবুড়ি।

আইজ্জার মায়?

হ।

কুনসুম?

রাইত্রে।

সকালবেলা মৃত্যু সংবাদ শুনে যতটা কাতর হওয়ার কথা সোনা মিয়ার ততটা সে হল না। নির্বিকার মুখে হুজুরের দিকে তাকাল।

ব্যাপারটা খেয়াল করেও সোনা মিয়াকে কিছু বললেন না মাওলানা সাহেব। মজনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার কাছে আপনি কী মনে করে আসছেন বাবা?

মৃত্যু সংবাদ দিয়ে ফেলার পর ভিতরে ভিতরে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে মজনু। মাওলানা সাহেবকে সালাম না দিয়ে যে বেয়াদবি করেছে সেকথা না ভেবে বলল, জানাজাডা যদি আপনে পড়াইতেন।

মওলানা সাহেব কথা বলবার আগেই সোনা মিয়া বলল, ক্যা মন্নান মাওলানারে পাইলি না? হেয় বাইত্তে নাই?

আছে।

তয়?

ছনুবুড়ির জানাজা হেয় পড়াইবো না।

ক্যা?

আপনে তো বেবাকঐ জানেন। আমারে আর জিগান ক্যা?

প্রথমে সোনা মিয়ার দিকে তারপর মজনুর দিকে তাকিয়ে মাওলানা সাহেব অবাক গলায় বললো, কেন, জানাজা তিনি পড়াবেন না কেন?

সোনা মিয়া বলল, যেয় ইন্তিকাল করছে সেয় মানুষ ভাল আছিল না হুজুর।

কেমন মানুষ ছিল?

খারাপ।

কী রকম খারাপ?

মজনুর দিকে তাকিয়ে সোনা মিয়া বলল, ঐ মউজনা তুই ক। তুই আমার থিকা ভাল জানচ। ছনুবুড়ির বাড়ি তগো বাড়ি থিকা কাছে।

AMARBOI.COM

মজনু বলল, টুকটাক চুরি করতো হুজুর। তয় বেবাকঐ খাওনের জিনিস। মাইনষের ঝাকার কদুডা, কোমড়ডা। গাছের আমডা, গয়াডা। পোলার সংসারে থাকতো, পোলারবউ খাওন দিতো না। এর লেইগাঐ অমুন করতো। আর দুই একওক্ত খাওনের লেইগা একজনের বদলাম আরেকজনের কাছে কইতো। বানাইয়া বানাইয়া কইতো, মিছাকথা কইতো। বহুত কূটনা আছিলো।

মাওলানা সাহেব বললেন, মান্নান মাওলানা সাহেব তাকে চিনতেন?

জ্বে হ চিনতো হুজুর। বহুত ভাল কইরা চিনতো।

সোনা মিয়া বলল, ছনুবুড়িরে দুই মেদিনমোন্ডলের বেবাকতেঐ চিনে।

কিন্তু মান্নান মাওলানা সাহেব তার জানাজা পড়াবেন না কেন? কী বললেন তিনি?

কইলো ছনুবুড়ি চোর আছিলো, চোগলখুরি করছে, চোর আর চোগলখোরের জানাজা অয় না। মাডি তারে নিবো না। এই রকম মুদ্দাররে গাঙ্গে ভাসাইয়া দিতে অয় যাতে কাউট্টা (কচ্ছপ) কাছিমে খাইতে পারে, নাইলে মড়কখোলায় হালাইয়া দিতে অয়, কাউয়া চিলে খাইবো, হিয়াল হকুনে খাইবো, কুত্তায় খাইবো।

মাওলানা সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর ম্লান মুখে হাসলেন। কথাগুলো তিনি ঠিক বলেননি। নামাজে জানাজা পড়া ফরজে কেফায়াহ। অর্থাৎ কেহ জানাজার নামাজ আদায় না করিলে যাহারা মৃত্যুর সংবাদ পাইয়াছে সকলেই গোনাহগার হইবে। যে কোনও একজন জানাজার নামাজ পড়িলেই ফরজে কেফায়াহ আদায় হইয়া যাইবে। কোনও জানাজার নামাজের জন্য জামায়াত শর্ত বা ওয়াজিব নহে। লাশ নদীতে ফেলে দেওয়া, কাক শকুনের খাওয়ার জন্য মড়কখোলায় ফেলে দেওয়ার কথা কোনও মুসলমান বলতে পারেন না। মাটি কোনও মানুষকে গ্রহণ করবে না, এ হয় না। এ ভুল কথা। মৃত্যুর পর মানুষের যাবতীয় বিচারের ভার আল্লাহপাকের ওপর। পবিত্র কোরআন শরীফে আছে 'আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?' 'আর কিয়ামতের দিন আমি ন্যায় বিচারের মানদণ্ড দাঁড় করাইব। সুতরাং কাহারও ওপর কোনও অবিচার করা হইবে না, আর যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও কাজ হয় তবু তাহা আমি উপস্থিত করিব; হিসাব গ্রহণ করিতে আমিই যথেষ্ট।'

মাওলানা সাহেবের কোনও কোনও কথার অর্থ বুঝল না মজনু, সোনা মিয়াও পুরাপুরি বুঝল বলে মনে হল না, তবে তারা দুইজনেই মুগ্ধ হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মাওলানা সাহেব বললেন, তিরমিযী শরীফে আছে 'তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের সৎ কার্যগুলির কথা উল্লেখ কর এবং তাহাদের দুষ্কর্মগুলির কথা উল্লেখ করিও না।'

মজনু এবং সোনা মিয়া দুইজনের দিকেই মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব। মৃতব্যক্তি সম্পর্কে এই সব কথা আপনারা মনে রাখবেন। আরও দশজনকে বলবেন। তাহলে ভুল ফতোয়াদানকারীরা ফতোয়া দিতে সাহস পাবে না। আরও দুতিনটে হাদিস বলে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলব আমি। তার আগে, বাবা মজনু, আপনি আমাকে বলুন মৃতের গোসল দেওয়া হয়েছে, কাফন দেওয়া হয়েছে?

মজনু বলল, অহনও অয় নাই। তয় ব্যবস্তা অইতাছে।

AMARBOI.COM

তাহলে ঠিক আছে। কারণ জানাজা বিলম্ব করা মাকরূহ। যদি জুমআ'র দিন কাহারও ইন্তেকাল হয় তবে সম্ভব হইলে জুমআ'র পূর্বেই নামাজে জানাজা ও দাফন সম্পন্ন করিবে। জুমআ'র সময় লোক সমাগম বেশি হইবে এই উদ্দেশ্যে জানাজা বিলম্ব করা মাকরূহ।

মাওলানা সাহেব একটু থামলেন, আকাশের দিকে তাকালেন, গাছপালা, পুকুরের পানি আর রোদের দিকে তাকালেন। যেন দুনিয়ার মালিক মহান আল্লাহপাককে চোখের দৃষ্টিতে অনুভব করলেন তিনি। তারপর যে কোনও মানুষ মুগ্ধ হতে পারে, আকৃষ্ট হতে পারে এমন গলায় বলতে লাগলেন, বুখারী শরীফে হযরত জাবির রাদিআল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, 'একবার আমাদের নিকট দিয়া একটি জানাজা অতিক্রম করিল। তাহা দেখিয়া হয়রত রাসুলুল্লাহ সাল্লেল্লাহুআলায়হেওয়াসাল্লাম উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সহিত আমরাও দাঁড়াইলাম। আমরা তাঁহাকে বলিলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ্! ইহা তো ইহুদীর লাশ। তিনি বলিলেন যখনই কোনও লাশ দেখিবে, উঠিয়া দাঁড়াইবে।' কেন রাসুলুল্লাহ এমন করেছিলেন বলুন তো?

মজনু এবং সোনা মিয়া মুখ চাওয়া চাওয়ি করল, কেউ কোনও জবাব দিতে পারল না।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব হাসিমুখে বললেন, অর্থাৎ মৃতব্যক্তি যেই হোক সে তো মানুষ! মানুষের লাশকে সম্মান দেখাতে হবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে 'একজন লোক মসজিদে অবস্থান করিতেছিল। একদিন রাসুলুল্লাহ তাহাকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কোথায়? সকলে উত্তর করিলেন, সে মারা গিয়াছে। তিনি বলিলেন, তোমরা আমাকে উহা জানাইলে না কেন? তাঁহারা বলিলেন, আমরা এটাকে সামান্য ব্যাপার বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, তোমরা আমাকে কবরের নিকট লইয়া চল। অতঃপর তিনি সেখানে যাইয়া জানাজার নামাজ পড়িলেন।' তিরমিযী শরীফে আছে, 'সেই শিশুর কোনও জানাজা নাই যে পর্যন্ত সে শ্বাস প্রশ্বাস না ফেলে এবং চিৎকার না করে এবং সে কাহারও উত্তরাধিকারী নহে এবং কেহ তাহার ওয়ারিশ নহে।' এছাড়া প্রত্যেকের জানাজা হবে। মান্নান মাওলানা সাহেব ঠিক বলেননি। বুঝলাম যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি চোর ছিলেন। কী চুরি করতেন? খাদ্যদ্রব্য। পেটের দায়ে একজন অসহায় বয়স্কমানুষ এটা ওটা চুরি করে জীবনধারণ করছেন। আপনাদের কথা শুনে বোঝা গেল এলাকার কেউ তাঁকে দুচোখে দেখতে পারত না, শুধুমাত্র এই অপরাধের জন্য। তিনি মিথ্যা বলতেন, কূটনামো করতেন, সবকিছুর মূলে কিন্তু ওই এক সমস্যা। ক্ষুধা, বেঁচে থাকা। যে সমাজ এই ধরনের একজন অসহায় মানুষকে খেতে দিতে পারে না সেই সমাজের কোনও অধিকার নেই তাঁর বিচার করার। তারপরও মৃত ব্যক্তির বিচার করার ক্ষমতা কোনও মানুষের নেই। মৃত্যুর পর যাবতীয় বিচারের ভার আল্লাহতায়ালার ওপর।

একটু থেমে মাওলানা সাহেব বললেন, যদিও ইসলামী আইনে চুরির সর্বোচ্চ শাস্তি হাতকাটা, কিন্তু তা কখন কার্যকর হবে? এ প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে 'হযরত আয়াশা রাদিআল্লাহুআনহু হইতে বর্ণিত, একদা কোরায়েশ গোত্রের প্রসিদ্ধ

AMARBOI.COM

মাখজুমী বংশের একজন মহিলা ফাতিমা বিনতে আসাদ ঘটনাচক্রে চুরি করিয়াছিল এবং তাহার মোকদ্দমা রাসুলুল্লার কাছে পেশ হইয়াছিল। এই অভিজাত বংশের মহিলাটির চুরির দায়ে হাতকাটা হইবে এই কথা ভাবিয়া তাহার স্বগোত্রের লোকেরা খুবই বিচলিত হইয়া পড়িল। ফলে তাহারা তাহার শাস্তি রহিত করিবার জন্যে রাসুলুল্লার প্রিয় ব্যক্তি হযরত উসামা রাদিআল্লাহুআনহুর দ্বারা সুপারিশ করাইলেন। এতে রাসলুল্লাহ খুবই অসন্তুষ্ট হইলেন এবং উপস্থিত সাহাবীদের উদ্দেশ্যে একখানা ভাষণ দিলেন। বলিলেন, শরীয়তের শাস্তি কার্যকরী করিবার ব্যাপারে এই ধরনের সুপারিশ বড়ই গর্হিত। ফাতিমা বিনতে আসাদ কেন যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও এই কাজটি করিত তাহা হইলে অবশ্যই আমি তাহার হাত কাটিয়া দিতাম।' কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা তেমন নয়, একেবারেই অন্যরকম। তাছাড়া যিনি চুরি করে জীবন ধারণ করেছিলেন তিনি মৃত।

মাওলানা সাহেব সোনা মিয়ার দিকে তাকালেন। চলুন বাবা, জানাজা পড়ে আসি।

মজনু বলল, আরেকখান কথা আছে হুজুর। না কইলে অন্যায় হইবো। মরণের আগে মাইট্টাতেল খাইছিলো ছনুবুড়ি।

মাওলানা সাহেব আর সোনা মিয়া দুজনেই চমকে উঠলেন।

সোনা মিয়া বলল, কচ কী!

মাওলানা সাহেব বললেন, আত্মহত্যা করেছে?

মজনু বলল, হেইডা আমি কেমতে কমু! তয় মাইনষে কইতাছে পানির তিয়াস লাগছিলো দেইখা পানি মনে কইরা খাইয়া হালাইছে।

ঘটনা বলল মজনু। শুনে মাওলানা সাহেব বললেন, হয়তো ভুল করেই মেটেতেল তিনি খেয়েছেন। আত্মহত্যা কি না আমরা কেউ তা জানি না। যদি আত্মহত্যা হয়ও, বিধান আছে 'যদি কেহ আত্মহত্যা করিয়া থাকে তবে তাহার গোসল ও নামাজে জানাজা উভয়ই আদায় করা হইবে।' তবে রোজ কিয়ামতের দিন আত্মহত্যার শাস্তি বড় ভয়ংকর। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, 'আত্মহত্যাকারী যেভাবে নিজের জীবন সংহার করে, কিয়ামতের দিন তাহাকে সেইভাবেই আযাব দেওয়া হইবে। যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক পাহাড়ের ওপর হইতে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করে, তাহাকে দোযখের মধ্যে পাহাড়ের উপর হইতে পতিত করিয়া আযাব দেওয়া হইবে। যে ব্যক্তি বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করে, দোযখের মধ্যে তাহাকে অনবরত বিষপান করাইয়া শাস্তি দেওয়া হইবে। যে ব্যক্তি অস্ত্রের সাহায্যে আত্মহত্যা করে, দোযখের মধ্যে তাহাকে পুনঃপুনঃ অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করা হইবে।' বুখারী শরীফে আরও আছে, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লেল্লাহুআলায়হেওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি স্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্বে আত্মহত্যা করে। অতঃপর আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে এরশাদ হইল, হে বান্দা! তুমি নিজের প্রাণ নিজে বিনাশ করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলে। অতএব আমি তোমার জন্য বেহেশত হারাম করিয়া দিলাম।'

কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব। চলুন যাই।

ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত এক ভাল লাগায় তখন মন ভরে গেছে মজনুর। মান্নান মাওলানার বাড়ি থেকে বেরিয়ে বুদ্ধি করে এখানে এসেছিল বলে এতকিছু জানা হল।

AMARBOI.COM

ছনুবুড়ির জানাজা, দাফন এখন ঠিকঠাক মতোই হবে। আর নয়তো ভুল ধারণায় অবহেলা করা হত মানুষের লাশ।

মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব আর সোনা মিয়ার পিছনে হাঁটতে হাঁটতে চারদিকে তাকাচ্ছিল মজনু। সূর্যের আলোয় শীতের আকাশ ভেসে যাচ্ছে, আল্লাহপাকের দুনিয়া ঝকমক ঝকমক করছে। গাছপালার বনে ঝিরিঝিরি হাওয়া, শূন্যে উড়ে যায় পাখি। পানির তলা থেকে শ্বাস ফেলতে ভেসে ওঠে মাছ, বিল বাওড়ের উর্বর মাটিতে অংকুরিত হয় শস্যের বীজ, নিরবধিকাল বয়ে যায়, বয়ে যায়। এই সুন্দর দুনিয়া ফেলে কেন যে মরে যায় মানুষ! কেন যে আল্লাহ জীবন দিয়ে পাঠান, কেন যে জীবন ফিরিয়ে নেন, সেই গভীর রহস্যের কথা মানুষ জানে না।

আথালের বাইরে মাটির ভুরার (ঢিবি) ওপর চারটা গামলা বসান। একেক ভুরাতে একেকটা। ভুরার চারকোণায় চারটা মাঝারি ধরনের মোটা বাঁশের খুঁটি পোতা। খুঁটিগুলি গামলার মাথা ছাড়িয়ে বেশ খানিকদূর উঠেছে। মান্নান মাওলানার বাড়ি তিন শরিকের বড় গিরস্তবাড়ি। পুবে পশ্চিমে লম্বা বাড়ির পশ্চিমের অংশ মান্নান মাওলানার। এই দিকটা সড়কমুখি পড়েছে বলে মান্নান মাওলানার অংশর গুরুত্ব বেশি। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় পুরা বাড়িটাই বুঝি মাওলানা সাহেবের। পিছন দিকে যে আরও দুই শরিকের ঘরদুয়ার বড়সড় উঠান পালান আছে, যারা না জানে তারা কেউ তা অনুমানও করে না। তবে সেই দুই শরিকের যার যার সীমানায় বাড়িতে ওঠা নামার রাস্তা আছে বলে মান্নান মাওলানার সীমানায় তাদের কাউকে প্রায় দেখাই যায় না। নিজেদের অংশে, নিজেদের ঘরদুয়ারে থেকেও তারা থাকে চোরের মতো। মান্নান মাওলানা আর তাঁর ছেলে আতাহারের দাপটে টুশব্দ করে না। যেন বাড়িটা তাদের না, যেন মান্নান মাওলানার বাড়িতে আশ্রিত তারা মান্নান মাওলানার চাকর বাকর। পান থেকে চুন খসলে তাদের কারও আর রক্ষা নাই।

ওই দুই শরিকের কেউ গ্রাম গিরস্থি করে না। একজনের দুইছেলে জাপানে থাকে। জাপানে এখন অঢেল পয়সা। মাসে এক দেড়লাখ টাকা রোজগার করে একেকজন। দেশে নিয়মিত টাকা পাঠায়। সেই টাকায় পায়ের ওপর পা তুলে খাচ্ছে তাদের মা বাবা ভাইবোন। কিছুদিন ধরে শোনা যাচ্ছে দেশগ্রামে তারা থাকবেই না। বাড়িঘর যেভাবে আছে পড়ে থাকবে, গরিব আত্মীয়স্বজন কেউ এসে থাকবে, তারা চলে যাবে ঢাকায়। সেখানে যাত্রাবাড়ির ওদিকে জাপানি টাকায় জমি কেনা হয়েছে। সেই জমিতে বাড়িও নাকি উঠছে। বাড়ির কর্তা গনি মিয়া প্রায়ই ঢাকায় গিয়ে সেই বাড়ির তদারক করছে। এই তারা গ্রাম ছাড়ল বলে।

AMARBOI.COM

অন্য শরিকের নাম মন্তাজ। মন্তাজউদ্দিন। বাড়িতে সে থাকে না। ঢাকায় থেকে সদরঘাটে পুরানা কাপড়ের ব্যবসা করে। স্বাধীনতার আগে এক পাকিস্তানি পুরানা কাপড়ের ব্যবসায়ীর কর্মচারি ছিল। খুব বিশ্বাসী ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও হাতের তালুতে জান নিয়ে মালিকের কাজ করে গেছে। দেশ যখন স্বাধীন হয় হয়, পাকিস্তানিরা যখন বেদম লাথ্থি খাওয়া কুত্তার মতো লেজ গুটিয়ে কেঁউ কেঁউ করে পালাচ্ছে তখন মন্তাজের মালিক দোকান আর গুদামের চাবি মন্তাজের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। তুম হামারা বহুত পুরানা আদমি মন্তাজ, সামহালকে রাখখো।

সামলে মন্তাজ ঠিকই রেখেছিল, তবে মালিক হয়ে। সেই গুদামে একশো চল্লিশ গাইট (গাট) মাল ছিল। আর এতবড় দোকান। বছর ঘুরতে না ঘুরতে কোটিপতি হয়ে গেল মন্তাজ। ঢাকায় এখন দুইখান বাড়ি তার। একটা গেন্ডারিয়ায় আর একটা ওয়ারিতে। একটা ছয়তালা, একটা চারতালা। পাঁচ ছয়টা নাকি গাড়ি। একেক ছেলেমেয়ের একেকটা। নিজের একটা, বউর একটা।

দেশগ্রামে মন্তাজ তেমন আসে না। সত্তর আশি বছর বয়সের বুড়া মা থাকে বাড়িতে। তার দেখাশোনা করে কোথাকার কোনও দূর সম্পর্কীয় অনাথ আত্মীয়া ফিরোজা। ষোল সতের বছরের যুবতী মেয়ে।

মাকে মন্তাজ ঢাকায় নেয় না বউর ডরে। মন্তাজের বউ দুই চোখখে তার শাশুড়িকে দেখতে পারে না। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত বার তিনেক ঘোরতর অসুখ হয়েছে মন্তাজের মায়ের। চিকিৎসার জন্য মাকে ঢাকায় নিয়ে গেছে ঠিকই মন্তাজ কিন্তু নিজের বাড়িতে রাখেনি, হাসপাতালে রেখে অসুখ সারিয়ে আবার বাড়িতে দিয়ে গেছে।

নিজে না এলেও মায়ের জন্যে কর্তব্য কাজ যা করার সবই করে মন্তাজ। দোকানের কর্মচারি পাঠিয়ে মায়ের খোঁজ খবর নেয়, টাকা পয়সা, অষুধ বিষুধ পাঠায়। ফল পাকুড় পাঠায়। পাটাতন ঘরের কেবিনের জানালার সামনে সারাদিন শুয়ে থাকে মন্তাজের মা আর বকর বকর করে। কী কথা যে বলে, কেন যে বলে কেউ তা জানে না! সংসার সামলায় ফিরোজা। বুড়ি বকর বকর করে আর ফিরোজা নিঃশব্দে কাজ করে।

দুই শরিকের কারোই গ্রাম গিরস্থি নাই বলে, খেতখোলার ঝামেলা নাই, গাই গরুর ঝামেলা নাই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিমছাম উঠান পালান। গেরস্থি যা করার করেন মান্নান মাওলানা। এত খেতখোলা তার, এতগুলি গাইগরু। বাড়িতে ভাত তরকারি যা রান্না হয় সেই ভাতের ফ্যানে, সেই সব তরকারির ছাল বাকলায় এতগুলি গাইগরুর জাবনা হয় না। তিনবেলা ভাত রান্না হয় বাড়িতে তবু চারটা গামলার দুইটাও পুরাপুরি ভরে না। এই একটা কারণে দুই শরিকের লগে একটু খাতির রাখতে হয়েছে মান্নান মাওলানার। গনি মিয়া আর মন্তাজের মায়ের সংসারে বলা আছে ফ্যান আর তরিতরকারির ছালবাকল যেন বাড়ির বাইরে ফেলে না দেয় তারা। যেন মান্নান মাওলানার আথালের সামনে যে গামলাগুলি আছে সেই গামলায় ফেলে যায়। গাইগরুগুলো তাহলে ভাল খাওয়া দাওয়া করে রাতের ঘুমটা ভাল দিতে পারবে। ভাল খাওয়া, ভাল ঘুম হলে দুধেরগুলি দেদারসে দুধ দিবে সকালবেলা।

চলছেও সেইভাবেই। তিন শরিকের তিনবেলার দ্রব্যে প্রায় ভরে ওঠে চারখান জাবনার গামলা।

AMARBOI.COM

সন্ধ্যার আগে গরু নিয়ে বাড়ি ফিরে গরুগুলি প্রথমে আথালে বাঁধে মাকুন্দা কাশেম। তারপর মাঝারি কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে রান্নাঘরে ঢুকে দুইতিন ঠিলা পানি গরম করে। খৈল ভুষি এসব থাকে রান্নাঘরের এক কোণায়, বিশাল দুইখান হাড়িতে। পানি গরম হলে বালতিতে গরম পানি নিয়ে খৈল ভুষি মিশিয়ে দুইটা করে বালতি দুইহাতে ধরে জাবনার গামলায় এনে ঢেলে দেয়।

দিনভর জমা তরিতরকারির ছালবাকল আর ভাতের সাদাফ্যান মিলেমিশে গামলায় তখন অদ্ভুত একটা গন্ধ। গন্ধটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। খৈল ভুষি মিশানো গরম পানি বালতি বালতি পড়ার লগে লগে বদলে যায় সেই গন্ধ। গাইগরুদের ক্ষুধার উদ্রেক করে এমন একটা গন্ধ বেরয় তখন। গন্ধে গরুগুলি হঠাৎ করে যায় দিশাহারা হয়ে। আথালে বান্ধা গলার সামনে তাদের মোটা শক্ত একখান বাঁশ। আথালের এইমাথা থেকে ওইমাথা পর্যন্ত লম্বা। এই একটা বাঁশেই সার ধরে বান্ধা থাকে গরুগুলি। আথাল থেকে গলা বাড়িয়ে দুইটা করে গরু মুখ দিতে পারে একেকটা গামলায়, গামলাগুলি এভাবে রাখা হয়েছে। খৈল ভুষি মিশান গরমপানি গামলায় পড়বার লগে লগে গরুগুলি যায় পাগল হয়ে। দিশাহারা ভঙ্গিতে গামলায় মুখ দেয়, দিয়েই ছটফটা ভঙ্গিতে মুখ সরিয়ে নেয়। হঠাৎ করে গরম পানিতে মুখ দিলে তো এমন হবেই!

প্রতিদিন একই ভুল করে গরুগুলি। দেখে মাকুন্দা কাশেম খুব হাসে। বেশ একটা মজা পায়। মন মেজাজ ভাল থাকলে ঠাট্টা মশকরাও করে গরুদের লগে। হালার গরু কি আর এমতেই গরু অইছে! রোজঐ মুক পোড়ে, রোজঐ মুক দেয়। মাইনষের লগে গরুর তাফাত অইলো এইডাঐ। মাইনষে এক ভুল বারবারে করে না। গরুরা করে।

আর মেজাজ খারাপ থাকলে মুখে যা আসে তাই বলে গরুদের সে বকাবাজি করে। তবে গরুরা ওসব পাত্তা দেয় না। তারা ব্যস্ত থাকে জাবনা নিয়া। কখন মুখ দেওয়ার মতন ঠাণ্ডা হবে জাবনা, কখন খাওয়া যাবে।

আজও তেমন ভঙ্গিতেই অপেক্ষা করছে গরুরা। কাশেমও তার কাজ নিয়ম মতনই করে যাচ্ছে। তবে অন্যান্য দিনের তুলনায় কাশেম আজ অন্যরকম। না গান গাইছে না গরুদের লগে ঠাট্টা মশকরা করছে, না বকাবাজি করছে। চুপচাপ কাজ করে যাচ্ছে। মান্নান মাওলানা ছিলেন বারবাড়ির দিকে। শীত বিকালের পশ্চিম আকাশে তাকিয়ে সূর্য ডোবার সময়টা দেখতে চাইছিলেন তিনি। খানিক আগে অজু করেছেন। এখনই আজান দেবেন। তারপর বাংলাঘরের চকির উপর, কান্দিপাড়ার ওদিককার কোনও এক মুরিদের সৌদি আরব থেকে এনে দেওয়া পবিত্র কাবা শরীফের চিত্র আঁকা লাল আর সবুজ রঙের মিশেলে তৈরি মখমলের জায়নামাজে নামাজ পড়তে বসবেন। এ সময় মাথায় সাদা গোলটুপি থাকে তাঁর, হাতে থাকে তসবি। আজান না দিয়ে এ সময় তিনি ভিতর বাড়ির দিকে আসেন না। আজ এলেন। কারণ বারবাড়ির সামনে, নাড়ারপালার সামনে দাঁড়ালেও আথালের দিকে মাকুন্দা কাশেমের সাড়া পান। হয় গান গায় কাশেম না হয় গরুদের লগে কথা বলে। আজ তার কিছুই হচ্ছে না দেখে অবাক হয়ে আথালের সামনে এলেন। পায়ে টায়ারের দোয়াল (বেল্ট) দেওয়া কাঠের খরম। হাঁটলে চটর পটর শব্দ হয়। এখনও হচ্ছিল। সেই শব্দ শুনেও গা করল না কাশেম, নিঃশব্দে নিজের কাজ

AMARBOI.COM

করতে লাগল। জাবনা দেওয়া হয়ে গেছে, গরম পানির তেজও গেছে কমে। গরুরা মনের আনন্দে খচরমচর শব্দে খেয়ে যাচ্ছে। আথালের অদূরে বসে বড় একখান আইল্লায় (মাটির মালশা) নারিকেল ছোবড়ার আগুন ফুঁ দিয়ে দিয়ে জ্বালাচ্ছে কাশেম। ছোবড়া পুড়ে যখন লাল দগদগে হবে তখন ছিটিয়ে দিবে ধুপ। সাদা ধুমায় আচ্ছন্ন হবে চারদিক, সুন্দর গন্ধ উঠবে, সারাবাড়ি ভরে যাবে সেই গন্ধে।

তবে ধুপটা কাশেম গন্ধের জন্য জ্বালায় না। বহুত মশা হয়েছে বাড়িতে। বাড়ির লোকজনকে তো পায় না, তারা শোয় মশারির ভিতর, মশারা খায় কী! তারা সব এসে পড়ে গুরুগুলির উপর। অবলাজীব, রাতেরবেলা আর ঘুমাতে পারে না। লেজ ঝাঁপটা দিয়া শুধু মশা খেদায়। এজন্য ধুপ দেয় কাশেম। মোটা লুছনি দিয়ে আইল্লা ধরে আথালে ঢুকে একবার এই মাথায় যায় আরেকবার ওই মাথায়। সাদা ঘন ধুমায় চোখ একেবারেই অন্ধ হয়ে যায় তার। নিজেকেও তখন দেখতে পায় না কাশেম, গরুদেরও দেখতে পায় না। আন্দাজ করে করে হাঁটে। আর ধুপের ধুমায় বেদম আনন্দে ঝোপঝাড় আর কচুরিপ্যানার অন্ধকার থেকে মাত্র বেরিয়ে আসা মশারা তখন গান না ধরে বেদিশা হয়ে পালায়। খুব সহজে এইমুখি আর হয় না। যে বাড়ির আথালে গরু আছে ঠিকই মাকুন্দা কাশেম নাই, ধুপ নাই, তারা তখন সেইমুখি হয়।

কাশেমের অদূরে দাঁড়িয়ে আজ সন্ধ্যায় কাশেমকে খেয়াল করলেন মান্নান মাওলানা। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, ঐ ব্যাডা কী অইছে তর?

আইল্লায় ফুঁ দিতে দিতে কাশেম বলল, কী অইবো! কিচ্ছু অয় নাই।

তাইলে যে এত চুপচাপ!

মনডা ভাল না।

শুনে মান্নান মাওলানা খিক করে হাসলেন। তর আবার মনও আছেনি?

মুখ বন্ধ করে মাওলানা সাহেবের দিকে তাকাল কাশেম। করুণ মুখ করে বলল, হ ঠিকঐ কইছেন। গরিব মাইনষের আবার মন থাকেনি! চাকর বাকরগো আবার মন থাকেনি!

কচ কী! আরে কচ কী তুই! এই পদের কথা কই হিগলি? এক্কেরে বাইসকোপের লাহান কথা!

আবার আইল্লায় ফুঁ দিতে লাগল কাশেম। ফুঁ দিতে দিতে বলল, আপনের আয়জানের সময় অইয়া গেছে হুজুর। যান আয়জান দেন গা, নমজ পড়েন গা।

মান্নান মাওলানা খ্যাক খ্যাক করে উঠলেন। আমি কী করুম না করুম হেইডা তর চিন্তা করনের কাম নাই। তর কী অইছে ক।

ছনুবুড়ির লাশ দেহনের পর থিকা মনডা ভাল না। খালি মউতের কথা মনে অয়।

ছনু নামটা শোনার লগে লগে একত্রে অনেকগুলি প্রশ্ন মনে উদয় হল মান্নান মাওলানার। সকালবেলা ছনুবুড়ির মৃত্যুর কথা শোনার পর হলদিয়া চলে গিয়েছিলেন। হলদিয়া বাজারের পুবদিকের এক বাড়িতে বড়মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। সেই মেয়ের ঘরের মাজারো নাতির ফ্যারা (হাম) উঠছে। কাজির পাগলা বাজার থেকে নাতির জন্য গান্ধী ঘোষের রসগোল্লা নিয়ে গিয়েছিলেন। আথকা বাপকে দেখে মেয়ে আর জামাই

AMARBOI.COM

দুইজনেই গেছে দিশাহারা হয়ে। ছেলের অসুখ ভুলে বাপ নিয়ে ব্যস্ত হয়েছে একজন, শ্বশুর নিয়ে ব্যস্ত হয়েছে একজন। মোরগ জবাই করে, চিনিগুড়া চাউলের পোলাও, ঘন দুধ, গান্ধী ঘোষের রসগোল্লা, বেদম একখান খাওয়া হয়েছে। সেই খাওয়া খেয়ে, দুপুরে ঘুম দিয়ে খানিক আগে বাড়ি ফিরেছেন মান্নান মাওলানা। ছনুবুড়ির লাশের কী হল সেসব আর জানা হয়নি। মজনুকে বলে দিয়েছিলেন ছনুবুড়ির জানাজা হবে না, মাটি হবে না। লাশটা ওরা কোথায় ফেলল!

মান্নান মাওলানা বললেন, ঐ কাইশ্যা, চুন্নির লাচ কী করছে রে? পদ্মায় নিয়া হালাইছে না মড়কখোলায়?

কাশেম যেন আকাশ থেকে পড়ল। গাঙ্গে হালাইবো ক্যা, মড়কখোলায় হালাইবো ক্যা?

তয় কী করছে?

গোড় দিছে।

কই?

গোরস্থানে।

কচ কী?

হ।

জানাজা ছাড়াঐ গোড় দিছে?

জানাজা ছাড়া দিবো ক্যা? মানুষ মরণের পর যা যা করে ছনুবুড়িরেও তা তা কইরা গোড় দিছে।

জানাজা পড়াইলো কে?

খাইগো বাড়ির হুজুরে। মজনু গিয়া তারে ডাইক্কা লইয়াইছে। হুজুর নিজে বইয়া থাইক্কা বেবাক নিয়ম কানন কইয়া দিল। হুজুরের কথা মতন আলার মা বুজানে আরও দুই তিনজন মাইয়ালোক লইয়া ছনুবুড়িরে নাওয়াইলো, কাফোন ফিন্দাইলো। বাড়ির নামায় লাচ রাইক্কা জানাজা পরলো হুজুরে। তারবাদে নিজে লাচ কান্দেও লইলো। বড় মেন্দাবাড়ির লাম্বা সোনা মিয়ায় আছিলো তার লগে। ভালঐ মানুষ অইছিলো জানাজায়। আমিও গেছিলাম।

এমনিতেই তাঁর কথা অমান্য করে খান বাড়ির মসজিদের ইমামকে এনে জানাজা পড়ান হয়েছে ছনুবুড়ির, ইমাম সাহেব নিজে গেছেন গোরস্থানে, লাশ কাঁধে নিয়েছেন শুনে রাগে ভিতরে ভিতরে ফেটে যাচ্ছিলেন মান্নান মাওলানা। তার ওপর তাঁর বাড়ির গোমস্তা গেছে সেই জানাজায়, এটা তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। হঠাৎ করেই কাশেমের কোকসা বরাবর জোরে একটা লাথথি মারলেন। আচমকা এমন লাথথি, হুড়মুড় করে আইল্লার ওপর পড়ল কাশেম। নিজের ফুঁ দিয়ে জ্বালানো আগুন মুখের একটা দিকে লাগল তার। লগে লগে বাবাগো বলে লাফিয়ে উঠল কাশেম। তার পা হাতে লেগে আইল্লার আগুন ছড়িয়ে পড়ল আথালের সামনের মাটিতে। মান্নান মাওলানা সেসব পাত্তা দিলেন না। পা থেকে খরম খুলে শরীরের সব শক্তি দিয়ে পিটাতে লাগলেন কাশেমকে। অবলা জীবের মতন মার খেতে খেতে, ঙো ঙো করে কাঁদতে কাঁদতে

AMARBOI.COM

কাশেম তখন একটা কথাই বলছে, আমারে মারেন ক্যা, আমি কী করছি! ওরে বাবারে, ওরে বাবারে। মাইরা হালাইলোরে, আমারে মাইরা হালাইলো!

কাশেমকে সমানে পিটাচ্ছেন বলে কোন ফাঁকে মান্নান মাওলানার মাথার টুপি খুলে পড়ে গেছে মাটিতে, হাতের তসবি পড়ে গেছে সেসবের কোনও দিকেই তাঁর খেয়াল নাই। কাশেমকে পিটাতে পিটাতে দাঁতে দাঁত চেপে তিনি তখন বলছেন, চুতমারানির পো, কাম করো আমার বাইত্তে, খাও আমারডা, জানাজা পড়তে যাও আমার কথা ছাড়া! যেই জানাজা অইবো না, যেই জানাজায় আমি যাই নাই ঐ জানাজায় আমার বাড়ির চাকর যায় কেমতে! তুই আমার বাইত থিকা বাইর অ শুয়োরেরবাচ্চা। তর লাহান বেঈমান আমি রাখুম না।

পিটাতে পিটাতে কাশেমকে তখন বারবাড়ির দিকে নিয়া আসছেন মান্নান মাওলানা। বাড়ির নামার দিককার রাস্তার মুখে এনে এমন একখান লাথথি মারলেন, সেই লাথথিতে কাশেম গড়িয়ে পড়ল বাড়ির নামায়। তখনও গোঙাচ্ছে। নাকমুখ দিয়ে দরদর করে পড়ছে রক্ত। রক্তে কান্নায় মাকুন্দা মুখটা গেছে বীভৎস হয়ে। এই মুখের দিকে একবারও তাকালেন না মান্নান মাওলানা। আগের মতোই দাঁতে দাঁত চেপে বলতে লাগলেন, আমার বাইত্তে তর আর জাগা নাই। এই তরে বাইর করলাম, আমার বাইত্তে তুই আর ঢুকবি না। আমি সব দেকতে পারি, বেঈমান দেকতে পারি না।

খান বাড়ির মসজিদ থেকে তখন ভেসে আসছিল মাগরিবের আজান। সেই পবিত্র সুরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল একজন অসহায় মানুষের কান্না। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল দিনশেষের অন্ধকার। দুনিয়াদারি মৌন হচ্ছিল গভীর বেদনায়।

AMARBOI.COM

দবির নরম গলায় ডাকল, নূরজাহান।

চকির ওপর পাশাপাশি শুয়েছে হামিদা আর নূরজাহান। মেঝেতে নিজের বিছানায় বসে ঘুমাবার আগের তামাকটা খেয়ে নিচ্ছে দবির। অদূরে গাছার ওপর জ্বলছে কুপি। জানলা দুয়ার বন্ধ ঘরের ভিতর ওইটুকু আলো বেশ চোখে লাগছে। চারদিকে অন্ধকার, শুধু এক জায়গায় সামান্য আলো। ফলে পরিবেশ থমথমা। এই থমথমা ভাব ভেঙে যাচ্ছিল দবির গাছির তামাক টানার শব্দে।

নূরজাহান দুই তিনবার এপাশ ওপাশ করেছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। তবে হামিদার লড়াচড়া নাই, সাড়াশব্দ নাই। আজ সারাদিন বেশ একটা ধকল গেছে তার। যে ধকল শীতের মাঝামাঝি থেকে কোনও কোনওদিন যাওয়ার কথা সেই ধকল শীতের প্রথম দিনেই হামিদার উপর দিয়ে একবার গেল। প্রথম দিনকার রস বিক্রি না করে বাড়িতে

নিয়ে এসেছিল দবির। দিনভর সেই রস জ্বাল দিয়ে তোয়াক করেছে হামিদা। তার ওপর সংসারের অন্যান্য কাজকাম তো ছিলই। নূরজাহান বাড়িতে থাকলে সেও হাত লাগাতো মায়ের লগে। একা সবদিক সামলাতে হতো না হামিদাকে। কিন্তু নূরজাহান বাড়িতে ছিল না। সকালবেলা সেই যে মুখের রস ফেলে ছুটে গিয়েছিল ছনুবুড়িকে শেষ দেখা দেখতে, মুর্দারের খাট কাঁধে পুরুষ মানুষরা গোরস্থানের দিকে রওনা দেওয়ার অনেক পর বাড়ি ফিরেছে। তখন পুরাপুরি বিকাল। সারাদিন পেটে কিছু পড়ে নাই তার উপর কানছে (কেঁদেছে), চোখ দুইটা ফুলা ফুলা, লাল, মুখটা শুকাইয়া ছোট হয়ে গেছে। দবির যাচ্ছিল হাঁড়ি পাততে, নূরজাহানকে দেখে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল তার। যেন মা বাবার মতোই কোনও আপনজন ছেড়ে গেছে নূরজাহানকে। মানুষের জন্য এত মায়া মেয়েটার!

নূরজাহান আবার পাশ ফিরল, আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আগেরবার ডেকে মেয়ের কোনও সাড়া পায় নাই দবির। আবার ডাকল, নূরজাহান।

নূরজাহান ধীর গলায় সাড়া দিল। উঁ।

কী গো মা, ঘুম আহে না?

না বাবা।

ক্যা গো মা?

কইতে পারি না। মনডা জানি কেমুন লাগে!

আমার কাছে আইয়া হুইবা?

হ।

আহো।

চকি থেকে নামল নূরজাহান। দবিরের কোলের কাছে এসে বসল।

হুকা রেখে একহাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরল দবির। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ছনুবুজি মইরা গেছে দেইক্কা এমুন লাগতাছে তোমার, না মা?

হ বাবা।

বাপ যখন জড়িয়ে ধরে নূরজাহানকে বয়স কমে যায় তার, শিশু হয়ে যায়। এখনও হল। বাপের বুকের লগে মিশে গেল নূরজাহান।

গভীর মমতায় মেয়ের মাথায় পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে দবির বলল, বেবাক মাইনষেরঐ একদিন না একদিন মরণ লাগবো মা, এইডাঐ দুইন্নাইর নিয়ম।

নূরজাহান কাতর গলায় বলল, এমুন নিয়ম ক্যা দুইন্নাইর?

দুইন্নাইডা যে বানাইছে এইডা তার নীলাখেলা মা। জীবন দিবোও হে, নিবোও হে।

তাইলে মাইনষের মনের মইদ্যে এত মায়া মহব্বত দেওনের কাম আছিলো কী! কাইল বিয়ালেও যেই মানুষটা আছিল আইজ বিয়ানে হেয় নাই। এই কষ্ট অন্য মাইনষে সয় কেমতে!

দবির কথা বলল না, কুপির আলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

নূরজাহান বলল, ছনুফুবুর লগে আমার আর কোনওদিন দেহা অইবো না, দেশ গেরামে ঘোরতে ঘোরতে কোনওদিন আর দেহুম না মাডির মিহি বেকা অইয়া রাস্তা দিয়া

AMARBOI.COM

আইট্টা যাইতাছে ফুবু। এর কথা অরে কইতাছে, কাইজ্জাকীত্তন লাগায় দিতাছে। একদিন দেহি মেন্দাবাড়ির ঝাকা থিকা পটপট কইরা কয়ডা ঢেরস ছিড়ল। এইমিহি চায়, ওইমিহি চায় আর ছিড়ে। আমি দৌড়াইয়া উটতাছি বাইত্তে, আমারে দেইক্কা এমুন শরম পাইলো! পয়লা মুখখান গেল কালা অইয়া, তারবাদে হাসলো। কেঐরে কইচ না মা! খিদা লাগছে তো এর লেইগা ছিড়লাম। কাচা ঢেরস চাবাইয়া খাওন যায়। খাইতে সাদ, পেডও ভরে। কী করুম ক! পোলারবউ ভাত দেয় না। ঢেরস কোছরে গুইজ্জা হাজামবাড়ি মিহি গেল গা ফুবু। বাবা, আইজ হারাদিন আমার খালি এই কথাডা মনে অইছে। ফুবু আমারে দেইক্কা শরম পাইছিল, কইছিলো কতাডা আমি যেন কেঐরে না কই। আমি কই নাই বাবা, কোনওদিন কেঐরে কই নাই। আইজ পয়লা তোমারে কইলাম। ফুবু মইরা গেছে দেইক্কা কইলাম।

ফোপাইয়া ফোপাইয়া (ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে) কাঁদতে লাগল নূরজাহান। জড়ানো গলায় বলতে লাগল, আল্লায় মাইনষের পেডে এত খিদা দিছে ক্যা বাবা? ক্যা দিছে এত খিদা! জীবন দিছে, মরণ দিছে, খিদাডা দেওনের কাম আছিলো কী!

AMARBOI.COM

মিয়াদের পুকুরপারের পুরানা হিজল গাছটার তলায় খালি গায়ে বসে আছে মাকুন্দা কাশেম। গায়ের রঙ বাইল্লামাছের মতো বলে হিজলের ছায়ায় ফুটে আছে সে।

ঝাঁকিজাল হাতে আলফু যাচ্ছিল পুকুরের পুব দক্ষিণ কোণে। সেখানে পুকুরপার ভরা কাশের জঙ্গল আর পুকুরের পানিতে ঠাসাঠাসি কচুরি। কচুরি আর কাশের রঙ প্রায় একরকম। শুধু ফুল ফুটেছে দুই রঙের। কাশফুল মানুষের মাথার পাকা চুলের মতো আর কচুরিফুল গ্রাম রমণীর হাতের চুড়ির মতো, নীল বেগুনীতে মিশানো। পানির তলায় ডুবে থাকা কচুরির ছোবা (ছোবড়া) দেখতে মান্নান মাওলানার দাঁড়ির মতো। মান্নান মাওলানার দাড়ির ভিতর যেমন লুকিয়ে থাকে নানারকম শয়তানি এই পুকুরের কচুরির ছোবার ভিতর তেমন করে লুকিয়ে থাকে কই রয়না খলিসা ফলি। সুযোগ পেলেই মান্নান মাওলানা যেমন কাঁকুই দিয়ে দাঁড়ি আঁচড়ান প্রায় তেমন করেই কোনও কোনওদিন ঝাঁকিজাল দিয়ে কচুরির চাক বেড় দেয় আলফু। কচুরির ছোবার আড়ালে লুকিয়ে থাকা জিয়ল মাছ ধরে ঘোপায় (মাছ জিয়াবার মাটির হাঁড়ি) রাখে।

দাঁড়ির ভিতর লুকিয়ে থাকা শয়তানিও কি প্রায় এই কায়দাই মনের ভিতর জিইয়ে রাখেন মান্নান মাওলানা!

আজ সকালে ঝাঁকিজাল কাঁধে, হাতে পোড়ামাটির বড় একটা ঘোপা, পুকুরের দিকে যেতে যেতে এই কথাটা মনে হল আলফুর। মান্নান মাওলানা যে এত বদ,

ছনুবুড়ির মৃত্যুর দিন আলফু তা টের পেয়েছে। মজনুর মুখে সব শুনে আলফুর মতো লোকও বুঝে গিয়েছিল সব মিথ্যা, সব শয়তানি মান্নান মাওলানার। ভুল ফতোয়া দিয়েছে সে। মানুষের মৃত্যু নিয়েও এমন করতে পারে মানুষ! তাও যার নামের শেষে আছে মাওলানা! মাথায় টুপি, মুখে দাঁড়ি, হাতে তসবি। কথায় কথায় আল্লাহর নাম নিচ্ছে কিন্তু করছে সব বদকাজ! মানুষ এমন হয় কী করে!

পাশাপাশি মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেবের কথাও মনে পড়ল আলফুর। ফেরেশতার মতো পবিত্র মানুষ। আচার আচরণ কথাবার্তা সব মিলিয়ে মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব হচ্ছেন যথার্থ পরহেজগার, সৎ ধার্মিক মানুষ। কী যত্নে কী মমতায় ছনুবুড়ির জানাজা পড়লেন, লাশ কাঁধে নিয়ে গেলেন গোরস্থানে।

এসব ভেবে মনে মনে মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেবকে সালাম দিল আলফু আর মান্নান মাওলানাকে দিল খুব খারাপ দুই তিনটা বকা। বিড়বিড় করে বলল, মুখে খালি দাড়ি থাকলেঐ অয় না, মাথায় খালি টুপি থাকলেঐ অয় না, দিল সাফ থাকতে অয়, মাইনষের লেইগা মহব্বত থাকতে অয়, কোরান হাদিস ঠিক মতন জানতে অয়, নাইলে মাওলানা অওন যায় না।

ঠিক তখনই হিজলতলায় বসে থাকা মাকুন্দা কাশেমকে দেখতে পেল আলফু। কাশেমের মুখ দেখতে পেল না, পেল পেছন দিকটা। তবু কাশেমকে চিনতে অসুবিধা হল না। এরকম গায়ের রঙ এই গ্রামে আর কারও নাই।

তবে কাশেমকে দেখে অন্যরকমের একটা অনুভূতি হল আলফুর। মাত্র মান্নান মাওলানার কথা ভেবেছে, মান্নান মাওলানাকে বকাবাজি করেছে ঠিক তখনই কি না তার বাড়ির গোমস্তাকে বসে থাকতে দেখল মিয়া বাড়ির হিজলতলায়! অবাক কাণ্ড! এর মধ্যে আল্লাহ্পাকের কোনও ইশারা নাই তো! নাকি মান্নান মাওলানা কোনও অলৌকিক ক্ষমতায় আলফুর মনে মনে দেওয়া গালি শুনতে পেয়েছেন? বাড়ির গোমস্তাকে সেজন্য পাঠিয়েছেন এখানে!

মুখে কথা কম বলা হয় বলে মনে মনে সারাক্ষণই কথা বলে আলফু। এখনও তেমনই বলতে লাগল। আমি হুনছি বদ মাওলানারা কুফরি কালাম জানে। কুফরি কালামের জোরেঐ কি মাকুন্দা কাশেমরে পাডাইছে এহেনে!

ততক্ষণে হিজলতলায় এসে পড়েছে আলফু। তার পায়ের শব্দ পেল না কাশেম। যেমন বসেছিল বসে রইল। পিছন ফিরে তাকাল না।

কিন্তু পিঠে এমুন দাগ ক্যান কাইশ্যার! কী অইছে? পিঠে আর ঘেটিতে ফ্যারা উঠলে যেমুন অয় তেমুন বিনবিনা গোটা।

এই সব দেখে খানিক আগের ভাবনা চিন্তা মন থেকে হাওয়া হয়ে গেল আলফুর। অবাক গলায় কাশেমকে ডাকল সে। ঐ কাইশ্যা।

আলফুর দিকে মুখ ফিরাল কাশেম। কাতর চোখে আলফুর দিকে তাকিয়ে রইল।

তার দিকে মুখ ফিরাবার পর কাশেমের মুখ দেখে চমকে উঠল আলফু। মুখটা বীভৎস হয়ে আছে। নিচের ঠোঁটের মাঝ বরাবর কেটে ঝুলে পড়েছে ঠোঁট। ডানদিকের চোখের কোণ এমন করে ফুলছে, চোখটাই ঢাকা পড়ছে। গাল কপাল ভরা দাগ, থ্যাতলানো, ফুলা ফুলা। মুখ আর মানুষের মুখ মনে হয় না।

AMARBOI.COM

দিশাহারা গলায় আলফু বলল, কী অইছেরে তর? মুখহান এমুন ক্যা?

আলফুর কথার জবাব দিতে পারল না কাশেম। পানিতে চোখ ভরে এল। কাঁদতে লাগল সে।

কাঁধের ঝাঁকিজাল মাটিতে রেখে কাশেমের পাশে বসল আলফু। একটা হাত রাখল তার কাঁধে। গভীর সহানুভূতির গলায় বলল, কী অইছে তর, আমারে ক। কে মারছে?

অতিরিক্ত কষ্ট পাওয়া মানুষ যখন কাঁদে, যত নিঃশব্দেই কাঁদতে থাকে তারা, বুক ঠেলে বেরয় তাদের অদ্ভুত কষ্টের এক শব্দ। কাশেমের কান্নার লগেও মিশে যাচ্ছিল তেমন শব্দ। সেই শব্দে বুক তোলপাড় করতে লাগল আলফুর। কাশেমের পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, ক আমারে, ক, কে মারছে তরে?

কাশেম জড়ান গলায় বলল, হুজুরে।

ক্যা? কী অন্যায় করছস তুই?

ছনুবুজির জানাজা পড়ছি এইডাঐ আমার অন্যায়।

কচ কী!

হ।

দুই হাঁটুর মাঝ বরাবর মুখ নামিয়ে লুঙ্গির খুঁটে চেপে চেপে চোখ মুছতে লাগল কাশেম। কান্না তবু কমল না। জড়ানো গলায় বলল, খালি মাইরাঐ ছাইড়া দেয় নাই, বাইত থিকাও বাইর কইরা দিছে। কইছে ওই বাইত্তে আমার আর জাগা নাই। ঐ বাইত্তে উটলে আমারে হেয় জব কইরা হালাইবো। জন্মের পর থিকা ওই বাইত্তে থাকি আমি। অন্য কোনওহানে গেলে ঘুম আহে না। লাতথি দিয়া হুজুরে আমারে বাড়ির নামায় হালায় দিছে। তাও রাইত দোফরে, বাড়ির বেবাক মানুষ ঘুমাইয়া যাওনের পর বাড়ির সামনের নাড়ার পালাডায় গিয়া হুইয়া রইছি। এক পলকের লেইগাও ঘুমাইতে পারি নাই। মাশায় আমারে খাইয়া হালাইছে। দেহ শইল্লডা কী করছে! এতেও আমার কোনও দুঃখ নাই। মাশায় আমারে যত ইচ্ছা খাউক, আমি খাই কী! দুইদিন ধইরা না খাইয়া রইছি। আলফু ভাই, সব কষ্ট সইজ্জ করন যায়, খিদার কষ্ট সইজ্জ করন যায় না। এত মাইর মারলো হুজুরে, এত বেদনা শইল্লে, খিদার কষ্টে হেই বেদনা আমি উদিস পাই না। আমার মা বাপ নাই, ভাই বইন নাই, কার কাছে যামু আমি! কে আমারে একওক্ত খাওন দিব?

হাঁটুতে মুখ গুঁজে আবার কাঁদতে লাগল মাকুন্দা কাশেম।

দোতালা ঘরের খাটাল থেকে খুনখুনা গলায় ডাকতে লাগলেন বড়বুজান। কুট্টি রে, ও কুট্টি, এইমিহি ইট্টু আয়। তাড়াতাড়ি আয় বইন।

রান্নাঘরের সামনে বসে মাছ কুটছিল কুট্টি। দুইটা শোলটাকি (ছোট শোল। বাচ্চা

AMARBOI.COM

অর্থে) কুটে ছাই আর মাছের আঁশ নিয়েছে ভাঙা কুলায়, পোড়ামাটির খাদায় নিয়েছে কোটা মাছ। মাছ ধুতে ঘাটে যাওয়ার আগে মাছের আঁশ আর ছাই ফেলে যাবে চালতাতলায়, খাদা কুলা হাতে মাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে তখনই ওই ডাক। তবে ডাকের লগে বইন কথাটা খুব কানে লাগল কুট্টির। এই বাড়ির মানুষ খুব সহজে আদরের ডাক ডাকে না কাউকে। বিপদে পড়লে ডাকে আর নয়তো কাউকে দিয়ে কোনও বাড়তি কাজ আদায় করতে হলে। বড় বুজানের কী এমন কাজ পড়ল! সকালবেলার সব কাজ সারিয়ে, কুট্টি বের হয়েছে সংসারের অন্যকাজে। সেটা তো বেশিক্ষণ হয় নাই।

রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে এসব ভাবছিল কুট্টি, সাড়া দেওয়ার কথা মনে ছিল না। বড় বুজান আবার ডাকলেন। কুট্টিরে, ও বইন, হোনচ না?

এবার সাড়া দিল কুট্টি। কী কন?

এইমিহি ইট্টু আয়।

ক্যা?

কাম আছে।

আমি অহন আইতে পারুম না। মাউচ্ছা হাত (মাছের গন্ধ আঁশ ইত্যাদি লেগে থাকা হাত)।

মাউচ্ছা হাতে কিচ্ছু অইবো না। আয় বইন।

বুজানের কাতর অনুনয়ে যেমন বিরক্ত হচ্ছিল কুট্টি তেমন মায়াও লাগছিল। নিশ্চয় কোনও ঝামেলা হয়েছে নয়তো এসময় এমন করে ডাকতো না।

কুলা মাছের খাদা একপাশে নামিয়ে রেখে, রান্ধনঘরের সামনে রাখা ঠিলা কাত করে খলবল করে হাত দুইটা ধুয়ে নিল কুট্টি। শাড়ির আঁচলে হাত মুছে মাছের খাদা নিয়ে দোতালা ঘরের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। কুলা পরে পরিষ্কার করলেও হবে। এখন বড় বুজানকে দেখে উত্তর দিকের বারান্দা টপকে ঘাটে গিয়ে মাছটা ধুয়ে আনলেই হবে। তাছাড়া মাছ এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া যাবে না। কাউয়া চিলের ভয় আছে, বিলাইয়ের ভয় আছে। বাচ্চা দেওয়া বিলাইটা সারাক্ষণ কাতর হয়ে আছে ক্ষুধায়। খেয়ে না খেয়ে পাঁচটা বাচ্চা পাহারা দিচ্ছে ঘরে বসে। চারদিন হল জায়গা বদল করেছে। ঘেটি (ঘাড়) কামড়ে ধরে একটা একটা করে বাচ্চা এনে রেখেছে বড় বুজানের পালঙ্কের তলায়। যতবার খেতে বসে ততবারই টিনের চলটা ওঠা বাটিটায় করে মাছের কাঁটাকোটা, নিজের পাতের মাখা ভাত কিছুটা পালঙ্কের তলায় রেখে আসে কুট্টি। তবু ক্ষুধা বিলাইটার কমে না। সুযোগ পেলেই এইটা ওইটা নিয়া দৌড় দেয়।

খাটালের পালঙ্কের সামনে এসে কুট্টি বলল, কী অইছে বুজান?

পালঙ্কের কাঁথা কাপড়ের ভুরের ভিতর জেগে আছে বড় বুজানের মাথা। শীত পড়তে না পড়তেই শীতে বেদম কাতর হয়েছেন তিনি। হাত পা আর মুখের কুঁচকানো চামড়ায় খড়ি উঠেছে। মাথায় চুল বলে কিচ্ছু নাই, সব উঠে গেছে। পাকা বেলের মতো মাথায় লেগে আছে একেবারেই সাদা দুই একটা চুল। মুখ শুকাইয়া এতটুকু হয়ে গেছে। শীতের সকালে পুকুর থেকে ডাঙায় উঠে কাউট্টা যেমন শক্ত খোলসের ভিতর থেকে মাথা বের করে রোদ পোহায়, কাঁথা কাপড়ের ভিতর থেকে বের হয়ে থাকা বড় বুজানের মুখ মাথা এখন তেমন দেখাচ্ছে।

AMARBOI.COM

কুট্টির কথা শুনে ফোকলা মুখে হাসবার চেষ্টা করলেন তিনি। বয়স আর শরীরের চাপে এমন হয়েছে চেহারা, হাসি কান্নার ভাব একই রকম। কুট্টি বুঝতেই পারে না কোনটা হাসি কোনটা কান্না।

এখনও পারল না। মনে হল বুজান কাঁদছেন। বলল, কী অইছে? কান্দেন ক্যা?

বুজান খিক করে হাসির শব্দ করলেন। কান্দি না, হাসি।

ক্যা? হাসনের কী অইছে?

অইছে একটা কাম।

তাড়াতাড়ি কন। ঘাডে যামু। কোডা মাছ লইয়া ঘরে আইছি। বেইল উইট্টা গেছে। ভাত চড়ামু।

আমি বইন একখান খারাপ কাম কইরা হালাইছি।

কী?

কইতে শরম করতাছে।

ইস আমার কাছে আবার শরম! মার কাছে ল্যাংটা পোলার শরম আছেনি!

বুজান কাঁচুমাচু গলায় বললেন, পেশাব কইরা দিছি।

শুনে কুট্টি খ্যাক খ্যাক করে উঠল। ক্যা আমারে ডাক দিতে পারলেন না? আমি মইরা গেছিনি?

কুনসুম করছি, উদিস পাই নাই।

এমতে দিহি পান। এমতে দিহি চিল্লাইয়া গলার রগ ছিড়া হালান। ও কুট্টি ডহি বাইর কর, আমি পেশাব করুম। অহন চিল্লাইতে পারলেন না? খালি আমার কাম বাড়ায়! বেবাক কেথা কাপোড় অহন রইদ্দে দেওন লাগবো। পশুত দিন নাওয়াইয়া দিছি আইজ আবার নাওয়ান লাগবো। নাওয়াইতে যে জানডা বাইর অইয়া যায় আমার হেইডা কেঐ বোজে? পানি গরম করো, পোলাপানের লাহান কুলে কইরা ফিরিতে (পিড়িতে) নিয়া বহাও। ইস জানডা শেষ কইরা হালাইলো আমার! মাজরো বুজানে ঢাকা যাওনের পর বুজছিলাম অহন কয়ডা দিন আরামে থাকুম, কাম ইট্টু কমবো, কীয়ের কী, আরও দিহি বাড়তাছে!

মাছের খাদা পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল কুট্টি। আগের মতোই গজ গজ করে বলল, পেশাব করনের সমায় মাইনষে আবার উদিস না পায় কেমতে!

বুজান অপরাধীর গলায় বললেন, এমুন তো কোনওদিন অয় নাই। আইজঐ পয়লা। তিন চাইর বচ্ছর ধইরা বিচনায় পড়ছি কোনওদিন এমুন অয় নাই। শীতের দিনে মাইনষের ইট্টু ঘন ঘন পেশাব অয়। হের লেইগা বিচনায় পেশাব করুম, এমনু কোনওদিন অয় নাই। এই শীতটা টিকুম তো! নাকি এইবারের শীতেঐ উডাইয়া নিবো আল্লায়! মরণের আগে বলে এমুন অয় মাইনষের। কী করে না করে উদিস পায় না!

মৃত্যুর কথা শুনে ভিতরে ভিতরে দমে গেল কুট্টি। শীতের শুরুতেই ছনুবুড়ি গেল, আবার যদি বড়বুজানও যায়!

মৃত্যুর কথা ভাবলে বুকের ভিতর কেমন করে কুট্টির। মনে হয় দেশ গ্রামের একেকজন মানুষ একেকটা গাছ, বাড়ির একখান ঘর। সেই ঘর ভেঙে নিলে সেই গাছটা

AMARBOI.COM

কেটে ফেললে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যায়, শূন্য হয়ে যায়। সেই শূন্যতার দিকে তাকালে বুকটা হাহাকার করে। বড়বুজান যদি না থাকে, বড়বুজান যদি মরে যায় তাহলে এই পালঙ্কটা খালি হয়ে যাবে। হঠাৎ করে খাটালে ঢুকলে বুকটা ছ্যাত করে উঠবে কুট্টির। একজন মানুষের শূন্যতা কেমন করে সয় অন্য মানুষ! ছনুবুড়ির শূন্যতা কেমন করে সইছে তাদের বাড়ির লোক!

বড়বুজান বলল, তুই চেতিচ না বইন। আমারে ইট্টু উডা। বিচনাডা বদলাইয়া দে। ভিজা জাগায় হুইয়া থাকতে ভাল্লাগে না।

কুট্টি নরম গলায় বলল, আর ইট্টু থাকেন। ঘাডে গিয়া মাছ ধুইয়াহি আমি, তারবাদে চুলায় পানি গরম দিয়া আইয়া রেবাক কেথা কাপোড় রইদ্দে দিমুনে। আপনেরেও নাওয়াইয়া দিমুনে। ইট্টু সবুর ক .ন।

বড়বুজান বিগলিত গলায় বললেন, আইচ্ছা বইন, আইচ্ছা।

পায়ের কাছ থেকে কোটা মাছের খাদা তোলার জন্য উপুড় হল কুট্টি ঠিক তখনই খাদা থেকে মুখ তুলে চঞ্চল ভঙ্গিতে পালঙ্কের তলার অন্ধকারে ছুটে গেল বিলাইটা। মুখে কামড় দিয়ে ধরা দুই টুকরা মাছ। কুট্টিকে বড়বুজানের লগে কথা বলায় ব্যস্ত দেখে, মাছের গন্ধে পালঙ্কের তলা থেকে বেরিয়ে আসছিল সে। একদিকে বড়বুজান কাজ বাড়িয়েছে অন্যদিকে বিলাইতে লইয়া যায় কোটা মাছ, অন্য সময় হলে এইসব নিয়া গলা চড়াত কুট্টি। খানিক আগে যেটুকু চড়িয়েছিল তারচেয়ে শতগুণ চড়াত। কিন্তু এখন তেমন কিছুই করল না। বিলাইটার জন্যও অদ্ভুত এক মায়া হল তার। খাউক, দুই টুকরা মাছই তো! না খাইতে পাইয়া বিলাইডা যুদি মইরা যায়, এই যে ঘরের ভিতরে টুকটাক ঘুইরা বেড়ায়, খাইতে বইলে পাতের সামলে ঘুরঘুর করে, ম্যাও ম্যাও করে আর নাইলে আল্লাদ দেহায় এই হগল কুট্টি পাইবো কই! ঘর খালি খালি মনে অইবো না!

AMARBOI.COM

ঘন কচুড়ির তলার পানি এমন ঠাণ্ডা হয়, খরালিকালে ডুব দিয়ে কচুরির তলায় গেলে শরীর জুড়ায় আর শীতকালে গেলে শরীর হিম। প্রথমে কাঁটা দেয় শরীরে তারপর শক্ত হতে থাকে। এজন্য শীতকালে কচুরির তলায় যেতে হলে কেউ কেউ খুব জুত করে সউষ্যার তেল মাখে গায়ে। তেল মাখার সময় হাত দুইটা শরীরের এইদিক ওইদিক ঘুরপাক খায় বলে শরীরে এমনিতেই তৈরি হয় এক ধরনেব উষ্ণতা, তার ওপর আছে তেলের উষ্ণতা। দুয়ে মিলে কচুরির তলার পানিকে কাবু করা যায়। তবে কচুরি তোলা আর চাক বেড় দিয়ে মাছ ধরার ব্যাপার থাকলে পানিতে নামার লগে লগে পানির ঠাণ্ডায় ধরতে না ধরতেই কাজের চাপে গরম হয় শরীর, পানির ঠাণ্ডা তো উদিস পাওয়া যায়ই না, একটু পর লাগে গরম। ঘাড় গলা, বুক পিঠ ঘামতে শুরু করে।

এই এখন যেমন হচ্ছে আলফুর।

মাকুন্দা কাশেমকে নিয়ে একটু আগে পুকুরের পুব দক্ষিণ কোণে আসছে সে। পুকুরপারে কাশঝোপের কাছে কাশেমকে বসিয়ে লুঙ্গি কাছা মেরে ঝাঁকিজাল নিয়ে নিজে নেমে গেছে কচুরি ভর্তি পুকুরে। পুকুরের একদিকটায় এখনও হাত পড়েনি। এমনিতেই ঘন কচুরি এখানটায় তার ওপর পারে আছে কাশ, কাশের শিকড় বাকড় তো আছেই, কোনও কোনও নুয়ে পড়া কাশও এসে লেপটে পড়েছে পানিতে, কচুরির ওপর, ফলে জংলা মতন জায়গটাকে নিরাপদ আশ্রয় ভেবে পুকুরের বাছা বাছা মাছগুলি নিশ্চয় এখানে এসে থান গাড়ছে। আলফু আজ সেই মাছ ধরবে। একটানা বেশ কয়েকদিন বাড়িতে থেকে আজ তিনদিন হল বাড়ির কর্ত্রী চলে গেছেন ঢাকায়। যে কয়দিন বাড়ি ছিলেন তিনি আলাম (আস্ত) একটা মাছও পড়েনি আলফুর পাতে। এত মাছ ধরে জিইয়ে রাখে ঘোপায়, হলে হবে কী কোনও কোনও ওক্তে মাছের চেহারাই দেখে নাই। কর্ত্রী বেজায় কৃপণ মানুষ। নিজে খেয়ে শেষ করে গেছেন ঘোপার সব মাছ।

আলফু ভেবেছিল কর্ত্রী চলে যাওয়ার পরদিনই পুকুরে নামবে। বাছা বাছা কিছু মাছ ধরে কুট্টিকে বলবে বেশি করে তেল মশলা দিয়ে রান্না করতে। তারপর দুইটা তিনটা করে আলাম মাছ দিয়া ভাত খাবে একেকবেলা। যে কয়দিন মাছ খেতে পারে নাই সেই কয়দিনেরটা উসিল করবে। কিন্তু দুইটা দিন কেটে গেছে পুকুরে আলফু নামতে পারেনি। একটা দিন গেল ছনুবুড়ির মৃত্যু নিয়ে আরেক দিন সকাল থেকেই আলস্য লাগল। এই সব কারণে আজ আর কোনও কিছু ভাবে নাই আলফু, কোনওদিকে তাকায় নাই, পুকুরে এসে নামছে।

আলফু যখন পুকুরে নামছে মাকুন্দা কাশেম কাতর গলায় বলল, আমিও তোমার লগে নামুম মিয়াবাই?

আলফু বলল, না। তুই বইয়া থাক। খালি একখান চাক উডামু। ঘণ্টাহানির কাম। একলাঐ পারুম। তারবাদে বাইত যামু। কুট্টি ততক্ষুণে রান্দন বাড়ন সাইরা হালাইবো। তরে আমার লগে বহাইয়া খাওয়ামুনে। দুইডা দিন কষ্ট করছস, আর ইট্টু কষ্ট কর।

হেইডা পারুম। তয় আজাইরা থাকলে খিদা বেশি লাগে মিয়াবাই। আমি তোমার লগে নামি?

আলফু হেসে বলল, লুঙ্গি তো ভিজ্জা যাইবো!

যাউক।

ভিজা লুঙ্গি ফিন্দা দিন কাডাবি?

ক্যা আমার আরেকখান লুঙ্গি আছে না।

কো?

কাশেমের মনে পড়ল লুঙ্গিটা মান্নান মাওলানার বাড়িতে রয়ে গেছে। লুঙ্গি কেন তার নিজের ব্যবহারের কোনও জিনিসই সে ওই বাড়ি থেকে আনতে পারিনি।

মার খাওয়া মুখটা আবার বিষণ্ন হয়ে গেল কাশেমের। চোখ দুইটা ছলছল করে উঠল। লুঙ্গিহান বাইত্তে রইয়া গেছে মিয়াবাই। আমারে যে বাইত থিকা বাইর কইরা দিছে, আমি যে ঐ বাইত্তে আর যাইতে পারুম না এই কথাডা আমার মনে থাকে না। ভুইল্লা যাই।

AMARBOI.COM

চোখের পানি সামলাতে অন্যদিকে তাকাল কাশেম।

আলফু বলল, এই হগল চিন্তা কইরা অহন আর মন খারাপ করিচ না। তুই পুরুষপোলা না, কী রে বেডা, পুরুষপোলাগো এমুন মুলাম (মোলায়েম) মন অইলে কাম অয়নি? বাইত থিকা বাইর কইরা দিছে দেইক্কা কী অইছে! শইল্লে জোরবল নাই তর? অন্য বাইত্তে গিয়া কাম লবি। আর যেই বাড়ির মাইনষে তরে বিনা দোষে এমুন মাইর মারছে হেই বাইত্তে তো তর এমতেঐ যাওন উচিত না। হেই বাইত্তে ফিরা যাওনের আশা ছাইড়া দে। অন্য বাড়ি দেক। অন্য বাইত্তে কাম ল।

হাত দিয়ে ডলে ডলে চোখ মুছল কাশেম। হুজুরের বাড়ির গোমস্তারে এই গেরামের কোনও বাইত্তে কামে রাখবো না।

আলফু অবাক হল। ক্যা?

হুজুরের ডরে। গেরামের বেবাক মাইনষেঐ হুজুররে ডরায়। হের পোলা আতাহাররে ডরায়। আমারে কামে রাইক্কা হেগো শতরু অইবো কেডা?

তাইলে কনটেকদার সাবের কাছে যা, মাইট্টাল অ। দিন গেলে নগদ টেকা পাবি।

ওহেনেও ভেজাল আছে। আতাহারে অইলো কনটেকদার সাবের দোস্ত।

আলফু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তুই তো তাইলে এই গেরামেই থাকতে পারবি না। অন্য গেরামে গিয়া কাম কাইজ কইরা খাইতে অইবো তর।

হেইডা আমি পারুম না মিয়াবাই।

ক্যা?

আমি কোনওদিন এই গেরাম ছাইড়া কোনওহানে যাই নাই, কোনওহানে গিয়া থাকি নাই। একদিন এই গেরামে আমগো বাড়িঘর আছিলো, বাপ দাদারা আছিলো, চাচারা আছিল, অহন আর কেঐ নাই। কেঐ গেছে মইরা, কেঐ গেছে দেশ গেরাম ছাইড়া। রক্তের আততিয় স্বজন কে কোনহানে আছে কইতে পারি না। এই গেরামডারেঐ মনে অয় আমার আততিয়। আমার বাপ দাদা, ভাই বেরাদর, চাচা ফুবু, বেবাক মনে অয় এই গেরামডারে। এই গেরাম ছাইড়া আমি কোনওহানে যামু না। মইরা গেলেও যামু না।

কাশেমের কথা শুনে অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল আলফু। তারপর পানিতে নামছে। ঝাঁকিজালটা হাতেই ছিল। শক্ত, মোটা সুতার জাল। ঘন করে কাঠি দেওয়া। একটু লম্বা ধরনের লোহার কাঠি। গাবের কষে প্রায়ই ভিজিয়ে রাখা হয় বলে কড়কড়া শুকনা বেগুনির কাছাকাছি রঙের শক্ত জাল। পাঁচ সাত কেজি ওজনের রুই বোয়ালেরও সাধ্য নাই এই জাল ছিঁড়ে বের হয়। ঘন করে কাঠি দেওয়া বলে জালের ওজনও বেশ। পানির তলায় গিয়ে এমন করে ছড়ায় জাল, ওজনদার বলে কাঠিগুলি গেঁথে যায় কাদায়। কাদার ভিতর লুকিয়ে থাকা শোল গজার তরি কাদা ভেঙে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় না। জালে আটকা পড়তেই হয়। তবে আলফুর মতো দশাসই জুয়ান ছাড়া এই জাল বাওয়া কঠিন। ছুড়ে জায়গা মতো ফেলা তো দূরের কথা, এক হাতে রশি ধরে অন্যহাতে বারোহাতি জাল কায়দা করতেই জান বের হয়ে যাবে।

এই জালে আজ চাক বের দিবে বলে জালের বারো চৌদ্দ হাত লম্বা রশিখান গুটিয়ে গরুর মুখের ঠুলির মতো গোল করেছে আলফু। এমন করে গিটঠু দিয়েছে যাতে রশিটা

AMARBOI.COM

খুলতে না পারে। চাক বেড় দেওয়ার সময় রশি খুলে যদি পানির তলায় ছড়িয়ে যায়, পানির তলায় লুকিয়ে থাকা কোনও খুঁটাখাটির লগে যদি প্যাঁচায়া যায় তাহলে লাগবে আরেক ভেজাল। অতিকষ্টে কচুরির তলা দিয়ে টেনে নিয়ে চারদিক থেকে কচুরির দশ বারোহাতি চাক বেড় দিয়ে যখন কচুরি তুলে ফেলতে ফেলতে গুটিয়ে আনা হবে জাল, হয়তো তখনই পানির তলায় জড়িয়ে যাওয়া রশির টানে কচুরির তলা থেকে সরে যাবে জাল। পালাবার তক্কে থাকা মাছগুলি পালিয়ে যাবে। সামান্য ভুলের জন্য পরিশ্রমটাই মাটি। এজন্য আগেভাগেই কাজটা সেরে রাখছে আলফু।

নিঃশব্দে কচুরির জঙ্গল ফাঁক করে আলফু যখন পানির গভীরে আগাচ্ছে তখনই ঘাটলায় মাছ ধুতে এসে তাকে দেখতে পেল কুট্টি। দেখে আনমনা হল। সেই যে একদিন চালতাতলায় আলফুর ঘাড়ের কাছে একটুখানি রোদ পড়ে থাকতে দেখে শরীরের খুব ভিতরে অন্যরকমের একটা অনুভূতি হয়েছিল, এতদূর থেকে আলফুকে দেখে আজও ঠিক তেমন অনুভূতিই হল। সব ভুলে আলফুর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। পুকুরপারে যে আরেকজন মানুষ আছে কুট্টি তাকে দেখতেই পেল না।

AMARBOI.COM

হাঁটাচলা করতে পারে না এমন পোলাপানকে যেমন করে ঘরে আনেন মা, নাওয়াইয়া ধোয়াইয়া (গোসল টোসল) পাথালি কুলে (পাঁজাকোল) নেন, ঠিক তেমন করে বড়বুজানকে ঘরে নিয়ে এল কুট্টি। পেশাবে দুর্গন্ধ হওয়া কাঁথা কাপড় আগেই রোদে দিয়েছিল। খাটালের পালঙ্কে এখন অন্য তোষক বিছানো। তোষকের উপর অন্য কাঁথা, সাদা গিলাপ লাগান অন্য বালিশ, শীতকালের জন্য তুলে রাখা লেপও বের করা হয়েছে। কটকটা লাল রঙের লেপখান ঢোকান হয়েছে ঠিক সাদা না সাদার কাছাকাছি রঙের ওসারে (ওয়ার)। এসবই তোলা ছিল ছোটখাট ঘরের সমান টিনের আলমারিতে। দীর্ঘদিন আলমারি বন্দি থাকার ফলে লেপ তোষকে ঘুম ঘুম গন্ধ হয়। বড়বুজানের পালঙ্কে এখন সেই গন্ধ। খুব সহজ প্যাঁচে বড়বুজানকে যখন সাদা কাপড় পরিয়ে পালঙ্কের ওপর বসিয়েছে কুট্টি, মানুষটার মুখে তখন গভীর প্রশান্তির হাসি। খুনখুনা গলায় বললেন, বহুত আরাম লাগতাছে রে বইন।

শুনে কপট রাগের গলায় কুট্টি বলল, আরাম তো লাগবোঐ! আরামের কাম কইরা দিলাম যে! আপনের আরামের লেইগা আমার যে কী খাটনিডা গেল হেইডা তো একবারও চিন্তা করলেন না!

কে কইছে চিন্তা করি নাই? করছি। তয় চিন্তা কইরা কী করুম ক? আমি আতুর লুলা মানুষ, আমার কিছু করনের আছে!

বড়বুজান কাত হয়ে শুয়ে পড়তে চাইলেন। দুইহাতে তাকে ধরল কুট্টি। ইট্টু পরে হোন।

ক্যা?

শইল্লে ইট্টু তেল দিয়া দেই।

শরীরে তেল ডলে দেওয়ার কথা শুনে খুশি হলেন তিনি। ফোকলা মুখ হাসিতে ভরে গেল। এটা যে কান্না না, এটা যে আনন্দের হাসি বুজানের মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল কুট্টি। তার মুখেও হাসি ফুটল। ইস তেল দেওনের কথা হুইন্না দিহি আল্লাদে আর বাচে না! হাসে কী!

আমার হাসন তুই বোজছ! তুই দিহি কচ আমি হাসি না কান্দি বুজা যায় না।

অহনকারডা বোজলাম।

খাটালের ছোট্ট আলমারির মাথার উপর রাখা সউষ্যার তেলের শিশি নিয়ে এল কুট্টি। এক হাতের তালুতে একটু তেল ঢেলে দুইহাতে সেই তেল ঘষে প্রথমে বুজানের মাথায়, তারপর হাতে পিঠে বুকে ডলতে লাগল। ডলায় ডলায় শিশুর মতো দোল খেতে লাগলেন বড়বুজান। শীতের দিনে সউষ্যার তেল শইল্লে দিলে শইল গরম থাকে। শীত লাগে কম।

কুট্টি বলল, তয় একখান কামও বাড়ে।

কী কাম?

শইল্লের বেবাক তেল লাইগ্যা যায় বিচনায়। বিচনা নষ্ট অয়।

বুজান একটু চমকালেন। ঘোলা চোখে কুট্টির মুখের দিকে তাকালেন। হ এইডা তো ঠিক কথা কইছস! আইজঐ নতুন বেপ তোষক বাইর করলি আইজঐ হেইডি নষ্ট অইবো! তাইলে আমারে তেল দেওনের কাম আছিলো কী!

তেল ডলতে ডলতে কুট্টি বলল, এত কষ্ট কইরা এত কাম আপনের লেইগা আইজ করলাম, এডু আর বাকি রাখুম ক্যা! বিচনা নষ্ট অইলে আমার কামঐ বাড়বো! আপনের কী?

তুই খুব ভালরে বইন, খুব ভাল।

কেডা কইছে আমি ভাল! আমি দিহি খালি আপনের লগে রাগ দেহাই, কাইজ্জা করি! ভাল অইলাম কেমতে!

কো কাইজ্জা করচ!

করি না?

যা করচ ওইডা কাইজ্জা না।

তয় কী?

ঐডা তর সবাব। যে কোনও কামে পয়লা ইট্টু চিল্লাচিল্লি করচ, তারবাদে হেই কামডাঐ খুব ভাল কইরা করচ। এই হগল মাইনষের ভিতরডা খুব ভাল অয়।

কুট্টি একটু উদাস হল। ভিতর ভাল অইলে কী অইবো? ভিতরডা তো মাইনষে দেহে না!

যারা মাইনষের ভিতর দেহে না তারা মানুষ না। তারা আমানুষ।

AMARBOI.COM

দুইন্নাইতে আমানুষঐ বেশি। জন্মের পর থিকা মা বাপরে দেকলাম, তাগো পেডে জন্মাইলাম, তাগো কুলে বড় অইলাম, তারা কেঐ আমার ভিতরডা দেকলো না। হাত পাও বাইন্দা হতিনের ঘরে ঘর করতে পাডাইলো। হতিন তো হতিনঐ, হেয় আমারে কী বুজবো! যার লগে বিয়া অইলো হেই মানুষটাঐ কিছু বোজলো না! পেডের কষ্ট তো আছেঐ, মনের কষ্টও আছে। যে কোনও একখান কষ্ট মাইনষে সইজ্জ করতে পারে দুইখান করে কেমতে! খাইতেও দিবো না মনও বুজবো না হেই মাইনষের ঘর কেমতে করে মাইনষে!

তেল ডলা শেষ করে বড়বুজানকে শোয়াইয়া দিল কুট্টি। গলা তরি লেপ টেনে দিল। বড়বুজান তখন ঘোলা চোখ দুইখান মায়াবি করে তাকিয়ে আছেন কুট্টির দিকে।

কুট্টি বলল, চাইয়া রইলেন ক্যা?

তরে দেকতাছি।

আমারে আবার দেহনের কী অইলো! এমুন পচামুখ মাইনষে দেহে?

আমি তর মুখ দেহি না, আমি তর ভিতরডা দেহি। তর লাহান একখান মাইয়া যুদি আমার থাকতো, এই দুইন্নাইতে আমার তাইলে কোনও দুঃকু থাকতো না।

আর আমার মা বাপে আমারে বাইত্তে যাইতে দেয় না। আমার মুখ দেহে না।

তর মা বাপে মানুষ না। আমানুষ।

তয় তাগোও আমি দোষ দেই না। দোষ দেই আমার কপালের। বিয়ার বস (বয়স) অওনের পর থিকা জামাই লইয়া, জামাইবাড়ি লইয়া কতপদের চিন্তা করছি। কত খোয়াব দেকছি। চিন্তা করছি এক, খোয়াব দেকছি এক, অইছে আরেক।

কুট্টি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বড়বুজান বললেন, আমার যুদি একখান পোলা থাকতো, হেই পোলার যদি তর লাহান একখান বউ থাকতো, আহা রে, কত খুশি অইতাম আমি।

দখিনা দুয়ার দিয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে কুট্টি বলল, বিয়ার আগে চিন্তা করছি জামাই বাইত্তে গিয়া আমার হরির (শাশুড়ি) বেবাক কাম কইরা দিমু আমি। হৌরের বেবাক কাম কইরা দিমু। গিয়া দেহি হৌরও নাই হরিও নাই। আছে একখান হতিন, তার এন্দাগেন্দা পোলাপান।

বিয়ার আগে তুই হোনচ নাই হতিনের ঘর?

না।

কচ কী!

হ। আমারে কেঐ কয় নাই। বুজান, আপনের কাম কাইজ যহন কইরা দেই, আপনেরে নাওয়াই ধোয়াই, খাওয়াই ঘুম লওয়াই তহন আপনেরে আর দেহি না আমি। দেহি বিয়ার আগে খোয়াবে দেহা আমার হরিরে। দেহি আমার জামাই বাড়িডা। যেন আমি আমার হরির কাম কাইজঐ করতাছি। যেন আমি আমার জামাই বাইত্তেঐ আছি। আমি তহন আর আউজকার আমি থাকি না। আমি অইয়া যাই কহেক বচ্ছর আগের আমি।

কুট্টির কথা শুনে বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল বড়বুজানের। গভীর দুঃখের গলায়

AMARBOI.COM

বললেন, বহুত ছোডকালে বিয়া অইছিলো আমার। ছয় সাতমাস জামাইর ঘর করছিলাম। তারবাদে জামাই মরলো। আগের দিনে ভাল বংশের মাইয়ারা রাড়ি (বিধবা) অইলে হারা জনমঐ রাড়ি থাকতো। তাগো আর বিয়া অইতো না। আমারও আর বিয়া অয় নাই। বাপের অবস্তা ভাল আছিলো দেইক্কা বাপে আমারে আর জামাই বাইত্তে রাখে নাই। বাপের বাইত্তে লইয়া আইছিল। একভাই দুইবইন আছিলাম আমরা। ভাইডা বেবাকতের ছোড। ছোড অইলে কী অইবো হেয়ঐ গেল বেবাকতের আগে। অহন আছি খালি রাজা মিয়ার মায় আর আমি। দুই বইনে খুব খাতির আছিলো আমগো, অহনও আছে,এর লেইগাঐ জনম ভর বইনে আমারে টানলো। বইনের সংসারে জীবনডা কাইট্টা গেল আমার। স্বামী সংসার বোজনের আগে বিয়া অইছিলো, বোজনের আগেঐ রাড়ি অইলাম। জীবনের সাদ আল্লাদ কিছুই বোজলাম না। স্বামী সংসার, পোলা মাইয়া, পোলার বউ, মাইয়ার জামাই, নাতি নাতকুর সব মিলাইয়া মাইয়াছেইলাগো যেইডা জীবন হেই জীবন আমি কোনওদিন চোক্কে দেকলাম না। একটা জীবন জীবন না অইয়া কাইট্টা গেল। কুট্টিরে, তর জীবনডাও দেকতাছি আমার লাহান। দিনে দিনে দিন চইলা যাইবো, একদিন দেকবি আমার লাহান বিচনায় পড়ছস, আর উইট্টা খাড়ঐত পারবি না। তহন খালি মনে অইবো জন্মাইছিলাম ক্যা! মাইনষের আসল যেই জীবন হেই জীবনঐ যদি না পাইলাম তয় জন্মাইছিলাম ক্যা!

বড়বুজানের কথা শুনে কখন যে কাঁদতে শুরু করেছে কুট্টি, কখন যে চোখের পানিতে গাল ভাসতে শুরু করেছে, কুট্টি তা টেরু পায়নি।

পালঙ্কের তলায় শিলাইয়ের বাচ্চাগুলি তখন কুঁইকুঁই করছে। বোধহয় ক্ষুধা লেগেছে তাদের, বোধহয় মায়ের সঙ্গে আল্লাদ করছে।

AMARBOI.COM

আলফু বলল, ভোলে কইরা ভাত দেও।

কুট্টির চোখ দুইটা ফুলা ফুলা, সেই চোখে আনমনা চাউনি। মুখ থমথম, দুঃখি। তবু আলফুর কথা শুনে অবাক হল। ক্যা?

কুট্টির মুখের দিকে তাকাল না আলফু। বলল, এমতেঐ। ভাত সালুন যা দেওনের একবারে ভোলের মইদ্যে দিয়া দেও আমি রান্দনঘরের ওহেনে বইয়া খামু।

আলফু ভাত খায় দোতলা ঘরের সামনের বারান্দায় বসে। রান্না হয়ে যাওয়ার পর ভাত তরকারি সব দোতালা ঘরের বারান্দায় নিয়ে আসে কুট্টি। এই ঘরের ভিতর দিককার বারান্দাটা খোলা না। খাটালের মতোই আরেকটা অংশ। বাইরের দিককার দরজা বন্ধ করে দিলে বারান্দা ঢুকে যায় ঘরের ভিতর। বারান্দার পশ্চিম কোণে ভাত

সালুনের হাঁড়ি কড়াই, থাল বাসন এসব রাখার ব্যবস্থা। সেই জায়গায় বসে মাত্র ভাত বাড়বে কুট্টি তখনই এই কথা বলল আলফু। কথা প্রায় বলেই না সে। ভাত বাড়া হলে কুট্টি ডাকে। নিঃশব্দে বারান্দায় এসে বসে। যত দ্রুত সম্ভব খেয়ে, কোনওদিকে না তাকিয়ে চলে যায়। সেই আলফু আজ কুট্টি না ডাকতেই ঘরে এসে ঢুকেছে। তারপর ওই কথা। অন্যসময় হলে যতটা অবাক হত কুট্টি, বড়বুজানের কথা শুনে মন খারাপ হয়ে আছে বলে অত অবাক সে হয়নি। টিনের মাঝারি গামলায় ভাত বাড়তে বাড়তে আনমনা গলায় বলল, সালুন আইজ ভাল না। শোলটাকি কুটছিলাম, দুই টুকরা খাইয়া হালাইছে বিলাইতে। রান্দনও মনে অয় ভাল অয় নাই। বড়বুজানরে লইয়া কাম পইড়া গেছিল।

কুট্টি যখন এই ধরনের কথা বলে আলফু চুপ করে থাকে। আজ চুপ করে রইল না। কথা বলল। ঘোপায় মাছ আছিল না। রানবা কই থিকা! তয় ম্যালা মাছ ধরছি আইজ। ষোল্লডা এত বড় বড় কই। রয়না খইলসা ফলি, শোল টাকি, গজার টাকি। তিন ঘোপা ভইরা হালাইছি। রাইত্রে ভাল কইরা রাইন্দো।

আলফুর কথা শুনে খারাপ হয়ে থাকা মন কেন যেন একটু হালকা হয়ে উঠল কুট্টির। যেন আরও কথা বললে আরও হালকা হবে মন। এক সময় পুরাপুরি ভাল হয়ে যাবে।

আলফুর চোখের দিকে তাকিয়ে কুট্টি বলল, রান্ধনঘরের সামনে বইয়া খাওনের কাম কী! এহেনেঐ বহেন।

আলফু অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, না থাউক।

ক্যা? রোজ তো এহেনেঐ বহেন।

আইজ বমুনা।

একথায় কুট্টি একটু ঠাট্টা করল। ক্যা আমার বোগলে (সামনে) বইয়া খাইতে শরম করে! আমার চেহারা খারাপ হেইডা আমি জানি। এই চেহারার সামনে বইয়াঐ তো আগে খাইতেন। আইজ আথকা কী অইলো! চেহারা কি বেশি খারাপ অইয়া গেছে আমার!

কুট্টির কথা শুনে পলকের জন্য তার দিকে তাকাল আলফু। বলল, এই হগল কথা কইয়ো না। যে তোমার চেহারা খারাপ কয় মাইনষের চেহারা হে বোজে না।

এ কথায় কুট্টির ভিতরটা কেমন করে উঠল! আলফুর দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। আশ্চর্য এক লজ্জায় গা কাঁটা দিয়ে উঠল। সেই যে সেদিন চালতাতলায় আলফুকে দেখে যেমন হয়েছিল, আজ ঘাটে দাঁড়িয়ে যেমন হয়েছিল ঠিক তেমন এক অনুভূতি শরীরের খুব ভিতরে এখনও হল। কিছুতেই আলফুর দিকে আর তাকাতে পারল না সে। দ্রুত হাতে ভাত সালুন বেড়ে, থাল দিয়ে গামলার মুখ ঢেকে আলফুর হাতে দিল। এলুমিনিয়ামের জগের একজগ পানি দিল, একটা মগ দিল। সেসব নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেল আলফু।

আলফু চলে যাওয়ার পর নিজের জন্য ভাত বাড়বে কুট্টি, বাড়তে ইচ্ছা করল না। ক্ষুধা যেন নাই তার, ক্ষুধা যেন মরে গেছে। কেন যে আলফুর মুখটা খুব দেখতে ইচ্ছা

AMARBOI.COM

করছে, কেন যে ইচ্ছা করছে রান্ধনঘরের সামনে বসে কেমন করে ভাত খাচ্ছে আলফু একটু দেখে আসে। ভাত কম হল কিনা তার, তরকারি কম হল কিনা দেখে আসে।

কিছু না ভেবে বাইরে এল কুট্টি। এসেই থতমত খেল। রান্ধনঘরের সামনে আলফু নাই। ভাত পানি নিয়া কোথায় গেল! কোথায় বসে খাচ্ছে! এই বাড়ির অন্যকোনও ঘরও তো খোলা নাই যে সেই ঘরে বসে খাবে। ব্যাপার কী!

আলফুকে খুঁজতে আমরুজতলায় এল কুট্টি। না সেখানে কেউ নাই। ভর দুপুরের নির্জনতায় খা খা করছে আমরুজতলা। একটা শালিক টুকটুক করে লাফাচ্ছে সাদা মাটিতে। শালিকটা চোখে পড়ল না কুট্টির। তার মনে তখন একটাই চিন্তা। ভাত পানি নিয়া কোথায় উধাও হয়ে গেল একজন মানুষ!

পশ্চিম দক্ষিণের ঘর দুইটার মাঝখানকার চিকন রাস্তায় কুট্টি তারপর চালতাতলায় এল। এসেই থতমত খেল। চালতাতলায় সামনা সামনি বসে ভাত খাচ্ছে আলফু আর মাকুন্দা কাশেম। আলফু খাচ্ছে গামলায় করে, থাল দিয়েছে কাশেমকে। কোনওদিকে না তাকিয়ে গপাগপ গাপাগপ খেয়ে যাচ্ছে কাশেম।

কিন্তু কাশেমের মুখটা এমন কেন? এমন হয়েছে কী করে!

কুট্টি যখন এসব ভাবছে তখন হঠাৎ করেই পিছন ফিরে তাকাল আলফু, তাকিয়ে হতবাক হয়ে গেল। খাওয়া ভুলে কুট্টির দিকে তাকিয়ে রইল।

AMARBOI.COM

শীতের বিকাল দ্রুত পড়ে যায়। বিকালেই হয়ে যায় সন্ধ্যা। আজকের সন্ধ্যা যেন আরও তাড়াতাড়ি হয়েছে। কখন বিকাল হল কখন ফুরাল কুট্টি তা টেরই পেল না। দুপুরবেলা চালতাতলায় বসে ওইভাবে দুইজন মানুষকে ভাত খেতে দেখার পর মনটা কেমন হয়ে আছে। নিজের ভাগের ভাত আরেকজন মানুষের লগে ভাগ করে খেতে হবে দেখে কুট্টির লগে খুব ছোট্ট একখান চালাকি করল আলফু। কেন করল! কুট্টিকে তো বললেই পারত, ভাত সালুন ইট্টু বেশি কইরা দিও। আমার লগে আরেকজন মানুষ খাইবো।

যে মানুষটার জন্য চালাকি আলফু করল, মাকুন্দা কাশেম, তাকে কুট্টি জন্মের পর থেকেই চিনে। একই গ্রামের মানুষ। তার কথা শুনলে কি ভাত একটু বেশি করে দিত না কুট্টি, সালুন দিত না! না হয় নিজে একটু কম খেত। একবেলা একটু কম খেলে কী হয়! প্রথমে বাপের ঘরে, পরে স্বামীর ঘরে কতদিন আধাপেট খেয়ে থেকেছে! কতদিন না খেয়ে থেকেছে। দুইদিন তিনদিন কেটে গেছে অনাহারে, একমুঠ ভাত জোটে নাই।

কথাটা আলফু কেন বলল না কুট্টিকে! দিনভর যে রকম পরিশ্রম করে, ওইরকম

পরিশ্রমের পর আধাপেট খেয়ে দিনটা তার কাটছে কী করে! তার ওপর একলা একটা চাক তুলেছে পুকুর থেকে। চাক তোলা যে কী পরিশ্রমের কাজ, যে না তুলেছে সে তা কখনও বুঝবে না। মাকুন্দা কাশেমের কথা যদি কুট্টিকে আলফু বলত তাহলে নিজের ভাগ থেকেও কিছুটা ভাত তাকে দিতে পারত কুট্টি। একজনের ভাগেরটা দুইজনে না খেয়ে দুইজনের ভাগেরটা খেতে পারত তিনজনে। তাতে পেট প্রায় ভরে যেত। কষ্টটা আলফুকে একা করতে হত না।

তবে মনের দিক দিয়ে আলফু যে খুব ভাল, মানুষের জন্য যে গভীর মায়া মমতা আছে তার আজ ওই দৃশ্যটা দেখার পরই কুট্টি তা টের পেয়েছে। মাকুন্দা কাশেম মেদিনীমণ্ডলের লোক আর আলফু পদ্মার মাঝখানে জেগে ওঠা কোথাকার কোন মাতবরের চরের লোক। দুইজন দুইবাড়ির গোমস্তা কিন্তু একজনের জন্যে কী টান আরেকজনের। মানুষের জন্যে মানুষের এই টানের নাম কী! এই টান থাকলে কি একজন আরেকজনের লগে ভাতের মতো ভাগ করে নিতে পারে জীবনের সবকিছু! সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা, হাসি কান্না!

এইসব ভেবে দুপুরের পর থেকে সন্ধ্যা তরি সময়টা যেন চোখের পলকে কেটে গেছে কুট্টির। চালতাতলা থেকে ফিরে এসে নিজে ভাত নিয়ে বসেছে ঠিকই খেতে ইচ্ছা করে নাই। বারবার মনে হয়েছে আরও কিছুটা ভাত সালুন দিয়ে আসে দুইজনকে। কিন্তু দিতে সে যায়নি। ভাত খেতে খেতে আলফু যেভাবে তার দিকে তাকিয়েছিল, চোখে যে ধরা পড়ে যাওয়া অপরাধী দৃষ্টি ছিল সেই দৃষ্টির সামনে আর যেতে ইচ্ছা করে নাই। শরম পাওয়া মানুষকে যে আবার শরম দেয় সে কোনও মানুষ না।

তবে শরমটা আলফু একটু বেশিই পেয়েছিল। খাওয়া দাওয়া শেষ করে থাল গেলাস গামলা সে আর কুট্টির কাছে ফিরায়া দিয়া যায় নাই, রান্ধনঘরের ছেমায় (সামনে) রেখে মাকুন্দা কাশেমকে নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল।

একটা কথা কিছুতেই কুট্টির মাথায় ঢুকছে না, মাকুন্দা কাশেম হঠাৎ করে আলফুর লগে এসে খেতে বসল কেন! মুখ চোখই বা অমন দেখাচ্ছিল কেন তার! কী হয়েছে! মান্নান মাওলানা কি মারধোর করেছে, বাড়ি থেকে খেদাইয়া দিছে!

ইচ্ছা করলে দুপুরবেলাই এই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেত কুট্টি, যদি আরেকটুক্ষণ চালতাতলায় দাঁড়াত, যদি আলফু আর নয়তো মাকুন্দা কাশেমের লগে কথা বলত। কিন্তু আলফুর শরম পাওয়া দেখে ওখানে আর দাঁড়াতে ইচ্ছা করে নাই। ঘরে ফিরে এসেছিল। তারপর থেকে সময় কেটেছে ঘোরের মধ্যে।

আসলে একই দিনে দুই দুইটা ঘটনা আজ ঘটে গেছে কুট্টির জীবনে। দুপুরের মুখে মুখে চাক তুলতে নামা আলফুকে দেখে দ্বিতীয়বারের মতো শরীরের খুব ভিতরে হয়েছে এক অনুভূতি আর চালতাতলায় বসে মাকুন্দা কাশেমকে নিয়ে ভাত খেতে দেখে হয়েছে মনের মধ্যে এক অনুভূতি। একই দিনে শরীর আর মনের অনুভব একজন মানুষকে তো বদলে দিবেই! আর যে অনুভব মানুষটার জীবনে এই প্রথম। কিছুকাল হলেও স্বামীর ঘর সে করেছে, খানিকটা হলেও পুরুষদেহ বুঝেছে। মন বোঝেনি একটুও। না নিজের না পুরুষটার। সংসারের অভাব অনটন, সতীন, সতীনের এন্দাগেন্দা পোলাপান কুট্টিকে

AMARBOI.COM

জীবনের স্বাদ পেতে দেয়নি। স্বামীর দেহ মন কোনওটাই সে ঠিকঠাক আবিষ্কার করতে পারে নাই। আবিষ্কার করবার সুযোগই পায় নাই। আজ পারল। তবে যারটা পারল সে স্বামী না, সে এক পরপুরুষ। সেই মানুষ উদিসই পাইলো না কুট্টি তার মনের কতখানি দেখে ফেলছে, কতখানি বুঝে ফেলছে।

অন্যদিকে কুট্টি যেন আজ নিজেকেও আবিষ্কার করল। নিজের দেহ মন আবিষ্কার করল। প্রথমে মিলতে হবে নারী পুরুষের মন। একজনের মন হবে আরেকজনের। মনের টানে একাকার হবে মন, তারপর দেহ। এই না হলে মানুষের জীবন জীবন হয়ে ওঠে না। নারীজন্মের আড়ালে লুকিয়ে থাকে যে পুরুষ আজ যেন সেই পুরুষটাকেই পেয়ে গেছে কুট্টি। বিহ্বল তো সে হবেই, সময় তো সে বুঝতেই পারবে না!

ঘরগুলির কোণাকানছিতে কালো ধুমার মতো জমতে শুরু করেছে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে গলা খুলছে রাতপোকারা। ফলে সন্ধ্যাবেলাই শুরু হয়ে গেছে রাতের শব্দ। গাছপালার মাথার ওপর যে স্বচ্ছ নীল আকাশখান, কখন সেই আকাশ চারদিকে ঢেলেছে সাদা মশারির মতো কুয়াশা! হিমশীতল উত্তরের হাওয়াখান বইছে। ঠিক এ সময় দোতালা ঘরের খাটাল থেকে বড়বুজান ডাকলেন, কুট্টি লো ও কুট্টি কই গেলি তুই!

কুট্টি দাঁড়িয়েছিল দক্ষিণের দরজায় ঢেলান দিয়ে। বড়বুজানের ডাকে নড়ে উঠল। ধীর পায়ে খাটালে, বড়বুজানের পালঙ্কের সামনে এসে দাঁড়াল। কী অইছে?

চাইরমিহি এমুন আন্দার আন্দার লাগে ক্যা?

হাজ হইয়া গেছে।

কুপি বাত্তি আঙ্গাচ নাই?

না।

ক্যা?

অহন আঙ্গামু।

AMARBOI.COM

তারপর অন্যরকম একটা প্রশ্ন করলেন বড়বুজান। আমার মুখের সামনে এমুন পিরপির করে কী লো?

কুট্টি আনমনা গলায় বলল, মোশা।

মোশা খালি মুখের সামনেঐ পিরপিরায়নি? শইল দেহে না!

কেমতে দেকব! শইল তো আপনের লেপের ভিতরে।

একথায় বড়বুজান একটু শরম পেলেন। হ। লেপের ভিতরে মোশা হানবো (ঢোকা) কেমতে!

একথার কোনও জবাব দিল না কুট্টি।

বড়বুজান অবাক গলায় বললেন, ও কুট্টি মোশা তো খালি পিরপিরায়ঐ না, কামড়ও তো দেয়, আমি তাইলে উদিস পাইনা ক্যা?

কুট্টি নির্বিকার গলায় বলল, আপনের চামড়ায় জান নাই।

বড়বুজান চমকালেন। কী?

হ। শইল্লের য়োদবোধ (বোধ অর্থে) গেছে গা আপনের।

কচ কী তুই! তাইলে তো এই শীতটা আমি টিকুম না।

কুট্টি কোনও কথা বলল না।

বড়বুজান কথা বললে তার প্রায় প্রতিটি কথার পিঠেই কথা বলে কুট্টি। কারণ এই বাড়িতে আর কথা বলবার মানুষ নাই। কথা না বলে, সারাদিন বোবা হয়ে কি মানুষ থাকতে পারে! ফলে কথা যেটুকু হয় কুট্টির সেটা এই বড়বুজানের লগেই।

কিন্তু এখন কুট্টি তেমন কথা বলছে না কেন? কী হয়েছে?

লেপের ভিতর থেকে কাউট্টার মতন বেরিয়ে থাকা মাথাটা কাত করে কুট্টির দিকে তাকালেন বড়বুজান। চোখে কিছুই প্রায় দেখেন না তবু কুট্টির মুখটা দেখবার চেষ্টা করলেন। মায়াবি গলায় বললেন, কী অইছে লো তর?

এই কথায় কুট্টির বুকটা মোচড় দিয়া উঠল। মনে হল বহুকালের জমে থাকা গভীর গোপন একটা কান্না যেন এখনই বুক ঠেলে বের হবে। বুক ফেটে যাবে তার, চোখ ফেটে যাবে।

এরকম কান্নার অনুভূতি আজকের আগে কখনও হয় নাই তার। জীবনে কত দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে, কথায় কথায় কত মেরেছে স্বামী, কত অপমান করেছে, স্বামী সংসার ছেড়ে আসার পর বাড়িতে আশ্রয় দেয় নাই মা বা, কুত্তা বিলাইয়ের মতন দূর দূর করে খেদাইয়া দিছে তবু আজকের মত এমন কান্না কখনও পায় নাই কুট্টির। এ যেন সম্পূর্ণ অচেনা এক কষ্টের কান্না। এ যেন জীবনের কোনও কিছুকে না পাওয়ার কান্না, এ যেন জীবনের সবকিছু পেয়ে যাওয়ার কান্না।

কান্নাটা কুট্টি কাঁদতে পারল না। সেই উথাল দিয়ে ওঠা গভীর কান্না বুকে চেপে জড়ান গলায় বলল, কী অইবো আমার! কিচ্ছু অয় নাই।

তয় এমুন চুপ কইরা রইছস ক্যা?

কথা কইতে ইচ্ছা করে না।

ক্যা?

এমতেঐ।

না লো ছেমড়ি কিছু একখান অইছে তর। তুই এমুন নুলাম গলায় কথা কওনের মানুষ না। মনডা ভাল তর, তয় কথা কচ চডর চডর কইরা। আইজ পয়লা দেকতাছি অন্য সুর। কী অইছে?

কুট্টি এবার গলা চড়াল। কইলাম যে কিছু অয় নাই।

মা বাপের কথা মনে অইছে, জামাইর কথা মনে অইছে?

না।

তয়?

এবার স্বভাবে ফিরল কুট্টি। আপনে অহন চুপ করেন তো। এত প্যাচাইল পাইরেন না। আমার কাম আছে।

বড়বুজান দমলেন না। কী কাম?

কুপি বাত্তি আঙ্গামু না? মুশরি (মশারি) টাঙ্গামু না?

কুপি বাত্তি আঙ্গা। মুশরি না টাঙ্গাইলেও অইবো।

ক্যা? মুশরি না টাঙ্গাইলে মোশায় খাইবো না আপনেরে?

AMARBOI.COM

খাইলেঐ কী! উদিস তো পাই না।

উদিস না পান দেইক্কা মোশার আতে আপনেরে আমি ছাইড়া দিমু!

কুট্টি আর কোনও কথা বলল না। ম্যাচ জ্বেলে একই লগে দুইটা পিতলের কুপি জ্বালল। একটা খাটালের গাছার ওপর রেখে অন্যটা হাতে নিয়ে দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে বসল। বারান্দার এককোণে রাখা আছে দুইটা হারিকেন। কেরাসিনের বোতল থেকে টিনের ছোট্ট চোঙা দিয়ে কেরাসিন ভরল হারিকেনে। তারপর চিমনি মুছতে লাগল।

এই বাড়িতে একখান হারিকেন সারারাত জ্বলে। সেটা থাকে খাটালের কোণায়। রাতে কখন কী অসুবিধা হয় বড়বুজানের! অন্ধকারে কে তখন ম্যাচ কুপি খুঁজবে। তারচেয় হারিকেন একখান জ্বালিয়ে রাখা ভাল।

এটা অবশ্য রাজা মিয়ার মায়েরই আদেশ। তাঁর আদেশ ছাড়া এই বাড়ির কোনও কাজ হয় না। সংসারের সব কিছুর নিখুঁত হিসাব আছে তাঁর কাছে। মাসে কতখানি কেরাসিন লাগে তিনি তা জানেন। একখান হারিকেন সারারাত নিভু নিভু করে জ্বললে তেল কতটা পুড়বে, সা সা করে জ্বললে পুড়বে কতটা, তাঁর তা মুখস্ত। সুতরাং এই সংসারের কোনও কিছু এদিক ওদিক করা অসম্ভব।

তবে সন্ধ্যার মুখে মুখে হারিকেন জ্বালাতে হয় দুইটা। একটা খাটালে রেখে অন্যটা দিয়ে সংসারের টুকটাক কাজ চালাতে হয়। হারিকেন জ্বালাবার পর কুপি দুইটা রাখতে হয় নিভিয়ে। আজও সেই কাজগুলি করল কুট্টি। করল আনমনা ভঙ্গিতে। কোনওদিকে খেয়াল নাই, যেন মৃতের মতো কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু মনের ভিতর কুট্টির তখন একজন মানুষের জন্য অপেক্ষা। মানুষটার মুখ দেখবার জন্যে অপেক্ষা। কই গেছেগা হেয়? হাজ আইয়া গেছে অহনতরি বাইরে আহে না ক্যা?

হারিকেন হাতে নিয়া খাটালের দিকে যাবে কুট্টি, দোতালা ঘরের সিঁড়ির সামনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল আলফু।

চোখ তুলে আলফুর দিকে তাকাল কুট্টি। বুকের অনেক ভিতর থেকে গভীর আবেগের গলায় বলল, আপনে আমারে কইলেন না ক্যা?

পলকের জন্য আলফুও তাকাল কুট্টির দিকে। মাথা নিচু করে বলল, কইলে তুমি আবার কী মনে করো এইডা মনে কইরা কই নাই।

আমি কী মনে করুম! আমি কি সংসারের মালিক?

মালিক অইলে কইতাম।

আলফুর কথাটা বুঝতে পারল না কুট্টি। তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। কী কইলেন বোজলাম না।

আলফু মৃদু হাসল। এই সংসারে তোমার আর আমার দুইজনের দশা একরকমঐ। বাড়ির চাকরবাকর আমরা। একজন আরেকজনরে কেমতে কই আমার একজন মেজবান আছে! দোফরে তারে খাওয়ান লাগবো!

কুট্টি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আপনে চিন্তা করছেন এক আমি করছি আরেক।

কেমুন?

সংসারের মালিক না অইতে পারি, আপনের ভাত থিকা যেমতে আপনে কাশেমরে ভাত দিলেন হেই ভাতের লগে আমার ভাগ থিকাও ইট্টু দিতে পারতাম।

AMARBOI.COM

তাইলে তোমার খাওনে টান পড়তো!

অহন যে আপনেরডায় টান পড়লো! টান যহন পড়ছিল দুইজনেরডায়ঐ পড়তো।

কুট্টির কথা শুনে ভিতরে ভিতরে কেমন একটা অনুভূতি হল আলফুর। কথা বলতে যেন ভুলে গেল সে। কুট্টির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কুট্টি বলল, কাশেমের অইছে কী? মুখটা জানি কেমুন দেকলাম!

কেমতে দেকলা! তুমি তো ওহেনে খাড়ওঐ নাই!

যেডু খাড়ইছি হেতেঐ দেকছি।

হুজুরে বেদম মাইর মারছে কাইশ্যারে। মাইরা বাইত থিকা বাইর কইরা দিছে।

ক্যা, ক্যা মারছে?

ঘটনাটা বলল আলফু। শুনে কুট্টি আকাশ থেকে পড়ল। মরা মাইনষের জানাজা পড়তে আইছে, মাডি দিতে গেছে, হের লেইগা মাইনষে মাইনষেরে মারবো! তাও মাওলানা সাবের লাহান মাইনষে!

হ। ছনুবুড়িরে দুই চোক্কে দেখতে পারতো না হুজুরে। কইছিলো চুন্নিবুড়ির জানাজা অইবো না, গোড় অইবো না। এর লেইগাঐত্তো খাইগো বাড়ির হুজুরে আইয়া বেবাক কিছু করলো।

হারিকেন হাতে কুট্টি তখন চিন্তিত হয়ে আছে।

ঘরের ভিতর অনেক দূর পর্যন্ত হারিকেনের আলো, বাইরেও অনেক দূর পর্যন্ত। সেই আলোর দিকে তাকিয়ে আলফু বলল, বড়বুজানে কিছু উদিস পাইছে?

আনমনা হয়েছিল বলে কথাটা বুঝতে পারলনা কুট্টি। বলল, কী উদিস পাইবো?

কাইশ্যা যে এই বাইত্তে দুইফরে ভাত খাইছে!

কেমতে উদিস পাইবো! হেয় কি বিচনা ছাইড়া উঠতে পারেনি! চোক্কে দেহেনি!

না আমি কইতে চাইলাম তুমি বড়বুজানরে কিছু কও নাই তো!

আলফুর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল কুট্টি। যা দেইক্কা আমি নিজে শরম পাইয়া চাউলতাতলা থিকা আইয়া পড়লাম, খাড়ইলাম না, হেই কথা আমি বড়বুজানরে কমু!

একথার বুক থেকে যেন পাথর নেমে গেল আলফুর। আনন্দের একটা শব্দ করল সে। সিঁড়িতে বসল।

খাটাল থেকে ভেসে এল বড়বুজানের গলা, ও লো কুট্টি, কই গেলি?

আলফুর অদূরে দাঁড়ান কুট্টি মুখ ঘুরিয়ে খাটালের দিকে তাকাল, এইত্তো আমি।

কো?

বারিন্দায়। হারিকল আঙ্গাই।

অয় নাই অহনতরি?

অইছে।

তয়?

একথার জবাব দিল না কুট্টি।

বড়বুজান বললো, কার জানি হাকিহুকি (ফিসফাস) হুনি! কেডা আইছে? কার লগে কথা কচ?

কুট্টি বিরক্ত হল। নতুন মানুষ কে আইবো? কার লগে কথা কমু? আপনে জানেন না আপনে আর আমি ছাড়া এই বাইত্তে আর কে থাকে!

হ জানি! আলফু।

তয়?

আলফুর লগে কথা কচ?

হ।

কী কথা?

কুট্টি রাগি গলায় বলল, হেইডা আপনেরে কওন লাগবোনি!

বড়বুজান কাঁচুমাচু গলায় বললেন, চেতচ ক্যা! চেতিচ না বইন। আলফু জুয়ান মরদো বেডা। তুই যুবতী মাইয়া। তগো মইদ্যে এত কথা কওন ভাল না।

একথা শুনে ভারি একটা লজ্জা পেল কুট্টি। আলফুর দিকে আর তাকাতে পারল না। লাজুক মুখে খাটালের দিকে পা বাড়াল।

আলফু বলল, বুজানের লগে কথা কইয়া আবার আহো। কথার কাম আছে।

AMARBOI.COM

অন্ধকার চালতাতলায় বসে আছে কাশেম। বিকাল হতে না হতেই গভীর অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল জায়গাটা। যখন চকেমাঠে, গিরস্ত বাড়ির উঠান আর গাছপালার মাথায় দিনের শেষ আলো ফুরাতে বসেছে তার অনেক আগেই মাথার ওপরকার ডালপালা ছড়ান প্রাচীন চালতাগাছের চওড়া গাঢ় সবুজ পাতার আড়াল থেকে তলায় বসা কাশেমের চারপাশে নিঃশব্দে নামতে শুরু করেছিল অন্ধকার। প্রথমে অন্ধকারের রং ছিল সবুজ। চালতাপাতা থেকে ঠিকরে নামছিল বলে এমন রং। তারপর সময় যত গেল রং বদলাতে শুরু করল। এখন অন্ধকারের রং পাকা পুঁইগোটার মতো। একহাত দূরে চোখ চলে না, এমন।

সন্ধ্যা হতে না হতেই ঠাকুর বাড়ির পুব উত্তর কোণের জঙ্গল পুকুর অতিক্রম করে মিয়াবাড়িতে এসে উঠেছে একটি কোক্কা। এই পাখিটা দেখতে চিলের মতো, গাঢ় খয়েরি রঙের। ক ক করে ডাকে। দিনেরবেলা দেখা যায় না। কোথায় কোন জঙ্গলের আন্ধারে পলাইয়া থাকে কে জানে। বের হয় সন্ধ্যার মুখে মুখে। তারপর সারারাত চড়ে গিরস্ত বাড়ির ছাইছে (ঘরের পিছনে)। ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই আবার গিয়ে ঢোকে জঙ্গলে। আন্ধারের জীব কোক্কা। এই পাখির মাংস খেলে লোকে নাকি পাগল হয়ে যায়। কাশেম শুনেছে। দেশগ্রামে কত গল্প গাথা থাকে, কত কুসংস্কার, কত প্রচলিত বিশ্বাস। কোক্কার মাংস খেয়ে পাগল হওয়াটা হয়তো তেমন কোনও বিশ্বাস। কেউ খেয়ে দেখেছে

কি না কে জানে! তবে এত কাছ থেকে এই পাখিটা আজকের আগে কখনও দেখে নাই কাশেম। নির্ভয়ে তার চারপাশে চড়ে বেড়ালো। এদিক গেল ওদিক গেল। মাটি থেকে খুঁটে খেল আধার। বার কয়েক ক ক ক করে ডাকল। একবার তো কাশেমের একেবারে গা ঘেঁষেই হেঁটে গেল। এমন নির্ভয়ে গেল, মানুষ দেখে পোষা পাখি ছাড়া কোনও পাখির এমন করার কথা না।

কাশেম বুঝেছিল পাখিটা তাকে মানুষ মনে করে নাই। মনে করেছে ঝোপঝাড় গাছপালা। লোকালয়ে থাকা পাখিরা মানুষের স্বভাব জানে। শীতকালের সন্ধ্যায় গিরস্ত বাড়ির ছাইছে অন্ধকার চালতাতলায় কোনও মানুষের বসে থাকবার কথা না।

পাখিটা তারপর ছোট্ট এক উড়ালে চলে গিয়েছিল সমেদ খাঁর বাড়ির দিকে। তখন বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল কাশেমের। পাখিটা তাকে মানুষ মনে করে নাই। আসলেই তো, সে কি মানুষ! মানুষ হলে মানুষের হাতে এমন মার খায়! মানুষ হলে মানুষের বাড়ির ছাইছে এমন করে বসে থাকে! একজনের ভাত ভাগ করে খায় দুইজনে! তাও ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে! কখন ধরা পড়ে, কখন দেখে ফেলে বাড়ির লোক! কখন খাওয়ার খোটা দেয়, কখন করে অপমান!

এইসব ভেবে কাশেমের বুক ঠেলে উঠেছিল কষ্টের পর কান্না। কান্নাটা তখন কাঁদতে পারে নাই। অন্ধকার গাঢ় হওয়ার পর চারপাশ থেকে ঝাঁক দিয়ে বেরিয়েছে অন্ধকার রঙের মশা। বিনবিন শব্দে ছেঁকে ধরেছে কাশেমকে। হাত পা নেড়ে, চড় চাপড় মেরে মশা তাড়াতে ব্যস্ত হয়ে গেছে সে। তবে এই কাজটাও কাশেমকে করতে হয়েছে শব্দ বাঁচিয়ে। মশা মারার শব্দে বাড়ির লোক যেন টের না পায়, এখনও চালতাতলায় বসে আছে মাকুন্দা কাশেম, এখনও এ বাড়ি ছেড়ে যায় নাই। যদিও দুপুরবেলা কুট্টি তাকে দেখে ফেলেছে। আলফু অভয় দিয়েছে, ভয়ের কিছু নাই, কুট্টিকে যা বুঝাবার বুঝাবে সে। তবু ভয়টা কাশেমের রয়ে গেছে।

কিন্তু মশা মারতে মারতে অন্য একটা কথা ভেবে আনমনা হয়ে গিয়েছিল কাশেম। সন্ধ্যার এই সময়টায় গরু নিয়ে বাড়ি ফিরে সে। গরু আথালে বাইন্ধা জাবনা দেয়। গরুরা খাদ্য নিয়া ব্যস্ত হয় আর সে ব্যস্ত হয় ধুপ নিয়া। ধুপের ধুমায় পালিয়ে বাঁচে মশা। দুইদিন হল বাড়িতে নাই কাশেম, ধুপটা কি ঠিক মতন দিচ্ছে কেউ! মশায় খেয়ে শেষ করছে না তো গরুগুলিকে! ধুপ না দিলে সারারাত জেগে থাকতে হবে গরুগুলির। লেজ নেড়ে, গায়ের চামড়া কাঁপিয়ে মশা তাড়াতে হবে। আহা অবলা জীব! মুখ ফুটে বলতে পারবে না কিচ্ছু, মনে মনে শুধু কাশেমকে খুঁজবে।

তারপর থেকে শুধুই গরুগুলির কথা ভেবেছে কাশেম। সকালবেলা কে তাদের মাঠে নেয়, দিনের শেষে কে ফিরিয়ে আনে ঘরে! কে দুধ দোয়ায় (দোয়), কে দেয় জাবনা! গরম ফ্যানে মুখ পুড়ে গেলে কে দেয় আদরের গাল! সকালবেলা মাঠে যাওয়ার সময় কি গরুগুলি কাশেমকে খোঁজে না! ফিরে এসে বাড়ির চারদিক তাকিয়ে খোঁজে না! কান খাড়া করে রাখে না কাশেমের সেই গানটি শোনার জন্য।

গুরু উপায় বলো না
জনম দুখি কপাল পোড়া গুরু
আমি একজনা।

আসলেই জনম দুখি এক মানুষ কাশেম। দুনিয়াতে আপন বলতে কেউ নাই। আছে কয়েকটা গরু, আছে এই গ্রাম। দুইদিন হল গরুদের ছেড়ে আছে সে। কোনদিন যেন গ্রাম ছেড়েও চলে যেতে হয়!

এসব ভেবে অন্ধকার চালতাতলায় বসে গভীর দুঃখ বেদনায় কাঁদতে লাগল কাশেম। চারপাশে মশা বিনবিন করে, উদাম শরীরের প্রতিটি রোমকূপ থেকে শুষে নেয় রক্ত, কাশেম তা টের পায় না।

আলফু বলল, এতক্ষুণ কী করলা?

বলল এমনভাবে যেন বিরাট এক অধিকার আছে তার কুট্টির ওপর। সেই অধিকারের জোরেই যেন বলল। অন্তত কুট্টি তাই বুঝল। বুঝে বুকের ভিতর দুপুরবেলার মতন অনুভূতিটা আবার হল তার। এক পলক আলফুর দিকে তাকিয়ে নিজের পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে বলল, মুশরি (মশারি) টানাইলাম।

হাজ অইতে না অইতেই মুশরি টাঙ্গান লাগে?

লাগে। বড়বুজান অচল মানুষ, তারে মোশায় খুব কামড়ায়।

এই বাড়িতে মোশা ইট্টু বেশি।

হ জঙলা বাড়ি তো! চাইরমিহি পুকঐর। পুকঐ ভরা কচুরি। কচুরিবনে মোশা তো থাকবই!

একটু থেমে কুট্টি বলল, কী কইবেন কন!

কোন ফাঁকে কোচড় থেকে বিড়ি বের করে ধরিয়েছে আলফু। কুট্টির কথায় বিড়িতে টান দিল। কেমতে যে কমু হেইডাঐ চিন্তা করতাছি।

আমার কাছে কথা কইতে এত চিন্তা কী আপনের!

আমার লেইগা তোমার যদি কোনও অসুবিদা অয়?

কী অসুবিদা অইবো?

এই বাড়ির মানুষরা তো ভাল না। ধরো কাম থিকা ছাড়াইয়া দিলো তোমারে!

কে ছাড়াইয়া দিবো! অহন তো মাজারো বুজানে নাই।

বড়বুজানে তো আছে! হারাদিন বিচনায় পইড়া থাকলে কী অইবো বেবাক মিহি খ্যাল রাখে।

আমি যদি কিছু করি হেয় খ্যাল রাইক্কা কী করবো। বোজবঐত্তো না কিছু।

বোজবো। দেকলা না কইলো আলফু জুয়ান মরদো বেডা, তার লগে এত কী কথা!

একথা শুনে কুট্টি খুব লজ্জা পেল। এক পলক আলফুর দিকে তাকিয়েই চোখ

AMARBOI.COM

ফিরিয়ে নিল। ব্যাপারটা খেয়াল করল না আলফু। বলল, আমারে আইজ অন্যমানুষ মনে অইতাছে না তোমার?

কথাটা বুঝতে পারল না কুট্টি। বলল, ক্যা অন্যমানুষ মনে অইবো ক্যা?

এই যে এত কথা কইতাছি তোমার লগে!

হেতে কী অইছে?

এত কথা কওনের মানুষ তো আমি না! আমি কথা কই কম।

ক্যা কম কন ক্যা?

কথা কম কওনঐ ভাল।

আপনে যত কম কন অত কম কওন ভাল না। এই যে অহন যেমুন কথা কইতাছেন, ভাল লাগতাছে।

তাইলে অহন থিকা এমুন কথাঐ কমু তোমার লগে।

কইয়েন। বাইত্তে মানুষ অইলাম তিনজন। তার মইদ্যে একজন অচল, বুড়া। তার লগে কত প্যাচাইল পাড়ন যায়! আপনে ইট্টু কথাবার্তা কইলে ভাল্লাগে।

কথাটা বলেই আবার লজ্জা পেল কুট্টি।

আলফু তখন কেমন চোখ করে তাকিয়ে আছে কুট্টির দিকে। হাতে বিড়ি জ্বলছে সেদিকে যেন খেয়াল নাই তার। নিঃশব্দে খানিকটা সময় কাটল। তারপর বিড়িতে শেষ টান দিয়ে ফেলে দিল আলফু। বলল, একখান কাম করতে পারবা?

কুট্টি চোখ তুলে আলফুর দিকে তাকাল। কী কাম?

উত্তর নাইলে পচ্ছিম কোনও ভিটির ঘরের চাবি দিতে পারবা?

কুট্টি অবাক হল। চাবি দিয়া কী করবেন?

ঘর খুলুম। আইজ রাইতটা কাইশ্যা আমার লগে থাকবো।

থাউক। হের লেইগা ঘর খোলতে অইবো ক্যা?

কুট্টির গলা বোধহয় সামান্য উঁচু হয়ে গিয়েছিল। আলফু সাবধানী গলায় বলল, আস্তে কথা কও। বড়বুজানে হোনবো।

কুট্টি হেসে বলল, হোনবো না। ঘুমাইয়া গেছে।

হাজ অইয়া সারলো না, ঘুমাইয়া গেল?

মুশরি টাঙ্গানের পর বুজানে অনেকক্ষুণ ঘুমায়।

একথা শুনে আলফু একটু নড়েচেড়ে বসল। স্বস্তির হাঁপ ছাড়ল। তাইলে ঠিক আছে। বুজানের বিচনার নিচে হাত দিয়া চাবিডা লইয়াহো।

কুট্টি আবার সেই প্রশ্নটা করল। কাইশ্যা থাকবো দেইক্কা ঘর খোলতে অইবো ক্যা?

শীতের দিন না অইলে খোলন লাগতো না। দুইজনে মিল্লা রান্দনঘরে হুইয়া থাকতাম।

অহন আপনে যেহেনে হোন কাইশ্যারেও ওহেনে হোয়ান।

আমি তো হুই তুমি যেই বারিন্দায় খাড়ইয়া রইছো এই বারিন্দায়।

এহেনে দুইজন হোয়ন যায় না?

যায়।

AMARBOI.COM

তয়?

দুইজন মানুষ একলগে হুইলে কত সুখ দুঃখের কথা কয়, বড়বুজানে আমগো কথার আওজ পাইলে ঝামেলা অইবো।

হোনবো কেমতে! বারিন্দা আর খাটালের মইদ্যের দুয়ার বন্ধ থাকবো না! দরকার অইলে আস্তে কথা কইবেন আপনেরা।

ধুর অত ইসাব কইরা কথা কওন যায়নি!

কুট্টি খানিক কী ভাবল তারপর বলল, চাবি আপনেরে আমি আইন্না দিতে পারি, বড়বুজানে উদিস পাইবো না, তয় আপনে অন্যঘরে থাকলে ডরে হারা রাইত ঘুমাইতে পারুম না আমি।

আলফু খুবই অবাক হল। ক্যা?

দেশ গেরামে আইজকাইল ডাকাতি অয়। ডাকাইতরা করে কী, বড় গিরস্ত বাড়িতে ঢুইক্কা ঢেকিঘর থিকা ঢেকি উডাইয়া আইন্না ঢেকি দিয়া পাড়াইয়া দুয়ার ভাইঙ্গা ঘরে ঢোকে।

হেইডা আমি এই ঘরে থাকলেও ঢোকতে পারে?

তাও পুরুষপোলা ঘরে থাকলে সাহস থাকে।

আমি থাকি বারিন্দায়। মইদ্যের দুয়ার বন্দ। খাটালের পালঙ্কে থাকে বড়বুজানে, নিচে থাকো তুমি। এমতে থাকন আর অন্যঘরে থাকন একঐ কথা!

কুট্টি মাথা নিচু করে বলল, না এক কথা না।

তাইলে তুমি অহন কী করতে কও?

কাইশ্যারে লইয়া এই ঘরের বারিন্দায়ঐ থাকেন।

আইচ্ছা।

কাইশ্যা অহন কো?

চাউলতাতলায় বইয়া রইছে।

ডাইক্কা লইয়াহেন। বুজানে ঘুমাইছে এই ফাকে খাওন দাওন সাইরা হালান।

রাইত্রে আমি আইজ খামু না। খালি কাইশ্যারে খাওয়াও।

ক্যা?

এমতেঐ।

এমতেঐ না। আমি বুজছি। আপনে মনে করতাছেন একজন বাড়তি মানুষ খাইলে ভাতে টান পড়বো। পড়বো না। কাইশ্যার ভাত আমি রানছি।

কও কী?

হ। আমি বুজছিলাম কাইশ্যা আইজ রাইত্রে এই বাইত্তে থাকবো।

কেমতে বোজলা?

হেইডা আপনেরে কইতে পারুম না। যান কাইশ্যারে ডাইক্কা লইয়াহেন।

কয়েক পলক কুট্টির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল আলফু। তারপর উঠল। পশ্চিম দক্ষিণের ভিটার ঘরের কোণায় এসে ডাকল, কাইশ্যা, ঐ কাইশ্যা, এইমিহি আয়।

দুইবার তিনবার ডাকল আলফু। কিন্তু চালতাতলা থেকে কেউ সাড়া দিল না।

AMARBOI.COM

গভীর রাতে মান্নান মাওলানার বাড়িতে এসে উঠল কাশেম। সন্ধ্যাবেলা মিয়াবাড়ির চালতাতলায় বসে অন্ধকার শীত আর মশার কামড় ভুলে গরুগুলির কথা ভেবে আকুল হয়ে কেঁদেছিল। কাঁদতে কাঁদতে ভুলে গিয়েছিল বাড়ি থেকে তাকে বের করে দিয়েছেন মান্নান মাওলানা। বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখলে কঠিন মাইর আছে কপালে। নিজের অজান্তেই চালতাতলা থেকে তারপর উঠেছিল কাশেম। তখনও চোখ ভেসে যাচ্ছে কাশেমের, গাল ভেসে যাচ্ছে। এক ফাঁকে হাঁটু তরি মুখ নামিয়ে লুঙ্গি দিয়ে চোখ মুছেছে। তারপর বাড়ির পিছন দিক দিয়া গিয়া উঠছে মেন্দাবাড়িতে। সেই বাড়ির উপর দিয়া গিয়া নামছে উত্তরের চকে। চক তখন থই থই করছে অন্ধকারে। চারদিকের ছড়ান ছিটান গিরস্ত বাড়ির ঘর দুয়ারে জ্বলছে কুপিবাতি। রান্ধনঘর, উঠানের কাজ শেষ করে রাতের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন চলছে কোনও কোনও বাড়িতে। যে বাড়ির ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে পড়ে তারা কুপি, হারিকেনের আলোয় পড়তে বসেছে। কোনও কোনও আয়েশি গিরস্ত ঘরের ছেমায় বসে তামাক খাচ্ছে। গল্পগুজব করছে কেউ কেউ। সড়কের দিকে মাটিয়ালদের চিল্লাচিল্লির আওয়াজ পাওয়া যায়। দিন কয়েক হল তোড়জোড় বেড়ে গেছে কাজের। প্রেসিডেন্ট এরশাদ নাকি বলেছেন, তিন চার মাসের মধ্যে মাওয়ার ঘাট পর্যন্ত রাস্তা হতেই হবে। শুনে কন্ট্রাক্টরদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নাওয়া খাওয়া ভুলে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তারা। একদিকে মাটির কাজ হচ্ছে, আরেক দিকে হচ্ছে ইট বিছানোর কাজ, আরেক দিকে হচ্ছে পিচ, পাথরের কাজ। শ্রীনগর পর্যন্ত পাকা হয়ে গেছে রাস্তা। কোলাপাড়া পর্যন্ত ইট বিছানো শেষ। এসব দেখে আলী আমজাদের গেছে মাথা খারাপ হয়ে। হ্যাজাক জ্বালিয়ে সারারাত কাজ করাচ্ছে সে। দিনের পর দিন বাড়িতে যায় না। ছাপড়া ঘরে থাকে। নাওয়া খাওয়া এখানেই। যদিও ম্যানেজার হেকমত আছে তবু নিজেও দেখাশোনাটা সে করছে। মাঝে একটু ঢিলা দিয়েছিল কাজে, এখন আর সেই ঢিলামি নাই। জাহিদ খাঁর বাড়ি ছাড়িয়ে বেশ অনেকদূর আগিয়েছে সড়ক কিন্তু ঘর আগায় নাই। যেখানে ছিল সেখানেই আছে। এইসব ঘর সাধারণত কন্ট্রাক্টরদের কাজের লগে লগে আগায়। বেড়া, চাল দরজা জানালা এমন কি খুটাখুটিও আলগা থাকে। আট দশজন মানুষ হলে যখন তখন সরিয়ে নেওয়া যায় পুরা ঘর। দিনে দিনেই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে উঠে যায়। ব্যাপারটি এত সহজ হওয়ার পরও আলী আমজাদ যে কেন সরায় নাই ঘরটা! নিজে কষ্ট করছে, বেশ খানিকদূর আগিয়ে যাওয়া সড়ক ধরে হেঁটে আর নয়তো মোটর সাইকেলে চড়ে ফিরে ফিরে আসছে এই ঘরে! কেন, কোন গোপন টানে, কে জানে!

AMARBOI.COM

অন্ধকারে ডুবা উত্তরের চক থেকে হাজামবাড়ির দিকে একবার তাকিয়েছিল কাশেম। তাকিয়ে গাছপালা, ঘর দুয়ারের ফাঁক ফোকর দিয়ে সড়কের ওদিকটা দেখতে পেয়েছিল। হ্যাজাকের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে। মাটি ভর্তি য়োড়া মাথায় ভাঙন থেকে সার ধরে সড়কে উঠছে মাটিয়ালরা, য়োড়া খালি করে সার ধরে নেমে যাচ্ছে। ঠিক তখনই হু হু করে আসছিল উত্তরের হাওয়া। সেই হাওয়ায় তীব্র শীতে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল কাশেমের উদাম গা। মনে পড়েছিল সবকথা। আলফুকে বলা আসা হল না। কী ভাববে সে! যে মানুষটা চুরি করে নিজের ভাগ থেকে এমন করে ভাত খাওয়াল, দুইদিনের অনাহারী পেট ভরল যার ভাতে, কুট্টির কাছে ধরা পড়েও যে একদমই ঘাবড়াতে দিল না কাশেমকে, বলল কথা শুনতে হলে সে শুনবে, কাশেমের কী, সে কেন পেট ভরে খাচ্ছে না, সে কেন ভয় পায়! সেই মানুষকে না বলে এমন করে কেন পালিয়ে এল কাশেম! যে মানুষ গেল তার জন্য রাতের ভাত জোগাড় করতে, আরামছে ঘুমাবার ব্যবস্থা করতে সেই মানুষকে কিছুই বুঝতে না দিয়ে কাশেম কি না পলালো!

চকের চষা অচষা জমি থেকে, বড়কলুই ছোটকলুই (মটুরশুঁটি। দুই ধরনের হয়। বড় এবং ছোট। বড়গুলোকে বলে বড়কলুই ছোটগুলোকে ছোটকলুই। শুকিয়ে যাঁতায় ভাঙিয়ে ডাল করা হয়। বিক্রমপুর অঞ্চলে বলে কলুইয়ের ডাইল। কলুই শাক বেশ আগ্রহ করে খায় লোকে। গরু ছাগলের খাদ্য হিসেবেও কাজে লাগে) আর সউষ্যার সদ্য গজান চারায় তখন অন্ধকারে ঝরছিল শিশির। উত্তরের হাওয়ার লগে পাল্লা দিয়া শস্যচারা আর ঘাসের আড়াল সরিয়ে মাটি থেকে উঠছিল আশ্চর্য এক শীতলতা। গ্রাম প্রান্তরের উপর পড়েছে কুয়াশা। আকাশ জুড়ে আছে ঝিকিমিকি তারার মেলা। তারার ক্ষীণ আলোয় অন্ধকারেও আবছা মতন চোখে পড়ে কুয়াশা। এরকম পরিবেশে আলফুর কথা ভেবে পা থেমে গিয়েছিল কাশেমের। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল সে। মনে মনে আলফুর উদ্দেশ্যে বলেছিল, দুনিয়াদারির চক্কর আমি বুজি না ভাই। আমি বলদা (বলদ, বোকা অর্থে) মানুষ। মানুষ থুইয়া গরুর লেইগা বেশি টান। তুমি আমারে মাপ কইরা দিও।

হন হন করে হেঁটে মান্নান মাওলানার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল কাশেম। বাড়ির ঘর দুয়ারে তখন কুপিবাতি জ্বলছে, এইঘর ওইঘর করছে লোকজন, এই অবস্থায় কিছুতেই বাড়িতে ওঠার সাহস হয় নাই কাশেমের। সে গিয়ে বসেছিল পথপাশের কাশবনে।

জায়গাটা বেপারীদের পুকুরপারে। পার জুড়ে ঘন কাশ জন্মেছে। পাশ দিয়ে চলে গেছে সরু একটা পথ। কয়দিন হল এমন সাদা হয়েছে কাশফুল, অন্ধকারেও ফকফক করে। জায়গাটায় শীত যেন আরও বেশি। জবুথুবু হয়ে বসেই হি হি করে কাঁপতে লাগল কাশেম। লুঙ্গি খুলে কান পর্যন্ত শরীর ঢুকিয়ে দিল লুঙ্গির ভিতর, দিয়ে তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে রইল মান্নান মাওলানার বাড়ির দিকে। কখন ঘরের দুয়ার বন্ধ হবে বাড়ির, কখন নিভবে কুপিবাতি, কখন কাশেম গিয়ে উঠবে বাড়িতে, কখন অন্ধকারে হাত রাখবে গরুগুলির গায়ে। তার স্পর্শে, গায়ের গন্ধে গরুরা টের পাবে তাদের প্রিয়তম জীবটি তাদের টানে ফিরে এসেছে।

AMARBOI.COM

সেই যে দুপুরবেলা খেয়েছিল তারপর পেটে আর কিছু পড়ে নাই কাশেমের, তবু ক্ষুধা বলতে কিছু টের পাচ্ছিল না সে। মন জুড়ে শুধু গরুদের কথা, কখন ছুঁয়ে দেখবে গরুদের, শরীর জুড়ে শুধু সেই উত্তেজনা। উত্তেজনায় উত্তেজনায় সময় কেটে গেছে। রাত হয়েছে গভীর। কাশবন থেকে বেরিয়েছে কাশেম। দ্রুত হেঁটে বাড়িতে উঠেছে। নাড়ার পালার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। তিনদিন হল বাড়ি ছাড়া সে, মনে হল তিনদিন না যেন বহু বহুদিন পর বাড়ি ফিরল সে, বহু বহুদিন পর নাড়ার পালাটা দেখতে পেল। বহুদিন পর দেখা হলে আপনজনকে যেমন করে ছোঁয় মানুষ ঠিক তেমন করে, গভীর মায়াবি হাতে নাড়ার পালাটা একটু ছুঁয়ে দিল কাশেম। তারপর আথালের সামনে এসে দাঁড়াল।

রাবের মতন অন্ধকারে ডুবে আছে চারদিক। তারার আলোয়ই যেটুকু যা চোখে পড়ে। আর মানুষের চোখের আছে এক আশ্চর্য ক্ষমতা। দীর্ঘক্ষণ অন্ধকারে থাকলে, অন্ধকারে চোখ সয়ে গেলে আবছা মতন হলেও কিছু না কিছু সেই চোখ দেখতে পায়। কাশেমও পাচ্ছিল। আথালের সামনে দাঁড়িয়ে যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল গরুগুলির কোনওটা দাঁড়িয়ে কোনওটা বসে। কোনওটা জাবর কাটছে, কোনওটা ঝিমাচ্ছে, কোনওটা বা গভীর ঘুমে। লেজ পিটিয়ে মশা তাড়াচ্ছে কোনও কোনওটা। আহা রে, মশায় বুঝি খেয়ে শেষ করছে গরুগুলিকে! ওই তো ধলিটাকে আবছা মতন দেখা যায় অবিরাম লেজ পিটাচ্ছে নিজের পেটে পিঠে। এই গরুটা একটু বেশি আরামপ্রিয়। মশার একটি কামড়ও সহ্য করতে পারে না। সারারাত দাঁড়িয়ে থাকে, সারারাত ছটফট করে।

ধলির দিকে তাকিয়ে নিজের অজান্তেই লুঙ্গি কাছা মারল কাশেম। যেন এখনই ধুপ জ্বালবে, আথালের চারদিকে ধুপদানী হাতে চক্কর দিবে। ধুপের ধুমায় বেদিশা হয়ে যে দিকে পারে চম্পট দিবে মশারদল।

কিন্তু এই রাত দুপুরে ধুপ কাশেম কোথায় পাবে! সন্ধ্যার পর থেকে বারবার সে কেন ভুলে যাচ্ছে সে এখন আর এই বাড়ির কেউ না। তার জায়গায় নিশ্চয় অন্য গোমস্তা এসেছে বাড়িতে। গরুগুলি এখন সেই গোমস্তার অধীনে। তার সঙ্গে মাঠে যায়, তার সঙ্গে ফিরে আসে। মাঠে যাওয়ার সময়, ফিরার সময় এমন কি বাড়িতে এসেও গুরুগুলি হয়তো কাশেমকে খোঁজে। মুখে ভাষা নাই বলে কথা বলতে পারে না। অবলা চোখে চারদিক তাকিয়ে খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে কাশেমের কথা একদিন ভুলে যাবে তারা। নুতন গোমস্তাকে ভালবাসতে শুরু করবে। দুনিয়ার নিয়মই তো এই, চোখের আড়াল থেকে মনের আড়াল। মানুষই মানুষকে মনে রাখে না আর এ তো গরু!

এসব ভেবে চোখ ভরে পানি এল কাশেমের। ধীর পায়ে হেঁটে আথালে ঢুকল সে। লগে লগে বসে থাকা গরুগুলি উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে থাকাগুলি কান লটরপটর করে এ ওর দিকে তাকাতে লাগল। দুইটা ছাড়া বাছুরের একটা গিয়ে মায়ের পেট ঘেঁষে দাঁড়াল। মা গাইটা লেজ সামান্য উঁচু করে চন চন শব্দে চনাতে লাগল (পেশাব করা)। কাশেম বুঝল অন্ধকারে গরুগুলি তাকে চিনতে পারেনি। গরুচোর ভেবে সচেতন হয়েছে।

দুইহাত দুইটা গরুর পিঠে রাখল কাশেম। গভীর মায়াবি গলায় ফিসফিস করে বলল, আমারে তোমরা চিনতে পার নাই? আমি কাশেম। মাকুন্দা কাশেম।

AMARBOI.COM

কাশেমের এই হাকিহুকি যেন পরিষ্কার বুঝতে পারল গরুগুলি। কী রকম একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল তাদের মধ্যে। কান লতপত করে, লেজ নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। মায়ের পেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ান বাছুরটা হঠাৎই তিড়িং করে একটা লাফ দিল, তারপর কাশেমের কাছে ছুটে এল। কাশেমের পেট বরাবর মাথা ঘষতে লাগল। যেন বা মায়ের মতোই আপন আরেকজনকে পেয়েছে সে। বাছুরটার আচরণে জীবনে এই প্রথম কাশেমের মনে হল বাছুরটা গরুর না, এ আসলে এক মানব সন্তান। যেন বা কাশেমের ঔরসেই জন্মেছে। বহুকাল দেখেনি পিতাকে। আজ কাছে পেয়ে আল্লাদে আটখানা হয়েছে।

দুইহাতে বাছুরটার গলা জড়িয়ে ধরে আথালের ভিতর বসে পড়ল কাশেম। আথালের মাটি মাখামাখি হয়ে আছে চনায়, গোবরে। চারদিকে বিন বিন করছে মশা। মানুষের উদাম শরীর পেয়ে গরুদের ছেড়ে মানুষটার ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়েছে তারা। যে যেদিক দিয়ে পারে রক্ত চুষছে। কিন্তু কাশেমের কোনওদিকে খেয়াল নাই। আপন সন্তানের মতো বাছুরটিকে বুকে জড়িয়ে বসেছে সে। চারদিকে দাঁড়ান গরুরা সরে গিয়ে তার বসার জায়গা করে দিয়েছে। কাশেমের পেটে বুকে যেমন আল্লাদে মুখমাথা ঘষছে বাছুরটা ঠিক তেমন করেই বাছুরটার মাথায় মুখ ঘষতে লাগল কাশেম। ফিসফিস করে বলতে লাগল, ওরে আমার সোনারে, ওরে আমার মানিকরে, এত রাইত অইছে ঘুম আহে না তোমার! ক্যান ঘুম আহে না বাজান! ঘুমাও, আমার কুলে হুইয়া তুমি ঘুমাও। আমি তোমার মাথা দোয়াইয়া (হাত বুলিয়ে দেয়া) দিমুনে, পিঠ দোয়াইয়া দিমুনে। একটা মোশায়ও তোমারে কামড় দিতে পারব না। বেবাক মশা আমি খেদাইয়া দিমু নে।

AMARBOI.COM

সাদা থানের মতো কুয়াশার ভিতর থেকে বের হয়ে আসে একজন মানুষ। কাঁধে একেক পাশে দুইটা করে মাঝারি মাপের ঠিলা বসান ভার। ঠিলাগুলি যে রসে ভরা মানুষটার বেঁকে যাওয়া শরীর দেখে তা বোঝা যায়। গায়ে খয়েরি রঙের হাফহাতা সোয়েটার। বহুকালের পুরানা সোয়েটার। দুইতিন জায়গায় বড় বড় ফুটা। সেই ফুটা দিয়া দেখা যায় সোয়েটারের তলায় আর কিছু পরে নাই সে।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে খানিক আগে মান্নান মাওলানার আথাল থেকে বের হয়েছে কাশেম। রাত কেটেছে গরুদের সঙ্গে, সেই বাছুরটাকে কোলে জড়িয়ে। চারদিকে গরুদের গায়ের উষ্ণতা, কোলের কাছে বাছুরটার উষ্ণতা, রাতেরবেলা শীত একদমই উদিস পায়নি কাশেম। ঘুমিয়েছে কী ঘুমায়নি তাও উদিস পায়নি। রাত কেটে গেছে অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে। ভোররাতে, মোরগে বাগ দেওয়ার লগে লগে নড়েচড়ে উঠেছে

কাশেম। রাত শেষ হয়ে এল। এখনই ঘরের দুয়ার খুলবেন মান্নান মাওলানা, উঠানে নামবেন। তারপর আথালের দিকে আসবেন। গরুগুলি ঠিকঠাক আছে কিনা দেখবেন। সেই ফাঁকে কাজের ঝি রহিমা রান্নাঘরে ঢুকে পানি গরম করবে। বালতি ভরে গরম পানি এনে রাখবে বারবাড়ির একপাশে অনেকদিন ধরে ফেলে রাখা চাইর কোনাইচ্চা (চৌকো) পাথরটার সামনে। পিতলের একখান বদনাও রাখবে। পাথরের ওপর বসে বদনা ভরে বালতি থেকে গরম পানি তুলে অজু করবেন মান্নান মাওলানা। শীতকালে গরম পানি ছাড়া অজু করেন না তিনি।

অজু শেষ করে সেই পাথরের ওপর দাঁড়িয়েই পশ্চিমমুখি হবেন। সারাটা শীতকাল গায়ে থাকে তার ফ্লানেল কাপড়ের মোটা পানজাবি। পানজাবির ওপর হাতে বোনা নীল হাফহাতা সোয়েটার। সোয়েটারের ওপর ঘিয়া রঙের আলোয়ান। সেই আলোয়ানে টুপির মতো করে মাথা ঢেকে আজান দিবেন। পায়ে থাকবে মোটা মোজা, কালো রাবারের পাম্পসু। এতসব ভেদ করে শীতের বাবার সাধ্য নাই মাওলানাকে কাবু করে।

এই মানুষটার ভয়েই, মানুষটা দুয়ার খুলবার আগেই আথাল থেকে বের হয়েছিল কাশেম। বের হবার আগে কোলে আদুরে মানব সন্তানের মতো লেপটে থাকা বাছুরটাকে ঠেলে তুলেছে। হাকিহুকি করে বলেছে, ওডো বাজান, ওডো। এলা (এখন) মার কাছে যাও। আমার তো যাওনের সময় অইলো।

ঘুমে চোখ জড়ান শিশুর মতো টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বাছুরটা। কাশেম তাকে ঠেলে দিয়েছে মা গরুটার পেটের কাছে। মার কাছে যাও বাজান।

যেন রাতভর পিতার গলা জড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকা শিশুটাকে ভোরবেলা মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিচ্ছে পিতা, ভঙ্গিটা তেমন ছিল কাশেমের। কাশেম তারপর আথালের প্রতিটা গরুর দিকে তাকিয়েছে, প্রতিটা গরুর গায়ে হাত দিয়েছে। আমি তাইলে যাই অহন। বিয়ান অইয়া গেছে। আবার রাইতে আমুনে। দিনে তোমগো লগে আর থাকতে পারুম না আমি। তয় রাইতে আইয়া থাকুম। বেবাকতে ঘুমাইয়া গেলে, চুপ্পে চুপ্পে আমু। তোমগো কাছ থিকা কেঐ সরাইয়া রাকতে পারবো না আমারে।

আথাল থেকে বেরিয়েই বেদম শীত টের পেয়েছিল কাশেম। তার উদাম শরীরের চামড়া যেন ফাটিয়ে দিচ্ছিল শীত। কাশেমের ইচ্ছা করছিল আবার ছুটে যায় আথালে। গরুদের ওমে শীত কাটায়। কিন্তু উপায় নাই। এখনই তাঁর ঘরের দুয়ার খুলবেন মান্নান মাওলানা।

উঠানের মাটি ছিল পুকুরের তলার পানির মতন ঠাণ্ডা। রাতভর ওস (শিশির) শুষে ঠাণ্ডা হয়েছে। কিন্তু এই ঠান্ডা গায়ে লাগল না কাশেমের। লুঙ্গি খুলে কোনও রকমে কান পর্যন্ত ঢাকল সে। দ্রুত হেঁটে বাড়ি থেকে নামল।

বাড়ির লগের রাস্তা সবুজ দূর্বাঘাসে ভরা। ওস পড়ে বৃষ্টিতে ভিজার মতো ভিজেছে ঘাসডগা। সেই ঘাসে পা ফেলার লগে লগে পায়ের তলার শীতটাও টের পেল কাশেম। হি হি করে কাঁপতে লাগল, দাঁতে দাঁত লেগে খটখট করে শব্দ হতে লাগল তার।

এই শীত থেকে কেমন করে এখন নিজেকে বাঁচাবে কাশেম! লুঙ্গি কাছা মেরে চক পাথালে দৌড় শুরু করবে নাকি। দৌড়ালে শীত বলে কিছু থাকবে না।

AMARBOI.COM

নাকি যেভাবে আছে সেভাবে থেকেই যত জোরে সম্ভব হাঁটতে শুরু করবে। জোরে হাঁটলেও শীত কমে।

কাশেম তারপর হাঁটতে শুরু করেছিল।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় মনে হয়েছে গরুগুলি কে নিয়া যায় চকে, একটু দেখা দরকার। নুতন গোমস্তা রেখেছেন নাকি মান্নান মাওলানা! নাকি নিজেরাই নিয়া যাচ্ছেন! নিজেরা নিয়া গেলে কে নিয়া যায়! মাওলানা সাহেব নিজে নাকি আতাহার! কিন্তু আতাহারের যা স্বভাব চরিত্র, শীতের দিনে বেলা অনেকখানি না উঠলে ঘুমই ভাঙে না তার। আর গরু নিয়ে চকে মরে গেলেও সে যাবে না!

তাহলে কি মাওলানা সাহেব নিজেই নিয়া যাচ্ছেন? গোমস্তা রাখলে কাকে রেখেছেন। মেদিনীমণ্ডলের কাউকে নাকি অন্য গ্রামের অচেনা কোনও লোককে!

এসব ভেবে মান্নান মাওলানার বাড়ির সামনে থেকে ফকির বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে যাচ্ছিল কাশেম আর ফিরে আসছিল। এই ফাঁকে শীতটাও এক সময় কব্জা হয়েছে, সময়টাও কেটেছে। খান বাড়ির মসজিদ থেকে আজানের সুর ভেসে এসেছে, মান্নান মাওলানার বাড়িতে জেগে উঠেছে মানুষজন। মান্নান মাওলানা যখন আজান দিচ্ছেন তখন বেপারি বাড়ির সামনে ছিল কাশেম। দ্রুত হেঁটে কাশবনের দিকে যাচ্ছিল তখনই কুয়াশা ভেঙে বের হয়ে এল ভার কাঁধে মানুষটা। পলকেই তাকে চিনতে পারল কাশেম। দবির গাছি।

দবিরও ততক্ষণে চিনে ফেলেছে কাশেমকে। বেশ খানিকদূর হাঁটার পর এমনিতেই কোথাও না কোথাও ভার নামাতে হয় তাকে, জিরাতে হয়। কাশেমকে দেখে এই সুযোগটা নিল সে। অতিযত্নে রাস্তার মাথাখানে নামাল কাঁধের ভার। এই শীতেও ঘেমে গেছে সে। উপুড় হয়ে লুঙ্গির খুঁটে মুখ মুছে কাশেমের দিকে তাকিয়ে হাসল, কী রে কাশেম, কই যাচ এত বিয়ানে?

তারপরই কাশেমের মার খাওয়া বীভৎস মুখটা দেখতে পেল। দেখে আঁতকে উঠল। কী রে, কী অইছে তর?

লুঙ্গির ভিতরে জবুথুব করে রাখা শরীর টানা দিয়ে দাঁড়াল কাশেম। নাভির কাছে লুঙ্গি বেঁধে বলল, হুজুরে মারছে।

ক্যা?

পরে কমুনে।

অহন কইতে অসুবিদা কী!

কাশেমের গায়ে যে কিছু নাই তারপরই তা দেখতে পেল দবির। দেখে এতই অবাক হল, কাশেমকে যে নির্মমভাবে মেরেছেন মান্নান মাওলানা, মুখচোখ ফাটিয়ে ফেলেছেন, ভুলে গেল। গভীর বিস্ময়ে বলল, খালি গায় ক্যা তুই? এমুন শীতে খালি গায় থাকতে পারেনি মাইনষে! মইরা যাবি তো বেডা!

কাশেম অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, কী করুম। কাপড় চোপড় বেবাকঐ হুজুরের বাইত্তে রইয়া গেছে। আনতে পারি নাই। হুজুরে আমারে মাইরা ধইরা খেদাইয়া দিছে।

অবাক হয়ে কাশেমের মুখের দিকে তাকিয়েছে দবির। জিজ্ঞাসা করেনি কিছু তবু

AMARBOI.COM

ঘটনা তাকে খুলে বলেছে কাশেম। শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে দবির। দুঃখে মাথা নেড়েছে। আহা রে! কী কমু ক, আমরা গরিব গরবা মানুষ। তারা বড় গিরস্ত, পরহেজগার বান্দা, তারা যুদি এমুন করে, আমগো লাহান মানুষ যায় কই! তুই একখান কাম কর, আমার সুইয়াটারডা নে। আমি তো বোজা কান্দে দৌড়াই, শীত লাগে না, লাগে গরম। এই দেক ঘাইম্মা গেছি।

ছেঁড়া সোয়েটারখান খুলে কাশেমের হাতে দিয়েছে দবির। এইডা গায় দে। দিয়া আমগো বাইত্তে যা। আমি রস বেইচ্চা আহি তারবাদে কথা কমুনে।

সোয়েটার হাতে কাশেম তখন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে দবিরের দিকে। পানিতে চোখ ভরে গেছে তার। সেই চোখের দিকে চোখ পড়ল না দবিরের। বলল, কী অইলো খাড়ই রইলি ক্যা? সুইয়াটার গায়ে দে, যা।

তবু সোয়েটারটা পরল না কাশেম। চোখের পানি সামলে ধরা গলায় বলল, তোমরা আমারে এত মহব্বত করো ক্যান, ক্যান এত মহব্বত করো! তোমগো মহব্বতের টানে, গরুডির মহব্বতের টানে, এই গেরামের গাছগাছলা, ঘরদুয়ার, আসমানের পাখি পুকুঐরের মাছ, চকের ফসল, রইদ বাতাস, ক্যান বেবাকতে তোমরা আমারে এত মহব্বত করো? তোমগ মহব্বতের টানেঐত্তো গেরাম ছাইড়া যাইতে পারি না আমি। নাইলে কে আছে আমার এই গেরামে, কও! মা বাপ নাই, ভাই বেরাদর নাই, আততিয় স্বজন নাই। ক্যান এই গেরামে পইরা রইছি আমি।

শেষদিকে কান্না আর ধরে রাখতে পারল না কাশেম। অন্যদিকে তাকিয়ে শব্দ করে কাঁদতে লাগল।

গভীর মমতায় কাশেমের কাঁধে একটা হাত রাখল দবির। এই বলদা, কান্দচ ক্যা? যা আমার বাইত্তে যা। নূরজাহানের আরে কইচ মুড়ি দিবোনে। খা গিয়া। আমি মাওলানা সাবের বাইত্তেঐ যাইতাছি। বেবাকে রস বলে আইজ হের লাগবো। দিয়া আইতাছি।

দবিরের দিকে মুখ ফিরাল কাশেম। চোখ মুছতে ভুলে গেল। ভয়ার্ত গলায় বলল, আমার কথা কিছু কইয়ো না হুজুররে। আমার লগে যে তোমার দেহা অইছিলো, আমারে যে তুমি সুয়াটার দিছো, কিচ্ছু কইয়ো না।

দবির কী বুঝল কে জানে, কাশেমের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আইচ্ছা কমু না।

মান্নান মাওলানার বাড়ির উঠানে বসে রস মাপছে দবির। ভার নামিয়ে হাতের কাছে রেখেছে রসের ঠিলা। সামনে বড় সাইজের তিনটা বালতি আর একটা এলুমিনিয়ামের হাঁড়ি।

AMARBOI.COM

দবির এই বাড়িতে এসে ওঠার পর বালতি হাঁড়ি এনে তার সামনে রেখেছে রহিমা। হাঁটু ভেঙে বসে বাঁপায়ের কাছে রসভর্তি ঠিলা রেখে, বাঁহাতে কায়দা করে ঠিলার কানা ধরে পা এবং হাতের ভরে ঠিলাখান কাত করে ডানহাতের একসেরি মাপের টিনের মগে রস ঢালছে। মগ ভর্তি হওয়ার লগে লগে রস ঢেলে দিচ্ছে বালতিতে। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মান্নান মাওলানা। তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে আছেন দবিরের হাতের দিকে। মাপে কম দিচ্ছে কিনা গাছি, খেয়াল করছেন। মুখে বিড়বিড়ান একটা ভাব তাঁর। অর্থাৎ কয়সের হল রস গনছেন তিনি।

ঠিক একই ভঙ্গিতে দবিরও গনছিল। ফলে অন্য কোনওদিকেই খেয়াল ছিল না তার। চারটা ঠিলা খালি করে হাসিমুখে মান্নান মাওলানার দিকে তাকাল সে। এক মোণ চাইস্বের (চারসের) অইছে হুজুর।

শুনে মান্নান মাওলানা যেন চমকালেন। কচ কী? এক মোণ চাইস্বের?

হ।

একটু থেমে অবাক গলায় দবির বলল, ক্যা আপনে গনেন নাই?

না।

কন কী! আপনে সামনে খাড়ইয়া রইছেন, আমি তো মনে করছি গনতাছেন!

না গনি নাই।

মুখটা চুন হয়ে গেল দবিরের। হতাশ গলায় বলল, তাইলে?

মান্নান মাওলানা অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, তাইলে আর কী!

আবার মাইপ্পা দিমু?

আবার মাপনের তো ঝামেলা অনেক।

আপনে কইলে মাপি। আমার ইট্টু কষ্ট অইবো, অউক।

মান্নান মাওলানা অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, কাম নাই আর মাপনের। তয় আমার মনে অইতাছে মাপে গরবর অইছে তর। ছয় পাড়ির (বিক্রমপুর অঞ্চলে পাঁচ সেরকে 'একপাড়ি' বলা হয়। তবে কথাটা খুব বেশি প্রচলিত নয়) বেশি রস এহেনে অওনের কথা না।

শুনে দবির আকাশ থেকে পড়ল। কন কী হুজুর! তিনডা বালতি পুরা ভরছে। পাতিলাডাও ভরা ভরা। বালতিডি তো বারোসেরির কম না!

আরে না বেডা, আষ্টসেরি বালতি। পাতিলডাও ওই মাপেরঐ।

তাইলে হুজুর আমি আরেকবার মাপি। আপনে গনেন।

না থাউক।

থাকবো ক্যা?

আমি তর কথা বিশ্বাস করলাম।

মনের মইদ্যে সন্দ রাইক্কা আমারে আপনের বিশ্বাস করনের কাম নাই।

না সন্দ আর কী! মাপে কম দিলে আল্লার কাছে ঠেকা থাকবি।

এইডা খাডি কথা কইছেন হুজুর। হ, এক মোণ চাইস্বের থিকা একফোডা রস যুদি আপনেরে কম দিয়া থাকি তয় আল্লার কাছে ঠেকা থাকুম। হাসরের দিন এই রসের বিচার অইবো।

AMARBOI.COM

দবির উঠে দাঁড়াল। আমরা হুজুর গরিব গরবা মানুষ, অভাবী মানুষ, তয় নিঐত (নিয়ত) খারাপ না। কেঐরে ঠকাইয়া দুইডা পয়সা খাইতে চাই না। হারাম খাওনের আগে আল্লায় য্যান এই দুইন্নাই থিকা উডাইয়া নেয়।

রস ভর্তি বালতি একটা একটা করে রান্ধনঘরে নিয়ে রাখছে রহিমা। কোন ফাঁকে পানজাবির পকেট থেকে কাঁকুই বের করেছেন মান্নান মাওলানা। এখন আনমনা ভঙিতে দাঁড়ি আচড়াচ্ছেন।

এক পলক তার দিকে তাকিয়ে দবির হাসিমুখে বলল, এত রস দিয়া কী করবেন হুজুর? কুডুম আইবোনি?

হ মাইয়ারা আইবো, জামাইরা আইবো। নাতি নাতকুররা আইবো। আতাহারের মায় পোনরো সের চাউল ভিজাইছে। কাইল বিয়ালে কাহাইল ছিয়া দিয়া গুড়ি (চাউলের গুড়ো) কুইট্টা রাকছে। আইজ হারাদিন পিডা বানাইবো।

কী পিডা? সেঐ কুলঐ? (সেঐ কথাটির মানে সেমাই। চাউলের গুড়ো আটার মতো দলে পিঁড়ি কিংবা পাটায় রেখে হাতের ঘষায় ঘষায় তৈরি করতে হয়। কড়ে আঙুলের সমান লম্বা এবং সামান্য মোটা। পরে রসে ফেলে জ্বাল দিতে হয়। রসের পরিবর্তে গুড় চিনি দিয়েও তৈরি করা যায়। কুলঐ পিঠা হচ্ছে অর্ধচন্দ্রাকারের, ভেতরে নারকেল দিয়ে মুখ বন্ধ করে রসে ছাড়তে হয়। কুলঐ পিঠাও গুড় চিনি দিয়ে তৈরি করা যায়)

হ। সেঐ কুলঐ তো আছেঐ, চিতঐও মনে অয় বানাইবো। চাইর পাচখান খাঁজ বাইর করছে দেকলাম। খাঁজের পিডাও বানাইবো। (মাটির তৈরি সাচ। চাউলের গুড়ো পানিতে গুলে যেভাবে চিতইপিঠা তৈরি করা হয় ঠিক সেভাবেই সাচে ফেলতে হয়। এ আসলে এক ধরনের চিতইপিঠা।)

ভাল। পিডা তো মাইনষে শীতের দিনেঐ খায়।

পুবের ঘরের চালা ডিঙিয়ে সকালবেলার রোদ এসে পড়েছে উঠানে। কুয়াশা কাটতে শুরু করেছে। যেটুকু আছে সেটুকু উঠে গেছে গাছপালার মাথায়। খানিকপর উধাও হবে। রোদের ছোঁয়ায় কুয়াশার মতো শীতটাও কাটছে।

মান্নান মাওলানা কয়েক পা হেঁটে রোদে এসে দাঁড়ালেন। দেখে দবির মনে মনে বলল, এত কিছু গায় দিয়াও শীত করে মাইনষের! আর আমি যে খালি গায়!

তারপরই কাশেমের কথা মনে পড়ল। ওইরকম শীতে খালি গায়ে ছিল কাশেম। আশ্চর্য ব্যাপার!

গোয়ালঘরে লুঙ্গি কাছা মেরে কাজ করছে একটা লোক। আনমনে সেদিক তাকাল দবির। লোকটাকে চিনতে পারল না। চালাকি করে বলল, কাইশ্যা কো? আথালে দিহি অন্যমানুষ!

হ। কাইশ্যারে খেদাইয়া দিছি। অন্য গোমস্তা রাকছি। চউরা।

নাম কী?

হাফিজদ্দি।

তারপরই হাত কচলাতে কচলাতে আসল কথাটা বলল দবির। দেন হুজুর।

কথাটা যেন বুঝতে পারলেন না মান্নান মাওলানা। বললেন, কী দিমু?

AMARBOI.COM

দবির হাসল। রসের দাম দিবেন না?

হ দিমু না? কত দাম অইছে?

দুই টেকা সের। এক মোণ চাইস্বের। আষ্টাশি টেকা অইছে।

কচ কী! দুই টেকা সের রস আছেনি? একটেকা দেটটেকার বেশি রসের সের অইতে পারে না!

না। আড়াই তিনটেকা সেরও বেচি। আপনের লগে দামাদামি করি না। দুইটেকা সেরঐ দেওন লাগবো।

পাগল অইছস! কয় সের অইছে না অইছে আমি বুজি না, দুইটেকা না দেটটেকা হেইডাও বুজি না, বেবাক মিল্লা পনচাস টেকা পাবি। চাইর পাঁচদিন বাদে আইয়া টেকা লইয়া যাইচ।

শুনে দাবির হাঁ করে থাকে। কথা বলতে পারে না। তারপর হা হা করে ওঠে। কন কী হুজুর! না না, এইডা অইবো না। আষ্টাশির জাগায় আপনে নাইলে আষ্টটেকা কম দেন। এত কম দিলে মইরা যামু আমি।

পনচাস টেকা কম টেকা না। যা বাইত্তে যা, পরে আইয়া লইয়া যাইচ।

না হুজুর পনচাস টেকা আমি নিমু না। এত ঠকান আমারে আপনে ঠকায়েন না।

একথায় মান্নান মাওলানা রেগে গেলেন। ঘেটি ত্যাড়া করে দবির গাছির দিকে তাকালেন। গম্ভীর গলায় বললেন, কী, আমি তরে ঠকাইছি! মান্নান মাওলানা মানুষ ঠকায়! আমার মুখের সামনে খাড়ইয়া এতবড় কথা কইলি! ঐ শুয়োরের বাচ্চা, তর রস তুই লইয়া যা। এই রস আমি রাখুম না। এই রসে আমি মুতি।

দবির কল্পনাও করেনি এইভাবে কথা বলবেন মান্নান মাওলানা। সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। কাঁচুমাচু গলায় বলল, আমি আপনেরে এইকথা কই নাই হুজুর। আপনে উল্টা বোজছেন।

চুপ কর শালার পো শালা। আমি উল্টা বুজছি! উল্টা ভাবদি (সোজা) আমারে বুজাও। তুমি চুতমারানীর পো বহুত খারাপ মানুষ। নিজে যেমুন মাইয়াডাও অমুন বানাইছস। ঙাঙ্গর মাইয়া, দিন নাই রাইত নাই যেহেনে ইচ্ছা ওহেনে যায়, যার লগে ইচ্ছা তার লগে রঙ্গরস করে। আমারে কয় রাজাকার। হেইদিনের ছেমড়ি ও রাজাকারের বোজে কী! হ আমি রাজাকার আছিলাম, কী অইছে? আমি অহনও রাজাকার, কী অইছে? আমার একখান পশমও তো কেঐ ছিড়তে পারে নাই। কোনওদিন পারবোও না। রাজাকারগো জোরের তরা দেকছস কী! জোর আছে দেইখাই পেসিডেন (প্রেসিডেন্ট) জিয়া রাজাকারগ কিছু করতে পারে নাই, এরশাদ কিছু করতে পারে নাই। উল্টা রাজাকারগো মন্ত্রি মিনিষ্টার বানাইছে।

মান্নান মাওলানার চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম চোখে উঠানে এসেছে আতাহার, বাড়ির বউঝিরা যে যার দুয়ারে দাঁড়িয়েছে, পোলাপান কেউ কেউ এসে জড়ো হয়েছে উঠানে। মান্নান মাওলানা কোনওদিকে তাকালেন না, কোনও কিছু তোয়াক্কা করলেন না। আগের মতোই চিৎকার করে বললেন, পনচাস টেকা দিতে চাইছিলাম অহন এক পয়সাও দিমু না। পারলে তুই আমার কাছ থিকা টেকা আদায় করিচ। যা বাইর অ, বাইর অ আমার বাইত থন।

AMARBOI.COM

দবির মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল, মাথা তুলে কিছু একটা বলতে চাইল, মান্নান মাওলানা তেড়ে এলেন। ঘেটে ধরে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিলেন দবিরকে। অহনতরি খাড়াইয়া রইছস?

ধাক্কা খেয়ে খানিকদূর ছিটকে গেল দবির কিন্তু হুমড়ি খেয়ে পড়ল না, নিজেকে সামলাল। এত অপমান কোনওদিন হয় নাই সে। এতটা দুঃখ কোনওদিন পায় নাই। দুঃখে অপমানে বুক ফেটে গেল দবির গাছির, চোখ ফেটে কান্না এল। অতি কষ্টে কান্নাটা আটকাল সে। মাথা নিচু করে খালি ঠিলা চারটা ভারে বসাল তারপর কোনও দিকে না তাকিয়ে ভারটা কাঁধে নিল।

মান্নান মাওলানার বাড়ি থেকে যখন নেমে যাচ্ছে দবির পিছনে তখনও সমানে চিল্লাচ্ছেন মান্নান মাওলানা। বাপ বেডি দুইডাঐ শয়তান। বাপে কয় আমি মানুষ ঠকাই মাইয়ায় কয় রাজাকার। রাজাকার যহন কইছে রাজাকারের কাম আমি কইরা ছাড়ুম। ল্যাংটা কইরা ঐ ছেমড়ির হোগায় (পাছায়) আমি বেতামু। হোগার চামড়া উডাইয়া হালামু।

দবির গাছির চোখ দিয়ে তখন টপ টপ করে পানি পড়ছে।

AMARBOI.COM

চাপা ক্রোধের গলায় নূরজাহান বলল, আপনে কেমুন পুরুষপোলা! আপনেরে যে এমনে মারলো আপনে কিছু কইতে পারলেন না?

নূরজাহানদের উঠানের রোদে বসে আছে কাশেম। সকালেবলার রোদ বেশ চড়েছে এতক্ষণে। কুয়াশা সরে ঝকঝক তকতক করছে চারদিক। গাছগাছালির ডালপালায় ঝোপঝাড় এবং ঘরবাড়ির আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকা কুয়াশা শীত উধাও হতে শুরু করেছে। গিরস্তবাড়ির লগের ডোবানালা আর পুকুরের পানিতে জমিয়ে বসেছিল যে কুয়াশা রোদের তাপে হালকা ধুমার মতো উড়তে শুরু করেছে তা। গিরস্তবাড়ির বউঝিরা ঘাটলায় বসে মরার মতো ঠাণ্ডা পানিতেই শুরু করেছে দিনের কাজ।

হামিদাও গেছে ঘাটপারে। যাওয়ার আগে পাতলা একখান কাঁথা গায়ে জড়িয়ে উঠানের কোণে রোদ পোহাতে বসা নূরজাহানকে দিয়ে গেছে পোয়াখানেক মুড়ি ধরে এমন ডালার একডালা মুড়ি আর মাঝারি মুচির (ডেলা) খাজুরা গুড়ের অর্ধেকটা। একমুঠ মুড়ি আর এক কামড় গুড় মাত্র মুখে দিয়েছে নূরজাহান তখনই বাড়িতে এসে উঠল কাশেম। হামিদা তখনও ঘাটপার যায়নি। দুইহাতে কায়দা করে ধরা বাসি থাল বাসন হাঁড়ি কড়াই, মাত্র পা বাড়িয়েছে, উঠানে এসে দাঁড়াল কাশেম। বিগলিত গলায় বলল, গাছি দাদার লগে দেহা অইলো তো, কইলো বাইত যা, তর ভাবীছাবরে কইচ মুড়ি মিডাই দিতে, খাইতে থাক আমি আইতাছি।

হামিদা আর নূরজাহান দুইজনেই তখন সব ভুলে কাশেমকে দেখছে। হামিদা কথা বলবার আগেই নূরজাহান জিজ্ঞাসা করেছে, কী অইছে আপনের? চেহারা এমুন ক্যা?

মান্নান মাওলানার হাতে মার খাওয়ার পর থেকে ঘটনাটা অনেককেই বলতে হয়েছে কাশেমের। প্রতিবার বলার সময়ই কেঁদে ফেলেছে সে। নূরজাহানকে বলার সময়ও কাঁদল। সেই কান্না দেখে ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড রেগে গেল নূরজাহান, গম্ভীর হয়ে গেল। মুড়ি খাওয়া ভুলে কাশেমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

নূরজাহানের মতো হামিদাও তাকিয়ে রইল তারপর হাতে ধরা থাল বাসন হাঁড়ি কড়াই উঠানে নামিয়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ঘরে গিয়ে ঢুকল। টিনের খাবদা (বেশি খাবার ধরে। বড় অর্থে) একখান থালার গলা তরি ভর্তি মুড়ি আর নূরজাহানকে যতটা দিয়েছে ততটা গুড় এনে কাশেমের হাত দিল। বহেন, বইয়া খান। আমি ঘাটপার থিকা আহি। তারবাদে হুনুমনে সব।

হামিদা চলে যাওয়ার পরই কথাটা বলল নূরজাহান। শুনে বড় করে একটা শ্বাস ফেলল কাশেম। কথা বলল না। অতিকষ্টে হাঁ করে একমুঠ মুড়ি মুখে দিল, এক কামড় গুড় নিল। তারপর আনমনা ভঙ্গিতে চাবাতে লাগল।

মুড়ি চাবাতে যে খুব কষ্ট হচ্ছে কাশেমের, কেটে ঝুলে পড়া ঠোঁটে যে ব্যথা হচ্ছে মুখ দেখে যে কেউ তা বুঝতে পারবে। নূরজাহানও পারছিল। ফলে ভিতরের রাগ আরও বেড়ে যাচ্ছিল তার। গুড়মুড়ি খাওয়ার কথা ভুলে বলল, শইল্লে জোরবল নাই আপনের? মারলো আর মাইর খাইলেন?

নূরজাহানের মুখের দিকে তাকিয়ে কাশেম বলল, কী করুম মা?

আপনেরে মারলো আপনেও তারে মারতেন!

কও কী, তাইলে তো সব্বনাশ অইয়া যাইতো। হুজুরের পোলা আছে না, আতাহার, ডাকাইত। আমি হুজুরের লগে বেদ্দপি করছি হোনলে জব কইরা হালাইতো আমারে। জব কইরা কচুরি বইন্না (বন অর্থে) পুকুঐরে ডুবাইয়া রাকতো। দুইন্নাইর কেঐ উদিস পাইতো না। আমার তো কেঐ নাই, কে সমবাত লইতো! তাও অনেকদিন আমারে না দেইক্কা কেঐ যদি জিগাইতো, কাইশ্যা কো, কইতো কই জানি পলাইয়া গেছে গা, সমবাত নাই।

কাশেমের কথা শুনে নিজেরও একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল নূরজাহানের। একমুঠ মুড়ি মুখে দিল সে। দুইটা কাক আর বাড়ির তিন চারটা কুকরা চড়ছিল উঠানে। দুইটি মানুষকে উঠানে বসে মুড়ি খেতে দেখে ঘুরঘুর করছিল তারা। ডালা থেকে একমুঠ মুড়ি নিয়ে দূরে ছুড়ে দিল নূরজাহান। কাক দুইটা লগে লগে উড়ে গেল সেখানে, কুকরাগুলি ছুটে গেল। একবার সেদিকে তাকিয়ে নূরজাহান বলল, না মারতে পারছিলেন মাইরডা ঠেকাইতেন। খাড়াইয়া খাড়াইয়া মাইর খাইলেন ক্যা?

কাশেম বলল, মাইর ঠেকানোরও উপায় আছিলো না মা। খাড়াইয়া খাড়াইয়া মাইর না খাইয়া উপায় আছিলো না। মাইর ঠেকাইলেও বেদ্দপি অইতো, দৌড় দিলেও বেদ্দপি অইতো।

কীয়ের বেদ্দপি?

AMARBOI.COM

হুজুরে যা করবো হেইডা বাদা দিলেঐ বেদ্দপি।

এইডা কোনও কথা অইলোনি! একজন মানুষরে মাইরা হালাইবো আর বাদা দিলে অইবো বেদ্দপি! অইলে অইবো। অমুন বেদ্দপি করণ খারাপ না।

তয় আমার দুক্কু এইডা না মা। আমার দুক্কু গরুডি।

গরুডি আবার কী করছে?

ঐ বাইত্তে আমি যাইতে পারি না, গরুডিরে দেকতে পারি না, আমার দুক্কু খালি এইডাঐ। মারছেলো নাইলে আরও মারতো তাও যুদি বাইত্তে থাকতে দিতো, গরুডির লগে থাকতে দিতো!

মান্নান মাওলানার বাড়িতে কাল রাতে গরুদের লগে থাকার ঘটনাটা বলল কাশেম। শুনে নূরজাহান স্তব্ধ হয়ে গেল।

গরুদের লেইগা এতো টান! এইটা কেমুন মানুষ!

খুব হাসি পেল নূরজাহানের। কিন্তু হাসল না। চেপে রেখে বলল, আপনে যে রাইত দোফরে ঐ বাইত্তে গিয়া উঠলেন যুদি কেঐ দেইক্কা হালাইতো?

দেকলে বিপদ আছিলো কপালে। আবার মাইর খাওন লাগতো।

এই হগল জাইন্নাও গেলেন?

হ মা গেলাম। গরুডিরে না দেইক্কা অনেকদিন থাকছি আর থাকতে পারতাছিলাম না। মাইর খাইলে কিছু অয় না। গরুডিরে না দেকলে মনডা কান্দে। কাইল রাইতে ঘুটঘুইট্টা আন্দারের মইদ্যে যহন গোয়াইল ঘরে গিয়া হানছি (হান্দাইছি, ঢোকা অর্থে), কী কমু মা তোমারে, অমুন আন্দারেও গরুডি আমারে ঠিকঐ চিনলো।

নূরজাহান অবাক হয়ে বলল, কেমনে চিনলো?

কাটা ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল কাশেম। শইল্লের গন্দে চিনলো। এহেকজন মাইনষের শইল্লে তো এহেক রকম গন্দ থাকে! চিননের পর গরুডি যে কেমুন করলো আমার লেইগা, কী কমু তোমারে! কোনডায় শইল চাইট্টা দেয়, কোনডায় শইল্লে মাথা ঘইষ্যা দেয়। ছোড বাছুরডা হারারাইত আমার কুলে হুইয়া ঘুমাইলো। আমার শইল্লে তো কিছু আছিল না, উদলা গাও, গরুডির লগে হারারাইত গোয়াইল ঘরে রইলাম, ইট্টুও শীত করলো না আমার। তয় শীত করছে বিয়ানে, গোয়াইল ঘর থিকা বাইর অওনের পর। গাছি দাদায় সুয়াটার না দিলে শীতে মনে অয় আইজ মইরা যাইতাম।

কাশেম আরেক মুঠ মুড়ি দিল মুখে, এক কামড় গুড় নিল।

নূরজাহান বলল, তয় আপনে অহনে কী করবেন? কই থাকবেন, কই খাইবেন?

কাশেম বলল, থাকনের কোনও অসুবিদা নাই। থাকনের জাগা আমার আছে।

কই?

হোনলে তুমি হাসবা।

না হাসুম না, কন।

হুজুরের বাড়ির গোয়াইল ঘরে।

কেমতে থাকবেন? ঐ বাইত্তে আপনেরে যাইতে দিবো?

না হেইডা দিবো না। আমি থাকুম অন্য কায়দায়।

AMARBOI.COM

কথাটা বুঝতে পারল না নূরজাহান। মুখে মুড়ি ছিল, চাবাতে ভুলে গেল। কাশেমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আবার হাসল কাশেম। কায়দাডা কী হোনবা মা? বেবাকতে ঘুমাইয়া যাওনের পর রাইত দুইফরে গিয়া উড়ুম হুজুরের বাইত্তে। চুপ্পে চুপ্পে গিয়া ঢুকুম গোয়াইল ঘরে। হারারাইত গরুডির লগে থাইক্কা বিয়াইন্না রাইত্রে, হুজুরে উইট্টা আয়জান দেওনের আগে আগে বাইর অইয়া আমু। হারাদিন অন্য জাগায় কাম করুম রাইত্রে গিয়া থাকুম গরুডির লগে।

গরুর লগে এমতে থাকতে পারেনি মাইনষে? গোয়াইল ঘরে থাকতে পারে? গরুর শইল্লের গন্দ, গোবর চনা এই হগলের গন্দ। গরুতে আইম (শ্বাস ফেলা অর্থে) দেয় ঐ আইমের গন্দ, এই হগলের মইদ্যে থাকবেন কেমতে?

আমি থাকতে পারি। মাইনষের থিকা গরুর লগে থাকতে আমার বেশি আরাম। মানুষ শয়তান বদমাইস অয়, ইতর বদজাইত অয়, গরুরা অয় না। গরুরা মাইনষের থিকা ভাল। হোনো মা, আমি যহন গরুডির লগে থাকি, আমার মনে অয় আমি আছি আমার মা বাপের লগে, আমার ভাই বইনের লগে, বউ পোলাপানের লগে। আমার মা বাপের কথা আমার মনে নাই, ভাই বইন আত্মীয় স্বজন কেঐরে আমি দেহি নাই, বউ পোলাপান এই জীবনে আমার অইবো না, তয় অমুন একখান সংসারের কথা চিন্তা করতে আমার বহুত আমদ লাগে। এমুন সংসার অনেক থাকে না মাইনষের, মা বাপ ভাই বইন বউ পোলাপান লইয়া একখান ছোট্ট ঘরের মইদ্যে থাকে বেবাকতে, গরুডির লগে গোয়াইল ঘরে থাকলে আমার এমুন মনে অয়। কোনও কোনও গরুরে মনে অয় আমার মা বাপ কোনও কোনওডারে মনে হয় ভাই বইন, বাছুড়ডিরে মনে অয় পোলাপান।

মানুষের এই ধরনের কথা কখনও শোনেনি নূরজাহান। গরুর লগে এমন সম্পর্ক হতে পারে মানুষের, জানা ছিল না। খুবই হাসি পাচ্ছিল তার। হাসির চোটে বুক ফেটে যাচ্ছিল। হাসি চাপবার জন্য অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল।

কাশেম বলল, আর যে গোবর চনার গন্দের কথা কইলা, গরুর শইল্লের গন্দ, আইমের গন্দ, এইডি আমার কাছে গন্দ মনে হয় না। একখান ঘরের মইদ্যে অনেকটি মানুষ থাকলে হেই ঘরের মইদ্যে অনেক পদের গন্দ থাকে না! পোলাপানের গু মুতের গন্দ, মাইনষের উয়াস নিয়াসের (শ্বাস প্রশ্বাসের) গন্দ, গোয়াইল ঘরে থাকলে আমার অমনঐ মনে অয়।

নূরজাহান ঠোঁট টিপে হাসল। মা বাপ মনে অয় গরুডিরে, ভাই বইন, পোলাপান মনে অয়, পোলাপানের মা মনে অয় না কেঐরে? বউ মনে অয় না?

কথাটা শুনে কী রকম লাজুক হয়ে গেল কাশেম। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, শরমের কথা, কী কমু মা তোমারে! মনে অয়, আমার পোলাপানের মাও মনে অয় একটা গরুরে। বউ মনে অয়।

একথা শুনে হাসি আর ধরে রাখতে পারল না নূরজাহান। খিলখিল করে হেসে উঠল। কোনওদিকে না তাকিয়ে পাগলের মতো দুলে দুলে হাসতে লাগল।

AMARBOI.COM

তখনই শূন্যভার কাঁধে মৃতের মতো বাড়িতে এসে উঠল দবির। ঘরের ছেমায় ভারটা নামিয়ে রাখল।

প্রথমে বাবার মুখ খেয়াল করেনি নূরজাহান। হাসির তালে ছিল। হাসতে হাসতে বাবার দিকে মুখ ফিরিয়েছে, কাশেমের মুখে শোনা কথা মজা করে বলতে যাবে, বাবার মুখ দেখে থতমত খেল। হাসি বন্ধ হল নূরজাহানের, মুড়ির ডালা ফেলে দবিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। কী অইছে বাবা? মুখহান এমুন দেহা যাইতাছে ক্যান তোমার?

লগে লগে ঠাস করে নূরজাহানের গালে একটা থাবড় (চড়) মারল দবির।

বাপের হাতে এমন একখান থাবড় খেয়ে নূরজাহান যে কী রকম থতমত খেল! খানিকক্ষণ বুঝতেই পারল না বাবা তাকে থাবড় মেরেছে, খুব জোরে, ডান গালে। গাল জ্বলে যাচ্ছে, মাথা টলমল করছে। চোখের দৃষ্টি একটুখানি ঝাপসা হয়েছে।

তবু এই দৃষ্টি নিয়েই ফ্যাল ফ্যাল করে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

মা বাবা যে কেউ মারলেই যে ব্যথা পাওয়া যায়, সেই ব্যথায় যে কাঁদতে হয় নূরজাহানের একবারও তা মনে হল না। এতটা অবাক তের চৌদ্দবছর বয়সের জীবনে সে আর কখনও হয়নি। বাবা তাকে থাবড় মেরেছে এরচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা আজকের আগে নূরজাহানের জীবনে কখনও ঘটেনি।

ছেলেবেলা থেকেই পাড়া বেড়ানোর স্বভাব নূরজাহানের, সারাদিন টই টই করে ঘুরে বেড়ানোর স্বভাব। এই স্বভাবের জন্য মায়ের চড়চাপড় কিলগুতা বহুবার খেতে হয়েছে। আর ঠোকনা তো উঠতে বসতেই খেতে হতো। এখনও হয়। মা যখন তার মাথার উকুন মারতে বসে তখন ঠোকনা নূরজাহানের কপালে বান্ধা। নূরজাহানের স্বভাব হচ্ছে বেশিক্ষণ স্থির হয়ে কোথাও বসতে পারেন না। শালিক পাখির মতো ছটফট করে লাফিয়ে ওঠে, হঠাৎ দৌড় দিতে চায়। উকুন মারার সময় স্থির হয়ে না বসলে কী করে হবে! এজন্য ওইসব সময় ছটফট করে ওঠা লাফিয়ে ওঠা আর আচমকা দৌড় দেওয়ার চেষ্টা করলেই গাল থুতনিতে ঠোকনাটা তাকে দিবেই মা।

তবে বাবা কখনও মেরেছে এমন স্মৃতি নাই নূরজাহানের। উল্টা মা যখন মেরেছে বাবা তাকে বুক দিয়ে আগলেছে, নূরজাহানকে মারার দায়ে দবির গাছির হাতের কিল থাবড় তরি খেতে হয়েছে হামিদাকে। জন্মের পর থেকে, বোধবুদ্ধি হওয়ার পর থেকে বাবার মুখে একটা কথাই শুনে এসেছে নূরজাহান, মাইয়ারা অইলো ঘরের লক্ষ্মী, বাড়ির লক্ষ্মী। লক্ষ্মীগো শইল্লে কোনওদিন হাত তুলতে অয় না। তাইলে অলক্ষ্মী লাইগ্যা যায় সংসারে। সেই বাবাই আজ হাত তুলল নূরজাহানের গায়ে! কেন, কী করেছে সে?

এসময় ঘাটপার থেকে উঠে আসছিল হামিদা। দুইহাত ভর্তি থাল বাসন হাঁড়ি কড়াই। সেই অবস্থায়ই দেখতে পেয়েছিল স্বামী তার মেয়েকে জোরে থাবড় মেরেছে। দেখে সেও নূরজাহানের চেয়ে কম অবাক হয়নি। এটা কী করে সম্ভব! দবির গাছি থাবড় মেরেছে নূরজাহানকে এরচেয়ে অবিশ্বাস্য ঘটনা আর কী হতে পারে সংসারে! নূরজাহানের মতো হামিদাও যেন বোবা হয়ে গেল, পাথর হয়ে গেল। থাল বাসন হাঁড়ি কড়াই হাতে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, দাঁড়িয়ে রইল।

তবে মুড়ির ডালা ফেলে লাফিয়ে উঠল মাকুন্দা কাশেম। হা হা করে উঠল। মারলা ক্যা মাইয়াডারে, মারলা ক্যা গাছি দাদা? কী করছে ও?

দবির কোনও কথা বলল না। থমথমা মুখে ঘরের ওটায় (উচু ভিতের ঘরে ওঠার জন্য দরজার সামনে সিঁড়ির মতো যে দুতিনটে থাক থাকে) বসল। না আকাশের দিকে তাকাল, না গাছপালা ঘর দুয়ারের দিকে, না কারও মুখের দিকে। মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল কিন্তু মাটি দেখতে পেল না।

কোনও কোনও সময় এমন হয় মানুষের, যেদিকে তাকায় সেদিককার কোনও কিছুই দেখতে পায় না। তাকিয়ে থাকে ঠিকই, দেখে না।

দবির গাছির অবস্থা এখন তেমন।

মাকুন্দা কশেম এসবের কিছুই বুঝল না। কাটা ঠোঁট সরু করে চুকচুক করে শব্দ করল। মাইয়াডা কী করছে কিছু বোজলাম না গাছি দাদা? ক্যান অরে এত জোরে একখান থাবড় মারলা?

দবির এবারও কথা বলল না। আগের মতোই মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

নূরজাহান তখনও স্তব্ধ হয়ে আছে, তাকিয়ে আছে বাপের মুখের দিকে। চোখে পলক পড়ে না তার।

কিন্তু হামিদার স্তব্ধতা ভেঙেছে তখন। হাতের থাল বাসন হাঁড়ি কড়াই নিয়ে নরম পায়ে রান্নাচালার সামনে এল সে। যেটা যেখানে রাখার নামিয়ে রাখল। তারপর দবিরের সামনে এসে দাঁড়াল। খানিক আগে সম্পূর্ণ নতুন এক ঘটনা ঘটেছে এই সংসারে, যেন সেই ঘটনার কিছুই জানে না হামিদা, যেন সে কিছুই দেখেনি, কিছুই শোনেনি, রস বেচে বাড়ি ফিরে আসার পর স্বামীকে প্রথমে যে কথাটা সে বলে আজও তাই বলল। মুড়ি মিডাই দেই, খাইয়া লও।

মাটির দিক থেকে চোখ তুলল না দবির। অদ্ভুত এক অসহায় গলায় বলল, না।

ক্যা, খাইবা না? খিদা লাগে নাই?

না।

তারপরই ধীরে শান্ত গলায় ঘটনাটা জানতে চাইল হামিদা। কী অইছে তোমার?

হামিদার লগে কাশেমও গলা মিলাল। হ, কী অইছে গাছি দাদা?

দবির চোখ তুলে কাশেমের দিকে তাকাল। উদাস গলায় বলল, হুইন্না আর কী করবি! মুড়ি খা।

হামিদা বলল, মাইয়াডারে যে মারলা?

উদাস এবং নরম দুঃখি ভাব কেটে গেল দবিরের। নূরজাহানের দিকে এক পলক তাকিয়ে রাগী গলায় বলল, অর লেইগা এত শরম পাইতে অইবো ক্যা মাইনষের কাছে? এত কথা হোনতে অইবো ক্যা?

কীয়ের শরম? কী কথা হোনছো?

ও বলে মাওলানা সাবরে রাজাকার কইছে। এর লেইগা যা মুখে আহে তাই আমারে হুনাইয়া দিল মাওলানা সাবে। রসের দাম যা অয় তার অরদেকে নামাইয়া আনলো, তাও টেকা দিল না। বেবাক অর লেইগা।

শুনে হামিদা তাকাল নূরজাহানের দিকে। কীরে সত্যঐ তুই মাওলানা সাবরে রাজাকার কইছস?

AMARBOI.COM

এই প্রথম চোখে পলক পড়ল নূরজাহানের। শরীর নড়ল না তার শুধু মুখটা নড়ল। নরম ভঙ্গিতে অন্যদিকে মুখ ফিরাল সে। অদূরে পড়ে আছে তার মুড়ির ডালা। এখনও অর্ধেকের বেশি মুড়ি রয়ে গেছে ডালায়, গুড় রয়ে গেছে বেশির ভাগই। সাহসী ডেকি (মাত্র যুবতী হয়েছে, এই অর্থে) কুকরাটা পায়ে পায়ে এগুচ্ছে নূরজাহানের মুড়ির ডালার দিকে। এখনই ঠোকরে ঠোকরে সাবাড় করবে ডালার মুড়ি। নূরজাহান কেন, উঠানে দাঁড়িয়ে বসে থাকা অন্য মানুষগুলির কেউই তা খেয়াল করল না।

হামিদা বলল, কথা কচ না ক্যা?

দবির বলল, কী কইবো! অর মোক দেহো না! মোক দেকলেঐ বুজা যায় মাওলানা সাবরে রাজাকার ও কইছে। মাওলানা সাবে মিছাকথা কয় নাই।

কাশেম বলল, আমার মনে অয় মিছাকথাই কইছে মাওলানা সাবে। মাওলানা অইলে কী অইবো, বহুত মিছাকথা কয় হেয়। মিছাকথা কইয়া উল্টাসিদা তোমারে বুজাইয়া দিছে যাতে রসের দামডা না দিতে অয়। বহুত বদ মানুষ হেয়। নিজের ভালর লেইগা যা মনে অয় হেইডাঐ করতে পারে। বকাবাজ্জি তো আছেঐ মাইর ধইরও দিতে পারে মাইনষেরে।

মান্নান মাওলানার ঘেটি ধাক্কার কথাটা মনে পড়ল দবিরের। এতটা অপমান জীবনে সে কখনও হয়েছে বলে মনে পড়ে না। চোখের পানিতে ভাসতে ভাসতে বাড়ি ফিরেছে। এখন আর কান্না পাচ্ছে না। কী রকম এক ক্রোধে বুক জ্বলে যাচ্ছে। এই ক্রোধই কি নূরজাহানের ওপর ঝাড়ল সে!

কাশেমের কথা শুনে মনে হচ্ছে নূরজাহান তাকে রাজাকার বলেছে কথাটা ঠিক বলেনি মান্নান মাওলানা। মেয়েটার ওপর দোষ চাপিয়ে রসের দাম না দেওয়ার অজুহাত তৈরি করেছে। এতকাল ধরে মান্নান মাওলানার বাড়ির গোমস্তা কাশেম, কাশেমের চেয়ে মান্নান মাওলানাকে আর বেশি কে চিনে! তবু ব্যাপারটা দবিরের জানতে হবে। কথাটা নূরজাহান বলেছে কিনা জানতে হবে। বলে থাকলে নূরজাহান তা স্বীকার করবে। মিথ্যা বলবে না।

হামিদার দিকে তাকিয়ে দবির বলল, জিগাও তোমার মাইয়ারে, মাওলানা সাবরে রাজাকার ও কইছে কিনা। মিছাকথা য্যান আমার লগে না কয়। সত্যকথা কইলে কিছু কমু না। মিছাকথা কইলে আবার মারুম।

নূরজাহানের দিকে এগিয়ে গেল হামিদা। কী রে, কইছস?

নূরজাহান কোনও কথা বলল না। কোনওদিকে তাকাল না। পাথরের মতো মুখ তার। চোখ স্থির। সেই চোখে রাগ অভিমান নাকি কান্না কোনটা যে আছে কেউ বুঝতে পারল না। আস্তে ধীরে বারবাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

হামিদা দিশাহারা গলায় বলল, কই যাচ, ও নূরজাহান!

নূরজাহান কথা বলল না, ফিরে তাকাল না। হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির নামার দিকে চলে গেল।

হামিদা ব্যস্ত চোখে স্বামীর দিকে তাকাল। যাও, ধরো মাইয়াডারে।

দবির গম্ভীর গলায় বলল, কাম নাই ধরনের। যেই মিহি ইচ্ছা যাইক গা।

AMARBOI.COM

একথায় হামিদা না, হা হা করে উঠল কাশেম। না না এইডা তুমি ঠিক কইলা না গাছি দাদা। রাগ কইরা যদি কোনও মিহি যায়গা মাইয়াডা? আমি দেকতাছি কই যায়! আমি অরে ফিরাইয়া আনি।

পায়ের কাছে পড়ে রইল কাশেমের মুড়ির ডালা, কাশেম সেদিকে ফিরেও তাকাল না, নূরজাহানের পিছু পিছু ছুটতে লাগল। সেদিকে তাকিয়ে দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলল দবির। কেন যেন এই দীর্ঘশ্বাসটা একেবারে বুকে এসে লাগল হামিদার। পায়ে পায়ে স্বামীর কাছে এসে দাঁড়াল সে। একটা হাত রাখল স্বামীর কাঁধে। সত্য কইরা কও তো আমারে কী অইছে? কী কইছে মাওলানা সাবে? জিন্দেগিতে কোনওদিন মাইয়ার শইল্লে তুমি হাত উডাও নাই, আইজ উডাইলা! রস বেচা টেকা পাও নাই দেইক্কা নাকি আর কিছু অইছে? কও, আমার কাছে তো দুইন্নাইর কোনও কথা না কও না তুমি! এইডাও কও। মাওলানা সাবে কী তোমারে মারছে?

লগে লগে দুইহাতে হামিদার মাজার কাছটা জড়িয়ে ধরল দবির। হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, মারে নাই, মাইরের থিকা বেশি করছে। গরদানডার মইদ্যে ঠেলা দিয়া বাইত থিকা নামায় হালায় দিছে। নূরজাহানের মা গো, জীবনে এমুন অপমান কোনওদিন অইনাই।

ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল দবির।

নিজের অজান্তেই দবিরের মাথাটা কখন জড়িয়ে ধরেছে হামিদা। ধরে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে অশুরের মতো মাওলানা প্রচণ্ড জোরে ঘেটি ধাক্কা দিয়ে বাড়ির নামায় ফেলে দিচ্ছে তার স্বামীকে। কী যে অসহায় ভঙ্গিতে মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে মানুষটা, কী যে করুণ ভঙ্গিতে পড়ে যাচ্ছে! এই দৃশ্য সইতে পারে কোনও নারী! হামিদাও পারল না। অসহায় এক দুঃখ বেদনায় বুক ফেটে গেল তার, চোখ ফেটে গেল। গভীর মায়া মমতায় স্বামীর মাথা বুকে জড়িয়ে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল সে।

বাড়ি থেকে বের হলেই নূরজাহানের মনে হয় স্বাধীনতা। চারদিকে অবারিত শস্যের চকমাঠ, গাছপালা, গ্রাম গিরস্তর ঘরবাড়ি, পুকুর ডোবা মাথার ওপরকার আকাশ, রোদ ছায়া, শীত খরালি কোনও কিছুই চোখে পড়ে না তার, কোনও কিছুই মনে থাকে না। নিজেকে নূরজাহানের মনে হয় দূর আকাশের পাখি আর নয়তো জোয়াইরা পানির উদ্দাম মাছ। যেদিকে ইচ্ছা উড়ে যাবে সে, জল কেটে ছুটে যাবে যেদিকে দুইচোখ যায়। এজন্য বাড়ি থেকে বের হবার পর নূরজাহান কখনও হাঁটে না। নিজের অজান্তেই মানুষ স্বভাব পাখি হয়ে যায়, মাছ হয়ে যায়। নূরজাহান উড়তে থাকে, ছুটতে থাকে।

বাড়ি থেকে চকে নামবার পর প্রথমে একটু দাঁড়ায় নূরজাহান। মুখ তুলে খোলা আকাশের দিকে চায়। আবহমান হাওয়া থেকে বুক ভরে টানে মুক্ত হাওয়া। তারপর আচমকা ছুট। অবস্থাটা এমন যেন বা নূরজাহান ছিল এক খাঁচাবন্দি পাখি। এইমাত্র খাঁচার দুয়ার খুলে দিয়েছে কোনও দয়ালু মানুষ। বাইরের দুনিয়াতে বের হয়েই কিছুক্ষণের জন্য স্বাধীনতার স্বাদ নিচ্ছে সে। তারপর মন চলো, যে দিকে দুইচোখ যায়।

কিন্তু আজ বাড়ি থেকে বের হয়ে অন্য অবস্থা হল নূরজাহানের। একবারও আকাশের দিকে তাকাল না সে, একবারও বুক ভরে টানল না মুক্ত হাওয়া। নির্বিকার ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল। যেন দুনিয়ার কোনও কিছুই তার জানা নাই, কোনও বিষয়েই নাই কোনও আগ্রহ। যেন সে এক মৃত মানুষ। হাঁটছে কিন্তু প্রাণ নাই। কোনদিকে যাবে, কার কাছে যাবে কিছুই জানে না।

আর মাকুন্দা কাশেমের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়েছে উল্টা। চকে নেমে সে কখনও দৌড়ায় না। বাড়ি থেকে তাকে বের হতে হয় গরু নিয়ে। গরুরা হেলেদুলে আয়েশি ভঙ্গিতে চলে। কাশেমও চলে গরুগতিতে। আস্তে ধীরে, উদাস আয়েশি ভঙ্গিতে। হাঁটে তো হাঁটে না, চলে তো চলে না।

দুই মানুষের দুই স্বভাব আজ উল্টাপাল্টা হয়ে গেল। দবির গাছির বাড়ি থেকে বের হয়েই নূরজাহানের পিছু পিছু ছুটতে লাগল কাশেম। শরীরে মান্নান মাওলানার মারের ব্যথা, ছুটতে গেলে মচমচ করে উঠে মাজার হাড়, এসবের কোনও কিছুই এখন মনে নাই কাশেমের, উদিসও পাচ্ছে না। চিৎকার করে নূরজাহানকে ডাকতে লাগল সে। নূরজাহান, ও নূরজাহান, খাড়ও মা খাড়ও, আমার কথা হোনো।

নূরজাহান নির্বিকার। একবারও পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না, একবারও শুনছে না কাশেমের ডাক। হাঁটছে তো হাঁটছে।

ছুটতে ছুটতে এসে নূরজাহানকে ধরল কাশেম। পিছন থেকে নূরজাহানের ডান হাতটা টেনে ধরে বলল, খাড়ও মা। যাইয়ো না।

নূরজাহান উদাস নির্বিকার ভঙ্গিতে কাশেমের দিকে মুখ ফিরাল। এমন চোখে কাশেমের দিকে তাকিয়ে রইল যেন এই মুখ আজকের আগে কখনও দেখেনি। কাশেম নামে কাউকে চিনে না। লোকমুখে কাশেম যে মাকুন্দা কাশেম জীবনেও যেন সে কথা শোনেনি নূরজাহান।

কাশেম এসব খেয়াল করল না। ছুটতে ছুটতে এসে নূরজাহানকে সে ধরতে পেরেছে এটাই যেন তার জীবনের এক বড়কাজ। কাজটা করতে পেরে সে দারুণ খুশি। যেন দবির গাছির ঋণ খানিকটা হলেও শোধ করতে পারছে। এরকম শীত সকালে দবির তাকে নিজের গায়ের সোয়েটার খুলে দিয়েছে। নিজে খালি গা হয়ে সোয়েটার পরিয়ে কাশেমকে পাঠিয়েছে বাড়িতে। গাছির বউ গুড়মুড়ি খেতে দিয়েছে। এরকম মানুষের মেয়ে বাপের হাতে থাবড় খেয়ে রাগ করে বের হয়ে যাচ্ছে বাড়ি থেকে, তাকে ফিরিয়ে আনা কাশেমের কর্তব্য। পোলাপান মানুষ রাগ করে কী না কী করে ফেলবে!

হাঁপাতে হাঁপাতে কাশেম বলল, কই যাও মা?

শীতল নির্বিকার গলায় নূরজাহান বলল, কইতে পারি না।

AMARBOI.COM

নূরজাহানের কথা বলার ভঙ্গি এমন, ভিতরে ভিতরে কাশেম কী রকম একটু থমকাল। এই কি সেই মেয়েটি, গাছি বাড়ি ফিরবার আগে কাশেমের মুখে তার মার খাওয়ার কথা শুনে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল যে! এই কি সেই মেয়েটি, গরুদের লগে কাশেমের সম্পর্কের কথা শুনে পানির ওপর পানি পড়ার শব্দে হেসেছিল!

ভুরু কুঁচকে চোখে দুই তিনটা পলক ফেলল কাশেম। কাটা ঠোঁট ছড়িয়ে হাসতে গেল, গিয়েই ঠোঁট কুঁচকাল। শীতের টানে ফসল তুলে নেওয়া চকের মতো শুকনা, কাটা ঠোঁটের কাটা অংশ চড়চড় করে উঠল। বুঝি রক্ত বের হবে। তবু সেদিকে মন দিল না কাশেম। পুরাপুরি হাসতেও পারল না। তবে মুখটা হাসিহাসি করে বলল, কও কী! কই যাও কইতে পারো না মা! থাউক যাওনের কাম নাই। লও বাইত্তে লও।

এবার কাশেমের দিক থেকে মুখ ফিরাল নূরজাহান। না আমি অহন বাইত্তে যামু না।

তয় কই যাইবা?

কইলাম যে কইতে পারি না।

একটু থেমে কাশেম বলল, গোসা করছো মা?

নূরজাহান কাশেমের দিকে তাকাল না। বলল, কার লগে গোসা করুম?

তোমার বাপের লগে।

নূরজাহান কথা বলল না। আগের মতোই আস্তে ধীরে হাঁটতে লাগল। কাশেমও হাঁটতে লাগল তার লগে লগে। হাঁটতে হাঁটতে বলল, মা বাপ থাকলে কত সময় তারা কিল থাবড় মারে। হেতে কী অয়! আদর যে করে হে তো মারতেও পারে। মা বাপ আছে দেইক্কাঐ মারে। না থাকলে তো আর মারতো না। এই যে আমার মা বাপ নাই, আমারে কেঐ মারে!

কাশেমের দিকে মুখ ফিরাল নূরজাহান। মান্নান মাওলানা মারছে না আপনেরে?

কাশেম থতমত খেল। হ মারছে।

তয়?

ঠোঁট ছড়িয়ে আবার হাসার চেষ্টা করল কাশেম। কাটা জায়গা কেটে রক্ত বের হবার ভয়ে হাসল না। বলল, হের মাইর আর বাপ মার মাইর এক না। বাপ মায় মারে যেমুন আদরও করে অমুন। দুইডা দুই পদের। তুমি বুজবা না মা।

আমার বোজনের কাম নাই। আপনে যান।

কই যামু?

কই যাইবেন আমি কেমতে কমু?

আমার তো যাওনের জাগা নাই। গাছি দাদায় কইলো তোমগো বাইত্তে যাইতে, গেছি।

তয় আবার যান।

কই?

আমগো বাইত্তে।

হ তোমগো বাইত্তেঐ যামু। তয় তোমারে না লইয়া যামু না। তোমারে না লইয়া গেলে তোমার বাপরে আমি কী জব দিমু?

AMARBOI.COM

এতক্ষণ ধরে কাশেমের মুখে বাপ কথাটা শুনছে, আর মানুষটা তার এত প্রিয়, জন্মের পর থেকে একটা দিনও যাকে না দেখে থাকেনি নূরজাহান, আজ এই প্রথমবার সেই মানুষের কথা শুনতে ভাল লাগছে না নূরজাহানের। কোনও রাগ ঘৃণা যে হচ্ছে বাপের ওপর তাও না। কেমন যেন একটা অবস্থা। যেন এই মানুষটা থাকলেও যা না থাকলেও তাই। আছে তো আছে, নাই তো নাই।

সংসারের প্রিয় মানুষরা সবসময় চোখ জুড়ে থাকে মানুষের। দূরে কোথাও চলে গেলে, চোখ বুজে, খুলে সেই মানুষটাকে দেখতে পায় মানুষ। মানুষটার মুখখান দেখতে পায়। দুনিয়াতে বাপের চেয়ে প্রিয় কোনও মানুষ নাই নূরজাহানের। প্রিয় কোনও মুখ নাই। বাপ যতক্ষণ বাড়িতে না থাকে, বাপের কথা ভাবলেই চোখের সামনে মানুষটাকে দেখতে পায় নূরজাহান। তার হাঁটাচলার ভঙ্গি, কথা বলা আর কাজ করবার ভঙ্গি, হাসিহাসি মুখ দেখতে পায়। আজ জীবনে প্রথম, কাশেমের মুখে বার বার শুনছে বাপের কথা, তাকে নূরজাহান দেখতে পাচ্ছে না। না তার হাঁটাচলা, না তার কাজকর্মের ভঙ্গি, না তার শোয়া খাওয়া, না তার মুখ।

ভিতরে ভিতরে নূরজাহান খুবই অবাক হল। পাশাপাশি হাঁটছে কাশেম, কাশেমের কথা একদম ভুলে গেল। ভাবল চোখ খোলা আছে বলে বাপের মুখটা সে দেখতে পাচ্ছে না, হয়তো বা চোখ বুজলে দেখতে পাবে।

হাঁটতে হাঁটতে চোখ বুজল নূরজাহান। তারপরও দবির গাছির মুখটা সে দেখতে পেল না। হামিদাকে দেখল, তাদের বাড়িটা দেখল, বাড়ির খুটিনাটি সবকিছু দেখল কিন্তু বাড়ির প্রধান মানুষটাকে দেখতে পেল না।

এটা কেমন করে হচ্ছে! কেন হচ্ছে!

ভিতরে ভিতরে নূরজাহান কেমন দিশাহারা হয়ে গেল! এমন তো কখনও হয়নি তার। আজ কেন হচ্ছে! জীবনে আজ প্রথম বাবা তার গায়ে হাত তুলেছে বলে!

কাশেম বলল, সড়কের কাছে তো আইয়া পড়লা মা, এলা বাইত্তে লও।

নূরজাহানের যেন হঠাৎ খেয়াল হল বাড়ি থেকে অনেকটা দূর চলে এসেছে। বড় সড়কের কাছাকাছি। বেশ কয়েকদিন সড়কের এদিকে আসা হয় না। আজ যখন এসেই পড়েছে একটু দেখে যাবে কতদূর আগালো সড়ক! মাওয়ার ঘাট ধরতে আর কতদিন লাগবে!

কাশেমের দিকে তাকিয়ে খুবই স্বাভাবিক গলায় নূরজাহান বলল, আপনে যান গা, আমি ইট্টু সড়কের মিহি ঘুইরাহি।

কাশেম বিগলিত গলায় বলল, তাইলে আমিও তোমার লগে যাই মা।

ক্যা?

তোমার মা বাপরে কইছি তোমারে বাইত্তে লইয়া যামু, না লইয়া যাই কেমতে?

অন্য সময় হলে এই ধরনের কথা শুনে হাসত নূরজাহান। এখন হাসল না। মুখ ঘুরিয়ে কাশেমের দিকে আর তাকালও না। সড়কের দিকে হাঁটতে লাগল।

AMARBOI.COM

আলী আমজাদের মাথার উপর ছাতা ধরে আছে হেকমত। শীত সকালের রোদে ছাতা জিনিসটার দরকার হয় না। তাও রোদ আটকাবার জন্য। যদি ক্বচিত কখনও গভীর হয়ে নামে কুয়াশা, দুপুর পর্যন্ত সুর্যের মুখ দেখা যায় না, রোদ বলতে কিছু থাকে না, কুয়াশা ফুটা করে আচমকা পড়তে শুরু করে গুড়িবৃষ্টি, তখন হয়তো গ্রাম গিরস্তের কেউ কেউ ছাতা মেলে মাথার ওপর। তাও খুব সৌখিন গিরস্ত না হলে না, সচ্ছল আর শীতকাতর গিরস্ত না হলে না। বেশিরভাগ গিরস্তই গায়ের চাদর মেয়েছেলের ঘোমটার মতো করে তুলে দেয় মাথায়। বৃষ্টি আটকায়। কিন্তু শীতের দিনের রোদ আটকাবার জন্য ছাতা দেশ গ্রামের কোনও মানুষ কখনও দেখেনি।

দূর থেকে দৃশ্যটা দেখে খুব মজা পেল নূরজাহান। ভুলে গেল সকালবেলার ঘটনা। সড়কের অদূরে এসে দাঁড়াল সে। মুখের মজাদার ভঙ্গি করে আলী আমজাদ আর ছাতা ধরা হেকমতের দিকে তাকিয়ে রইল। লগে যে মকুন্দা কাশেম আছে ভুলে গেল।

সড়কের কাজে মাটিয়াল বেড়েছে ম্যালা। প্রতিদিন অনেকখানি করে আগাচ্ছে সড়ক। এই তো কয়দিন আগে ছিল জাহিদ খাঁর বাড়ির সামনে, আজ এসে গেছে হযরতদের বাড়ির সামনে। দুইদিন পর দক্ষিণ মেদিনীমণ্ডল ছাড়িয়ে কুমারভোগ ধরবে। তারপর মাওয়ার ঘাট।

মাটিয়াল, সড়কের কাজ কোনওটাই খেয়াল করছিল না নূরজাহান। সে তাকিয়ে আছে আলী আমজাদের দিকে, হেকমতের দিকে। আলী আমজাদ নড়ে তো ছাতা হাতে হেকমতও নড়ে। আলী আমজাদ দুইপা আগায়, তিন পা পিছায় তো হেকমতও আগায় পিছায়। যেন কোনওভাবেই রোদের আঁচ কন্ট্রাক্টর সাহেবের গায়ে না লাগে।

আলী আমজাদ এই ব্যাপারটাকে মোটেও পাত্তা দিচ্ছে না। কালো রঙের কোটপ্যান্ট পরা। কোটের তলায় সাদা শার্ট। গলায় মাফলার আছে। মাফলারটা বেশ টাইট করে প্যাঁচিয়ে রেখেছে। পায়ে জুতা। দেখে বুঝা যায় এতকিছু পরে থাকার পরও শীতটা তার আছে।

এই অবস্থায় রোদে থাকতেই তো পছন্দ করে মানুষ, হেকমত তাহলে ছাতা ধরে রেখেছে কেন আলী আমজাদের মাথায়!

অল্প কয়দিনে আলী আমজাদ লোকটা বেশ ফুলেছে। বিশেষ করে পেট। এই এতটা দূর থেকেও পোটকা মাছের মতন পেটখান তার দেখা যাচ্ছে। যেন গরুর ফ্যান খৈল খাওয়ার বিশাল একখান গামলা উপুড় করে পেটের লগে বেঁধে রেখেছে আলী

AMARBOI.COM

আমজাদ। কথাটা ভেবেই খিলখিল করে হেসে উঠতে চাইল নূরজাহান। কী ভেবে শব্দ করে হাসল না, হাসল নিঃশব্দে। তার সেই হাসি মাকুন্দা কাশেম দেখে ফেলল। দেখে খুবই অবাক হল। হাসো ক্যা মা? কী অইছে?

হাসি বন্ধ করল নূরজাহান। কিছু না।

সড়ক মিহি যাইবা কইলা, যাইতাছ না ক্যা? সড়কের সামনে আইয়া খাড়াইয়া রইল্যা ক্যা?

এমতেঐ।

কনেটেকদার সাবরে দেইক্কা?

ক্যা, হেরে দেইক্কা খাড়ামু ক্যা?

কনটেকদার সাবরে ডরাইতেও পারো।

অবাক হয়ে কাশেমের মুখের দিকে তাকাল সে। কনটেকদার সাবরে আমি ডরামু ক্যা?

কাশেম কাঁচুমাচু গলায় বলল, অনেকেই হেরে ডরায়।

কন কী!

হ।

ক্যা, ডরায় ক্যা?

পয়লা কথা অইলো ম্যালা টেকা পয়সা আছে, তারবাদে আতাহারগো লগে দুস্তি। টেকা আর ক্ষেমতা যার থাকে হেরে মাইনষে এমতেঐ ডরায়।

আমি ডরাই না। লন আমার লগে, দেইখেন নে কনটেকদার সাবের লগে কেমতে কথা কই আমি! হেয় কেমতে কথা কয় আমার লগে।

কাম নাই যাওনের। লও আমরা বাইত্তে যাই গা।

হাঁটতে হাঁটতে নূরজাহান বলল, না।

আদিলদ্দি নামের মাটিয়ালটা একেবারেই ভাঙাচোরা শরীরের, একেবারেই কমজোরি। মাপ মতন ভরা মাটির য়োড়া বহন করতেই তার জান বেরিয়ে যায়। কোদাল চালিয়ে চাপ চাপ মাটি কেটে য়োড়া ভর্তি করে দেয় যেসব মাটিয়াল, হাতের মাপ তো সব সময় আর ঠিক থাকে না তাদের, মাটি তো আর ধান চাউল না যে ওজন রাখতে হবে কাঁটায় কাঁটায়, দুই এক কোদাল মাটি কমবেশি হতেই পারে কোনও কোনও য়োড়ায়। কম হলে আদিলদ্দির কোনও অসুবিধা নাই, বেশি হলেই মরণ। ঘেটি সোজা করে হাঁটতে পারে না। যেন এখনই হরমাইলের (পাটখড়ি) মতন মট করে ঘেটি ভেঙে যাবে তার।

AMARBOI.COM

মাথাটা কিছুতেই তখন আর সোজা রাখতে পারে না। মাত্র হাঁটতে শিখা শিশুর ভঙ্গিতে শ্বাস টানে, যেন এখনই জানটা বেরিয়ে যাবে তার। ফলে আদিলদ্দিকে দেখলেই মেজাজ বিগড়াইয়া যায় আলী আমজাদের। মাটিভর্তি য়োড়া মাথায় হেঁটে যাওয়া মানুষটার কোকসা বরাবর লাথথি মারতে ইচ্ছা করে। শইল্লে জোরবল নাই, মাইট্টাল অইতে আইছস ক্যা চুতমারানির পো! টেকার সমায় তো একটেকা কম নিবি না!

এখনও ঠিক এমন একটা অনুভূতিই হল আলী আমজাদের। য়োড়া মাথায় ভাঙন থেকে উঠে আসছিল আদিলদ্দি, তার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। দুই এক কোদাল মাটি বুঝি বেশি ছিল আদিলদ্দির য়োডায়। সে হাঁটছিল টলোমলো পায়ে। ঘেটি মটমট করছিল তার, হাঁ করে শ্বাস টানছিল। গায়ের চামড়ার মতো চাদরটা লগেই আছে। চিকন মাজার লগে চাদরটা সে প্যাঁচিয়ে বেঁধে রেখেছে। একপলক চাদরটার দিকে তাকিয়ে হেকমতের দিকে মুখ ফিরাল আলী আমজাদ। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, এই চুতমারানির পোরে দেকলেঐ মেজাজ খারাপ অইয়া যায় আমার।

চারদিকের এত মাটিয়ালের মধ্যে কার কথা বলছে আলী আমজাদ ঠিক বুঝতে পারল না হেকমত। ছাতি ধরা হাত বদল করে বলল, কার কথা কন?

ঐ যে আদিলদ্দি না কী নাম! কামাড়গাও বাড়ি। নাম জিগাইলে পুরা নাম কয়। আদিলউদ্দিন।

হ এই বেডার শইল্লে জোরবল নাই।

জোরবল নাই তয় রাকছো ক্যা?

আপনেঐত্তো রাকতে কইলেন!

আলী আমজাদ জানে সেই আদিলদ্দিকে রাখতে বলেছে। তার কথা ছাড়া লোক রাখার সাহস হেকমতের হবে না। রাখলেও কোনও না কোনও ফাঁকে আলী আমজাদকে বলবে, লোকটাকে ডেকে এনে দেখাবে। এমনভাবে তার গুণকীর্তন গাইতে থাকবে যেন অশুরের মতো শক্তি লোকটার গায়ে। একা তিন মানুষের কাজ করবে। এমন মাটিয়াল আর হয় না।

কিন্তু আদিলদ্দিকে সে রাখেনি। আলী আমজাদ রাখার পরও দুই একবার বলবার চেষ্টা করেছে, এমুন ম্যাড়া (রোগা অর্থে) মাইট্টাল দিয়া কাম অইবো না। সেকথা পাত্তা দেয়নি আলী আমজাদ। কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। লোক যত পাও লাগায়া দেও। আদিলদ্দি কমজুরি হউক আর যাই হউক মানুষ তো, কিছু না কিছু মাডি তো উডাইতে পারবো!

এখন যেন এসব কথা আর মনেই নাই আলী আমজাদের। হেকমতের কথা শুনে অন্যদিকে তাকিয়ে নির্বিকার গলায় বলল, আমি রাকছিলামনি! কী জানি, মনে নাই।

হেকমত আমতা গলায় বলল, আপনে না রাকতে চাইলে খেদাইয়া দেই।

না থাউক। কাম তাড়াতাড়ি শেষ করন লাগবো। অহন আর মাইট্টাল খেদাইয়া লাব নাই। পারলে আরও ধরো। কামে লাগাও।

তখনই নূরজাহান আর মাকুন্দা কাশেম এসে দাঁড়াল আলী আমজাদ আর হেকমতের সামনে। প্রথমে নূরজাহানকে খেয়াল করেনি আলী আমজাদ, আনমনা চোখে

AMARBOI.COM

তাকিয়েছিল হযরতদের বাড়ির উঁচু তালগাছটার দিকে। কী কথা বলবার জন্য হেকমতের দিকে তাকিয়েছে, তাকিয়ে নূরজাহানকে দেখে সেই কথা ভুলে গেল। দুই দিকের ঠোঁট যতদূর লম্বা করা যায় করে হাসল। সোনায় বাঁধানো দাঁতখান চকচক করে উঠল। সেই দাঁত দেখে ব্যাটারির কথা মনে হল নূরজাহানের। হাসি পেল। হাসবার আগেই আলী আমজাদ বলল, কই থিকা আইলা নূরজাহান? তোমারে আইজকাইল দেহিই না!

নূরজাহান বলল, একলগে দুইডা কথা জিগাইতেছেন। কয়ডার জব দিমু?

দুইডারঐ দেও।

একটা একটা কইরা দিমু, না একলগে?

আলী আমজাদ আবার আগের মতো হাসল। তুমি বড় রস কইরা কথা কও নূরজাহান। আমার বহুত ভাল্লাগে।

তাইলে আরেকখান কই?

কও।

আপনের গরম বেশি?

কিছু না ভেবে আলী আমজাদ বলল, গরমের দিন গরম বেশি, শীতের দিন শীত বেশি।

এইডা শীতের দিন না?

হ।

তয়?

তয় আবার কী! শীতের দিন দেইক্কাঐত্তো সুটকুট ফিনছি। গলায় মাপলার, পায়ে জুতামুজা। আর এই বছর কেমন শীত পড়ছে দেকতাছো না!

নূরজাহান হাসল। হ দেকতাছি। দেইক্কাঐত্তো জিগাইলাম।

এবার আলী আমজাদ একটু চিন্তিত হল। চোখ সরু করে নূরজাহানের দিকে তাকাল। তুমি মনে অয় আমার লগে ঠাট্টা মশকরা করতাছো?

নূরজাহান কথা বলবার আগেই কাশেম হাসিমুখে করে বলল। হ। আপনের মাথায় ছাতি দেকতাছে তো এর লেইগাঐ এত কথা কইতাছে।

কাশেমের দিকে তাকাল আলী আমজাদ। কীরে মাকুন্দা, তুই আইলি কই থিকা?

কাশেম লাজুক গলায় বলল, মার লগেঐ আইছি।

আতাহরগ বাইত্তে থিকা তরে বলে খেদাইয়া দিছে? তয় তুই অহন থাকচ কই? কাম করচ কই?

নূরজাহান বলল, এই হগল কথা পরে কইবনে। আগে ছাতিডা বুজান।

আলী আমজাদ হেকমতের দিকে তাকাল। যেন ব্যাপারটা খুবই মজার এমন ভঙ্গি করে বলল, সব সময় ছাতি ধইরা রাখনের কাম নাই। ছাতিডা বুজাও। ঐ মিহি গিয়া কামকাইজ দেহো। আমার থিকা কামকাইজ দেহন ভালো।

হেকমত আড়চোখে একবার নূরজাহানের দিকে তাকাল। ভিতরে ভিতরে ক্ষিপ্ত হয়েছে। মুখে হালকা রাগি একটা ভাব। নরম ভঙ্গিতে ছাতা বন্ধ করল, তারপর দ্রুত হেঁটে মাটিয়ালদের ভিড়ে মিশে গেল।

AMARBOI.COM

আলী আমজাদ বলল, বোজলা নূরজাহান, ম্যানেজার অইলে কী অইবো, এই হালায় অইলো চাকর বাকরের লাহান। শীতের দিনেও আমার মাথার উপরে ছাতি মেইল্লা রাখে। কও দিহি, তোমার খবরবার্তা কী!

আলী আমজাদের চোখের দিকে তাকিয়ে নূরজাহান বলল, আপনের লগে কথা আছে।

তার লগে কথা আছে নূরজাহানের শুনে অদ্ভুত এক আনন্দে বুকের খুব ভিতরে দোলা লাগল আলী আমজাদের। প্রথমে যেন কথাটা তার বিশ্বাস হল না। হাসিমুখে নূরজাহানের দিকে তাকাল। কী কইলা! আমার লগে তোমার কথা আছে!

নূরজাহান বলল, হ।

আলী আমজাদ বিগলিত হয়ে গেল। সত্য কথা কইতাছো তো, না ফাইজলামি করতাছো?

আমি আপনের লগে কোনওদিন ফাইজলামি করি?

করো না!

কবে করছি?

কতদিন করছো!

নূরজাহান মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, একদিনের কথা কন তো! কী ফাইজলামি করছি কন!

কইছিলা না আমার মুকে এমুন পচাগন্দ, আমার বউ আমার লগে থাকে কেমতে!

শুনে নূরজাহান লজ্জা পেয়ে গেল। আড়চোখে একবার মাকুন্দা কাশেমের দিকে তাকাল। অদূরে দাঁড়িয়ে আছে কাশেম। এদিকে তার মন নাই। তাকিয়ে তাকিয়ে মাটিয়ালদের কাজ দেখছে।

নূরজাহান যে কাশেমের দিকে তাকিয়েছে ব্যাপারটি যেন খেয়ালই করল না আলী আমজাদ। আগের মতোই আমোদের গলায় বলল, ওই দিনঐ আমার সোনায় বানদাইন্না দাঁত লইয়া ফাইজলামি করছেলা। কইছেলা আমি হাসলে বলে তোমার মনে অয় আমি বেটারি লাগাইয়া হাসতাছি।

শুনে এমন হাসি পেল নূরজাহানের! এক হাতে মুখ চেপে ধরে হাসি সামলাল। বলল, আপনের দিহি বেবাক কথা মনে আছে!

থাকবো না! তোমার কথা আমার মনে না থাইক্কা পারে?

নূরজাহান ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, কন কী!

হ। মাইনষে যার কথা বেশি চিন্তা করে তার বেবাক কথা মনে থাকে।

আমার কথা আপনে চিন্তা করেন?

করি।

ক্যান?

পরে একদিন কমুনে। সময় অইলে কমুনে। অহন তোমার কথা কও। কী বলে কইবা আমারে! কও।

তারপর হঠাৎ করেই মাকুন্দা কাশেমকে তাদের পাশে দেখতে পেল আলী

AMARBOI.COM

আমজাদ। নূরজাহানকে কিছু একটা বলবার জন্য আগাইয়া আসছে কাশেম। কথাটা আর বলতে পারল না, তার আগেই কুত্তার মতন খাউ খাউ করে উঠল আলী আমজাদ। এই বেডা, তুই এহেনে খাড়ইয়া রইছস ক্যা? চাছ কী!

আলী আমজাদের এরকম খেউক্কানি (খেঁকুড়ে ভাব) দেখে কাশেম থতমত খেল। মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল তার, বলতে পারল না। বলল নূরজাহান। এমুন কইরেন না। হেয় আমার লগেঐ আইছে।

শুনে আলী আমজাদ নরম হল। অ। কীর লেইগা আইছে তোমার লগে?

এমতেঐ।

খাড়ই রইছে ক্যা? যাইতে কও গা।

একটুখানি থেমে থাকল নূরজাহান তারপর বলল, যেই কথা আপনেরে কইতে চাই হেইডা কাশেম কাকার লেইগাঐ।

কাশেম কাকা কেডা?

নূরজাহান হাসল। এই যে হেয়।

মুখে ভারি একটা তাচ্ছিল্যের ভাব করল আলী আমজাদ। মাকুন্দারে তুমি কাকা কও?

কাকা অইলে কমু না?

কেমুন কাকা তোমার?

আপনা না। এক গেরামের মানুষ। আমার বাবারে কয় গাছিদাদা। হের লেইগা আমি কই কাকা।

আতাহরগো বাড়ির গোমস্তারে কও কাকা, শরম করে না তোমার?

কীয়ের শরম!

আড়চোখে কাশেমের দিকে একবার তাকাল আলী আমজাদ। তারপর বলল, শরমডা যে কীয়ের তুমি বুজবা না।

না বুজলে বুজান।

কাম নাই। কাইশ্যারে লইয়া কী কইবা কও।

আলী আমজাদের কথায় আচরণে বোঝা যাচ্ছিল কাশেমকে নিয়ে কথা বলবে নূরজাহান এটা তার ভাল লাগছে না। সে আশা করেছিল অন্যকিছু। হয়তো এমন কোনও কথা বলবে নূরজাহান যা শুনে অন্যরকম একটা আনন্দ পাবে সে!

নূরজাহান বলল, কাশেম কাকায় অহন আর মাওলানা সাবের বাইত্তে কাম করে না।

আলী আমজাদ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, হেইডা জানি।

কাকারে একটা কাম দেন।

চট করে নূরজাহানের দিকে মুখ ফিরাল আলী আমজাদ। কী?

হ। কাম দেন একখান।

কী কাম?

মাইট্টাল বানাইয়া দেন। মাইট্টাল তো আপনের লাগেঐ।

হ লাগে। মানুষ পাইলেঐ অহন মাইট্টাল বানাই আমি। তয় কাইশ্যারে বানান যাইবো না।

AMARBOI.COM

ক্যা?

ও আমার দোস্তের বাড়ির গোমস্তা আছিলো।

আছিলো কী অইছে? অহন তো নাই।

মাওলানা সাবে বাইত্তে থিকা খেদাইয়া দিছে অরে। ঐ বাড়ির খেদাইন্না মানুষ আমি রাকুম না।

ক্যা? রাকলে কী অইবো?

আতাহার গোসা করবো।

আলী আমজাদের কথার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারল না নূরজাহান। তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

নূরজাহানকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসল আলী আমজাদ। যেন নূরজাহানের কথার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে এমন ভঙ্গিতে বলল, তয় তুমি যুদি কও তাইলে কাইশ্যারে আমি রাখুম।

শুনে লাফিয়ে উঠল নূরজাহান। সত্যই রাখবেন।

সত্যই রাখুম।

তয় রাখেন।

তুমি কইলা?

হ।

আলী আমজাদ এবার কাশেমের দিকে তাকাল। ঐ কাইশ্যা, আমার ম্যানাজার হেকমইত্তারে ডাক দে।

কাশেম লগে লগে বলল, দিতাছি।

দূরে, মাটিয়ালদের ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকা হেকমতকে চিৎকার করে ডাকল। ম্যানাজার সাব, ও ম্যানাজার সাব এইমিহি আহেন। কনটেকদার সাবে ডাকে।

আলী আমজাদ ডেকেছে শুনে পাগলের মতো ছুটে এল হেকমত। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কন সাব।

নূরজাহানের দিকে তাকিয়ে আলী আমজাদ বলল, অরে মাইট্টাল বানাইয়া দেও।

কাকে মাটিয়াল বানাতে হবে! নূরজাহানকে! এইটুকু মেয়ে মাটিয়াল হবে কী করে! আজকাল কোনও কোনও এলাকার গরিব মেয়েছেলেরা মাটিয়ালগিরি করে কিন্তু এই এলাকায় তেমন মেয়েছেলে নাই। তাহলে?

হেকমত ভয়ে ভয়ে বলল, কারে?

মুখ ঘুরিয়ে কটমটা চোখে হেকমতের দিকে তাকাল আলী আমজাদ। বোজচ নাই কারে! তুই কী মনে করছস নূরজাহানরে মাইট্টাল বানাইতে কইছি আমি!

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল নূরজাহান। সেই হাসির শব্দে হেকমত বেকুব হয়ে গেল। এই অবস্থা থেকে তাকে বাঁচাল মাকুন্দা কাশেম। কনটেকদার সাবের কথা আপনে বোজেন নাই ম্যানাজার সাব। নূরজাহানরে না, আমারে মাইট্টাল বানাইতে কইছে।

হেকমত বলল, এইবার বুজছি।

তারপর আলী আমজাদের দিকে তাকাল। কবে থিকা কামে লাগামু সাব?

AMARBOI.COM

আলী আমজাদ গম্ভীর গলায় বলল, আইজ থিকাঐ।

তাইলে অহনই লাগাইয়া দেই।

দে।

লগে তো য়োড়া নাই।

আমগো য়োড়া থিকা একটা দিয়া দে।

আইচ্ছা।

কাশেমের দিকে তাকাল হেকমত। আহো আমার লগে।

এত সহজে এরকম কাজের ব্যবস্থা হয়ে যাবে স্বপ্নেও ভাবেনি মাকুন্দা কাশেম। নূরজাহানের জন্য হয়েছে। তার একবার ইচ্ছা হল নূরজাহানকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। কাজে দেরি হয়ে যাবে দেখে করল না। দেরি হলে কাজটা যদি আবার না দেয় কনটেকদার সাবে!

হেকমতের পিছন পিছন ছুটতে লাগল মাকুন্দা কাশেম।

আলী আমজাদ তখন নূরজাহানের দিকে তাকিয়ে আছে। নূরজাহান তাকিয়েছিল ছুটে যাওয়া কাশেমের দিকে। গভীর আনন্দে মুখটা যেন ফেটে পড়ছে তার। আলী আমজাদের দিকে মুখ ফিরাতেই সে বলল, তোমার কথা তো আমি রাখলাম তাইলে তুমিও আমার একখান কথা রাখো।

নূরজাহান অবাক হল। কী কথা?

আমার লগে এক জাগায় যাওন লাগবো। লও।

সড়ক যেখানে শেষ হয়েছে, যেখান থেকে মাটি ফেলে ফেলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সড়ক তার থেকে খানিক দূরে সড়কের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আলী আমজাদের মোটর সাইকেল। যেন সড়কটা আলী আমজাদের বাপের সম্পত্তি। সড়কের মাঝখান ছাড়া মোটর সাইকেল সে রাখেই না। লোক চলাচল পুরা মাত্রায় শুরু না হলেও চারপাশের গ্রামের কিছু না কিছু লোক এরমধ্যেই সড়ক ব্যবহার করতে শুরু করেছে। সড়কের মাঝখানে মোটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে রাখলে হাঁটাচলায় যে তাদের অসুবিধা হতে পারে ওসব ভাবেই না আলী আমজাদ।

নূরজাহানকে তার লগে যাওয়ার কথা বলেই মোটর সাইকেলটার দিকে তাকাল আলী আমজাদ। নূরজাহান বলল, কই যামু আপনের লগে?

আলী আমজাদ নূরজাহানের দিকে মুখ ফিরাল। হাসি মুখে বলল, আছে একখান জাগা।

কইতে পারেন না কই?

তোমার কি মনে অইতাছে আমি তোমারে খারাপ জাগায় লইয়া যামু!

একথায় নূরজাহান একটু রাগল। খারাপ জাগা ভাল জাগা আবার কী! কই লইয়া যাইবেন হেইডা কন না ক্যা?

রাগি ভঙ্গিতে কথা বলবার সময় খুবই অন্যরকম লাগে নূরজাহানকে। নাকের পাটা একটুখানি ফোলে, চোখ ছোট হয়, ভুরু কুঁচকে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি হয় কপালের, সব মিলিয়ে দেখতে অপূর্ব লাগে।

AMARBOI.COM

এখনও লাগছিল।

আলী আমজাদ মুগ্ধ চোখে নূরজাহানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরই নূরজাহানের ডান গালটা দেখতে পেল লাল হয়ে আছে। মানুষের হাতের পাঁচটা আঙুল যেন ফুটে আছে নূরজাহানের ডানগালে।

আলী আমজাদ আঁতকে উঠল। এমন একটা ভঙ্গি করল মুখের যেন নূরজাহানের গালের এই দাগ নূরজাহানের গালে পড়েনি, পড়েছে তার কলিজায়। পারলে নূরজাহানের গালটা দুইহাতে চেপে ধরে সে এমন দিশাহারা গলায় বলল, কী অইছে?

এইমাত্র হচ্ছিল এক জায়গায় যাওয়ার কথা, সেই কথা শেষ হতে না হতেই হচ্ছে আরেক কথা। তাছাড়া আলী আমজাদের দিশাহারা, ভয় পাওয়া ভাব দেখে, কথা বলবার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কী যেন কী মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে তার। এসব দেখে মুখের রাগ উধাও হয়ে গেল নূরজাহানের। চোখের দৃষ্টিতে পড়ল দুশ্চিন্তার ছায়া। বলল, কো কী অইছে?

তোমার গালে?

নূরজাহান তার ডানগালে হাত দিল। কী অইছে গালে?

লাল অইয়া রইছে। মনে অয় মাইনষের হাতের পাচখান লউং (আঙুল) ফুইট্টা রইছে।

আলী আমজাদের কথায় এতক্ষণের উদ্বিগ্ন ভাব কেটে গেল নূরজাহানের। সে একটু বিরক্তই হল। ইস আপনে যে কেমুন একখান মানুষ! আমার গালে কী অইছে হেইডা লইয়া যে এমুন একখান ভাব করলেন যেন জাইত (জাত) সাপে দংসাইছে আপনেরে!

মুখের ভয় পাওয়া ভাব তবু বজায় রাখল আলী আমজাদ। বলল, করুম না? কও কী? গালডা এমুন অইয়া রইছে তোমার আর হেইডা দেইক্কা আমি কিছু কমু না!

এত কওনের কিছু নাই। এমুন করনেরও কিছু নাই।

আইচ্ছা করলাম না। অহন কও গালে কী অইছে তোমার?

এবার বাবার কথা মনে পড়ল নূরজাহানের। জীবনে প্রথম বাবা আজ তার গায়ে হাত তুলেছে। প্রচণ্ড জোরে থাবড় মেরেছে নূরজাহানের গালে। কথাটা ভেবে গভীর অভিমানে বুক ভরে গেল নূরজাহানের। চোখ ছলছল করে উঠল। চোখের পানি সামলাবার জন্য অন্যদিকে মুখ ফিরাল সে।

আলী আমজাদ বুঝল ব্যাপারটা। একটা সুযোগ নিল। হাত বাড়িয়ে নূরজাহানের একটা হাত ধরল। কী অইছে কও আমারে!

গলার স্বর কাদার মতো, যেন নূরজাহানের কষ্টে মরে যাচ্ছে সে, যেন নূরজাহানের কষ্টে এখনই হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করবে।

আলী আমজাদের এসব কায়দা একদমই পাত্তা দিল না নূরজাহান। আলী আমজাদ তার হাত ধরবার লগে লগে নিজেকে বদলে ফেলেছে সে। চোখের পানি সামলেছে, বুকের ভিতরকার অভিমান চাপা দিয়েছে। প্রথমে রাগি চোখে আলী আমজাদের দিকে তাকাল সে, তারপর ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল। হাত ছাড়েন।

আলী আমজাদের হাত থেকে ঝটকা মেরে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে নূরজাহান

এই দৃশ্য কোনও মাটিয়াল দেখল কী না, দেখে কনটেকদার সাবের অপমানে ভিতরে ভিতরে পুলক বোধ করল কী না বুঝার জন্য মাটিয়ালদের দিকে তাকাল আলী আমজাদ। তাকিয়ে বেকুব হয়ে গেল। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে হেকমত। কিছু একটা বলবার জন্য যেন অপেক্ষা করছে। অনুনয়ের চোখে তাকিয়ে আছে আলী আমজাদের দিকে।

হেকমতকে দেখেই মাথায় রক্ত লাফিয়ে উঠল আলী আমজাদের। প্রচণ্ড ক্রোধে গর্জে উঠতে যাবে তার আগেই ভয়ার্ত গলায় হেকমত বলল, দেখি নাই সাব, আমি কিচ্ছু দেখি নাই। একখান কথা কইতে আইছিলাম। এমুন কোনও দরকারি কথাও না। পরে কইলেও অইবো। যাই গা।

আলী আমজাদকে রেগে উঠবার সুযোগ না দিয়ে, বকাবাজি করবার সুযোগ না দিয়েই ঝড়ের বেগে পা চালিয়ে মাটিয়ালদের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল হেকমত। তবে হেকমতের কারবার দেখে ভিতরে ভিতরে ভাল রকমের ধাক্কা খেল আলী আমজাদ। মনে মনে খারাপ একটা বকা দিল হেকমতকে। চুতমারানির পোয় তো দেহি ভাল কায়দা ধরছে! বেবাক কিছু দেইক্কাও কইলো কিচ্ছু দেহে নাই। গাইল দেওনের আগেঐ পলাইলো। কয় কী! এমুন অইলে তো হেকমইত্তার কাছে মাইর খাইয়া যামু আমি!

হেকমতের কথা ভাবতে ভাবতেই পাশে দাঁড়ান নূরজাহানের দিকে তাকাল আলী আমজাদ। ভুলে গেল ঝটকা মেরে তার হাত ছাড়িয়ে দিয়ে তাকে অপমান করেছে নূরজাহান সেই দৃশ্য দেখে ফেলেছে তার ম্যানেজার। এসব যেন কোনও ব্যাপারই না এমন ভঙ্গিতে হাসল সে। কইলা না কী অইছে গালে?

নূরজাহান মুখ গোমড়া করে বলল, কিছু না।

আমার কাছে মিছাকথা কইয়ো না। আমি জানি কী অইছে।

কন তো কী?

কেঐ তোমার গালে থাবড় মারছে।

কে কইলো আপনেরে?

এই হগল আমি বুজি।

তাইলে কন তো কে মারছে?

তোমার বাপে।

কথাটা শুনে চমকে উঠল নূরজাহান। কেমতে কইলেন?

আলী আমজাদ হে হে করে হাসল। কথাডা মিলছে কী না কও।

নূরজাহান মাথা নিচু করে করে বলল, মিলছে।

তয় আরেকখান কথা কই দেখবা ওইডাও মিলবো।

কী কথা?

বিয়ান থিকা অহনতরি তুমি কিছু খাও নাই।

নূরজাহান কথা বলল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

আলী আমজাদ বলল, এর লেইগাঐ তোমারে একটা জাগায় লইয়া যাইতে চাইতাছি। তুমি আমার সামনে আইয়া খাড়নের পরঐ তোমার মুক দেইক্কা আমি

AMARBOI.COM

বুজছিলাম বিয়ান থিকা তুমি কিছু মুখে দেও নাই। থাবরের দাগ দেখছি পরে। কইলে বিশ্বাস করবা না, বিয়ান থিকা আমিও কইলাম কিছু মুখে দেই নাই। বহুত খিদা লাগছে। এক মাইট্টালরে পাডাইয়া কাজির পাগলা বাজার থিকা রসোগোল্লা আনাইছি। গান্দিগোষের (গান্ধি ঘোষ) দোকানের রসোগোল্লা। পাউরুটি আনাইছি। চা ও আছে। আমার লগে বহাইয়া এই হগল খাওনের লেইগাঐ তোমারে লইয়া যাইতে চাইতাছি। আমার ঘরডা অহনতরি জাহিদ খাঁর বাড়ির লগেঐ আছে। লও যাই। দুইজনে মিল্লা খাওয়া দাওয়া করি গা।

নূরজাহান নির্বিকার গলায় বলল, না।

ক্যা?

আমি কিছু খামু না। খিদা নাই।

না খাইলা তাও লও।

ক্যা?

আমি খাইলাম তুমি বইয়া বইয়া দেকলা। তোমার লগে কথা কইতে কইতে খাইলাম।

না।

এবার অন্য লাইন ধরল আলী আমজাদ। মুখটা শিশুর মতো অভিমানী করে বলল, তোমার এক কথায় এতবড় একখান কাম আমি কইরা দিলাম, মাকুন্দারে মাইট্টাল বানাইয়া দিলাম, ডেলি পনচাইশ ষাইট টেকা কামাইবো, মাওলানা সাবের পোলা আতাহার আমার দোস্ত, তাগো কথা চিন্তা করলাম না, আর তুমি আমার একখান কথা হোনতাছো না! আমি কী বদলোক? ঐ ঘরে নিয়া তোমার লগে আকাম করুম! বদলোক অইলে তুমি এহেন থিকা চইলা যাওনর পরঐত্তো মাকুন্দারে আমি কামে থিকা ছাড়াইয়া দিতে পারি। তুমি পরে আইয়া জিগাইলে কমু ও কাম পারে না দেইক্কা ছাড়াইয়া দিছি। তহন তুমি আমারে কোনও দোষ দিতে পারবা?

আলী আমজাদের কথায় ব্যাপারটা বুঝার চেষ্টা করল নূরজাহান। মন একটু নরম হল তার। তবে মুখের ভঙ্গি বদলাল না। আগের মতোই নির্বিকার গলায় বলল, আইচ্ছা লন।

আচমকা রাজি হয়ে যাবে নূরজাহান এটা ভাবেনি আলী আমজাদ। প্রথমে কথাটা বিশ্বাসই করল না। বলল, কী কইলা?

কইলাম, লন যাই।

এবার গলাকাটা কুকরার মতন একটা ভাব হল আলী আমজাদের। কী রেখে কী করবে বুঝতে পারল না। পারলে নূরজাহানকে কুলে নিয়ে দৌড় দেয়।

তবে এই ভাব সামাল দিল আলী আমজাদ। সরল গলায় বলল, তয় লও।

পাশাপাশি হেঁটে মোটর সাইকেলটার সামনে এল দুইজন। আলী আমজাদ বলল, তুমি কোনওদিন মটর সাইকেলে চড়ছো?

না।

তাইলে আইজ তোমারে চড়ামু। অহনঐ।

AMARBOI.COM

মোটর সাইকেলে চড়ার কথা শুনে ভারি একটা আনন্দ হল নূরজাহানের। মোটর সাইকেলে চড়তে কেমন লাগে জানা নাই। নিশ্চয় খুব মজার।

আলী আমজাদ বলল, মটর সাইকেলে আমার পিছে বইয়া আমারে প্যাচাইয়া ধইরা রাখবকা। আমি ভো কইরা চালাইয়া দিমু। চোক্কের নিমিষে দেখবা জাহিদ খার বাড়ির সামনে গেছি গা।

মার কথা মনে পড়ল নূরজাহানের। মা একদিন বলেছিল মেয়েমানুষের শরীর শুধুমাত্র একজন পুরুষের জন্য। সেই পুরুষের নাম স্বামী। স্বামী ছাড়া অন্যকোনও পুরুষ মেয়েদের শরীর ছুঁইতে পারে না। আলী আমজাদের মোটর সাইকেলে চড়ে পিছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধরতে হলে তার বুক লেগে যাবে আলী আমজাদের পিঠে। ছি।

নূরজাহান অস্থির গলায় বলল, না না আমি মটর সাইকেলে চড়ুম না।

আলী আমজাদ অবাক হল। ক্যা?

এমতেঐ।

তারপর কথা অন্যদিকে ঘুরাল নূরজাহান। আমার ডর করে।

কীয়ের ডর? আমি আছি না!

থাকলেই বা কী, আমি চড়ুম না। আপনে মটর সাইকলে যান, আমি আইট্টাইতাছি।

আলী আমজাদ চতুর লোক। ব্যাপারটা সে বুঝল। বুঝে খুব সূক্ষ্ম একটা হাসি হাসল। তাইলে আমিও আর মটর সাইকেল লমু না। লও দুইজনেঐ আইট্টা যাই।

মোটর সাইকেল আগের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে রইল, আলী আমজাদ আর নূরজাহান পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

AMARBOI.COM

ছাপড়া ঘরের পিছনদিকে, পুকুরপারে একটা হিজলগাছ। গাছের গোড়া পুকুরপারের আঁটালমাটি কামড়ে ধরে আছে, দেহ চলে গেছে পুকুরের দিকে, গিয়ে ডিঙ্গি নৌকার মতো বাঁক নিয়ে মাথা তুলেছে আকাশে। সকালবেলার রোদ জাহিদ খাঁর বাড়ি ডিঙিয়ে, বাড়ির গাছপালা, বাঁশঝাড় আর চৌচালা টিনের ঘরগুলির চাল ডিঙিয়ে যখন এই পুকুরে আসে, মাথার দিককার ঝাপড়ানো ডালপালা দিয়ে গাছটা আপ্রাণ চেষ্টা করে রোদ ঠেকিয়ে রাখতে। রোদ পুরাপুরি ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা গাছটার নাই। ডাল পালার ফাঁক ফোকর দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রোদ এসে পড়ে পুকুরের পানিতে। হিজলের ছায়ার তলে পানি, পানির ওপর ছিটরুটির মতো রোদ, জায়গাটা সারাদিন কাল (ঠাণ্ডা) হয়ে থাকে। হঠাৎ হঠাৎ তাকালে মনের ভিতর কী রকম একটা অনুভূতি হয়। এই অনুভূতির অর্থ বোঝে না বদর। বহুকালের পুরানা একখান হিজলগাছ, তার তলায় পুকুরের পানি,

ছড়ানো ছিটানো রোদ, কালভাব, দেশ গ্রামের পথেঘাটে, গিরস্ত বাড়ির লগের আর ছাড়াবাড়ির নির্জন পুকুরপারে তাকালে এরকম দৃশ্য দেখা যেতেই পারে কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে মনের ভিতর এমন করবে কেন!

আজ সকালে এই অনুভূতির অর্থ বুঝতে চাইছিল বদর। কিছুক্ষণ আগে কাজির পাগলা থেকে ফিরেছে। ফিরে গান্ধী ঘোষের দোকান থেকে কাঁঠাল পাতার ঠোঙায় চিকন সুতলি দিয়ে বাঁধা রসগোল্লার পোটলা রেখেছে চৌকির ওপর। হাফ পাউন্ড পাউরুটিটা রেখেছে, কমলা রঙের ফ্লাস্কটা রেখেছে। ফ্লাস্ক ভর্তি চা। আগে চা আনতো কেটলিতে করে। এলুমিনিয়ামের মাঝারি সাইজের একটা কেটলি আছে। কেটলির নলে কাগজের ঢিপলা (দলা) দিয়ে, যত দ্রুত সম্ভব হেঁটে মাওয়া কাজির পাগলা থেকে ফিরে আসতে আসতে ওই অত যত্নের পরও চা যায় পুকুরের পানি হয়ে। কাগজ জ্বেলে, শুকনা পাতা খড়নাড়া জ্বেলে আবার গরম করো চা। ম্যালা হাঙ্গাম (যন্ত্রণা)। এখন এত হাঙ্গাম করবার সময় নাই। বদরকে যে চা গরম করবার কাজে বসিয়ে রাখবে, যতক্ষণে চা গরম করবে বদর ততক্ষণে দুইতিন য়োড়া মাটি ফেলবে রাস্তায়, কাজ আগাবে, এসব ভেবে কয়দিন আগে দিঘলী বাজার থেকে এই ফ্লাস্কটা কিনে এনেছে আলী আমজাদ। ফ্লাস্কে রাখা চা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গরম থাকে। এক ফ্লাস্ক চা আনলে একা খেলে বেশ কয়েকবার খাওয়া যায়। কাপেরও দরকার হয় না, ঢাকনাটাই কাপ! সময়ে সময় বাঁচে, খেয়েও আরাম।

কিন্তু সময়ের কথা আজ ভাবছে না কেন আলী আমজাদ! এখনও যে নাশতা করতে এল না!

রোদ ওঠার পর আজ কাজের সাইটে গিয়েছে আলী আমজাদ। লগে মোটর সাইকেল। ঘুম থেকে উঠে মুখ তরি ধোয়নি। ঘন মোটা লোমের ভুরুর তলায়, নাকের বাঁকের দুইপাশে চোখের কোণে আমরুজ রঙের কেতুর (পিচুটি)। মাথার চুল এলোমেলো। বালিশে মুখ গুঁজে শুয়েছিল বলে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত পশমি কম্বল মুড়া দিয়ে রেখেছিল বলে চুল মুখে কম্বলের আঁশ লেগে আছে। মুখটা বেশ নোংরা দেখাচ্ছিল। ঘুম ভাঙার পর এসব খেয়াল করেনি আলী আমজাদ। শুধু পোশাক খেয়াল করেছে। লুঙ্গি আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে ঘুমিয়েছিল। উঠে কালো রঙের প্যান্ট পরেছে, সাদা শার্ট পরেছে, শার্টের ওপর প্যান্টের লগে মিলিয়ে পরেছে কোট। পায়ে জুতা, গলায় মাফলার। এমনিতেই বেদম শীত, তার ওপর চালাতে হবে মোটর সাইকেল, একদিকে মোটর সাইকেলের বেগ অন্যদিকে শীতের বেগ, দুই বেগে কাবু হয়ে যাবে আলী আমজাদ। তাছাড়া মুখ ধুতে গেলে পরিশ্রমও তো কম না! জাহিদ খাঁর বাড়ির ঘাটলায় যাও, মরার মতন ঠাণ্ডা পানিতে হাত ডুবাও, সেই পানি স্নো পাউডারের মতন লাগাও মুখে। না হয় বালতির তোলা পানিতেই মুখ ধুইলো, সারারাত বালতিতে থাকার ফলে পুকুরের পানির চেয়ে কম ঠাণ্ডা হয় না বালতির পানি। কথা একই। বাড়িতে থাকলে না হয় গরম পানিতে মুখ ধোয়া যেত। বউ পানি গরম করে দিত। কিন্তু বাড়িতে তো আলী আমজাদ থাকছে না! থাকছে কাজের সাইটে, ছাপড়া ঘরে।

আগে প্রায়ই আতাহারদের বাড়িতে থাকত। ওই বাড়িতে থাকলেও মুখ ধোয়ার গরম পানিটা পেত। মান্নান মাওলানার অজুর জন্য যে পানি গরম করা হত তার

AMARBOI.COM

অনেকটাই থেকে যেত আলী আমজাদের জন্য। ওই বাড়িতে থাক ন জামাই আদরে থাকা যায়।

কদিন ধরে থাকা হচ্ছে না। সারারাত কাজ চলে। হ্যাজাকের আলোয় মাটি তোলে মাটিয়ালরা, সারাদিন কাজ করে একদল, সারারাত আরেকদল। দিনের তদারকি তো আছেই, রাতের তদাররিকটাও করতে হয়। হেকমত আছে, তার ওপর কতটা নির্ভর করা যায়! কাজ কমিয়ে দিয়ে বিশ পঞ্চাশজন মাটিয়ালের কাছ থেকে এক দুইটাকা করে প্রতিদিন খেলে দিনরাত মিলে ম্যালা টাকা। মাটির কাজ শেষ হতে না হতে বড়লোক হয়ে যাবে হেকমত। মাস ছয়েক পরে দেখা যাবে নিজেই কন্ট্রাক্টর হয়ে গেছে। আজ সে যেমন ছাতা ধরে রাখে আলী আমজাদের মাথায় সেদিন তার মাথায় ছাতা ধরে রাখবে আরেকজন।

টাকা কি হেকমত মাটিয়ালদের কাছ থেকে খাচ্ছে না! বাড়তি রুজি কি তার হচ্ছে না! না হলে কোন স্বার্থে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করছে। মানুষের শরীর তো! শরীরে কুলাচ্ছে কী করে! দুইজন ম্যানেজারের কাজ একা সে করছে কী করে! আলী আমজাদ নিজে তো হেকমতের দশভাগের একভাগ কাজও করছে না। দিনরাত মিলে ছয়সাত ঘণ্টার বেশি সাইটে সে থাকে না। যদিও প্রতি য়োড়া মাটির লগেই পয়সা উঠছে তার। তবু সময়টা সে পুরাপুরি দেয় না। সাইটে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেই ক্লান্ত লাগে। যদিও দাঁড়িয়ে খুব একটা থাকতে হয় না তাকে। আলী আমজাদ সাইটে আসবার লগে লগে হেকমত এসে মাথার ওপর ছাতা ধরে, বদর ছুটে যায় সড়কের ধারের যে কোনও বাড়িতে, গিয়ে হাতাআলা, হাতছাড়া একটা কাঠের চেয়ার নিয়ে আসে। আরাম করে সেই চেয়ারে বসে আলী আমজাদ। কখনও কখনও আশপাশের বাড়ি থেকে বউঝিরা চা পর্যন্ত বানিয়ে পাঠায় তাকে। এতবড় সড়কের কাজ হচ্ছে, রাতারাতি বদলে গেছে এলাকার চেহারা, কত মানুষ, কত উন্নতি, গিরস্ত বাড়ির বউঝিদের ধারণা এই উন্নতির মূলে আলী আমজাদের মতো কন্ট্রাক্টরদের বিরাট অবদান। সুতরাং এক দুইকাপ চা দিয়ে ফেরেশতার মতো এই সব মানুষের একটুখানি সেবা যদি করা যায়!

তবু সাইটে মন টিকে না আলী আমজাদের। দাঁড়িয়ে থাকলেও ক্লান্ত লাগে, বসে থাকলেও।

কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করবার পরও হেকমতের ক্লান্তি নাই কেন? কোন লোভে, কোন আশায় ওই অসুরের পরিশ্রম সে করছে! আলী আমজাদ না হয় অল্প কিছু পয়সা তার বাড়িয়েছে, এই পয়সার লোভে একজন মানুষ কী এতটা পরিশ্রম করে!

রাতের কাজ শুরু করবার পর একটানা চব্বিশ ঘণ্টা হেকমতকে কাজ করতে দেখে প্রথমে খুশি হয়েছে আলী আমজাদ। ভেবেছে লোক খুবই ভাল হেকমত, লোক খুবই কাজের। পয়সা যেটুকু বেড়েছে কাজ তারচেয়ে বেশিই করছে। এই ধরনের পরিশ্রমী লোক সবাই পছন্দ করে।

কয়েকদিন যাওয়ার পরই খটকা লাগল আলী আমজাদের। মনে হল যে পয়সা সে বাড়িয়েছে শুধুমাত্র ওই পয়সার লোভে নাওয়া খাওয়া ঘুম হারাম করে আবালের (যুবা ষাঁড়) মতো পরিশ্রম করতে পারে না কোনও মানুষ। নিশ্চয় ভিতরে কোনও রহস্য

AMARBOI.COM

আছে। বড় রকমের কোনও স্বার্থ আছে হেকমতের। সেই স্বার্থটা ধরবার জন্য তারপর উঠে পড়ে লেগেছে আলী আমজাদ। দিন নাই রাত নাই যখন তখন চলে যায় সাইটে। প্রতিবারই যাওয়ার আগে ভাবে এইবার গিয়েই হেকমতের স্বার্থটা ধরে ফেলবে। হয়তো গিয়ে দেখবে দশ বিশজন মাটিয়াল কাজ বন্ধ করে সড়কের পাশে বসে গল্প গুজব করছে, বিড়ি খাচ্ছে। নয়তো দেখবে মাটিয়ালদের কাজে গতি নাই। হেকমতও সাইটে নাই। আশপাশের কোনও বাড়ির বাংলাঘরে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। কপাল ভাল হলে হেকমতের আসল স্বার্থটাই হয়তো ধরে ফেলবে আলী আমজাদ। কাজে ফাঁকি দেওয়া মাটিয়ালদের কাছ থেকে মাথা পিছু এক দুইটাকা করে হয়তো বুঝে নিচ্ছে হেকমত আর ঠিক তখনই গিয়ে তাকে হাতেনাতে ধরবে সে।

কিন্তু আলী আমজাদের সেই আশার গুড়ে য়োড়া য়োড়া বালি ঢেলে যাচ্ছে হেকমত। যখনই সাইটে যায় আলী আমজাদ গিয়েই দেখে দৃশ্য এক রকম। মাটিয়ালরা নিয়ম মতো কাজ করছে, হেকমত তার নিজস্ব নিয়মে ছুটাছুটি করছে, চিৎকার চেঁচামেচি করছে, কোথাও কোনও গড়বড় নাই। আলী আমজাদ হতাশ হয়েছে, তবে দমে যায়নি। হেকমতের স্বার্থ রহস্য উদঘাটনের আশায় এখনও সমান উৎসাহে লেগে আছে। যে কারণে রাত বিরাতে আতাহারদের বাড়িতে আর ঘুমাতে যাওয়া হয় না তার। ওই বাড়িতে গেলে যখন তখন সাইটে যাওয়া হবে না। হেকমতকে হাতে নাতে ধরা হবে না।

আজ সকালেও হেকমতকে ধরবার আশায়ই সাইটে এসেছে আলী আমজাদ। এসে আগের মতোই হতাশ হয়েছে। মাহতাব আলীদের বাড়ি থেকে হাতলআলা কালো রঙের ভারী একখান চেয়ার এনে দিয়েছে বদর, সেই চেয়ারে বসেই পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার নোট বের করেছে। কিছুদিন হল মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না আলী আমজাদ, অন্যদিকে তাকিয়ে বলে। বদরের লগেও তাই করল। টেকাডা ধর।

গভীর উৎসাহে টাকা ধরল বদর। আড়চোখে তার টাকা ধরার ভঙ্গি খেয়াল করল আলী আমজাদ। গম্ভীর গলায় বলল, টেকা ধইরা বহুত আরাম, না?

কথাটা বুঝতে পারল না বদর। বলল, কী কইলেন?

আগের মতোই অন্যদিকে তাকিয়ে আলী আমজাদ বলল, তুই মনে করছস টেকাডা তরে আমি আল্লাদ কইরা দিলাম!

শুনে বদর খুবই লজ্জা পেল। না হেইডা মনে করুম ক্যা? আমারে আপনে টেকা দিবেন কীর লেইগা?

তাইলে যে ভেটকাইলি (হাসলি)?

কুনসুম ভেটকাইছি!

ভেটকাইছস। আমি দেকছি।

এবার সত্যি সত্যি হাসল বদর। কেমতে দেকলেন? আপনে তো অন্যমিহি চাইয়া আছিলেন!

আমার চক্কু অইলো আষ্টডা। সবই দেহি। কুনসুম কুন চক্কু দিয়া দেহি কেঐ উদিস পাইবো না।

AMARBOI.COM

তয় আমি কইলাম হাসি নাই কনটেকদার সাব। সত্যঐ হাসি নাই।

না হাসলেও আমদ পাইছস। ক পাচ নাই?

বদর মাথা নিচু করে বলল, হ পাইছি।

কীর লেইগা পাইছস কমু আমি?

কন তো!

তুই বোজছস তরে কোনও কামে পাডামু আমি। মাইট্টালগিরি ছাড়া অন্য যে কোনও কামে পাডাইলে তুই বড় আমদ পাচ। ক পাচ না?

হ পাই। মাইট্টালগিরি করতে আমার ভাল্লাগে না।

এবার বদরের দিকে মুখ ফিরাল আলী আমজাদ। হাসল। তয় বোজছস আমি কী মাল?

বুজছি।

এইবার তাইলে কাজির পাগলা বাজারে যা। গান্দির দোকান থিকা দুইটেকা দামের আষ্টডা রসোগোল্লা আনবি, এক ফেলাচ (ফ্লাস্ক) চা আনবি। করিমের ডাক্তারখানার লগে একখান দোকান আছে ওই দোকান থেইকা একখান পোয়ারুটি (পাউরুটি) আনবি। মাজারকি (মাঝারি)।

কোটের পকেট থেকে ছাপড়া ঘরের চাবি বের করে বদরের হাতে দিয়েছে আলী আমজাদ। জিনিসটি আইন্না ঘর খুইল্লা বহিচ। আমি আইতাছি। দেরি করিচ না কইলাম। আমি আইয়া যদি দেহি তুই আহচ নাই তাইলে কইলাম খাইছি তরে। বহুত খিদা লাগছে আমার।

ভারি একটা উদ্বেগ নিয়ে তারপর কাজির পাগলা ছুটেছে বদর। যত দ্রুত সম্ভব ফিরে এসেছে। এসে যখন দেখেছে আলী আমজাদ আসেনি, খুশি হয়ে ঘরের দুয়ার খুলেছে। জিনিসগুলি চৌকির ওপর রেখে নিজে এসে বসেছে বাইরে, দুয়ারের কাছে এমন জায়গায় যেখান থেকে পুকুরের ওপর ঝুঁকে থাকা হিজলগাছটা পরিষ্কার দেখা যায়। গাছের তলায় পানির ওপর ছিটরুটির মতো রোদ, ঠাণ্ডা একখান ভাব, তাকিয়ে থাকতে থাকতে আশ্চর্য এক ঘোর লেগে গেল বদরের। বুকের ভিতর অদ্ভুত এক অনুভূতি। এই অনুভূতির অর্থ কী!

কতক্ষণ এই গাছের দিকে তাকিয়ে বসে আছে বদর, মনে নাই। হঠাৎই পিছনে একজোড়া মানুষের পায়ের শব্দ পেল। ঘোর ভেঙে গেল। চমকে পেছন ফিরে তাকাল।

বদরের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে আলী আমজাদ। সঙ্গে নূরজাহান। এখানে মাটিয়ালের কাজ করতে আসার পর থেকেই নূরজাহানকে চিনে বদর। সময় সময় সড়কের কাজ দেখতে আসে। চঞ্চল স্বভাবের মেয়ে। সারাক্ষণই দইকুলির (দোয়েল পাখি) মতন লাফায়। কখনও হাঁটে না, ছুটে বেড়ায়। গাঙ্গের পানির মতন আওয়াজ করে হাসে। মুখখান এত মিষ্টি মেয়েটার, মুখের দিকে তাকালে খারাপ মন ভাল হয়ে যায়।

সেই মেয়ে আজ এত বিষণ্ন হয়ে আছে কেন?

আলী আমজাদকে দেখেই ফাল (লাফ) দিয়ে উঠেছে বদর। যে হিজলগাছের দিকে

AMARBOI.COM

তাকিয়ে মনের ভিতরকার রহস্য বোঝার চেষ্টা করছিল, কোথায় উধাও হয়ে গেল সেই সব। আলী আমজাদের সঙ্গে কথা বলল না সে। পাশে দাঁড়ান নূরজাহানের দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রতিদিনকার মতোই ডুরেশাড়ি পরা নূরজাহান। টিয়াপাখি রঙের শাড়ির ওপর টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো লাল রঙের ডোরা। কিন্তু মুখ এমন মলিন কেন মেয়েটার! কোথায় তার চঞ্চলতা, কোথায় হাসি। আলী আমজাদের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চোখে উদাসীন দৃষ্টি! হঠাৎ করে এমন বদলে গেছে কেন নূরজাহান! কী হয়েছে তার? এরকম সকালবেলা আলী আমজাদের লগে কোথা থেকে এল?

বদরের ইচ্ছা করে নূরজাহানকে জিজ্ঞাসা করে, ও মাইয়া, কী অইছে তোমার? আইজ দিহি হাসো না, বইচা মাছের লাহান ফালাও না, আইজ দিহি তুমি অন্য মানুষ! বিয়াইন্নাবেলা কনটেকদার সাবের লগে কই থিকা আইলা?

জিজ্ঞাসা করা হয় না। আলী আমজাদের মানুষের লগে আগ বাড়িয়ে কথা বলবে তার কোনও মাটিয়াল এমন সাহস, এমন কলিজা কার আছে! আবার যদি হয় মেয়েমানুষ! আগ বাড়িয়ে কথা বলতে গেলে ঢোর (স্বরনালী) ছিঁড়ে ফেলবে আলী আমজাদ। পাছায় লাথথি মেরে কাজ ছাড়িয়ে দিবে। মারের লগে কাজ চলে যাওয়া, কে যাবে এমন কাজ করতে! তারচেয়ে মনের কথা মনে চেপে রাখা ভাল।

নূরজাহানের মুখের দিকে তাকিয়ে এসব ভাবছে বদর, আলী আমজাদ বলল, আনছচ?

আলী আমজাদের দিকে মুখ ফিরাল বদর। দাঁত না বের করা হাসি হেসে বলল, হ আনছি।

কুনসুম?

আট্টু আগে।

তারবাদে কী করছস?

বইয়া রইছি।

ক্যা?

পলকের জন্য নূরজাহানের দিকে তাকিয়েই আলী আমজাদের দিকে তাকাল বদর। মুখটা হাসি হাসি করল। আপনেঐত্তো কইছেন বেবাক জিনিস আইন্না য্যান বইয়া থাকি। আমার আগে য্যান আপনে না আহেন।

তরে কী আমি বাইরে বইয়া থাকতে কইছি?

না কোনহানে বমু হেইডা কন নাই।

বদর আবার নূরজাহানের দিকে তাকাল।

এবার ঘেটি কাত করে ব্যাপারটা খেয়াল করল আলী আমজাদ। ভিতরে ভিতরে রাগল। রাগলে গলার স্বর প্রথমে নিচে নামে তার, তারপর ওঠে। এখনও তাই হল। অরে চিনচ?

কথাটা বুঝতে পারল না বদর। বলল, কারে?

এই যে আমার লগে আইছে, আমার লগে খাড়ইয়া রইছে?

AMARBOI.COM

চিনুম না ক্যা?

ক তো কে?

নূরজাহান। দবির গাছির মাইয়া।

এত ভাল কইরা যহন চিনচ তাইলে বারবার অর মুখের মিহি চাইতাছস ক্যা?

একথায় বদর লজ্জা পেল। কথার উত্তর দিল না। মাথা নিচু করল।

আলী আমজাদের গলা এবার একটু উঠল। কইলি না?

বদর ভয় পেয়ে গেল। এমতেঐ চাইছি।

এবার রাগে ফেটে পড়ল আলী আমজাদ। এমতেঐ চাইছো চুতমারানির পো! তুমি একখান বদ। জিনিসপত্র লইয়া ঘরে না বইয়া থাইক্কা তুমি আইয়া বইছো বাইরে। এমুন জাগায় বইছো যেহেন থিকা জাহিদ খার বাড়ির ঘাড দেহা যায়। বাড়ির বউঝিরা ঘাডে আহে তুমি চাইয়া চাইয়া দেহো। বহুতদিন তোমারে আমি দেকছি বাড়ির বউঝি দেকলে তুমি মিষ্টাইয়া মিষ্টাইয়া (মিটি মিটি) হাসো।

একটু থেমে, নূরজাহানের দিকে একবার তাকিয়ে, আবার বদরের দিকে তাকাল আলী আমজাদ। চড়া গলা নামাল। তর কপালে কইলাম শনি আছে।

বদরের ইচ্ছা হল আলী আমজাদকে বলে, সে ভুলেও জাহিদ খাঁর বাড়ির ঘাটলার দিকে তাকায় না, সে তাকায় ওই যে পুকুরের ওপর বাঁকা হয়ে থাকা গাছটার দিকে। গাছটার দিকে তাকালে তার মনের ভিতর কেমন করে।

বলা হয় না। আলী আমজাদ বিশ্বাস করবে না। বললে বকাবাজির মাত্রা বাড়িয়ে দিবে। ভেক ধরছো চুতমারানির পো!

অন্য সময় হলে আলী আমজাদের বকাবাজি গায়ে লাগত না বদরের, এরকম বকাবাজি তো দিনে রাতে মিলে বহুবার বহুজনকে করছে আলী আমজাদ। দুইচার দিনে এক দুইবার বদরকেও করে। শুনে অভ্যস্ত বদর। কিন্তু আজকের বকাটা খুব গায়ে লেগেছে তার। নূরজাহানের সামনে হুদাহুদি (শুধু শুধু) এমন বকা! নূরজাহানের দিকে তো বদচোখে একবারও তাকায়নি বদর। আর জাহিদ খাঁর বাড়ির বউঝিদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস তার হবে কেন!

দুঃখে অপমানে চোখ ফেটে যেতে চাইল বদরের। আলী আমজাদ ওসব খেয়াল করল না। বলল, কয় টেকা খরচা করছস?

নিজেকে সামাল দিয়ে বদর বলল, সাতাইশ টেকা।

কেমতে?

দুই টেকা দামের আষ্টডা রসোগোল্লা ষোল্ল টেকা, পোয়ারুটি ছয় টেকা, চা পাচ টেকা। ষোল্ল আর ছয় বাইশ আর পাচ সাতাইশ।

লুঙ্গির কোঁচড় থেকে বাকি টাকা বের করে দিল বদর। টাকা হাতে নিয়ে আলী আমজাদ বলল, চুরি করছস কত?

একথায় বদর একেবারে আঁতকে উঠল। মুখের অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আলী আমজাদের দিকে। কথা বলতে যেন ভুলে গেল।

আলী আমজাদ আবার বলল, কইলি না?

AMARBOI.COM

এতক্ষণ ধরে মানুষ দুইজনের কথা শুনছিল নূরজাহান। নিজে কথা বলেনি। এবার বলল। আলী আমজাদের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, কী প্যাচাইল পারতাছেন? বান্দা ইসাব দিছে। এহেন থিকা চুরি করবো কেমতে!

বদরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নূরজাহানের দিকে তাকাল আলী আমজাদ। এতক্ষণের রাগরাগি, বকাবাজি সব ভুলে গেল। সোনায় বাঁধানো দাঁতে ঝিলিক দিয়ে হাসল। করছে, করছে। এর মইদ্যেও চুরি করনের পথ আছে। আষ্টডা রসোগোল্লা কিন্না ষোল্ল টেকার জাগায় গান্দিরে দিছে পোনরো টেকা। চাইর টেকার চা কিন্না কইতাছে পাচ টেকা। খালি পোয়ারুটিডা থিকা চুরি করতে পারে নাই। ওইডার বান্দা দাম।

বদর তখনও তাকিয়ে আছে আলী আমজাদের দিকে। মুখে অদ্ভুত ভঙ্গি, চোখে পলক পড়ে না। ব্যাপারটা আলী আমজাদ খেয়াল করল না, পাত্তা দিল না। নূরজাহান খেয়াল করল। বদরের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনে যান গা।

আলী আমজাদও বলল, হ যা গা। যা চুরি করছস, করছস। হেইডা তো আর ফিরত পামু না। যা অহন কামে যা।

বদর তবু নড়ল না। আগের মতোই তাকিয়ে রইল আলী আমজাদের দিকে। চোখে পলক পড়ে না তার।

এবার আলী আমজাদ বিরক্ত হল। খাউ খাউ করে উঠল, কীরে যাচ না?

বদর নড়েচড়ে উঠল। চোখে পলক পড়ল তার। মুখভঙ্গি বদলে গেল। তবে এক পা নড়ল না সে।

বদর নড়ছে না দেখে আলী আমজাদ এবার প্রচণ্ড রাগল। চিৎকার করে বলল, কীরে অহনতরি যে খাড়োইয়া রইলি! গেলি না!

কোন ফাঁকে বদরের মুখভঙ্গি আবার বদলেছে, চোখের দৃষ্টি আবার বদলেছে। শীতল চিন্তিত একটা ভঙ্গি তার চোখে মুখে। আলী আমজাদ যত জোরে চিৎকার করল ঠিক ততটাই নিচু গলায় সে বলল, আপনে আমারে চোর কইলেন!

আলী আমজাদ আবার চিৎকার করল। হ কইলাম। তুই চুরি করছস কইছি। চোররে চোর কমু না, দারগা কমুনি!

ক্যান কইলেন? আমি তো চুরি করি নাই।

চুরি কইরা বেবাকতেই এইকথা কয়।

আমি মিছাকথা কই না।

আলী আমজাদ মুখ ভেংচি দিয়ে বলল, না তুমি মিছাকথা কও না নমবার পো! (নমোরপুত্র অর্থে) তুমি অইলা পীর আউল্লা (আউলিয়া)। যা সর আমার চোক্কের সামনে থিকা।

বদরের দৃষ্টি এখনও আগের মতো। চিন্তিত, অপমানিত মুখভঙ্গি। আলী আমজাদ এত যে চিল্লাচিল্লি করছে তার যেন গায়েই লাগছে না।

আলী আমজাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ঠিক আগের ভঙ্গিতে আবার বলল, আমি মিছাকথা কই না। একটা পয়সাও আপনের চুরি করি নাই। আমগো বংশের কেঐ চোর না। আমার বাপ দাদায় বহুত পরহেজগার মানুষ আছিলো। আপনে আমারে চোর কইলেন ক্যা?

AMARBOI.COM

এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না আলী আমজাদ। লগে যে নূরজাহান আছে ভুলে গেল। প্রচণ্ড রাগে ঝাঁপিয়ে পড়ল বদরের ওপর। ডানহাতে এমন জোরে ঘেটি ধাক্কা দিল বদরের, বদর উড়ে গিয়ে তিনচার হাত দূরে পড়ল। মুখটা মাটিতে থুবড়ে গেল। তবু মুখভঙ্গি আর চোখের দৃষ্টি বদলাল না তার। আস্তে ধীরে উঠে দাঁড়াল, হাতমুখে লাগা ধুলামাটি ঝাড়ল তারপর আবার এসে দাঁড়াল আলী আমজাদের সামনে। আপনে আমারে চোর কইলেন!

এবার আলী আমজাদ থতমত খেল। তবে পলকের জন্য। তারপরই নিজেকে সামলাল। আগের তেজ বজায় রেখে বলল, চুতমারানির পোয় তো বহুত দিগদারি (যন্ত্রণা) করতাছে। ঐ বেডা চোর কইছি কী অইছে। তুই কইলাম যা এহেন থিকা। অহনতরি নাস্তাপানি খাই নাই। মেজবান লইয়াইছি নাস্তা খাইতে। মিজাজ আর খারাপ করিচ না। তাইলে পিডাইয়া মাইরাই হালামু। যা কামে যা।

এসব কথা বদরের যেন কানেই গেল না। সে আগের মতোই বলল, আপনে আমারে চোর কইলেন!

এবার আলী আমজাদের গেল মাথা খারাপ হয়ে। দুইহাত তুলে বদরের গলা টিপে ধরতে গেল কিন্তু পারল না, নূরজাহান এসে মাঝখানে দাঁড়াল। বদরকে কিছু বলল না, বদরের দিকে তাকালও না। আলী আমজাদের দিকে তাকিয়ে ঝাঁঝাল গলায় বলল, কী আরম্ভ করলেন আপনে?

নূরজাহানকে এভাবে মাঝখানে দাঁড়াতে দেখে থামল আলী আমজাদ। তবে গলার জোর কমাল না। বলল, অরে চোর কইছি কী অইছে! এমুন করতাছে ক্যা? কামে যায় না ক্যা?

নূরজাহান বদরের দিকে তাকাল, যান আপনে কামে যান।

নূরজাহানের কথায় চোখ ছলছল করে উঠল বদরের। কাতর গলায় বলল, কনটেকদার সাবে আমারে চোর কইলো ক্যা? কও বইন, আমি বলে চোর? আমি বলে চুরি করছি? আমগো বাড়ি কান্দিপাড়া। ভাল বংশের পোলা আমি। পেডের দায়ে মাইট্টাল অইছি। চোর অইলে তো আগেঐ অইতে পারতাম!

সামান্য একটা কথায় এমন আঘাত পেতে পারে কোনও মানুষ, এমন করে ভেঙে পড়তে পারে নূরজাহান কখনও দেখেনি। নূরজাহান কী, তার বাপের বয়সী আলী আমজাদও দেখেনি। দুইজনই তারা অবাক হয়েছে। তবে দুইজনের অবাক হওয়া দুইরকম। আলী আমজাদ ভাবছে চুরি বদর করেছেই না হলে এইটুকু কথা এত গায়ে লাগবে কেন তার! এইটুকু কথা নিয়া এমন বাড়াবাড়ি সে কেন করবে! আর নূরজাহান ভাবছে, চুরি করার কথা শুনে, তাও নূরজাহানের সামনে চোর বলা হয়েছে দেখে এতটা ভেঙে পড়েছে বদর। আসলে চুরি সে করেনি।

মানুষটার জন্য খুব মায়া লাগল নূরজাহানের। বদরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কথাডা কনটেকদার সাবে এমতেঐ কইছে। আমি জানি আপনে চুরি করেন নাই। আপনে ভাল মানুষ। যান কামে যান।

বদর তারপর আর একটাও কথা বলল না। দুইহাতে চোখ মুছতে মুছতে সড়কে উঠল, উঠে ধীরে পায়ে হাঁটতে লাগল। যেন কাজে যাওয়ার কোনও গরজ নাই তার।

AMARBOI.COM

একবার বদরের দিকে তাকিয়ে নূরজাহানের দিকে মুখ ফিরাল আলী আমজাদ। হাসল। বদইরা হালায় পাগল! চোর কইলে এমুন করে মাইনষে! কইছি কী অইছে!

নূরজাহান চিন্তিত গলায় বলল, চুরি হেয় করে নাই।

করছে।

কেমতে বুজলেন?

চুরি না করলে কথাডা অর গায় লাগতো না।

আমার মনে অয় অন্যকথা। চুরি করে নাই দেইক্কাঐ কথাডা তার গায় লাগছে, মনে লাগছে।

যা ইচ্ছা অউক গা। লও ঘরে লও।

নূরজাহন একটু চমকাল। ক্যা ঘরে যামু ক্যা?

আলী আমজাদ হাসল। নাস্তা খাইবা না?

না। কইলাম যে খিদা নাই!

খিদা তোমার আছে। লও।

বলেই নূরজাহানের কাঁধে হাত দেওয়ার চেষ্টা করল আলী আমজাদ। তার আগেই চট করে সরে গেল নূরজাহান। একটু রাগল। আপনে কইলাম এমুন করবেন না আমার লগে।

নূরজাহানের কথায় দমল না আলী আমজাদ। হাসিমুখে বলল, কী করলাম!

খালি শইল্লে হাত দিতে চান!

কো?

চান। আমি খ্যাল করছি।

এইডা আমি কুমতলবে করি না। আমার অব্বাস।

অব্বাসটা ভাল না।

ভাল অইবো না ক্যা! বেবাকতের লগে তো করি না! যারে আপনা মনে করি তার লগে করি। আপনা মাইনষের হাত ধরলে কী অয়! কান্দে হাত দিলে কী অয়!

কী অয় হেইডা জানি না। আমি আপনের আপনা মানুষ না।

মুখ করুণ করল আলী আমজাদ। তুমি আমারে আপনা মানুষ না মনে করতে পারো, আমি করি। করি দেইক্কাঐ তোমার কথার লগে লগে কাইশ্যারে মাইট্টালগিরির কামে লইয়া লইলাম। কাইশ্যা অইলো আমার দোস্ত আতাহারগো গোমস্তা। আতাহারের বাপে যারে বাইতথনে খেদাইয়া দিছে তার কামে লওন ঠিক না। দোস্ত অইয়া দোস্তর লগে বেঈমানি। হেই বেঈমানি আমি তোমার লেইগাঐ করলাম! তারবাদেও তুমি আমারে আপনা ভাবো না! দেশ গেরামের মাইনষে এর লেইগাঐ কয়, যার লেইগা চুরি করি হেয় কয় চোর।

আলী আমজাদের করুণ মুখভঙ্গি আর কথার বলার ধরন দেখে মন নরম হল নূরজাহানের। সে কোনও কথা বলল না। অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আড়চোখে নূরজাহানকে একবার দেখল আলী আমজাদ। কপট অভিমানের গলায় বলল, আইচ্ছা ঘরে যাওনের কাম নাই। লও যাই গা।

AMARBOI.COM

কামের ওহেনে।

ক্যা?

এমতেঐ।

নাস্তা খাইবেন না?

না। খিদা নষ্ট হইয়া গেছে।

নূরজাহান মিষ্টি করে হাসল। যেই নাস্তার লেইগা এতকিছু করলেন, ভাল একটা মানুষরে চোর বানাইলেন আর অহন হেই নাস্তা খাইবেন না?

আলী আমজাদ মুখ গোমড়া করে বলল, না খামু না।

আমি ঘরে গেলে খাইবেন?

না তাও খামু না।

ক্যা?

খিদা মইরা গেছে।

আমি লগে বইলে খিদা আবার জ্যাতা (জ্যান্ত) অইয়া যাইবো। লন।

আলী আমজাদের আগে নূরজাহানই গিয়ে ছাপড়া ঘরে ঢুকল।

এবার সাবধানী চোখে চারদিক তাকাল আলী আমজাদ। তারপর ঘরে ঢুকল। তবে মুখ তখনও গোমড়া করে রেখেছে। ভঙ্গি এমন যেন নূরজাহান তার ঘরে ঢোকা না ঢোকায় তার কিছুই যায় আসে না।

চৌকির ওপর রসগোল্লার ঠোঙা, পাউরুটি আর চা ভর্তি ফ্লাস্ক। তার একপাশে বসল নূরজাহান। বসে আলী আমজাদের দিকে তাকিয়ে হাসল। এই যে আমি বইলাম, অহন খাইতে বহেন।

মুখ তবু উজ্জ্বল হল না আলী আমজাদের। গম্ভীর গলায় বলল, দুয়ারডা লাগায় দেই।

নূরজাহান নরম গলায় বলল, ক্যা দুয়ার লাগাইবেন ক্যা?

দেশ গেরামের কারবার। কেঐ যদি আমার লগে এই ঘরের মইদ্যে তোমারে বইয়া থাকতে দেহে তাইলে সন্দ করবো।

কী সন্দ করবো?

হেইডা তুমি বোজবা না।

বুজুম না ক্যা? বেবাকঐ বুজি। খোলাঘরে বইয়া থাকতে দেকলে মন্দ কইবো না, দুয়ার বন্দ ঘরে দেকলে মন্দ কইবো।

দুয়ার বন্দ ঘরে মানুষ আছে না আছে বোজবো কেমতে?

বাইর অওনের সুম দেকবো না?

না দেকবো না। পয়লা আস্তে কইরা দুয়ার খুলুম আমি। তারবাদে চাইরমিহি চাইয়া যহন দেহুম কেঐ কুনহানে নাই চুপ্পে চুপ্পে তোমারে বাইর কইরা দিমু।

নূরজাহান কথা বলবার আগেই কপাটে হাত দিল আলী আমজাদ। কিন্তু এখনও ইট বিছানো হয়নি এমন কাঁচা মাটির সড়ক ধরে একটা রিকশা এসে যে গ্রামে ঢুকবে

AMARBOI.COM

আলী আমজাদ তা কল্পনাও করেনি। বন্ধ করবার জন্য কপাটে মাত্র হাত দিয়েছে, বুক তোলপাড় করছে চোরা উত্তেজনায়, সেই উত্তেজনা নাস্তানাবুদ করে মান্নান মাওলানার বাড়ি ডানদিকে রেখে টুং টাং শব্দে এগিয়ে আসছিল একটা রিকশা। রিকশায় পায়ের উপর পা তুলে বসা একজন মাত্র সওয়ারী। চোখে কালো সানগ্লাস, পরনে ফুলহাতা সোয়েটার, জিনসের প্যান্ট। পায়ে সাদা কেডস। কোলের ওপর ধরা কালো রঙের ব্যাগ। এতটা দূর থেকেও রিকশায় তার বসার ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় দাপটের মানুষ।

বেল বাজিয়ে অকারণেই টুং টাং শব্দ করছে রিকশাআলা। যে উত্তেজনায় বিভোর হয়ে আছে আলী আমজাদ, রিকশার ওই সামান্য শব্দ তার কানে যেত না। কিন্তু রিকশা এসে গ্রামে ঢোকার লগে লগে সড়কের দুই পাশের বাড়িঘরে সাড়া পড়ে গেছে। বেশ একটা আমোদ ফুর্তির ভাব লেগে গেছে মানুষের মধ্যে। গিরস্ত বাড়ির বউঝি, অল্প বয়েসী পোলাপান, খেতখোলায় কাজ করতে থাকা কামলা চাষী, সড়ক পথে চলাচল করা দুই চারজন পথিক আজকের আগে অনেকেই তারা রিকশা দেখেনি বলে কামলা চাষীরা হাতের কাজ ফেলে যে যেখানে ছিল উঠে দাঁড়িয়েছে, পথিকরা বন্ধ করেছে চলাচল, হই হই শব্দে ছেলেমেয়েরা এসে জুটেছে রিকশার সামনে, পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে আর বাড়ির বউঝিরা এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির নামায় কেউ, বারবাড়িতে কেউ। প্রত্যেকের মধ্যেই উত্তেজনা। রিকশা নিয়ে নানারকম কথাবার্তা বলছে বউঝিরা, চাষী কামলা পথিকরা, আর পোলাপানগুলি করছে চিল্লাচিল্লি।

এই চিল্লাচিল্লির শব্দটাই পেল আলী আমজাদ। পেয়ে থতমত খেল। দুয়ার বন্ধ না করে গলা বাড়িয়ে সড়কের দিকে তাকাল। তাকিয়ে বেকুব হয়ে গেল। রিকশা ঢোকছে গেরামে।

চিল্লাচিল্লির শব্দ নূরজাহানও পেয়েছিল কিন্তু গায়ে লাগায়নি। আলী আমজাদকে ওভাবে তাকাতে দেখে নির্বিকার গলায় বলল, কী অইছে?

নূরজাহানের দিকে মুখ ফিরাল না আলী আমজাদ। রিকশাটা এদিকেই আসছে দেখে মহাবিরক্ত হল। রাগে দুঃখে ভিতরটা ফেটে ছ্যাড়াভেড়া হয়ে যাচ্ছিল তার। এই এলাকায় কাজ করতে আসার পর থেকে, নূরজাহানকে প্রথম যেদিন দেখল সেদিনের পর থেকে মেয়েটাকে যে কোনওভাবে একবার, শুধু একবার পাওয়ার জন্য যত রকমের চেষ্টা লোকচক্ষু ফাঁকি দিয়ে, দশদিক ঠিক রেখে করা যায় করে গেছে আলী আমজাদ। তার এতকালের চেষ্টা আজ সফল হতে চলেছে। কোনও রকমে দুয়ারে যদি খিল একবার দিতে পারত সে তাহলে কোনও না কোনও ভাবে মনের আশা আজ পূরণ হতই। মুখের কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে হোক, যত রকমের কায়দা করা যায় করে হোক মনের আশা সে পূরণ করতই। যদি তাতেও না হত তাহলে জোর করত। দরকার হলে হাতমুখ বেঁধে নিত নূরজাহানের।

তীরে এসে তরী ডুবে গেল আলী আমজাদের। কোথা থেকে গ্রামে এসে ঢুকল রিকশা। কারও কিছু হল না সর্বনাশ হল শুধু আলী আমজাদের।

রাগে ক্রোধে ভিতরটা বাঙ্গির মত ফেটে যেতে চাইছে আলী আমজাদের। মনে মনে

AMARBOI.COM

রিকশায় বসা লোকটাকে বেদম গালাগাল করতে লাগল সে। তুই কেডারে নম্বার পো! কইথিকা আইলি? খাড়ো, জুইত (সুবিধে) মতন পাইয়া লই, গোয়া মাইরা দিমু তর।

আলী আমজাদ কথা বলছে না দেখে নূরজাহান আবার বলল, কী অইছে! এত চিল্লা চিল্লি কীয়ের!

এবারও নূরজাহানের দিকে মুখ ফিরাল না আলী আমজাদ। রিকশায় বসা লোকটার উদ্দেশ্যে মনে মনে করতে থাকা গালাগাল বন্ধ করে মনমরা গলায় বলল, একখান রিকশা আইছে।

কথাটা বুঝতে পারল না নূরজাহান। বলল, কী হইছে?

রিকশা।

নিজের অজান্তে চৌকিতে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা মেয়েটা তারপর উঠে দাঁড়াল। রিকশা আইছে আমগো গেরামে! কন কী!

নূরজাহানের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাবার আগেই, নূরজাহানের লগে কথা বলবার আগেই তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ছাপড়া ঘর থেকে পাগলের মতো ছুটে বেরুল নূরজাহান। প্রথমে বেশিদূর গেল না, ঘরের অদূরে, সড়কের মুখে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে রিকশার দিকে তাকিয়ে রইল। আনন্দে উত্তেজনায় মিষ্টি মুখখান ফেটে পড়ছিল। সকাল থেকে ঘটে যাওয়া এতগুলি ঘটনার কোনওটাই আর মনে রইল না।

রিকশা তখন হাজামবাড়ি বরাবর থেমেছে। চারদিক ঘিরে ধরেছে পোলাপানে। চিল্লাচিল্লি এখন একটু থেমেছে তবে রিকশায় বসা লোকটা তখনও রিকশা থেকে নামেনি। চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। এই লোককে দেখতে না, রিকশা একেবারে কাছ থেকে দেখবার জন্য আচমকাই দৌড় দিল নূরজাহান।

AMARBOI.COM

বাপের হাতে থাবড় খাওয়ার পর নূরজাহান আজ আর নূরজাহান ছিল না, একেবারেই বদলে গিয়েছিল। গ্রামে রিকশা দেখে, আচমকা দৌড় দেওয়ার সময় সে আবার নূরজাহান হয়ে গেল। জোয়ারের পানিতে ছুটতে থাকা মাছের মতো ছুটতে লাগল। পিছনে কপাট ধরে দাঁড়িয়ে থাকা আলী আমজাদের মনের ভিতর যে তখন কী হচ্ছে আলী আমজাদ ছাড়া কেউ তা জানে না। কয়েক পলক ছুটন্ত নূরজাহানের দিকে তাকিয়ে রইল সে, তারপর মুখ ঘুরিয়ে ঘরের ভিতর চৌকির দিকে তাকাল। চৌকির ওপর কাঁঠালপাতার ঠোঙায় বাঁধা গান্ধি ঘোষের আটখান রসগোল্লা, হাফ পাউণ্ড পাউরুটি আর ফ্লাস্ক ভর্তি চা, জিনিসগুলো যেমন ছিল তেমনই আছে, শুধু পাশে বসা নূরজাহান নাই।

আস্তে ধীরে হেঁটে চৌকিটার সামনে এল আলী আমজাদ। তারপর প্রথমেই যেন রিকশায় বসা লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এমন ভঙ্গিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্লাস্কের ওপর। বেদম জোরে একটা লাথথি মারল ফ্লাস্কে। উড়ে গিয়ে ধাম করে ঢেউটিনের চালায় লাগল জিনিসটা। লেগে চৌচির হয়ে গেল। ঢাকনা খুলে, ঢাকনার তলার মুখ খুলে কোনটা কোনদিকে ছিটকে গেল কে জানে? ফাটা ফ্লাস্কের মুখ দিয়ে, তলা দিয়ে

ভরভর করে তখন চা পড়ছে। যেন রিকশায় বসা লোকটাকেই লাথথি মেরে নাকমুখ ফাটিয়ে দিয়েছে আলী আমজাদ। ফাটা নাকমুখ দিয়ে এখন ভরভর করে রক্ত পড়ছে তার। সড়কের মাটি ভিজছে। তারপর বিশাল ক্রোধে দুই হাতে পাউরুটিটা খামছে ধরল আলী আমজাদ, যেন রিকশাআলার ঘেটি গলা খামছি দিয়া ধরছে। ধরে এমন দলা মোচড়া করতে লাগল যেন রিকশাআলার ঘেটি মুচড়ে, গলা টিপে আধামরা করে ছুড়ে ফেলছে সড়কের ধারে এমন ভঙ্গিতে পাউরুটিটা ছুড়ে ফেলল।

রসগোল্লার ঠোঙাটা যেমন ছিল তখনও তেমন আছে। ঠোঙাটাকে আলী আমজাদের মনে হল খালি রিক' । এতক্ষণ সওয়ারী ছিল, রিকশাআলা ছিল, তাদের উপর প্রতিশোধ আলী আমজা· নিয়ে ফেলেছে। এখন বাকি আছে শুধু রিকশা, রিকশাটাকেও ছাড়বে না আলী আমজাদ। এই রিকশার জন্যই হাতের কাছে এসেও ফসকে গেছে শিকার!

শরীরের সব শক্তি এক করে, শরীরের সব রাগ ক্রোধ এক করে যেন রিকশার হুড ভাঙছে আলী আমজাদ এমন ভঙ্গিতে খচমচ করে মিষ্টির ঠোঙা ছিঁড়ল, ছিঁড়ে একটা একটা করে রসগোল্লা একেকদিকে ছুড়তে লাগল, যেন রিকশা ভেঙে টুকরা টুকরা করে রিকশার একেক অংশ একেক দিকে ছুড়ে ফেলছে। এরকম শীতসকালেও আলী আমজাদের কপালে ঘেটিতে আর গলায় জমেছে রসগোল্লার সিরার (রস) মতন ঘাম। কোটের তলায়, শার্টের তলায় ক্রোধের গরমভাপ। চোখ কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। নাকমুখ দিয়ে সমানে বের হচ্ছে গরম চায়ের বাষ্পের মতো শ্বাস। আলী আমজাদ আর মানুষ নাই, জন্তু হয়ে গেছে।

AMARBOI.COM

হাজামবাড়ি আর সড়কের মাঝখানে দশগণ্ডা জমিন। সেই জমিন চোখের পলকে পেরিয়ে এল তছি পাগলনি। প্রথমে বাড়ির নামা থেকে রিকশাটা দেখেছে সে, দেখে দামড়ি বাছুরের মতো দুই তিনটা লাফ দিয়েছে তারপর চিৎকার করতে করতে সড়কের দিকে ছুটেছে। তোমরা কে কই আছো, দেইক্কা যাও, রিশকা আইছে দ্যাশে।

তছি পাগলনির পরনে বেগুনি রঙের সস্তা একখান কাপড়। কয়দিন ধরে এই কাপড় পরে আছে কে জানে। হদ্য ময়লা। খানে খানে ধুলামাটি লেগে আছে। কাপড়ের তলায় ছায়া ব্লাউজ কিছুই কখনও থাকে না তার। ফলে তছি যখন ছুটাছুটি করে, নিচের দিকে তার কোনও অসুবিধা হয় না, হয় উপরের দিকে। হাওয়ায় আঁচল সরে যায় বুক থেকে, তছির যুবতী বুক দেখা যায়।

জন্ম পাগল হলে কী হবে, মেয়েমানুষ তো, শরীর বোঝে তছি। ফলে ছুটার সময় যেমন করে পারে আঁচল টেনে বুক ঢেকে রাখে।

আজ আর এসব দিকে খেয়াল রইল না তছির। রিকশা দেখে সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেল সে। দশগণ্ডা জমিন পার হবার আগেই হাওয়ার বেগে কখন বুকের আঁচল খসে পড়ল তার, কখন উন্মুক্ত হল যুবতী স্তন, দৌড়ের তালে তালে লাফাতে লাগল, কিছুই খেয়াল করল না সে। তছির পিছন থেকে এই ব্যাপারটা খেয়াল করল তার মা। করে দিশাহারা হয়ে গেল। রিকশা দেখে তছির লগে বাড়ির নামায় এসে দাঁড়িয়েছিল তছির মা। পাগল মেয়ে আচমকা ছুট দেবে এটা সে জানত না। যখন ব্যাপারটা তার চোখে পড়ল সেও চিৎকার করতে করতে ছুটল তছির পিছন পিছন। ওলো ও তছি, কাপোড় ঠিক কর মাগি। মাইনষে কইবো কী!

মায়ের কথা কানেই গেল না তছির, সে ছুটছে তো ছুটছেই। ছুটতে ছুটতে যখন সড়কে এসে উঠল, ভিড় ঠেলে যখন রিকশার সামনে এসে দাঁড়াল তখনও তার বুক খোলা। রিকশাআলা জোয়ানমর্দ লোক, সে হা করে তাকিয়ে আছে তছির বুকের দিকে। রিকশায় বসা মানুষটাও তাকিয়েছিল। তবে পলকের জন্য। তাকিয়ে অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। এটা খেয়াল করল নূরজাহান। করে তছির মায়ের মতো সেও দিশাহারা হয়ে গেল। কী করবে না করবে বুঝতে পারল না। তারপর তছির গা ঘেঁষে দাড়িয়ে কনুই দিয়ে আস্তে করে তছির পেট বরাবর একটা গুতা দিল। লগে লগে রিকশা দেখা বাদ দিয়ে তেড়ে উঠল তছি। ঐ ছেমড়ি, কন্নি (কনুইয়ের গুতো) দিলি ক্যা?

কথা না বলে চোখ ইশারায় তছিকে তার খোলা বুক দেখাল নূরজাহান। তছি তা বুঝল না। খ্যাক করে উঠল। কী কচ?

এবার দাঁতে দাঁত চেপে ফিসফিস করে নূরজাহান বলল, কাপোড় ঠিক কর।

এবার ব্যাপারটা বুঝল তছি। ছটফট করে বুক ঢাকল। লাজুক ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল।

রিকশায় বসা লোকটা এবার তছির দিকে তাকিয়ে প্রথম কথা বলল, কী রে পাগলনি, কেমন আছচ?

প্রথমে রিকশা দেখায় ব্যস্ত ছিল তছি তারপর নূরজাহানের কনুইয়ের গুঁতা খেয়ে ব্যস্ত হয়েছে নিজেকে নিয়ে। ফলে রিকশায় বসা লোকটাকে সে খেয়ালই করেনি। লোকটার কথা শুনে মুখ তুলে তার দিকে তাকাল। তাকিয়ে হাসল। খানিক আগের পাওয়া লজ্জা কোথায় উধাও হয়ে গেল তার! ভারি একটা আমোদের গলায় বলল, হায় হায় এনামুল দাদায় দিহি! আপনেরে তো আমি খ্যালঐ করি নাই। রিশকা কইরা কই থিকা আইলেন?

সানগ্লাসটা আবার চোখে পরল এনামুল। কোলের ওপর রাখা ব্যাগ হাতে নিল, রিকশা থেকে নামল। হাসিমুখে বলল, ঢাকা থিকা।

ঢাকা থেকে রিকশা নিয়ে বাড়ির কাছে চলে এসেছে এনামুল এই কথা শুনে নূরজাহান আর তার বয়সী পোলাপানরা তো অবাক হলই, তছি যে তছি, পাগলনি, সেও অবাক। ভুরু কুঁচকে, চোখ পিটপিট করে বলল, কন কী দাদা! ঢাকা থিকা রিশকা লইয়া বাইত্তে আইয়া পড়ছেন?

AMARBOI.COM

এনামুল কথা বলবার আগেই রিকশাআলা বলল, আরে না। সাবে তোমার লগে ফাইজলামী করতাছে। আইছে ছিন্নগর থিকা।

লোকটার আগ বাড়িয়ে কথা বলা পছন্দ করল না এনামুল। সানগ্লাসে ঢাকা বলে চোখ দেখা যাচ্ছে না তার, দৃষ্টি কতটা বদলেছে বোঝা যাচ্ছে না, তবে মুখটা থমথম করছে, নাকের পাটা সামান্য ফুলেছে। রিকশাআলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, এই মিয়া এত কথা কও ক্যা! তোমারে কেঐ জিগাইছে?

রিকশাআলা বলল, না জিগায় নাই।

তয়?

এমতেঐ কইলাম। এত মানুষজন দেইক্কা ফুর্তি লাগতাছে।

বেশি ফুর্তি ভাল না।

তছি বলল, করুক না। ফুর্তি করলে কী অয়। ও রিশকাআলা ভাই, আমারে ইট্টু রিশকায় চড়াইবেন?

রিকশাআলা প্রথমে তছির মুখের দিকে তাকাল তারপর তাকাল বুকের দিকে। তছির বুক এখন যত্ন করে ঢাকা, কিছুই দেখতে পেল না সে। তবে তার তাকানোটা সানগ্লাসের ভিতর থেকে খেয়াল করল এনামুল, করে রাগল। মুখে কিছু বলল না, মনে মনে খারাপ একটা গাল দিল লোকটাকে। তারপর প্যান্টের হিপ পকেটে হাত দিয়ে মোটা মানিব্যাগ বের করল। একটা দশ টাকা আর একটা পাঁচ টাকার নোট একত্র করে রিকশাআলার হাতে দিল। নেও।

তছির দিকে মন ছিল বলে কয়টাকা ভাড়া দিয়েছে এনামুল রিকশাআলা তা খেয়াল করেনি। টাকা হাতে নিয়ে হা হা করে উঠল। কত দিলেন সাব?

এনামুল নির্বিকার গলায় বলল, গুনা জানো না?

জানুম না ক্যা?

তয় গইন্না দেহো।

দেকছি। পোনরো টেকা।

পোনরো টেকা ঠিক আছে না?

না। পোনরো টেকা দিবেন ক্যা?

তয় কত দিমু?

ইনসাফ কইরা দেন।

ইনসাফ কইরাঐ দিছি।

এইডা কোনও ইনসাফ হয় নাই। পচিশ টাকা দেন।

কী? ছিন্নগর থিকা মেদিনমোণ্ডল পচিশ টেকা ভাড়া?

হ। পচিশ টেকা ক্যা তিরিশ টেকাও অইতে পারে। আমি কমঐ চাইছি। এইমিহি তো রিশকাঐ আহে না। রাস্তা অহনতরি পাকা অয় নাই, ইটাও বিছাইন্না হয় নাই, কাচা মাডির রাস্তা। এমুন রাস্তায় রিশকা চালাইতে জান বাইর অইয়া যায়। তার উপরে খালি রিশকা লইয়া ফিরন লাগবো। আমি এইমিহি আইতামঐ না। আপনে জোর কইরা আনছেন দেইক্কা আইছি। এই যে এত পোলাপান দেকতাছেন, রিশকা গেরামে ঢোকনের

AMARBOI.COM

লগে লগে ঝাঐক্কর (ঝাঁক) দিয়া বাইত থনে বাইর অইছে, রিশকার পিছে পিছে দৌড়াইতাছিল, অহ্ন চাইরমিহি ভিড় কইরা খাড়ইছে, কীর লেইগা কন তো? কারণ আছে। কারণ অংলো অরা তো ইহ জিন্দিগানিতে (জিন্দেগি। জীবন) রিশকা দেহে নাই। ঐ যে মাইনষের বাড়ির মিহি চান, দেহেন বাইরবাইত্তে নাইলে বাড়ির নামায় আইয়া খাড়ইছে বাড়ির বউঝিরা, বুড়াবুড়িরা। খেতখোলার মিহি চান, দেহেন কিষাণরা বেবাকতে এইমিহি চাইয়া রইছে। রিশকা দেকতাছে। আজঐ পয়লা রিশকা আইলো এই গেরামে। আপনেঐ পয়লা আইলেন। দেন, পচিশটা টেকা দেন।

লোকটা যে শুধু আগ বাড়িয়েই কথা বলে না, বেশিও যে বলে এনামুল তা পুরাপুরি বুঝল। আবার রাগল সে, নাকের পাটা আবার ফুলল তার। গম্ভীর গলায় বলল, এই মিয়া, এত প্যাচাইল পাইরো না।

লোকটা বলল, আর দশটা টেকা দেন, প্যাচাইল পারুম না।

তছি বলল, দেন দাদা। রিশকাআলা ভাইরে দশটা টেকা দেন আর আমারে দশটা টেকা দেন।

তছির কথা শুনে হি হি, হি হি করে হেসে উঠল পোলাপানরা। বেপারি বাড়ির দশ এগারো বছরের দুষ্টের শিরোমণি ছেলে তোতা বলল, পাগলেও টেকা চিনে।

শুনে আবার হাসির রোল পড়ল।

তাকে যে পাগল বলা হল, পাগল বললে সে যে রাগে একথা তছির এখন মনে নাই, সেও হি হি করে হাসতে লাগল। তোতার কথা শুনে ঠোঁট টিপে হাসছিল নূরজাহান। এখন তছিকে হাসতে দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না সে, খিলখিল করে হেসে উঠল।

এই প্রথম মুখ ঘুরিয়ে নূরজাহানের দিকে তাকাল এনামুল। চোখ থেকে আবার সানগ্লাস খুলল। তীক্ষ্ণচোখে কয়েক পলক নূরজাহানকে দেখে তছির দিকে তাকাল। সবাই হাসছে দেখে তার মুখেও মৃদু হাসি। সেই হাসি হাসিমুখে এনামুল বলল, টেকাদা কী করবি?

মুরলিভাজা খামু।

তছির কথায় আবার হেসে উঠল পোলাপানরা। এবার তছি আর তাদের লগে গলা মিলাল না। রেগে গেল। মুখ খিচাইয়া (খিঁচিয়ে) বলল, ঐ শয়তানের ছাওরা, ভেটকাচ ক্যা? দিমু ঠোকনা।

তারপর আবার এনামুলের দিকে তাকাল। দেন দাদা।

তছির পিছন পিছন সড়কের অদূরে এসে দাঁড়িয়েছিল তার মা। খানিক আগে মেয়ে তার বুকের কাপড় ঠিকঠাক করেছে দেখে এখন সে নিশ্চিন্ত। তবু বাড়ি ফিরে যাচ্ছে না। গ্রামে নতুন একখান জিনিস আসছে দেখে তছি না কোনও গণ্ডগোল লাগিয়ে দেয়, এরকম একটা ডরে আছে।

একবার তছির মায়ের দিকে তাকিয়ে তছিকে এনামুল বলল, মুরলিভাজা খাইতে দশটেকা লাগেনি ছেমড়ি?

না লাগুক, আপনে দেন।

তছির লগে গলা মিলিয়ে রিকশাআলা বলল, হ দেন সাব। দশবিশ টেকায় আপনের লাহান মাইষের কী যাইবো আইবো! আপনে বড়লোক মানুষ। এতবড় একখান গাড়ি লইয়া একলা আইছেন। রাস্তা পাকা অইয়া গেলে আমগো রিশকায় তো আর উডবেন না। গাড়ি লইয়া বাইত্তে আইবেন। দেন।

এনামুল আর কথা বলল না। মানিব্যাগ থেকে চকচকে দুইটা দশ টাকার নোট বের করে প্রথমে রিকশাআলাকে একটা দিল তারপর দিল তছিকে। দিয়েই বলল, টেকা দশটা চাইছস, দিছি। অহন আমার ব্যাগ ল। বাইত্তে দিয়ায়।

তছি নির্বিকার গলায় বলল, পারুম না। আমার কাম আছে।

কী কাম?

আপনেরে কমু না।

তছির এই ধরনের কথায় পোলাপানদের মুখে হাসির রোল পড়ার কথা কিন্তু তেমন কিছু হল না। বোধহয় তছির মুখ খিঁচানো আর বকাবাজির ভরে কেউ হাসছে না। নূরজাহান দাঁড়িয়েছিল তছির গা ঘেঁষে। একবার তছির মুখের দিকে তাকিয়ে এনামুলের ব্যাগের দিকে হাত বাড়াল। দেন দাদা, আমার কাছে দেন। আমি দিয়াহি।

এনামুল বলল, তোমারে আমি ঠিক চিনতে পারতাছি না। কোন বাড়ির মাইয়া তুমি?

নূরজাহান কথা বলবার আগেই তছি বলল, হায় হায় দাদা, কন কী আপনে? অরে চিনেন নাই? ও তো দবির গাছির মাইয়া নূরজাহান।

নূরজাহান! কচ কী?

হ।

ব্যাগ নূরজাহানের হাতে দিয়ে হাসল এনামুল। তরে তো আমি চিনতেঐ পারি নাই নূরজাহান। তুই তো বিয়ার লাইক (লায়েক) অইয়া গেছস। কী রে ছেমড়ি, কবে এত ডাঙ্গর অইলি?

নূরজাহান কথা বলল না। হেসে মাথা নিচু করল।

এনামুল বলল, খালি ডাঙ্গরঐ অচ নাই চালাকও অইছস।

কথাটা বুঝতে পারল না নূরজাহান। একপলক এনামুলের মুখের দিকে তাকিয়ে সড়কের নামার দিকে হাঁটতে লাগল। এনামুলও চলল তার পিছন পিছন।

দশটা টাকা হাতে পাওয়ার পর তছি আর তছি নাই, দিশাহারা হয়ে গেছে, অন্য মানুষ হয়ে গেছে। কী রেখে কী করবে বুঝতে পারছে না। রিকশার দিকেও এখন আর মন নাই তার।

AMARBOI.COM

রিকশার চারপাশ ঘিরে দাঁড়ান ভিড়টা এখন আর নাই। ছেলেমেয়েরা যে যার মতো ফিরে গেছে। রিকশাআলা যায়নি। রিকশা আগের জায়গায়ই দাঁড় করিয়ে রেখেছে। নিজের জায়গায় না বসে এনামুল যেখানে বসেছিল সেখানে বসে খুবই আয়েশি ভঙ্গিতে পা দুইটা লম্বা করে দিয়েছে নিজের সিটের ওপর। প্রায় শুয়ে পড়ার মতো অবস্থা। এই অবস্থায় বিড়ি ধরিয়েছে, আরামছে টানছে, আড়চোখে তছিকে দেখছে।

তছির মা তখনও দাঁড়িয়ে আছে সড়কের নামায়। তার দিকে তাকিয়ে মুখ খিঁচালো তছি। তুমি এহেনে খাড়ইয়া রইছো ক্যা? বাইত্তে যাও।

তছির মা নিরীহ গলায় বলল, তর লেইগা খাড়ইয়া রইছি। তুইও বাইত্তে ল মা।

না আমি অহন যামু না। আমার কাম আছে।

কী কাম?

কইতে পারি না।

এনামুল যে দশটা টাকা দিয়েছে তছিকে, তছি যে মুরলিভাজা খাওয়ার কথা বলেছে সবই শুনেছে তার মা। মেয়ের এলোমেলো কথা শুনে এখন বুঝল সেই টাকা নিয়ে বেদম উত্তেজনায় আছে পাগল মেয়েটা। কী করবে না করবে বুঝতে পারছে না। এই ব্যাপারে মেয়েকে সাহায্য করতে চাইল সে। বলল, বাইত্তে ল মা। আলাদ্দিরে দিয়া মাওয়ার বাজার থনে মুরলিভাজা আনাইয়া দিমুনে তরে।

তছি বলল, না। টেকা আমি কেঐর হাতে দিমু না, দিলেই আমার টেকা দিয়া বেবাকতে মিল্লা মুরলিভাজা কিন্না খাইবো। আমি সীতারামপুর যামু।

ক্যা?

সীতারামপুরের দোকানে মুরলিভাজা পাওয়া যায়। দুই টেকার কিনলে টোপর ভইরা যাইবো। খাইতে খাইতে হাইটা আমু। বাইত্তে আহনের আগেঐ শেষ। কেঐরে একটা দিমু না। রোজ দুই টেকার কইরা খামু।

পাগল মেয়ে একা সীতারামপুর যাবে শুনে চিন্তিত হল তছির মা। বলল, একলা যাওনের কাম নাই।

ক্যা? গেলে কী অয়? আমি কী আইজ নতুন যাইতাছি নি!

তারপরই মুখ খিঁচালো তছি। তুমি কইলাম এহেন থিকা যাও মা। আমি কইলাম তোমার মতলব বোজতাছি। আমার হাতে টেকা দেইক্কা সরতাছো না তুমি। টেকাডা নেওনের মতলবে আছো। মইরা গেলেও এই টেকা আমি তোমারে দিমু না। তুমি যাওগা। আমি সীতারামপুর যামু।

তছির মা বুঝে গেল এরপর দাঁড়িয়ে থাকলে ঘটনা খারাপ হবে। মুখে যা আসে তাই বলে বকাবাজি তো তছি করবেই, সড়ক থেকে দৌড়ে নেমে চুলও টেনে ধরতে পারে মায়ের। গুম গুম করে কিল মারতে পারে মায়ের পিঠে। মাটিতে ফেলে গলা টিপে ধরতে পারে, বুকে চেপে বসতে পারে। যদিও তছির হাতের এসব মার খাওয়ার অভ্যাস আছে তার তবু আজ সে মারটা খেতে চাইল না। রিকশাআলা বসে আছে সড়কে, মেয়ে মারছে মাকে এ দৃশ্য দেখে বেকুব হয়ে যাবে। মেয়ে যে পাগল এটা তো সে জানে না! অচেনা মানুষের সামনে তছির হাতে মার খেতে আজ শরম করবে তার।

AMARBOI.COM

তছির মা তারপর বাড়ির দিকে পা বাড়াল। মুখ ঝামটা দিয়ে বলে গেল, জাহন্নামে যা মাগি! মর গা।

এসব কথা গায়েই মাখল না তছি। মুঠায় ধরা টাকা শাড়ির আঁচলে গিটঠু (গিঁট) দিয়ে বাঁধল। তারপর গভীর আনন্দে ফেটে পড়া মুখে সড়কের পুব দিককার নামায় নেমে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। রিকশাঅলা তাকে ডাকল। এই যে, হোনো হোনো। এইমিহি আহো।

তছি থামল। কীর লেইগা?

হাতের বিড়ি শেষ হয়ে আসছিল। ফুক ফুক করে বিড়িতে শেষ দুইটা টান দিল লোকটা তারপর নিজের বসার সিট থেকে পা নামিয়ে লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নামল। তার আগে বিড়িটা ছুড়ে ফেলেছে। তছির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, আহো। কথার কাম আছে।

এবার লোকটার সামনে এসে দাঁড়াল তছি, রিকশার সামনে এসে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি কন। আমার কাম আছে।

লোকটা হাসল। কী কাম?

তছি বিরক্ত হল। মারে যে কইলাম হোনেন নাই আপনে?

হুনছি। তুমি মুরলিভাজা কিনতে সীতারামপুর যাইবা।

তয়?

ঐডা তোমার মা?

হ।

কোন বাড়ি তোমগো?

হাত তুলে নিজেদের বাড়ি দেখাল তছি। ঐ বাড়ি।

তছির হাত অনুসরণ করে বাড়ি দেখল লোকটা। মুখ এখনও হাসি হাসি তার। বলল, তুমি যে কইছিলা রিশকায় চড়বা?

হ কইছিলাম। অহন চড়ুম না।

ক্যা?

আমার কাম আছে।

কাম তো সীতারামপুর যাওন, মুরলিভাজা কিনন।

হ।

সীতারামপুর রিশকা যায় না।

হ যায় না।

সাবধানী চোখে চারদিকে একবার তাকাল লোকটা। গলা নিচু করে বলল, সীতারামপুর তোমার যাওনের কাম নাই। তুমি আমার লগে লও।

কই যামু আপনের লগে?

তছির গলা চড়া। শুনে লোকটা একটু ভড়কাল। সাবধানী চোখে আবার চারদিকে তাকাল। আগের মতোই নিচু গলায় বলল, আস্তে কথা কও।

লগে লগে গলা একেবারেই নিচু করে ফেলল তছি। আইচ্ছা।

AMARBOI.COM

আমি কই কী, তুমি আমার লগে কোলাপাড়া বাজারে লও। আমার রিশকায় বহো, তোমারে আমি লইয়া যাই। এককামে দুইকাম অইবনে তোমার। রিশকায় চড়নও অইলো, মুরলিভাজা খাওনও অইলো। কোলাপাড়া বাজারে বহুত ভাল মুরলিভাজা পাওয়া যায়। লাল টুকটুইক্কা। আমিঐ কিন্না দিমুনে তোমারে। তোমার টেকা ভাঙ্গন লাগবো না।

রিকশাআলার কথা শুনে চোখ দুইটা চকচক করে উঠল তছির। সত্যঐ?

হ।

তারপরই মুখে দুশ্চিন্তার একটা ছায়া পড়ল তছির। কোলাপাড়া থিকা আহুম নে কেমতে? আমি তো কোনওদিন ঐমিহি যাই নাই।

রিকশাঅলা বলল, আমি তোমারে রিশকায় কইরা দিয়া যামুনে।

সত্যঐ?

হ।

এবার হাসল তছি। আপনে বহুত ভাল মানুষ রিশকাআলা ভাই। নাম কী আপনের?

রোস্তম।

বাড়ি কোন গেরামে?

উত্তর বাকশা (পাইকসা)।

একটু থেমে রুস্তম বলল, এত প্যাচাইলের কাম নাই। তাড়াতাড়ি লও। তোমারে আবার দিয়া যাওন লাগবো। হারাদিন যাইবো গা নে।

দ্রুত হাতে রিকশার হুড তুলল রুস্তম। অকারণেই দুই তিনটা থাবড় দিল সিটে। কাঁধে ফেলা গামছা শক্ত করে মাজায় বাঁধতে বাঁধতে বলল, ওডো। তাড়াতাড়ি ওডো।

লাফ দিয়া রিকশায় উঠল তছি। গভীর আনন্দে মুখখানা যেন ফেটে পড়ছে। সেই মুখের দিকে একবার তাকিয়ে রুস্তম বলল, আঁচল দিয়া মুখখান ঢাইক্কা লও। এই গেরামের মাইনষে যেন তোমারে দেইক্কা না চিনতে পারে।

তছি অবাক হল। ক্যা?

দেকলে তোমারে যুদি আমার লগে না যাইতে দেয়, তোমার মা ভাইগো যুদি গিয়া কইয়া দেয় তাইলে একখান ভেজাল লাইগগা যাইবো। তয় বেশিক্ষুণ মুখ ঢাইক্কা বইয়া থাকন লাগবো না, দোকাছির (দোগাছি) সামনে গিয়া খুইল্লা হালাইলেঐ অইবো। ঐমিহি তোমারে কেঐ চিনবো না।

ভাল কথা কইছেন। গেরামের কেঐ দেকলে আপনের লগে আমারে যাইতে দিব না।

বেশ যত্নে মাথায় ঘোমটা দিল তছি, আঁচল টেনে নাকের ডগা পর্যন্ত ঢাকল, অচেনা মানুষ হয়ে গেল। গ্রামের কেউ তছিকে দেখে এখন চিনতেই পারবে না। জীবনে মাথায় কখনও ঘোমটা দেয়নি তছি, মুখ ঢাকেনি আঁচলে। দেশ গ্রামের নরম সরম বউর ভঙ্গিতে রিকশায় বসেছে তছি, এই ভঙ্গিতে বসার মেয়ে সে না। তছি এখন একেবারেই বদলে যাওয়া তছি।

একবার তছিদের বাড়ির দিকে তাকাল রুস্তম তারপর তাকাল তছির দিকে। তছি বলল, লন, তাড়তাড়ি লন।

AMARBOI.COM

শীতের পাখি।

দুইপা তুলে বেশ গুছিয়ে পালঙ্কের মাথার দিকটায় ঢেলান দিয়ে বসলেন দেলোয়ারা। চোখ থেকে চশমা খুলে শাড়ির আঁচলে মুছতে মুছতে বললেন, সমবাত (সংবাদ) না দিয়াঐ যে বাইত্তে আইলা!

পালঙ্কের মাঝামাঝি জায়গায় একখান ছপ (মাদুর) বিছানো হয়েছে। সেই ছপে আসাম (আসনপিঁড়ি) করে বসে ভাত খাচ্ছে এনামুল। তার পরনে এখন আকাশি রঙের চেক লুঙ্গি আর সাদা স্যাণ্ডো গেঞ্জি। গলায় মোটা সোনার চেন আছে। চেনের মাথায় সিকির মতো একখান লকেট। মাথা ঝুকিয়ে ভাতের লোকমা যখন মুখে তুলছে এনামুল, গলার চেন আর লকেট এসে পড়ছে পাতের ওপর। এক ফাঁকে চেনটা স্যাণ্ডো গেঞ্জির বুকের কাছে ঢুকিয়ে দিল এনামুল, দেলোয়ারার দিকে তাকাল। মুখভর্তি ভাত চাবাতে চাবাতে জড়ান গলায় বলল, সমবাত দিয়া সব সময় আহন যায়নি? আথকা আইয়া পড়নঐ ভাল।

চশমা মোছা শেষ করে চোখে পরলেন দেলোয়ারা। নিজেগ বাইত্তে সমবাত না দিয়া আইলেও অয়। তয় অসুবিদা খালি একখানঐ, খাওন দাওনের। আগে সমবাত পাইলে বাজার হাট করাইয়া রাখন যায়। দেহো তো কী দিয়া কী খাইতাছো আইজ!

এনামুল আরেক লোকমা ভাত মুখে দিল। ভালঐ তো খাইতাছি। এত বড় বড় দুইডা কইমাছ, দুইডা হাসের আন্ডা, ডাইল দুদ, খারাপ কী!

এনামুলের সামনে সাজিয়ে রাখা ভাতের গামলা, তরকারির বাটি, ডাল আর দুধের বাটির দিকে একবার তাকালেন দেলোয়ারা। বললেন, আগে জানলে মাওয়ার বাজার থিকা বড় একখান ইলশা মাছ আনাইতাম। এক দেশসের দুদ আনাইতাম।

ইলশা মাছের থিকা কইমাছ অনেক ভাল। শীতকাইল্লা কই খাইতে খুব স্বাদ। এই দিনে বুকটা লাল টকটইক্কা অইয়া যায় কইমাছের। শইলভর্তি তেল। আর জোয়াইরা দিনের কই অইলো খারাপ। মুখে দেওন যায় না। পেটভর্তি আন্ডা। শইলডা যায় লাম্বা হইয়া, মাথাডা যায় বড় অইয়া, খাইতে লাগে টাকি মাছের লাহান।

একটা কই খাওয়া শেষ করেছে এনামুল। এখন বাটি উপুড় করে বাকি কইটাও নিল। প্রচুর তেল মশলা দিয়ে, প্রচুর পিঁয়াজ দিয়ে ভুনা করা হয়েছে কই। মাছটা পাতে নেওয়ার পর বাটির গায়ে লেগে থাকা ঝোল আঙুল দিয়ে কেচে প্লেটে নিল এনামুল।

ANARBOI.COM

ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় রান্না খুবই পছন্দ হয়েছে তার, আগ্রহ নিয়ে খাচ্ছে। যদিও প্রায় সব খাবারই সমান আগ্রহ নিয়েই খায় এনামুল। ছেলেবেলা থেকেই সে একটু পেটুক স্বভাবের। তবু আজকের এই খাবারের প্রতি তার এতটা আগ্রহ দেখে দেলোয়ারা খুশি হলেন। সরল গলায় বললেন, রান্দন কেমুন অইছে?

আপনে রানছেন আম্মা?

না বাবা আমি রান্দি নাই। রানছে রাবি। আল্লায় বাচাইছে যে ছেমড়িডা আইজ বাড়া বানতে (ধানভানা। ঢেঁকি সংক্রান্ত কাজ) যায় নাই। গেলে আমি ঝামেলায় পড়তাম।

কই মাছটা এত বড়, এনামুলের প্লেট ভরে গেছে। ভাতও আছে বেশ খানিকটা, তবে ভাতের দিকে মন নাই তার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কই মাছের পেটের দিকটা ভাঙছে আর মুখে দিচ্ছে। দেলোয়ারার দিকে তাকাচ্ছেও না, কথা টুকটাক বলছে। এখনও বলল। কী ঝামেলায় পড়তেন?

রান্দন বাড়নের কী করতাম?

ক্যা আপনের রান্দন রান্দেন নাই?

হেইডা তো রানছি। ঐ রান্দন তুমি মুখে দিতে পারতা না। এক পোয়া চাউলের ভাত রান্দি আর ইট্টু ডাইল, ইট্টু দুদ। ঐ এক রান্দনে দুফইরা খাওনও অয় রাইতের খাওনও অয়।

কিছু না থাকলে ঐডাঐ খাইতাম নে।

তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন গলায় এনামুল বলল, ও আম্মা, এতবড় কই পাইলেন কই?

দেলোয়ারা হাসলেন। কইডি আমার না।

তয়?

রাবিগো।

অরা পাইলো কই?

বাদলাকে কোলে নিয়ে রাবি দাঁড়িয়ে আছে পুব দিককার দুয়ারের সামনে। সেখান থেকে বলল, বাদলার বাপে ধরছেলো।

চোখ তুলে রাবির দিকে তাকাল এনামুল। কই থিকা?

বিলেরবাড়ির পুকঐর থিকা। বিলে কামলা দিতে গেছিলো, ফিরনের সময় আইত্তাইয়া (হাতিয়ে) ধইরা আনছে।

হ বিলেরবাড়ির পুকঐরের কই বহুত বড় অয়।

বাদলা বলল, তিনডা ধরছিলো। একটা আমি খাইয়া হালাইছি।

বলেই হি হি করে হাসল। হাসিটা বেশ মজা লাগল এনামুলের। খেতে খেতে বাদলাকে সে বলল, কীরে ছেমড়া, মার কুলে উইট্টা রইছস ক্যা?

বাদলা কথা বলবার আগেই দেলোয়ারা বললেন, ছেমড়াডা এমনঐ। বেশি আল্লাইদ্দা। মায় যহন বাড়া বানতে যায় তহন দেহগা (দেখ গিয়া) টই টই কইরা ঘোরতাছে। এক্কেরে ডাঙ্গর পোলাপানের লাহান। মায় বাইত্তে আইলো আর নান্নাবাচ্চা অইয়া গেল। কুলে উইট্টা বইয়া থাকে।

AMARBOI.COM

রাবি হাসিমুখে বলল, না বুজি সব সময় কুলে ওডে না। মানুষজন দেকলে ওডে। অহন উটছে মামারে দেইক্কা।

এনামুল আনমনা গলায় বলল, মামাডা আবার কেডা?

রাবি লাজুক গলায় বলল, ক্যা আপনে? আপনেরে আমি মামা কই জানেন না! আপনের মা খালারে যদি বুজি কই, আপনে তো তাইলে মামাঐ!

বাদলা বলল, আর আমার অইলেন দাদা।

চোখ পাকিয়ে, কপট রাগে বাদলার দিকে তাকাল এনামুল। তোমার আর দাদা কওনের কাম নাই। কুল থিকা নামো।

দেলোয়ারা বললেন, হ ও আর নামছে। কতুক্ষুণ পর দেইক্কোনে মার বুকের দুদ খাইতাছে।

একথা শুনে এনামুল মজা পেল, রাবি পেল লজ্জা। মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। মুখে লাজুক হাসি।

এসব কথার ফাঁকে ফাঁকে কই মাছটা খেয়ে শেষ করেছে এনামুল ভাত শেষ করেনি। কইয়ের কাঁটা একপাশে রেখে আঙুলের ডগায় ভাত নাড়াচাড়া করছে। দেলোয়ারা বললেন, আন্ডা দুইডা খাও বাজান।

এনামুল ডিমের বাটির দিকে তাকাল। দুইডা খাইতে পারুম না আম্মা। একটা খাই।

খাও।

এনামুল একটা ডিম নিল। ডিমও রাবি রানছে?

হ। বেবাক রান্দনঐ রাবির।

এত তাড়াতাড়ি রানলো কেমতে?

ও কামের আছে। তুমি বাইত্তে আহনের লগে লগে রান্দনঘরে গিয়া হানছে। আমার কিছু কওন লাগে নাই, রান্দন বাড়ন শেষ।

ডিম ভেঙে ভাতে মিশিয়ে বেশ পরিপাটি করে একটা লোকমা মুখে দিল এনামুল। মুখভর্তি ভাত, সেই অবস্থায়ই বলল, রান্দন বাড়ন খুব ভাল শিখছে রাবি। আমগো বাড়ির মতনঐ।

দেলোয়ারা বললেন, আগে এমুন রানতে পারতো না। আমি হিগাইছি। আগের রান্দন আছিলো চউরাগো রান্দন। মুখে দেওন যাইতো না।

পারভীনের রান্দনও আগে মুখে দেওন যাইতো না।

ঐডা বউর দোষ না। বিয়ার আগে কোনওদিন রানছেনি? পারবো কেমতে?

অহন খুব ভাল রান্দে। মার কাছে শিখছে।

বুজির শইলডা কেমুন? ভাল আছে?

হ অহন ভালঐ। কয়দিন আগে বি চদরীরে (বদরুদ্দোজা চৌধুরী) দেহাইছি। এত বড় ডাক্তার চদরী সাবে, মারে দেইক্কাঐ কইলো আরে কিচ্ছু হয় নাই আপনের। একদোম ভাল আছেন। সংসারের কাম কাইজ যত পারেন করবেন আর সকালে বিকালে যতক্ষুণ পারেন হাটবেন। দুইডা না তিনডা অষইদ দিল। তার কথা মতন চলতাছে

AMARBOI.COM

দেইক্কা মায় অহন একদোম ভাল। আপনে ইবার ঢাকা গেলে আপনেরেও দেহাইয়া আনুম।

দেলোয়ারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হ দেহান ইট্টু লাগবো। বুকের মইদ্যে আইজ কাইল জানি কেমুন করে!

খাওয়া শেষ করে ঢক ঢক করে একগ্লাস পানি খেল এনামুল। দেখে হা হা করে উঠলেন দেলোয়ারা। দুদভাত খাইবা না?

না।

ক্যা?

খাজুরা মিডাই না অইলে দুদ ভাত খাওন যায় না।

খাজুরা মিডাই তো আছে। ঐ রাবি কারে (ঘরের চালার কাছাকাছি পাটাতন করা, কাঠের দোতলার উপরতলার মতো। দরকারি জিনিসপত্র রাখার জায়গা। কোথাও কোথাও 'আপার'ও বলে) ওট। মুড়ির জেরে দেক খাজুরা মিডাই আছে। লইয়ায়।

বাদলাকে কোল থেকে নামাল রাবি। বেতের ছোট্ট একখান সাজি (পাত্র) হাতে সিঁড়ি ভেঙে তরতর করে কারে উঠে গেল। একদলা গুড় নিয়ে নেমে এল। গুড়ের দলায় মুড়ি লেগে আছে দেখে দেলোয়ারা বললেন, কী লো রাবি, মিডাই গইল্লা গেছেনি?

রাবি বলল, হ। মুড়িডি ওদাইয়া (নরম হয়ে যাওয়া) গেছে। আরবচ্ছর যে মুড়ির জেরে মিডাই রাকলেন, মুড়িডি তো আর বদলান নাই।

হায় হায় মুড়ি বদলানের কথা তো আমার মনে আছিলো না।

এনামুল বলল, মিডাই গইল্লা গেছে কী অইছে। ঐ রাবি অন্য একখান পেলেট দে। এই পেলেটে তরকারি লাইগ্গা রইছে, এই পেলেটে দুদভাত খাওন যাইবো না।

চটপটা হাতে অন্য একখান প্লেট দিল রাবি। একবার সেই প্লেটের দিকে তাকিয়ে আগের প্লেটটায় যত্ন করে হাত ধুয়ে ফেলল এনামুল। তারপর নতুন প্লেটে সামান্য ভাত নিল, বাটির দুধ অর্ধেকটা ঢালল, প্লেটের সামনে রাখা গুড়ের সাজি থেকে এক খামছা থকথকা গুড় নিল, নিয়ে নতুন করে খাওয়া শুরু করল।

এনামুলের দিকে তাকিয়ে একটু নড়েচড়ে বসলেন দেলোয়ারা। আবার চোখ থেকে চশমা খুললেন, শাড়ির আঁচলে কাচ মুছতে মুছতে বললেন, ইবার কী তুমি দুই একদিন থাকবা বাজান?

দুধভাত খেতে খেতে এনামুল বলল, হ থাকুম। কয়দিন আজাইর (বেকার) আছি।

ক্যা কনটেকদারি কাম নাই তোমার? কাপড়ের ব্যবসা চলতাছে না?

চলতাছে, বেবাকঐ চলতাছে।

তয়?

তয় আগের থিকা ইট্টু কম চলতাছে। এর লেইগাঐ বাইত্তে আইলাম। মান্নান মাওলানা সাবে আমারে একখান পত্র দিছিলো। তার বলে কী কথার কাম আছে আমার লগে!

হ আমারেও কইছিল তুমি বাইত্তে আইলে য্যান তারে খবর দেই।

দুধ ভাতের লগে এক কামড় গুড় মুখে দিয়ে এনামুল বলল, পত্রে মাওলানা সাবে

AMARBOI.COM

আমারে লেকছিল আমার যুদি টাইম না থাকে তাইলে হেয়ঐ ঢাকা গিয়া আমার লগে দেহা করবো। আমার কাছে এমুন কী কাম পড়লো মাওলানা সাবের? আপনে কিছু জানেননি আম্মা?

চশমাটা চোখে পরে দেলোয়ারা বললেন, পুরা জানি না। তয় তার লগে একদিন কথা অইছিলো, কথা হুইন্না বোজলাম তোমারে দিয়া গেরামে একখান মজজিদ করাইতে চায়।

একথা শুনে খাওয়ার কথা যেন ভুলে গেল এনামুল। দেলোয়ারার মুখের দিকে তাকাল। মজজিদ করাইতে চায়? কোনহানে?

আমগ ছাড়া বাইত্তে।

কন কী?

দেলোয়ারা হাসলেন। হ আমার কাছে তো কইলো!

খানিক আনমনা হয়ে কী ভাবল এনামুল তারপর রাবির দিকে তাকিয়ে বলল, ঐ রাবি, আতাহারগ বাইত্তে যা তো। মাওলানা সাবরে ডাইক্কা লইয়ায়। আমার কথা কবি।

AMARBOI.COM

কোলাপাড়া বাজারের কাছাকাছি রিকশা থামাল রুস্তম। থামিয়ে লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নামল। তছির দিকে তাকিয়ে অস্থির গলায় বলল, তুমি ইট্ট বহো। আমি খালি যামু আর আমু।

ঘোমটায় মুখ মাথা ঢেকে এখনও আগের মতোই বসে আছে তছি। কী রকম একটা ঘোরের মধ্যে যেন ছিল। রুস্তমের কথা শুনে ছটফট করে উঠল। দাঁতে কামড়ে রেখেছিল শাড়ির আঁচল, ছেড়ে দিয়ে বলল, কই আইলাম?

আগের মতোই অস্থির গলায় রুস্তম বলল, কোলাপাড়া আইছি। এইডা কোলাপাড়া বাজার।

উঁকি মেরে বাজারের দিকটা দেখল তছি,। এত তাড়াতাড়ি কোলাপাড়া আইয়া পড়লাম? ও রিশকাআলা ভাই, রিশকা তো আপনের উড়াজাহাজের লাহান। চোক্কের নিমিষে মেদিনমোণ্ডল থন কোলাপাড়া আইয়া পড়লাম!

হ আমার রিশকা উড়াজাহাজঐ। তয় তুমি বহো আমি মুরলিভাজা কিন্না আনি।

আমিও আপনের লগে যামু।

ক্যা?

এইমিহি কোনওদিন আহিনাই। কোলাপাড়া গেরামডা কেমুন, বাজারডা কেমুন ইট্ট দেহি। ও রিশকাআলা ভাই, কাচারুগো (তামা পেতল কাচের জিনিসপত্র এবং

এলুমিনিয়ামের ব্যবসা করেন যারা) বাড়ি কোনডি কন তো? কোলাপাড়ায় বলে বহুত কাচারু বাড়ি?

তছির কথায় রুস্তম একটু বিরক্ত হল তবে বিরক্তিটা প্রকাশ করল না। তছিকে বুঝতেও দিল না কিছু। ভিতরের অস্থিরতা ভিতরে চেপে হাসিমুখে নরম গলায় বলল, কাচারুগো বাড়ি তোমারে যাওনের সময় দেহামুনে। কোলাপাড়া গেরামে কাচারুগো বাড়ি ছাড়া দেহনের কিছু নাই। আগে কইলে আহনের সময়ঐ দেহাইতাম। খালপাড়ের লগে অনেক কাচারু বাড়ি আছে। পাডাতন করা ঘর, দোতালা ঘর। নতুন ঢেউটিনের বেড়া ঝকঝক করে। কোনও কোনও ঘরের টিনে রঙ লাগাইন্না, জানলা কপাটে রঙ লাগাইন্না। যাওনের সময় দেহামুনে।

তছি বাধুক শিশুর মতো বলল, আইচ্ছা দেহাইয়েন। তয় অহন খালি বাজারডা দেহান।

বাজার দেইক্কা কী করবা, আর বাজারে যাওন তোমার ঠিকও অইবো না।

ক্যা?

তোমগো গেরামের কোনও মাইনষে যুদি তোমারে এহেনে দেইক্কা হালায়?

কেমতে দেখবো? আমগো গেরামের কোনও মানুষ এই বাজারে আহে না। মাওয়ার বাজারে যায়, নাইলে যায় কাজির পাগলা বাজারে।

এই বাজারেও আহে। আমি দেকছি।

দেকতে পারেন। কেঐ মরলে কাফোনের কাপোড় কিনতে আহে। ছনু মামানি যেদিন মরলো হেদিন মেন্দাবাড়ির মোত্তালেইব্বা আইছিলো। আইজ তো আমগ গেরামের কেঐ মরে নাই। কেডা আইবো?

তছির কথা শুনে রুস্তম একটা ফাঁপরের মধ্যে পড়ে গেল। ভিতরে আগের অস্থিরতাটা আছেই। সে চাইছে একরকম, হতে যাচ্ছে অন্যরকম। এত কিছুর পরও যদি পরিকল্পনা মতো কাজ না হয় তাহলে কী লাভ হল এসব করে! তার লগে যদি বাজারে যায় তছি, তছির পরিচিত না হোক রুস্তমের পরিচিত কেউ না কেউ দেখবেই! কথা কিছু না কিছু উঠবেই! কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, কী রে রোসতইমা, লগে কেডা? কী জবাব দিবে রুস্তম! স্বভাব চরিত্রের কথা রুস্তমের এদিককার অনেকেই জানে। ভারি একটা প্যাঁচঘোচের মধ্যে রুস্তম পড়ে যাবে।

না তছিকে নিয়ে বাজারে সে কিছুতেই যাবে না।

হঠাৎ করে নিজেকে তারপর বদলে ফেলল রুস্তম। গভীর চিন্তার একখান ছায়া মুখে ফেলে বলল, আসলে এই হগল কোনও কামের কথা না। রিশকায় থিকা নামতে তোমারে ক্যান দিতাছি না, ক্যান বাজারে নিতে চাইতাছি না তার অন্য একখান কারণ আছে।

তছি উদ্বিগ্ন গলায় বলল, কী কারণ?

আমগ এইমিহি রিশকা চোর খুব বাইড়া গেছে।

কন কী?

হ। চোরডি খালি তালে থাকে কুনসুম কোন রিশকাআলা রিশকা রাইক্কা চোক্কের

AMARBOI.COM

আঐল (আড়াল) অইলো। লগে লগে সিডে বইয়া রিশকা চালাইয়া দেয়। মাইনষে তো মনে করে যার রিশকা হেয়ঐ চালাইয়া যাইতাছে। কিছু কয় না। রিশকা যার চুরি অয় মাথায় বাড়ি পড়ে তার। পাছ ছয় হাজার টেকা দাম এহেকখান রিশকার। পুরা টেকাডা গলায় পাড়া দিয়া উসিল কইরা লয় মাহাজনে। এর লেইগা রিশকা থুইয়া কোনওহানে যাই না আমি।

যেন ব্যাপারটা খুবই ভাল ভাবে বুঝেছে তছি এমন গলায় বলল, ভালঐ করেন। রিশকা থুইয়া যাইবেন ক্যা?

এইত্তো বুজছো। তয় বহো, আমি মুরলিভাজা লইয়াহি।

তছি কাতর গলায় বলল, আমি যামু না?

শুনে হেসে ফেলল রুস্তম। অইছে কাম। আমি কই কী আর আমার সারিন্দায় (সারেঙ্গি) কয় কী! আরে রিশকা চুরি অওনের ডর আছে দেইক্কাইত্তো তোমারে বহাইয়া থুইয়া যাইতাছি। তুমি বইয়া রিশকাডা পাহারা দেও, আমি আইতাছি।

এবার তছিও হাসল। বুজছি। যান আপনে। তয় তাড়াতাড়ি আইয়েন।

আইচ্ছা।

রুস্তম পা বাড়িয়েছে, তছি বলল, মুরলিডি দেইক্কা আইন্নেন। ওদাইন্না (ন্যাতানো) মুরলি আইন্নেন না।

রুস্তম আবার বলল, আইচ্ছা।

AMARBOI.COM

ছাই রঙের খাদায় ভাতের ফ্যান আর তরিতরকারির ছালবাকল নিয়ে মান্নান মাওলানার সীমানায় এসেছে ফিরোজা। গোয়াল ঘরের লগে মাটির ভিটির ওপর বসান জাবনা দেওয়ার গামলায় জিনিসগুলি ফেলে ফিরে যাবে, মান্নান মাওলানা তাকে দেখে ফেললো। দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ করে মুখে একখান পান পুরেছেন তিনি। ছিলেন বড়ঘরের দুয়ারের সামনে, ফিরোজাকে দেখে পান চাবাতে চাবাতে গোয়ালঘরের দিকে এলেন। গরুর জাবর কাটার মত মুখখান নাড়াতে নাড়াতে বললেন, সমবাত কী লো ফিরি?

খাদা কাত করে জিনিসগুলি মাত্র জাবনার গামলায় ফেলতে যাবে ফিরোজা, হাত থেমে গেল। মান্নান মাওলানাকে দেখলেই বুক ধুগবুগ ধুগবুগ করতে থাকে, গলা শুকিয়ে আসে, হাত পা আড়ষ্ট হয়ে যায়। নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ফিরোজা। এখনও তেমন হল। বুকের কাছে খাদা ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে। এক ফাঁকে বুকের আঁচল ভাল করে টেনে দিয়েছে। চোখ এখন মাটির দিকে। ভঙ্গি জড়সড়।

তাকিয়ে তাকিয়ে ফিরোজাকে দেখলেন মান্নান মাওলানা। তারপর বললেন, কথা কচ না ক্যা?

ফিরোজা তবু কোনও কথা বলল না, তবু নড়ল না।

মান্নান মাওলানা বললেন, আইচ্ছা ফ্যানডি হালা।

এবার নড়ল ফিরোজা। তবে মান্নান মাওলানার দিকে তাকাল না। খাদা কাত করে জিনিসগুলি জাবনার গামলায় ফেলল।

কাজ শেষ করবার পর এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকবার কারণ নাই, যে রকম দ্রুত পায়ে এসেছিল সেইরকম পায়েই ফিরে যাওয়ার কথা ফিরোজার। এখনও কত কাজ বাকি রয়ে গেছে। ঘাটে গিয়ে গোসল করবে, ভিজা কাপড় রোদ দিবে উঠানের তারে, নানীকে খাওয়াবে, নিজে খাবে, তারপর যদি একটু আজার পাওয়া যায়। কিন্তু পা নড়াতে পারছে না ফিরোজা। মান্নান মাওলানা এসে সামনে দাঁড়াবার পর পা যেন মাটিতে গেঁথে গেছে। সেই পা টেনে তোলবার শক্তি নাই।

ফিরোজার মুখের দিকে তাকিয়ে পান চাবাতে চাবাতে মান্নান মাওলানা বললেন, মন্তার সমবাত কী লো?

ফিরোজা চোখ তুলে তাকাল না, কথার জবাবও দিল না।

তিনি প্রশ্ন করেছেন অথচ সামনে দাঁড়ান মানুষ জবাব দিচ্ছে না এটা হতে পারে না। এটা বরদাশত করবার মানুষ মান্নান মাওলানা নন। প্রথমেই প্রচণ্ড একখান ধমক দিবেন, তারপরও কথার জবাব না পেলে কোনওদিকে তাকাবেন না, কোনও কিছু খেয়াল করবেন না, গায়ে হাত তুলবেন।

তবে এখন তেমন কোনও অনুভূতি হল না মান্নান মাওলানার। একদমই রাগলেন না তিনি। মুখখান হাসি হাসি করে নরম গলায় বললেন, তুই আমারে এত ডরাচ ক্যা লো ছেমড়ি? আমি কি বাঘ ভাল্লুক যে তরে খাইয়া হালামু, নাকি তর লগে কোনওদিন রাগ করছি, তরে ধমক দিছি!

এবার পলকের জন্য মান্নান মাওলানার দিকে চোখ তুলে তাকাল ফিরোজা। তারপরই আগের মতো মাথা নিচু করল, কিন্তু কথা বলল না।

মান্নান মাওলানা বললেন, মন্তার সমবাত বেবাকঐ আমি জানি। দুই বউ লইয়া মোজে (মৌজে) আছে। এক রাইত এই বউর কাছে আরেক রাইত ঐ বউর কাছে। মাইনষে যাঐ কউক আমি মনে করি কামডা মন্তা খারাপ করে নাই। ভালঐ করছে। মোসলমানের চাইরখান পইরযন্ত বিয়া জায়েজ।

বলেই চোখ মুখের অশ্লীল ভঙ্গি করলেন মান্নান মাওলানা। খিক করে একটু হাসলেন। জুয়ান মর্দ পুরুষ পোলাগো তিন চাইরডা বউ না অইলে কাম অয় না। একখান বউ থাকলে দুই তিনডা পোলাপান অওনের পর হেইডা যায় ভিজা কেথার লাহান লোতলোতা হইয়া। হেইডারে আর বউ মনে অয় না। তহন আরেকখান বিয়া করন লাগে। দুইনম্বরডা যহন দুই তিনডা পোলাপান পয়দা কইরা আগেরডার লাহান অইয়া যায় তহন করতে হয় তিন নম্বরটা। এইভাবে চাইরখান জায়েজ।

আবার খি খি করে হাসলেন মান্নান মাওলানা। হোন ছেমড়ি, তুই তো ডাঙ্গর

AMARBOI.COM

অইছস, দুইদিন বাদে বিয়া দিলে বচ্ছরও ঘোরতে দিবি না, পোলাপান পয়দা কইরা হালাবি, আমার কথা হুইন্না রাখ, কামে লাগবো। পুরুষ পোলাগো জুয়ানকি থাকে সইত্তর আশি বচ্ছর আর মাইয়া ছেইলাগ কুড়ি বচ্ছর। ডাকের কথা আছে, মাইয়া ছেইলারা কুড়িতে বুড়ি। আতাহারের মারে দেহচ না একদোম বুড়ি অইয়া গেছে। আর আমারে দেখ। অহনতরি কী জুয়ান! তর লাহান ছেমড়ির লগে বিয়া হইলে বচ্ছর বাদে পোলা অইবো।

মান্নান মাওলানার কথা শুনতে শুনতে ফিরোজার মনে হচ্ছিল সে যেন আর বেঁচে নাই, সে যেন মরে গেছে। এই ধরনের কথা সে জীবনেও শোনেনি, তাও বাপ দাদার বয়সী কোনও পুরুষ মানুষের [illegible]। নাতনীর বয়সী মেয়েকে কেমন করে এসব কথা বলতে পারে একজন মানুষ! তাও যে মানুষ মাওলানা। পরহেজগার লোক।

মান্নান মাওলানা বললেন, হোন ছেমড়ি, তরে এই হগল কথা কওনের কারণ আছে। মাসে মাসে দোকানের কর্মচারি দিয়া মন্তার মারে টেকা পাডায় মন্তা। হেই বেডা দুই তিনদিন বাইত থাইক্কা বাজার হাট কইরা দিয়া যায়। মন্তার মায় বুড়ি তো আর দুইন্নাইদারি বোজে না অহন, বোজচ তুই। বেডা যে আহে, দুই তিনদিন যে থাকে বাইত্তে, তরা বলে একঘরে হোচ?

শেষ কথাটা এমনভাবে বললেন মান্নান মাওলানা, ফিরোজা চমকে উঠল। নিজের অজান্তেই কথা বলে ফেলল। কে কইছে আপনেরে?

আমি হুনছি।

কার কাছে হোনছেন?

হেইডা তরে কমু ক্যা? বাইত্তে কী কম মানুষ আছে! তিন শরিকের অউক আর যারঐ অউক বাড়িডা তো আসলে আমার। এই বাড়ির কোনহানে কী হয় বেবাক আমি জানি।

তয় এইডা ঠিক জানেন না। যেই বেডারে মন্তাজ মামায় পাডায় হেই বেডার নাম মালেক। আমার বাপের বইশশা। আমি তারে মামা কই।

মান্নান মাওলানা আবার হাসলেন। বয়সের কথা কইচ না। এতক্ষুণ তো তরে আমি ঐ হগল বুজাইলামঐ।

তয় মালেক মামায় বড়ঘরে থাকে না। ঐ ঘরে থাকি আমি আর নানী। মামায় থাকে পুবের ঘরে।

চিরিক করে পানের পিক ফেললেন মান্নান মাওলানা। মুখখান অমায়িক করে ফিরোজার দিকে তাকালেন। ঠিক আছে যা, তর কথা আমি বিশ্বাস করলাম।

তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে ফিরোজা কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার কাঁধে হাত দিলেন, দিয়ে খামচে ধরলেন। যেন ইচ্ছা করলেই হাতটা সরিয়ে দিতে না পারে ফিরোজা, দৌড় দিয়ে পালাতে না পারে।

মান্নান মাওলানা তারপর বললেন, তরে আমি বহুত ভাল জানি ফিরি। কেন জানি কইতে পারি না। তুই এই বাইত্তে আহনের পর থিকাঐ, তর মুখখান দেকলেঐ আমার মায়া লাগে। মালেকরে লইয়া তর কথা আমি অনেকদিন আগেই হুনছি, তরে কিছু কই

AMARBOI.COM

নাই এর লেইগাঐ। তুই অনাত এতিম মাইয়া। আমি পারি মালেকের লগে একখান বদলাম রটাইয়া তরে এই বাইত থিকা খেদাইয়া দিতে। দেই নাই। দিমুও না। ঐ যে তরে আমি ভাল জানি এর লেইগা। হোন, আজাইর পাইলে আমি তগ ঘরে যামু। তুই আমারে ইট্টু সেবা যত্ন করিস।

মান্নান মাওলানা তার কাঁধ খামছে ধরার পর থেকে ফিরোজা যেন আর ফিরোজা নাই, সে যেন মাটি হয়ে গেছে, মরা গাছ হয়ে গেছে। তার কোনও অনুভূতি নাই, জীবন মরণ বোধ নাই। ফ্যাল ফ্যাল করে মান্নান মাওলানার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

এ সময় বাদলার পিছু পিছু মান্নান মাওলানার বাড়িতে এসে উঠল রাবি।

দুইজন মানুষ যে বাড়িতে এসে উঠেছে মান্নান মাওলানা তা টেরই পেলেন না। ফিরোজার কাঁধ খামছে ধরে মুখে ওসব কথা তিনি বলছিলেন ঠিকই কিন্তু ভিতরে ভিতরে মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন অন্য একটা ব্যাপারে। মুখের পান মুখে আছে, চাবানের কথা মনে নাই। শরীর ভরে গেছে অদ্ভুত এক পুলকে। মৃতের মতো অনুভূতিহীন চোখে ফিরোজা তাকিয়ে ছিল তাঁর দিকে। সেই চোখে চোখ রেখে গদগদ কণ্ঠে গভীর কোনও আবেগের কথা বলতে যাবেন মান্নান মাওলানা তার আগেই লোকজন দেখে বাদলা তার স্বভাব মতন কাজটা করল। রাবির দিকে দুইহাত বাড়িয়ে বলল, কুলে লও মা।

বাদলার কথায় হিংস্র থাবা থেকে শিকার ফসকে যাওয়া জন্তুর মতো চোখ করে পিছন ফিরে তাকালেন মান্নান মাওলানা। এই ফাঁকে ফিরোজা যেন জান ফিরে পেল। ঝটকা মেরে মান্নান মাওলানার হাত কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল, খাদা বুকের কাছে ধরে হন হন করে হেঁটে মস্তাজদের সীমানার দিকে চলে গেল।

ততক্ষণে বাদলাকে কোলে নিয়েছে রাবি। এক যাঁকে ঘোমটাও দিয়েছে মাথায়। মান্নান মাওলানা ফিরে তাকাতেই বলল, মামায় আইছে বাইত্তে।

সাদা কালোয় মিশান বিছার মতো জোড়া ভুরু কুঁচকে, মুখখান যতদূর সম্ভব বিকৃত করে খাউ খাউ করা গলায় মান্নান মাওলানা বললেন, মামাডা আবার কেডা?

প্রথমে ওইরকম হিংস্র চোখে তাকানো তারপর এমন মুখ করে কথা বলা, রাবি ভড়কে গেল। তার কাছে মান্নান মাওলানা রক্ত মাংসের তৈরি মানুষ না। মাটি দিয়ে নিশ্চয় এই রকম পরহেজগার বান্দা তৈরি করেননি আল্লাহতায়ালা। তৈরি করেছেন নূর দিয়ে। মান্নান মাওলানা তো আসলে ফেরেশতা। এই রকম একজন ফেরেশতা বদমাস মানুষদের মতো খাউ খাউ করছেন কেন? যুবতী মেয়েটার কাঁধে হাত দিয়েই বা কী করছিলেন তিনি!

রাবি একটা ঢোক গিলল। কাচুমাচু গলায় বলল, এনামুল মামায়।

এনামুল নামটা দোয়া দরুদের মতন কাজ দিল। চোখের পলকে চেহারা বদলে গেল মান্নান মাওলানার। চোখের হিংস্রতা কোথায় উধাও হল, কোথায় গেল মুখ বিকৃতি আর কুত্তার মতন খেউক্কানি! মুখ অমায়িক হয়ে গেল। গলার স্বর হল পুকুরের অনেক গভীরে লুকিয়ে থাকা কাদার মতো। হাসিমুখে মান্নান মাওলানা বললেন, কচ কী! এনামুল আইছে?

মাওলানা সাহেবের এই আচরণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল রাবি। সেও হাসল। হ।

AMARBOI.COM

কুনসুম?

দুফইরা ভাত খাওনের আগে।

কেমতে আইছে? লনচে?

না। রিশকা কইরা।

রাবি কথা বলবার আগেই তার কোল থেকে বাদলা বলল, হ রিশকা কইরা আপনেগ বাড়ি ছাড়াইয়া হাজামবাড়ি মিহি আইয়া নামছে।

আমগো গেরামে তাইলে রিশকা আইয়া পড়ছে! বা বাবা বা।

তারপর আবার চিন্তিত হলেন মান্নান মাওলানা। ঢাকা থিকা রিশকা লইয়া বাইত্তে আইছে এনামুল! না, এইডা সম্ভব না। ছিন্নগর তরি গাড়ি লইয়াইছে তার বাদে লইছে রিশকা।

বয়স্ক লোকদের মতো মাথা নাড়িয়ে বাদলা বলল, হ। অমনেঐ আইছে।

এবার বাদলাকে একটা ধমক দিলেন মান্নান মাওলানা। ঐ বেডা, এত ডাঙ্গর অইছস অহনতরি মার কুলে উইট্টা রইছস ক্যা?

রাবি বলল, হ হুজুর, বাদলা সব সময় খালি আমার কুলে উইট্টা থাকে। আপনে অরে ইট্টু ফুঁ দিয়া দেন।

তরে না আমি কইছিলাম, আহিচ আমার কাছে, পোলাডারে ঝাইড়া দিমুনে আর খাওনের লেইগা পানি পড়া দিমুনে। তুই তো আহচ নাই।

কেমতে আমু! হারাদিন কাম থাকে।

পোলাডার ভালমন্দও কাম। এইডা করতে অইবো না?

হ করতে তো অইবোঐ।

আমি ঐদিন যে ঝাইড়া দিয়াইলাম তারবাদে মোতালেইব্বাগ ঐমিহি কইতর দেকতে যায়?

রাবি কথা বলবার আগেই বাদলা বলল, হ যাই।

মান্নান মাওলানা ভুরু কুঁচকালেন। কচ কী?

ছেলের দিকে তাকিয়ে তাকে একটা ধমক দিল রাবি। এই ছেমড়া মিছাকথা কচ ক্যা? ঐ দিনের পর থিকা তুই কি আর কইতর দেকতে যাচ? গেলে আমি জানতাম না! যহন বাইত্তে থাকি তহন তো দেকতামও!

বাদলা হাসল। আমি তো পলাইয়া পলাইয়া যাই। কেঐ দেহে না। চুপ্পে চুপ্পে মোতালেব নানাগো খোয়াড়ের সামনে খাড়ইয়া কইতর দেইক্কাহি। তোমারেও কই না।

মান্নান মাওলানা চিন্তিত গলায় বললেন, রাবি রে পোলাডা তর কমিনা। এই পোলায় বহুত ভোগাইবো তরে।

রাবি ভয়ার্ত গলায় বলল, তাইলে অহন কী করুম?

ভাল কইরা ঝাড়ন লাগবো অরে, তিনওক্ত পানি পড়া খাওয়ান লাগবো।

তাইলে আজ থিকাই ঝাড়েন, আইজ থিকাই পানি পড়া দেন।

ঐডা অইবো নে। তার আগে আরেকখান কথা ক আমারে। বাদলা বলে অহনতরি তর বুকের দুধ খায়?

AMARBOI.COM

একথায় লজ্জা পেল রাবি। মাথা নিচু করে বলল, হ।

এইডা তো সব্বনাইশা কথা। না না বুকে মুখ দিতে পারবো না পোলায়। দুধ ছাড়ান লাগবো। নাইলে ফাড়া আছে পোলার কপালে।

রাবি ভয়ার্ত গলায় বলল, কেমতে ছাড়ামু?

মান্নান মাওলানা আশ্বাসের গলায় বললেন, ব্যবস্থা আছে। কইরা দিমুনে।

আইজঐ কইরা দেন।

আইজ হইবো না। সময় লাগবো। আমি যেদিন কমু ঐদিন আবি। বাদলারে লগে আনবি না। একলা আবি। ঝাড়ন লাগবো তরে, বাদলারে না।

রাবি চিন্তিত গলায় বলল, আমারে ঝাড়ন লাগবো ক্যা?

মান্নান মাওলানা হাসলেন। তর পোলার সামনে এই কথা কওন যাইবো না। পরে কমুনে।

আইচ্ছা।

অহন ক এনামুল কী কইছে।

এ কথায় রাবি চমকাল। হায় হায় আসল কথাঐত্তো ভুইল্লা গেছি। যেই কামে আইছি ঐ কামঐত্তো অহনতরি করি নাই। এনামুল মামায় আপনেরে যাইতে কইছে।

কুনসুম? অহনঐ?

না বিয়ালে।

বিয়ালে ক্যা? অহন কী করে?

দুফইরা ভাত খাইয়া লেপ মুড়া দিয়া ঘুমাইছে।

আইচ্ছা তাইলে বিয়ালেঐ যামুনে, ঐ রাবি আমার পত্রডা এনামুল পাইছিলো?

হ।

তরে কইল কেডা?

এনামুল মামায় দেলরা বুজিরে কইতাছিল। আমি হুনছি।

মান্নান মাওলানা বেশ একটা ফুর্তির শব্দ করলেন। আমার পত্র পাইয়া যহন বাইত্তে আইছে এনামুল, তাইলে কাম অইয়া যাইবো।

রাবি কথা বলল না, বাদলা বিজ্ঞের মতো বলল, হ অইয়া যাইবো।

মান্নান মাওলানা ঘেটি ত্যাড়া করে বাদলার দিকে তাকালেন। ঐ বেডা, কী অইয়া যাইবো?

বাদলা হাসল। আপনের কাম।

আমার কী কাম তুই জানচ?

হ।

কী কাম ক তো?

আপনে একখান মজজিদ বানাইবেন।

মান্নান মাওলানা চমকে উঠলেন। তুই জানলি কেমতে?

বাদলা না এবার কথা বলল রাবি। ভাত খাইতে বইয়া দেলরা বুজির লগে এই হগল প্যাচাইল পারতাছিল এনামুল মামায়। ও হোনছে।

AMARBOI.COM

মান্নান মাওলানা অতি উৎসাহের গলায় বললেন, তুই সামনে আছিলি না? কী প্যাচাইল পারছে আমারে ইট্টু ক তো।

ঐত্তো আপনে পত্র লেকছেন, মজজিদ বানাইতে চান এই হগল। এনামুল মামায় এর লেইগাঐ আপনেরে খবর দিছে।

মান্নান মাওলানার চোখ তখন কী এক আশায় চকচক করছে। খানিক আনমনা হয়ে কী ভাবলেন তিনি তারপর রাবির দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে তুই যা। আমি বিয়ালে আমুনে।

সড়কের পাশে একটা ছাড়াবাড়ি। দুপুরের পর পর নিঝুম হয়ে আছে বাড়িটা। গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের ছায়ায় বেশ একটা শীত শীত ভাব। ডালপালার ফাঁক ফোকর দিয়ে টুকরা টাকরা রোদ ছড়িয়ে পড়েছে গাছের তলায়, ঝোপঝাড়ের মাথায়। সেই রোদে শীত ভাব কমেনি। একটা ঝোপে অচেনা কিছু ফুল ফুটে আছে। বেশ ঝাঁঝাল গন্ধ। সেই গন্ধে বিভোর হয়ে আছে বাড়ি। কয়েকটা প্রজাপতি মাতাল হয়ে উড়ছে। জামগাছটার মগডালে বসে থেকে থেকে ডাকছে একটা ঘুঘু। ঘুঘুর ডাকে নিঝুম ভাব তো কাটেইনি আরও বেড়ে গেছে।

রিকশা নিয়ে এই বাড়িটার সামনে চলে এল রুস্তম। খানিক আগে কোলাপাড়া বাজার থেকে মুরলিভাজা কিনেছে। কিনে ঠোঙাটা দিয়েছে তছির হাতে। যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে এমন ভঙ্গিতে মুরলির ঠোঙা তছি বুকে চেপে ধরেছে। আনন্দ আহল্লাদে বিগলিত হয়ে বলেছে, অহনঐ খামু রিশকাআলা ভাই?

রুস্তম হেসেছে। না ইট্টু পরে খাও।

ক্যা?

রাস্তাঘাডে খাওন ভাল না।

তয় কই গিয়া খামু?

লও অন্য একখান জাগায় যাই। ওহেনে গিয়া নিরালায় বইয়া দুইজনে মিল্লা সুখ দুক্কের কথা কমুনে আর মুরলিভাজা খামুনে।

বাইত্তে যাইতে তাইলে দেরি অইয়া যাইবো না আমার?

না, কীয়ের দেরি অইবো? রিশকা কইরা আমি তোমারে দিয়ামু না? এহেন থিকা রিশকা ছাড়ুম, চোক্কের নিমিষে তোমগো গেরামে যামু গা।

তয় লন।

রুস্তম তারপর রিকশায় চড়েছে। হাওয়ার বেগে রিকশা চালিয়ে এসেছে ছাড়াবাড়িটার সামনে।

তছির তখন আর মন মানছে না, মন চলে গেছে আঁচলের তলায়। কতক্ষণে আঁচল তুলবে সে, মুরলির ঠোঙায় হাত দিবে। মনে মনে ততক্ষণে আরেকটা পরিকল্পনাও করে ফেলেছে সে। এখনকার মুরলিটা রুস্তমই খাওয়াচ্ছে, ওইদিকে এনামুল দাদার দেওয়া টাকা দশটা পুরা রয়ে গেল। এটা একটা বিরাট লাভ। কাল থেকে রোজ সকালে সীতারামপুরের খালের ঘাটে যাবে সে। ওখানকার মুদি দোকান থেকে এক টাকার করে মুরলিভাজা কিনে খাবে। এক টাকার করে রোজ খেলে দশ টাকায় দশদিন। একটানা দশদিন খেলে মুরলিভাজা খাওয়ার লোভটা কমবে।

এসব চিন্তা ছিল বলে কোথায় এসে রিকশা থামাল রুস্তম তছি খেয়াল করল না।

রুস্তম তখল চঞ্চল চোখে চারদিক তাকাচ্ছে। তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, নামো।

তছি লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নামল। আঁচলে প্যাঁচিয়ে দুইহাতে যক্ষের ধনের মতো ধরে রেখেছে মুরলির ঠোঙা। কোনওদিকে খেয়াল নাই তার।

রুস্তম বলল, ঐ যে ফুলের ঝাড়টা দেকতাছো ঐডার আঐলে গিয়া বহো। আমি আইতাছি।

তছি কোনওদিকে তাকাল না, কিচ্ছু খেয়াল করল না, ভর পেট মুরলিভাজা খাওয়ার আনন্দ উত্তেজনায় বনফুলের ঝোপটার দিকে ছুটে গেল। ঝোপের আড়ালে বসেই আঁচলের তলা থেকে মুরলিভাজার ঠোঙা বের করল। কোনওদিকে তাকাল না, হামহাম করে খেতে লাগল। কোথায় বসে আছে সে, কেমন করে এখানে এল, কখন বাড়ি ফিরবে কোনও কিছুই মনে রইল না। এমন কী রুস্তমের কথাও। অচেনা মানুষটা যে মেদিনীমণ্ডল গ্রাম থেকে এতটা দূরে নিয়ে এসেছে তাকে, তছির দশ টাকার নোটখান ভাঙাতে দেয়নি, নিজের তফিলের (তহবিল) পয়সা খরচা করে কোলাপাড়া বাজার থেকে মুরলিভাজা কিনে দিয়েছে তাকে, এরকম নির্জন ছাড়াবাড়িতে নিয়ে এসেছে এসব এখন একেবারেই ভুলে গেছে তছি। তার মন ঢুকে গেছে মুরলির ঠোঙায়, মন পড়ে আছে মুরলি খাওয়ায়।

শীতকালের দুপুরে তখন লেগেছিল আশ্চর্য সমাহিত ভাব। গাছপালার আড়াল সরিয়ে গাঁদাফুলের পাপড়ির মতন রোদের টুকরা এসে পড়েছিল ছাড়াবাড়ির এখানে ওখানে। বনফুলের ঝোপের কাছটা তীব্র গন্ধে মাতোয়ারা। তছির মাথার ওপর, বনফুলের গা ঘেঁষে ওড়াউড়ি করছে কয়েকটা প্রজাপতি। ফুলের মধু খেতে এসেছে অজস্র মৌমাছি। মধু খেতে খেতে গুনগুন গুনগুন করে শব্দ করছে। তুলতুলে হাওয়া মন্থর হয়ে আছে শীত আর ফুলের গন্ধে। জামগাছের মগডালে বসে ঘুঘুর ঘুঘ, ঘুঘুর ঘুগ শব্দে ডাকছে একটা রাজঘুঘু। গাবগাছটার অন্ধকার খোড়লে স্থির হয়ে আছে একটা আরজিনা (গিরিগিটি)। বনফুলের ঝোপ ছাড়িয়ে ভাঙনের দিকে খাল। খালের শীতল কোমল পানিতে শ্বাস ফেলতে উঠেছিল পানির তলার মাছ। আর দূরের কোনও নির্জন গ্রাম প্রান্তরের একাকী বৃক্ষের ছায়ায় বসে প্রাণখুলে ডাকছিল এক কোকিল। শীতকালেই বসন্তের ডাক ডাকতে শুরু করেছে। আশ্চর্য ব্যাপার, মুরলিভাজা খেতে খেতে কোকিলের ডাকটা পরিষ্কার শুনতে পেল তছি। কেন যে সে একটু আনমনা হল! কেন যে সে একটু কান খাড়া করল!

AMARBOI.COM

তখনই রুস্তম এসে বসল তার পাশে।

মাজার গামছা খুলে মাফলারের মতো গলায় প্যাঁচিয়েছে। চোখ মুখে কী রকম উত্তেজনা। আচরণে মাছের মতো চাঞ্চল্য। পাশে বসেই তছির খোলা কাঁধে হাত রাখল। জড়ান গলায় আস্তে করে করে বলল, মুরলিভাজা খাইতে কেমুন লাগে?

তছির মুখভর্তি মুরলি। তবু রুস্তম এসে পাশে বসার পর আরেক মুঠ মুরলি মুখে দিল। যেন যত দ্রুত সম্ভব খেয়ে শেষ করতে হবে এক ঠোঙা মুরলি। নয়তো রুস্তম যদি ভাগ বসায়!

মুরলি মুখেই তছি বলল, খুব ভাল।

কথাটা একেবারেই জড়িয়ে গেল তার। কিছুই বোঝা গেল না। অবশ্য তছির কথা বোঝা না বোঝায় রুস্তমের কিছু আসে যায় না। সে কি আর মুরলির চিন্তায় আছে! সে আছে অন্য চিন্তায়, অন্য উত্তেজনায়। তবু কোনও একটা কথা দিয়ে শুরু করতে হয় বলে কথাটা সে বলেছে।

রুস্তম যতটা নিচু গলায় কথা বলছে তছি যেন বলছে ততটাই উঁচু গলায়। মুখে মুরলিভাজা ছিল বলে কথা বোঝা যায়নি, শব্দটা বোঝা গেছে! সেই শব্দে চমকেছে রুস্তম। চঞ্চল চোখে চারদিক তাকিয়েছে। তারপর নিজের শরীর তছির পিঠে ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলেছে, আস্তে কথা কও, আস্তে।

মুরলি চাবাতে চাবাতে তছি নির্বিকার গলায় বলল, ক্যা?

কেঐ হুনবো।

হুনলে কী হইছে?

তছির পিঠের উপর দিকে নিজের মুখ একটুখানি ঘষে দিয়ে রুস্তম বলল, হুনলে মন্দ কইবো?

ক্যা আমরা কী মন্দ কথা কইছি?

না।

তয়?

এমুন নিটাল জাগায় আমরা দুইজন মানুষ বইয়া রইছি দেকলে মাইনষে মনে করব অন্যকাম করতাছি।

কী কাম?

তুমি বোজ না?

না।

সত্যঐ বোজ না?

তয় কী মিছা? আমি আপনের লগে মিছাকথা কই?

না মিছাকথা কইবা ক্যা! বোজবা, আস্তে আস্তে বোজবা। বহো। মুরলিভাজা খাও। তয় আওজ কইরো না।

বলে মুখখান গভীর আবেগে তছির পিঠের উপর দিকে, আগের জায়গায় ঘষতে লাগল রুস্তম। আর দুইহাতে হাতাতে লাগল তার দুইবাহু। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা পাত্তা দিল না তছি। তারপরই ছটফট করে উঠল। উঁহুহু, এমুন কইরেন না রিশকাআলা ভাই। আমার জানি কেমুন লাগে!

AMARBOI.COM

রুস্তম গুঙিয়ে গুঙিয়ে বলল, কেমুন লাগে?

শইল্লের পশম খাড়ইয়া যায়। ক্যাতকুতি (সুরসুরি) লাগে। উঁহু উঁহু। এমুন করতাছেন ক্যা আপনে? কী অইলো আপনের, এমুন করতাছেন ক্যা?

বোজ না ক্যান এমুন করি! বোজ না তুমি?

না বুজি না। আপনে আমার কাছ থিকা সরেন, সইরা বহেন। এমুন কইরেন না। মুরলিভাজা খাইতে দেন আমারে।

তছির কথা গ্রাহ্য করল না রুস্তম। তছির কাঁধে, পিঠে মুখ ঘষতে ঘষতে, তছির বাহুতে হাত বুলাতে বুলাতে, আকাতলির (বগল) দিকে হাত দিয়ে বেশ যত্নে, বেশ কায়দায় তার গা থেকে সরাতে লাগল কাপড়। শ্বাস প্রশ্বাস হঠাৎ জ্বর আসা রোগির মতন গরম। মুখে মৃদু গোঙানীর শব্দ। বুকের ভিতর অদ্ভুত উত্তেজনা। তলপেট ফেটে যেতে চাইছে যন্ত্রণায়। পিছন থেকে আস্তে ধীরে নিজের দুটি হাত তছির বুকের দিকে এগিয়ে দিল রুস্তম।

তখনই যা বোঝার বুঝে গেল তছি। ঠোঙায় তখনও রয়ে গেছে কিছু মুরলিভাজা। সেদিকে আর খেয়াল রইল না তার। সাপের ছোবল এড়াতে যেমন করে লাফিয়ে ওঠে সাবধানী পাখি ঠিক তেমন করে লাফ দিয়ে উঠল সে। দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিস করে বলল, বুজছি। তোমার মতলব আমি বুজছি। তুমি তো মানুষ ভাল না! তুমি তো বদ! মুরলি খাওনের লোভ দেহাইয়া এর লেইগা ছাড়াবাইতে লইয়াছো আমারে?

হিংস্র হাতে থাবা দিয়ে রুস্তমের গলার গামছাটা ধরল তছি। ধরে চোখের পলকে গিটঠু দিয়ে ফেলল। দুইহাতে দুইদিকে টেনে ধরল গামছার দুইমাথা। আগের মতোই দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিস করে বলল, কীরে খানকি মাগির পোলা, কীরে ছিলানী মাগির পোলা, মা বইন নাই তর? এই হগল করতে অয় তর মার লগে কর, তর বইনের লগে কর। আমার লগে ক্যা?

রুস্তম এতটা কল্পনাও করেনি। প্রথমে সে হতভম্ব হল, তারপর গেল ভয় পেয়ে। শরীরের উত্তেজনা কোথায় উধাও হল! শুধু মনে হল যে রকম হিংস্র গলায় কথা বলছে তছি, শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়েছে গামছা, অবস্থাটা এরকম থাকবে না। এভাবে তাকে ধরে রেখে এখনই চিৎকার শুরু করবে সে। তোমরা কে কোনওহানে আছো, আউগগাও। রোস্তম রিশকাআলা আমার ইজ্জত নষ্ট করতে চায়। আর তছির সেই চিৎকার শুনে সড়ক পথে চলতে থাকা পথিকরা একজন দুইজন করে একত্রিত হবে। দল বেঁধে এগিয়ে আসবে ছাড়াবাড়ির বনফুলের ঝোপটার কাছে। তছির হাত থেকে ছাড়িয়ে নিবে রুস্তমকে। তারপর শুরু করবে মাইর। একেকজন একেক ভাষায় বকাবাজি করবে আর মারবে। কেউ কোকসা বরাবর লাথথির পর লাথথি মারবে, কেউ মারবে নাকে মুখে ঘুষি। সেইসব ঘুষির কোনওটায় খাড়া হয়ে থাকা নাক যাবে চ্যাপটা হয়ে, দাঁতগুলি কদুবিচির মতন ছিটকে ছিটকে পড়বে এদিক ওদিক, জিভের অর্ধেকটা কেটে বউন্না গাছের বাকলার মতন খসে পড়বে। কারও কারও কিল ঘুষিতে ঠোঁট হবে ফালা ফালা, চোখের মণি গলে ভাঙা ডিমের মতন বেরিয়ে আসবে। কেউ হয়তো অতিরিক্ত ক্রোধে ভেঙে নেবে শক্ত কোনও গাছের ডাল। সেই ডাল দিয়ে বেছে বেছে

AMARBOI.COM

বাড়ি মারবে হাত পায়ের জোড়ায়। জোড়াগুলি ভেঙে দিবে। অতিরিক্ত নৃশংস কোনও মানুষ হয়তো দুইখান থানইট জোগাড় করে আনবে। যে কর্মের উদ্দেশ্যে তছিকে সে এখানে নিয়ে এসেছে সেই কর্ম সমাধার অঙ্গ একটা থানইটের ওপর রেখে অন্য থানইট দিয়ে গিরস্ত বাড়ির বউঝিরা যেভাবে টাকিমাছ ভর্তা করে সেইভাবে ভর্তা করবে। গুহ্যদ্বার দিয়ে হাতের লাঠিও প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে কেউ।

এরপর রুস্তম আর কিছু ভাবতে পারল না। দুইহাত মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে একত্র করে দিশাহারা গলায় তছিকে বুঝ দেওয়ার চেষ্টা করতে গেল। আমার ভুল অইয়া গেছে। মস্ত বড় ভুল হইয়া গেছে। তছি, বইন গো, বইন, তুমি আমারে মাপ কইরা দেও বইন। এমন ভুল জিন্দেগিতে আর করুম না। বইন কইলাম, তোমারে আমি বইন কইলাম, তুমি আমারে মাপ কইরা দেও। চিক্কইর দিও না বইন, মানুষজন ডাক দিও না। মানুষ ডাক দিলে আমার আর বাচন নাই। আমারে তারা মাইরা হালাইবো। বইন না, দরকার অইলে তোমারে আমি মা ডাকতাছি। মা, তছি মা, তুমি আমারে মাপ কইরা দেও মা।

আশ্চর্য ব্যাপার, রুস্তমের গলা দিয়ে শব্দ বের হল না। কথা বলতে গিয়েও রুস্তম দেখে কথা সে বলতে পারছে না। গলা বন্ধ হয়ে গেছে। বুকের ভিতর ফুরিয়ে আসছে দম। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। জিবলাটাও থাকতে চাইছে না মুখের ভিতর, নিজের অজান্তেই অনেকখানি বের হয়ে আসছে। থুতনি ছাড়িয়ে নেমে গেছে। গামছার ফাঁস কঠিন থেকে কঠিন হয়ে আটকে গেছে গলায়।

রুস্তম তার তাগড়া জোয়ান শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে দুইহাতে টেনে ছাড়াতে চাইল গামছার ফাঁস। কোরবানী দেওয়া গরুর মতো দাপড়া দাপড়ি করতে লাগল। বিন্দুমাত্র আলগা করতে পারল না। কোরবানী দেওয়ার সময় গরুর সর্বাঙ্গ যেমন চেপে ধরে আট দশজন তাগড়া জোয়ান পুরুষ, যতই দাপড়া দাপড়ি করুক লোকগুলিকে যেমন গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে না গরু, তছিকেও তেমন ঝেড়ে ফেলতে পারছে না রুস্তম। তছি যেন এখন আর কোনও নরম কোমল, ঢলঢল যৌবনের যুবতী মেয়ে না। তছি যেন এখন কোনও অবলা নারী না। তছি যেন এখন একাই আট দশজন তাগড়া জোয়ান পুরুষ। রুস্তম নামের গরুটাকে মাটিতে ফেলে জবাই করছে। রুস্তমের গলায় গিঁটঠু দিয়ে ধরা গামছা যেন ঝকঝকা ধারের গরু জবাই করার বিশাল ছুরি। সেই ছুরি দিয়ে পুচিয়ে পুচিয়ে রুস্তমকে যেন সে জবাই করছে।

রুস্তমের ধ্বস্তাধ্বস্তি আর তছির রাগ ক্রোধের হিসহিস শব্দে বনফুলের মাথার ওপর ওড়াউড়ি করতে থাকা প্রজাপতিগুলি ভয় পেয়ে অন্যদিকে উড়াল দিয়েছে। মধু খেতে আসা মৌমাছিরা বন্ধ করেছে গুনগুন শব্দ, পালাবার পথ খুঁজছে। আমগাছের আগডালে বসা রাজঘুঘুটা আচমকাই স্তব্ধ হয়েছে। গাবগাছের খোড়লের কাছে স্থির হয়ে থাকা আরজিনাটা লুকাতে ব্যস্ত হয়েছে অন্ধকার খোড়লে। বনফুলের গন্ধে মাতায়োরা হাওয়া হয়েছে আরও ধীর। দূর থেকে ভেসে আসা কোকিলের ডাক আর শোনা যায় না।

কতক্ষণ, কতক্ষণ এভাবে চলেছে কে জানে। হঠাৎ করেই যেন নিজের মধ্যে ফিরে এল তছি পাগলনি। একে একে সব মনে পড়ল তার। মুরলিভাজার ঠোঙাটা পড়ে আছে

রুস্তমের পায়ের কাছে। ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে যে কয়টা মুরলি তখনও ছিল ঠোঙায় সেগুলি ছড়িয়ে পড়েছে এদিক ওদিক। গামছার ফাঁস তখনও শক্ত হাতে টেনে রেখেছে তছি। রুস্তমের কোনও সাড়া নাই। একবোরেই স্থির হয়ে আছে সে। ধ্বস্তাধ্বস্তি দূরের কথা, হাত পা ছোড়া দূরের কথা, লড়াচড়াও নাই তার। কুকরার আন্ডার মতন চোখ দুইটা বেরিয়ে, ভুরুর তলায়, নাকের বাঁকের কাছে এসে ঠেকে আছে। হাঁ করা মুখ থেকে জিভ বেরিয়েছে বিঘতখানেক। থুতনির তলায় বরকির দাড়ির মতো ঝুলছে। এসব দেখেও ক্রোধ যেন কমল না তছির। গামছার ফাঁসে হ্যাচকা একটা টান দিল, দিয়েই ছেড়ে দিল। নুনের বস্তার মতো একদিকে কাত হয়ে পড়ল রুস্তম।

তছির বুক তখন হাপরের মতন ওঠানামা করছে। ফোঁস ফোঁস, ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস পড়ছে। গভীর ক্লান্তিতে ভেঙে আসতে চাইছে শরীর। ইচ্ছা করে রুস্তমের পাশে সেও লুটিয়ে পড়ে থাকে।

তছি তা করে না। ক্রোধ এখন অচেনা এক দুঃখে রূপ নিয়েছে। গভীর কষ্টের এক কান্নায় বুক ফেটে যেতে চাইছে, চোখ জ্বালা করছে। তবু শেষ ক্রোধটা রুস্তমের ওপর মিটাল সে। ডান পা তুলে প্রচণ্ড একখান লাথথি মারল রুস্তমের মুখ বরাবর। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, মিটছে না, মনের খায়েশ মিটছে না তর?

তছির লাথথি খেয়ে রুস্তমের দেহ তখন গাছের গুঁড়ির মতো গড়িয়ে যাচ্ছে ভাঙনের দিকে। দেখতে দেখতে ঝপ করে গিয়ে পড়ল খালের পানিতে। সেই শব্দে কী হল তছির, বুকের কান্না, চোখের কান্না আর ধরে রাখতে পারল না সে। মুখে আঁচল চেপে গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বনফুলের ঝোপের আড়াল থেকে বেরুল। বেরিয়ে পাগলের মতো সড়ক বরাবর ছুটতে লাগল।

AMARBOI.COM

গলার চেন হাতাতে হাতাতে এনামুল বলল, বলেন মাওলানা সাব, খবর কী?

মান্নান মাওলানা বসে আছেন হাতলআলা ভারী চেয়ারে। বিকাল হতে না হতেই শীতের কাপড় পরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। খয়েরি রঙের ফ্লানেলের পানজাবি। পানজাবির উপর নীল রঙের হাফহাতা সোয়েটার। গলায় জড়ান হলুদ রঙের মাফলার। পাযে উলের সাদা মোজা আর খয়েরি রঙের পাম্পসু। এমনিতেই পেট মোটা মানুষ তার ওপর পরেছেন এতগুলি কাপড়, মান্নান মাওলানাকে দেখাচ্ছিল গাবগাছের গুঁড়ির মতন। তার ওপর কাপড় একেকটা একেক রঙের। কাপড়ের কারণে তাকে মনে হচ্ছিল সার্কাসের জোকার। বসে আছেন ঘরের ভিতর, দেলোয়ারাদের বড়ঘরের উত্তর দিককার কামরায়, তবু যেন শীতে কাতর।

এনামুলের কথা শুনে একবার নাক টানলেন মান্নান মাওলানা। আছে, খবর আছে। আমার পত্র পাও নাই তুমি?

হ পাইছি।

পত্রে তো খবর আমি কিছু লেকছিলাম।

হ লেকছেন। তয় তেমুন খোলসা কইরা কিছু লেকেন নাই। বাড়িতে আসনের পর আম্মায় আমারে কইছে।

কী কইছে?

আমারে দিয়া গেরামে একখান মজজিদ করাইতে চান।

মান্নান মাওলানা আবার নাক টানলেন।

এনামুলের পাশাপাশি চৌকিতে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন দেলোয়ারা। খানিক আগে চোখ থেকে চশমা খুলে মুছে নিয়েছেন। মন দিয়ে এনামুল আর মান্নান মাওলানার কথা শুনছিলেন। মান্নান মাওলানাকে পরপর দুইবার নাক টানতে দেখে বললেন, ঠাণ্ডা লাগছেনি মাওলানা সাব?

হ বইন। ভাল ঠাণ্ডা লাগছে। আমার ইট্টু ঠাণ্ডার বাই আছে। শীতের দিনে ঘন ঘন লাগে।

রাবি দাঁড়িয়ে আছে ভিতর দিককার দরজার সামনে। বাদলা তার কোলে। বোধহয় কোল থেকে একটু পিছলে পড়েছিল, ঝাঁকি (ঝাঁকুনি) দিয়ে রাবি তাকে জায়গা মতন উঠাল। বলল, কুনসুম ঠাণ্ডা লাগলো হুজুর? আমি যহন আপনেরে সমবাত দিতে গেলাম তহনও তো দেকলাম ভাল!

চোখ তুলে রাবির দিকে তাকালেন মান্নান মাওলানা। তহন লাগে নাই। লাগলো এই বাইত্তে আইতে আইতে।

কন কী? কেমতে?

খেতখোলার মাঝখান দিয়ে হাইট্টা আইলাম তো! মনে অয় এর লেইগাই লাগছে। শীতের দিনে খোলা জাগায় বাইর অইলেঐ ঠাণ্ডা লাগে আমার।

দেলোয়ারা বললো, চা খাইবেননি?

মান্নান মাওলানার মুখ উজ্জ্বল হল। খাইতে পারি।

দুদচা না আদাচা?

এনামুল বলল, আদাচাঐ দিতে কন। ঠাণ্ডার মইদ্যে আদাচা খাইলে আরাম পাইবো।

মান্নান মাওলানা বললো, হ এইডা ঠিক কথা।

দেলোয়ারা এনামুলের মুখের দিকে তাকাল। তুমিও ইট্টু খাইবানি বাজান?

এনামুল বলল, না। চা আমি খাই না।

মান্নান মাওলানা বললেন, ক্যা?

চা খাইলে আমার শইল কইষ্যা (কষে) যায়।

তাইলে না খাওনঐ ভাল।

দেলোয়ারা বললেন, আদাচা খাইলে শইল আরও বেশি কষে।

AMARBOI.COM

তারপর রাবির দিকে তাকালেন তিনি। ঐ রাবি, মাওলানা সাবরে এককাপ আদাচা বানাইয়া দে।

দিতাছি।

বাদলাকে কোলে নিয়েই রান্নাঘরের দিকে চলে গেল রাবি।

এবার মান্নান মাওলানার দিকে তাকাল এনামুল। হঠাৎ আমারে দিয়া মজজিদ করাইতে চাইতাছেন ক্যান আপনে?

মান্নান মাওলানা একটু থতমত খেলেন। তবে পলকের জন্য। তারপরই নিজেকে সামলালেন। তুমি ছাড়া আমগো পাড়ায় আর টেকাআলা মানুষ কে আছে? কারে কমু?

যে সব লোকের টাকা আছে তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে টাকাআলা বললে তারা খুশি হয়। এনামুল এই ধরনের লোক। মান্নান মাওলানার কথা শুনে ভিতরে ভিতরে খুবই খুশি হল সে। তবে মুখে তা প্রকাশ করল না। মুখটা হাসি হাসি করে বেশ একটা বিনয়ের ভাব ফোটাল। কী যে কন মাওলানা সাব! আমি আর কয় টেকার মালিক! আমারে কিনতে পারে এমন মানুষ ম্যালা আছে গেরামে।

গেরামে থাকতে পারে, আমগো পাড়ায় নাই।

আছে।

কেডা কও তো!

ধরেন রাজা মিয়া।

রাজা মিয়ার টেকা আছে জানি। তয় তোমার লাহান না।

আরেকজন তো আপনের বাইত্তেঐ আছে। ম্যালা টেকার মালিক।

কেডা, কার কথা কইতাছো?

মন্তাজ।

হ মন্তাজের টেকা আছে। তয় যাই কও, তোমার লাহান না।

দেলোয়ারা বললেন, আপনেরই বা কম টেকা আছেনি!

মান্নান মাওলানা আকাশ থেকে পড়লেন। আমার টেকা! আমি টেকা পামু কই?

আপনের ছোডপোলা থাকে জাপানে। বাড়ির একখান পোলা জাপানে থাকলে আর কিছু লাগেনি? মাসে সব বাদ দিয়া কমপক্ষে লাকটেকা পাডায়। বচ্ছরে বারোলাক। চাইর পাচ বচ্ছর ধইরা আছে। আপনের আর লাগে কী!

মান্নান মাওলানা আবার নাক টানলেন। তুমি যা কইলা এইডা পুরাপুরি সত্য না। মাসে লাকটেকা আজাহারে পাডায় না। অনেক কম পাডায়। মাসে কামাই করে লাক দেড়েক এইডা আমি বুজি। বহুত চালাক পোলা আজাহারে। বাড়িতে অল্প টেকা পাডায়, বাকিডা নিজের কাছে রাখে। আমার এই পোলাডা অন্যপদের। সহাজে কেঐরে বিশ্বাস করে না।

হোনলাম জাপানে বলে কেঐ আর থাকতে পারবো না। ঐ দেশের সরকার বলে ধইরা ধইরা বেবাকতেরে দেশে পাডাইয়া দিবো!

কথাটা শুনে চমকালেন মান্নান মাওলানা। কার কাছে হোনলা?

ফকির বাড়ির মালেকের বউয়ে কইলো। মালেকের এক পোলায় থাকে জাপানে।

AMARBOI.COM

হ, ইব্রাহিম। আজাহার ইব্রাহিম অরা একলগেই গেছিল। ইব্রাহিম পত্র লেকছেনি? পত্রে এই হগল কথা লেকছে?

হ। মালেকের বউয়ে তো কইল।

তাইলে কথা মিছা না।

মান্নান মাওলানা চিন্তিত চোখে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে, আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শীতের বিকাল দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে তখন। রোদ উঠে গেছে গাছপালার মাথায়। একটু পরেই আকাশ থেকে নামতে শুরু করবে কুয়াশা। চকমাঠ, গিরস্ত বাড়ির উঠান পালান ভরে যাবে কুয়াশায়। কুয়াশার উপর কুয়াশার মতো জমবে অন্ধকার। শন শন করে বইবে উত্তরের হাওয়া। পাটাপুতার মতো ভারী একখান রাত নামবে।

মান্নান মাওলানাকে চিন্তিত দেখে এনামুল গলা খাঁকারি দিল। আপনে এত চিন্তায় পড়লেন ক্যা মাওলানা সাব?

মান্নান মাওলানা মুখ ঘুরিয়ে এনামুলের দিকে তাকালো। চিন্তার কথাঐ। আজাহাররে যুদি জাপান থিকা খেদাইয়া দেয় তাইলে বিপদে পইড়া যামু।

কীয়ের বিপদ?

এতবড় সংসার। বড় পোলার বিধবা বউ পোলাপান, আমি, আতাহার, আতাহারের মায়। এতডি মাইনষের সংসার চলবো কেমতে?

সংসার কি আজাহারের টেকায় চলেনি?

তয়!

ক্যা বিলে আপনের এত খেতখোলা, এত ইরি পান, এতডি গরু। আজাহারের টেকা না পাইলেঐ কী! অভাব আছেনি আপনের!

মান্নান মাওলানা হাসলেন।

দেলোয়ারা বললেন, মাওলানা সাবে খালি গলা হুগায়।

এনামুল বলল, বাদ দেন এই হগল কথা। কামের কথা কন।

তখনই বড় একটা কাপে চা এনে মান্নান মাওলানার হাতে দিল রাবি।

দেলোয়ারা বললেন, বাদলা কো?

রাবি লাজুক গলায় বলল, রান্দনঘরে।

কী করে?

বাডিতে ইট্টু চা দিছি। ফুয়াইয়া ফুয়াইয়া খাইতাছে।

দেলোয়ারা একটু রাগলেন। এতডু পোলার চা খাওনের অব্বাস করিচ না।

রাবি কথা বলল না।

চায়ে চুমুক দিয়ে মান্নান মাওলানা বললেন, রাজা মিয়ার টেকা আছে, মন্তাজের টেকা আছে আমি জানি। তাগো দুইজনরে ধরলে দুইজনে টেকা দিয়া, দুইজনে মিল্লা মজজিদ একখান বানাইয়া দিবো। তাগো আমি ধরতে চাই না।

এনামুল বলল, ক্যা?

তারা মানুষ ভাল না। বারোপদের কথা কইবো।

AMARBOI.COM

কী কথা?

তারা তো এমতেঐ আমারে দেকতে পারে না। মনে করবো মজজিদ আমি অন্য মতলবে বানাইতাছি।

মজজিদ আবার অন্য মতলবে বানায় কেমতে? মজজিদ অইলো আল্লার ঘর। মাইনষে নমজ (নামাজ) পড়বো। মজজিদের লগে মতলবের কোনও সমন্দ নাই।

এনামুলের কথা শুনে মান্নান মাওলানা মুগ্ধ হলেন। এইডা তুমি বোজো দেইক্কাঐ তোমারে ধরছি। অন্য কেঐর কাছে যাই নাই।

বোজলাম। তয় খাইগো বাড়ির মজজিদ থাকতে একঐ গেরামে আরেকখান মজজিদ আপনে বানাইতে চাইতাছেন ক্যা?

এই প্রশ্নের উত্তর তৈরিই ছিল মান্নান মাওলানার। বললেন, খাইগো বাড়ির মজজিদটা আমগো পাড়া থিকা অনেক দূরে। অতদূরে গিয়া জামাত ধরন বহুত অসুবিদা। অনেক বুড়া মানুষ আছে এতাহানি হাইট্টা যাইতে পারে না। তাগো চিন্তা কইরাঐ তোমারে ধরছি।

এনামুল কী চিন্তা করল তারপর বলল, খাইগো বাড়ির মজজিদে মাইক আছে না?

আছে?

আয়জান দিলে গেরামের বেবাকতে হোনে না?

হোনে।

নিয়ম আছে বলে এক মজজিদের আয়জান যতদূর পর্যন্ত হুনা যায় অতদূরের মইদ্যে আর কোনও মজজিদ করন যাইবো না?

কে কইছে তোমারে?

আমি হুনছি।

বাজে কথা। ঢাকার টাউনে দেহো না এক মহল্লায় চাইর পাচখান কইরা মজজিদ। একলগে দশখান মজজিদের আয়জান হুনা যায়।

এইডার কারণ আছে।

কী কারণ?

ঢাকার টাউনে মানুষ বেশি। এক মহল্লায় যেই পরিমাণ মানুষ থাকে, একখান মজজিদে অত মানুষ নমজ পড়তে গেলে মজজিদে মানুষ আডে না। এর লেইগা মজজিদ বেশি। তারপরও জুমমার দিন কোনও কোনও মজজিদের সামনের রাস্তায়ও নমজ পড়তে খাড়ইয়া যায় মাইনষে।

এনামুলের কথা শুনে একটু যেন ফাঁপড়ে পড়লেন মান্নান মাওলানা। হাঁ করে এনামুলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এনামুল কী বুঝল কে জানে, বলল, ঠিক আছে আপনে যহন আইছেন আমার কাছে, মজজিদ করন ছোয়াবের কাম, কী রকম টেকা পয়সা লাগবো কন! চিন্তা কইরা দেখি।

মান্নান মাওলানার মুখ আবার উজ্জ্বল হল।

তখনই মোতালেব এসে ঢুকল এই ঘরে। এনামুলের দিকে তাকিয়ে খুবই ফুর্তির গলায় বলল, কুনসুম আইলা মামু?

AMARBOI.COM

মোতালেবকে পাত্তা দিল না এনামুল। অবজ্ঞার চোখে একবার তার দিকে তাকাল, তারপর খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, দোফরে আইছি।

অবজ্ঞাটা মোতালেব বুঝল, বুঝেও গায়ে লাগাল না। লম্বা বেঞ্চটায় বসল। হাসিমুখে বলল, কেমতে আইলা? লনচে?

এনামুল আগের মতোই অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, না।

তয়?

গাড়ি লইয়াছি।

কোনতরি আইলা?

ছিন্নগর তরি।

গাড়ি ছিন্নগরে রাকছো?

না।

তয়?

গায়ে পড়ে এত কথা বলা মোতালেবের পছন্দ করছিল না এনামুল। তবু একটা লোক কথা জিজ্ঞাসা করলে সে কথার জবাব না দিয়ে তো পারে না। তার ওপর লোকটা যদি হয় খুব কাছের আত্মীয়।

বিরক্তি চেপে এনামুল বলল, গাড়ি ফিরত পাডাই দিছি।

কই?

কই আবার? ঢাকা।

বিরক্তির ভাব এবার পরিষ্কার ফুটল এনামুলের গলায়। মোতালেব পাত্তা দিল না। বলল, তোমারে নামাইয়া দিয়া গাড়ি ঢাকা গেছে গা?

হ।

তয় ছিন্নগর থিকা আইলা কেমতে? হাইট্টা?

না রিকশায় আইছি।

ও তাইলে তুমিঐ আইছো রিকশা কইরা? গেরামে প্রথম রিকশা আইলো তোমারে লইয়া? ভাল, ভাল।

তারপর যেন মান্নান মাওলানার হাতে চায়ের কাপ দেখতে পেল মোতালেব। দেখে রাবির দিকে তাকাল। ঐ রাবি, চা আছেনি?

তার ছেলের গায়ে হাত তুলেছে মোতালেব, ওই ঘটনার পর থেকে দুইচক্ষে মোতালেবকে দেখতে পারে না রাবি। দেখলেই মুখ আপনা আপনি বেঁকা হয়ে যায়। এই ঘরে মোতালেবকে ঢুকতে দেখেই হয়েছিল। এখন চায়ের কথা বলায় আরও হল। মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, না।

এককাপ বানায় দে আমারে।

আমি অহন চা বানাইতে পারুম না। আমার কাম আছে।

হয়তো মোতালেবের কথা শুনে এনামুল নয়তো দেলোয়ারা, এমন কি মান্নান মাওলানাও রাবিকে বলতে পারেন, দে এককাপ চা বানাইয়া। এইসব মানুষের কথা রাবি না রেখে পারবে না! তারচেয়ে এখান থেকে সরে যাওয়াই ভাল। চোখের আড়ালে

AMARBOI.COM

থাকলে তাকে ডেকে মোতালেবের জন্য চা বানাতে কেউ বলবে না। মোতালেব এত দামী লোক না।

এসব ভেবে রাবি আর দাঁড়াল না, পিছন দিককার দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মোতালেব তীক্ষ্ণচোখে রাবির চলে যাওয়া দেখল তারপর এনামুলের দিকে মন দিল।

এনামুল আর একবারও তাকায়নি মোতালেবের দিকে। সে তাকিয়ে আছে মান্নান মাওলানার দিকে। একহাতে গলার চেন নাড়াচাড়া করছে।

শব্দ করে চায়ে শেষ চুমুক দিলেন মান্নান মাওলানা। এই শব্দে বরাবরে মতো বিরক্ত হলেন দেলোয়ারা। নিজের অজান্তেই ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর। বিরক্তি কাটাবার জন্যই কিনা কে জানে, একফাঁকে চশমা খুলে শাড়ির আঁচলে মুছতে লাগলেন।

এনামুল বলল, তয় কোন জাগায় করতে কন মজজিদ?

কাপটা পায়ের কাছে নামিয়ে রাখলেন মান্নান মাওলানা। কথা বলতে যাবেন তার আগেই গভীর আগ্রহের গলায় মোতালেব বলল, কীয়ের মজজিদ?

এনামুল বিরক্ত হয়ে বলল, মজজিদ আবার কীয়ের অয়?

এনামুলের বিরক্তিটা বুঝলেন মান্নান মাওলানা। মোতালেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, চুপ কইরা বহো মিয়া, বেশি পাচাইল পাইরো না। এনামুল সাবে কী কয় বইয়া বইয়া হোনো।

এনামুলকে সাহেব বলছেন মান্নান মাওলানা। শুনে খুবই খুশি হল এনামুল। মোতালেবের ওপরকার বিরক্তি কেটে গেল। হাসিমুখে বলল, কন মাওলানা সাব কোনহানে করবেন মজজিদ?

তোমগো ছাড়া বাইত্তে।

লগে লগে দেলোয়ারার দিকে তাকাল এনামুল। হাসল। ছাড়া বাড়িডা আমগো না। আমার মা খালার।

মোতালেব আগ বাড়িয়ে বলল, মা খালার বাড়ি আর তোমগো বাড়ি তো মিয়া একঐ।

না এক না।

মোতালেব তারপর দেলোয়ারার দিকে তাকাল। বুজি কী কয়?

দেলোয়ারা নরম গলায় বললেন, আমিও হেইডাঐ কই।

তারপর চশমা চোখে পরলেন।

মান্নান মাওলানা বললেন, মজজিদের ব্যাপার তো। মুখ দিয়া খালি কইলেঐ অইবো না। হয় মা খালার কাছ থিকা বাড়িডা কিন্না নিতে অইবো এনামুলের, নাইলে দেলোয়ারারা দুই বইনে মিল্লা মজজিদের নামে বাড়িডা লেইক্কা দিবো।

এনামুল বলল, তাইলে তো মজজিদ আমার একলা অইলো না। আমার মা খালায় দিলো জাগা আমি উডাইলাম বিল্ডিং।

মোতালেব বলল, হ। তাতে অসুবিধা কী?

এবার মোতালেবকে ছোটখাট একটা ধমক দিল এনামুল। এই মিয়া আপনে চুপ করেন তো। কথার মইদ্যে কথা কইয়েন না।

ANWARBOI.COM

মোতালেব একটু থতমত খেল কিন্তু এনামুল তা গ্রাহ্য করল না। মান্নান মাওলানার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার একখান নীতি আছে মাওলানা সাব। বেবাক কামেঐ নীতিডা আমি মাইন্না চলি।

মান্নান মাওলানা সামান্য গলা খাঁকারি দিলেন। কী নীতি?

যেই কামঐ করি, একলা করতে চাই। নিজের ক্ষমতায় করতে চাই।

এইডাঐত্তো ভাল।

যেইডা করুম, একলা করুম। অন্যরে লইয়া করুম না। ছোড করি আর বড় করি, আমি একলা করুম। নাম অউ- বদলাম অউক আমার একলা অইবো। নিজের কামে অন্য কেঐরে জড়ামু না।

দেলোয়ারা নরম গলায় বললেন, মা খালারা কি তোমার পরনি?

খালার দিকে তাকিয়ে হাসল এনামুল। কথাডা কইলাম তা না আম্মা। কথাডা কইলাম অন্য। একখান মজজিদ যহন আমি করুমঐ, একলাঐ করুম। আপনেগো ঐ ছাড়া বাড়িডা যুদি না থাকতো তারবাদেও যুদি গেরামে মজজিদ আমি করতে চাইতাম, কেমতে করতাম? কোনও একখান বাড়ি নাইলে জাগা কিন্না, মাডি উডাইয়া, বাড়ি বাইন্দা তারবাদে করতাম না?

হ তাতো করতাঐ।

অহন করলেও অমতেঐ করুম।

জাগা কিন্না?

হ।

জাগা পাইবা কই?

এনামুল হাসল। জাগা তো আছেঐ।

কোনহানে?

আপনেগো ছাড়াবাড়ি।

AMARBOI.COM

অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল মোতালেব। আর পারল না। বলল, মা খালার কাছ থিকা বাড়ি কিন্না লইবা মামু?

মোতালেবের কথায় এবার আর রাগল না এনামুল। হাসল। হ। লেইজ্জ (ন্যায্য) দাম যা অয় তা দিয়াঐ কিনুম। তারবাদে মজজিদ করুম।

আবার দেলোয়ারার দিকে তাকাল এনামুল। কী আম্মা, বাড়িডা বেচবেন না আমার কাছে?

দেলোয়ারা বললেন, আমার কিছু কওয়ার নাই। তোমার মায় যা কইবো তাই অইবো।

মায় আমার কথা হালাইবো না।

হেইডা আমি জানি। তয় তোমারে আমি আরেকখান কথা কই বাজান, তোমার মায় দেউক না দেউক আমার অংশ আমি তোমারে দিয়া দিলাম।

একথায় এনামুলের চেয়ে মান্নান মাওলানা বেশি মুগ্ধ হলেন। মোতালেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেকছো মিয়া, খালা কারে কয়! খালা অইলে এমুনঐ অইতে অয়। মুখের কথায় লাকটেকার সমপিত্তি বইনপোরে দিয়া দিল।

মোতালেব কথা বলবার আগেই এনামুল বলল, আমার মায়ও এই কথাই কইবো আমারে।

এবার মোতালেব আর চুপ করে থাকতে পারল না। বেশ একটা গর্ব নিয়ে বলল, এনামুলের মা খালারা কোন বাড়ির মাইয়া হেইডা দেকতে অইবো না? কাগো (কাদের) বইন হেইডা দেকতে অইবো না? আমার বইনতো মিয়া, বুজলেন না!

মোতালেবের কথা শুনে অন্যদিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন মান্নান মাওলানা।

এনামুল বলল, মজজিদ করনের লেইগা ঐ ছাড়াবাড়িডা সব থিকা ভাল।

মান্নান মাওলানা বললেন, হ বড় সড়কের এক্কেরে লগে। সড়ক দিয়া হাজার হাজার মানুষ যাইবো আর চাইয়া চাইয়া মজজিদ দেকবো। দেইক্কা মাইনষেরে জিগাইবো, মেদিনীমণ্ডল গেরামে এত সোন্দর মজজিদখান কেডা করলো? মাইনষে কইবো, এনামুল সাবে করছে। মাইনষের মুখে মুখে তোমার নাম ছড়াইয়া যাইবো।

মোতালেব বলল, তয় ঐ বাড়ি থিকা কইলাম সড়ক দেড় দুইকানি অইবো।

অইলে কী অইছে, রাস্তা আছে না?

আছে, তয় ভাল রাস্তা না। আইল (আলপথ)।

এনামুল বলল, ঐ আইল থাকবো না। বড় সড়ক থিকা মজজিদ তরি ঐ আইল বাইন্দা আমি হালট (সড়ক) বানাইয়া দিমু। সড়ক তার বাড়ির লেবেল অইবো এক। হালটের লেবেল অইবো এক।

মোতালেব বলল, তাইলে তো মাডি উডান লাগবো?

উডামু।

কই থিকা?

ছাড়াবাড়ির পশ্চিমে পুকঐর আছে না! ঐ পুকঐর থিকা মাডি উডাইয়া বাড়িডারেও ঠিক মতন বান্দন লাগবো, হালটও বান্দন লাগবো।

মান্নান মাওলানা বললেন, হ এই হগল কাম আগে করন লাগবো।

এনামুল হাসিমুখে বলল, অইয়া যাইবো। চিন্তা কইরেন না। কাইল ঢাকা যামু আমি। গিয়া মার লগে কথা কমু। আম্মার লগে কথা তো অইয়াঐ গেল। কহেক (কয়েক) দিনের মইদ্যে বাড়িডা আমার নামে রেস্টারি (রেজিষ্ট্রি) কইরা হালামু। তারপর মাডির কাম লাগাইয়া দিমু। বাড়ি আর হালট বান্দা অইলে বিল্ডিংয়ের কাম ধরুম। আইচ্ছা হোনেন মাওলানা সাব, ইট সিমিটি (সিমেন্ট) রড এইসব আনুম কেমতে? বাইষ্যাকাল অইলে তো নৌকায় কইরা আনন যাইতো।

অহন আনবা টেরাকে।

টেরাক আইবো?

আইবো না ক্যা? ছিন্নগর তরি তো আহেঐ। আইজ রিকশা আইছে গেরামে। তোমার কাম কাইজ শুরু করতে মাস দেড়মাস লাগবো না?

হ তা তো লাগবোঐ।

হেতদিনে মেদিনীমণ্ডল তরি টেরাক আইয়া পড়বো।

তয় তো কোনও চিন্তাঐ নাই। টেরাক ভইরা মাল পাডামু। সামনের বাইষ্যার আগেঐ মজজিদ অইয়া যাইবো।

AMARBOI.COM

একটু থেমে এনামুল বলল, সবমিল্লা কত টেকা লাগতে পারে মাওলানা সাব কইলেন না?

চাইর পাচলাক টেকা।

হ আমিও এমনুঐ আন্তাজ করছি। পাচলাক টেকা আমি খরচা করুম।

এত সহজে এতদিনকার স্বপ্ন সত্য হবে ভাবেননি মান্নান মাওলানা। উত্তেজনায় ফেটে পড়তে চাইছিলেন তিনি। তবু কায়দা করে চেপে রাখছিলেন উত্তেজনা। এখন সবকিছু একেবারে পাকা হয়ে যাওয়ার পর ধীর শান্ত গলায় বললেন, আমার যে আরেকখান কথা আছে।

এনামুল হাসল। কন। যা কথা আছে কইয়া হালান।

মজজিদের ইমাম হমু আমি।

হইবেন। আমার আপিত্তি নাই। আপনে যহন আছেন অন্য ইমাম আনুম ক্যা? অন্যরে যেই মায়না দিমু আপনেও ঐডাই নিবেন।

অনেকক্ষণ পর এই প্রথম কথা বললেন দেলোয়ারা। মাওলানা সাবে তো বলে মায়না নিবো না!

একথা শুনে বেশ একটা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন মান্নান মাওলানা। বেতনের কথা শুনে আনন্দিত হয়েছিলেন। মসজিদের ইমামতি পাওয়া মানে গ্রামের মাতাব্বরি সর্দারি সব পাওয়া। বিচার সালিশের ভার সব পড়বে তার ওপর। তিনি যা বলবেন তাই হবে। সমাজে মসজিদের ইমামের বিরাট দাম। ইমাম সাহেবের কথার উপর দিয়া কেউ কোনও কথা বলে না। ইমাম সাহেব যা বলবেন তাই হবে। ইমামের মিথ্যাও সত্যর চেয়ে জোরাল। এই ক্ষমতার লগে যদি মাসে মাসে পাওয়া যায় বেতন তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

কিন্তু বেতনটা যে দেলোয়ারার কারণে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে! এজন্য অবশ্য মান্নান মাওলানাই দায়ী। দেলোয়ারার কাছে মসজিদের কথা বলতে এসে বেতন না নেওয়ার কথা তিনি নিজ মুখেই বলেছিলেন! ইস আগ বাড়িয়ে কথা বলে নিজের কতবড় সর্বনাশ যে করে বসে আছেন মান্নান মাওলানা!

সর্বনাশের হাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে দিল এনামুল। বলল, না না, মায়না নিবো না ক্যা? মায়না ছাড়া ইমাম আমি রাখুম ক্যা? লাক লাকটেকা খরচা কইরা মজজিদ বানাইতে পারুম আর ইমাম রাখুম মাগনা, এইডা অয় না। লেইজ্জ মায়না আপনে পাইবেন মাওলানা সাব, চিন্তা কইরেন না।

মান্নান মাওলানা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। মুখে অমায়িক হাসি ফুটল তাঁর। ঐডা লইয়া আমি চিন্তা করি না। আমি জানি তুমি আমারে ঠকাইবা না। তুমি মানুষ ঠকাও না। মানুষ ঠকাইলে এতঅল্প বস্থে আল্লায় তোমারে এতটেকা দিতো না।

মান্নান মাওলানার কথা শুনে মুগ্ধ হল এনামুল। সে আর কোনও কথা বলল না। খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাইরে তখন শীতের বিকাল প্রায় শেষ। গাছপালার মাথায় জমতে শুরু করেছে কুয়াশা। ঘরের ভিতর কুয়াশার মতো করে জমছে অন্ধকার। হঠাৎই যেন এই পরিবেশটা

AMARBOI.COM

খেয়াল করলেন মান্নান মাওলানা। ব্যস্তভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। তয় যাই অহন। নমজের সময় অইয়া গেল।

এনামুল বলল, আইচ্ছা যান। ফাইনাল কথা তো অইয়াঐ গেল। দশ পোনরো দিনের মইদ্যে আমি আবার বাইত্তে আইতাছি। আইয়া মাডির কাম শুরু কইরা দিমু। আপনে ধইরা নেন মজজিদ আপনের অইয়া গেছে।

হেইডা আমি জানি।

তয় আমারে আপনে দোয়া কইরেন। কামডা যেন ঠিকঠাক মতন করতে পারি।

গদগদ ভঙ্গিতে এনামুলের মাথায় হাত রাখলেন মান্নান মাওলানা। খালি দোয়া করুমনি তোমারে! জান পরাণ দিয়া দোয়া করুম। ধর্মের কতবড় একখান কাম যে তুমি করলা, আখেরের কতবড় কাম যে করলা এইডা অহন বোজবা না। এইডা বোজবা পরে।

মান্নান মাওলানা বেরিয়ে গেলেন। দেলোয়ারাও উঠলেন। দেখে এনামুল বলল, আপনে উঠলেন ক্যা আম্মা?

সন্ধ্যা অইয়া গেছে। হারিকেন ধরাই।

রাবিরে কন, রাবি ধরাইবো নে। আপনে বহেন।

দেলোয়ারা বসলেন। বসে রাবিকে ডাকলেন। ঐ রাবি, হারিকেন ধরা।

রান্নাঘরের দিক থেকে সাড়া দিল রাবি। ধরাইআছি।

এবার এনামুল একটু লড়েচেড়ে বসল। দেলোয়ারার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কী কন আম্মা, মজজিদের কাম তাইলে শুরু কইরা দেই।

দেলোয়ারা অমায়িক গলায় বললেন, দেও।

তার আগে অন্য কামডি যে করতে অয়।

কী কাম?

ছাড়াবাড়িডা রেস্টারি।

কইরা হালাও।

আপনে তাইলে আমার লগে ঢাকা লন। মার লগে কথা কইয়া বাড়িডা আমার নামে রেস্টারি কইরা দেন। দামের টেকা লগে লগেঐ দিয়া দিমুনে। দিয়া ব্যাংকে একাউন্ট কইরা দিমুনে। টেকা ব্যাংকে রাইক্কা দিয়েন।

দেলোয়ারা নরম গলায় বললেন, তুমি যা ভাল বোজো করো।

এনামুল বলল, বাড়ির দলিল পরচা কো?

তোমার মার কাছে।

তাইলে ঠিক আছে। কাইলঐ আপনে আমার লগে লন।

লও।

অনেকক্ষণ পর এবার কথা বলল মোতালেব। হ যান বুজি। ভালকামে দেরি করন ঠিক না।

একটু থামল মোতালেব। তারপর এনামুলের মুখের দিকে তাকাল। তোমারে একখান কথা কইতে চাই মামু।

AMARBOI.COM

এনামুল ভুরু কুঁচকে বলল, কী?

এতবড় একখান কাম করতাছো তুমি, দেশ গেরামে কত নাম অইবো তোমার। আল্লায় টেকা দিচ্ছে তোমারে, হেই টেকা তুমি আল্লার কামে লাগাইতাছো। তয় আমরা কিছু আশা করতে পারি না তোমার কাছে? আমরা তো পর না! তোমগো আপনা মানুষঐ। আপনা মানুষগো ইট্টু দেকবা না?

মুখ তুলে মোতালেবের দিকে তাকাল এনামুল। কথাডা বোজতে পারলাম না। খোলসা কইরা কন।

মোতালেব হাত কচলাতে কচলাতে বলল, মজজিদ বানাইবা, কত কাম মজজিদের! মাইট্টাল দিয়া মাডি কাইট্টা বাড়ি বানবা, হালট বানবা। বড় সড়কে আইয়া টেরাক থামবো, টেরাক থিকা ইটা নামান লাগবো, রড সিমিট নামান লাগবো। তারবাদে বাড়ি তড়ি আনন লাগবো। এই হগল কামের দেখভালের লেইগা একজন মানুষ লাগবো না?

মোতালেবের উদ্দেশ্য ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে এনামুল। বুঝেও না বোঝার ভান করল। সরল গলায় বলল, হ তা তো লাগবোঐ।

ঐ কামডা আমারে দেও। দরকার অইলে কনটাক দিয়া দেও। বেবাক কাম ঠিক মতন কইরা দেই। তোমার কোনও চিন্তা থাকবো না।

এনামুল কথা বলবার আগেই দেলোয়ারা গম্ভীর গলায় বললেন, না তরে কোনও কাম দেওন যাইবো না।

মোতালেব থতমত খেল। ক্যা?

তুই আইজ কাইল বহুত বড় বড়কথা কচ।

কবে আপনের লগে বড়কথা কইলাম আমি?

হারিকেন হাতে রাবি এসে দাঁড়াল ভিতর দিককার দরজার সামনে। তার পিছনে বাদলা। হারিকেনটা দুই কামরার মাঝামাঝি মাটিতে রাখল রাবি। ঘরের ভিতর জমে ওঠা অন্ধকার হারিকেনের আলোয় কেটে গেল।

রাবি এবং বাদলার দিকে একবার তাকালেন দেলোয়ারা, তারপর বললেন, কয়দিন আগে বাদলারে তুই মারছস। আমি হেই কথা জিগাইছি দেইক্কা আমার লগে কুইদ্দা (রেগে ওঠা অর্থে) উঠছস। এনামুলের কথা কওনের লগে লগে কইছস আমি তরে এনামুলের ডর দেহাইনি!

বাদলার গায়ে হাত তোলার কথা উঠেছে দেখে রাবি ভাবল এই তো সুযোগ। এই সুযোগে এনামুল মামার সামনে মোতালেবকে যতটা নাকাল করা যায় করবে সে।

দেলোয়ারার দিকে তাকিয়ে রাবি বলল, বুজি, আসল কথাডিই তো কইতাছেন না আপনে। হেয় যে বাদলারে কইছিলো আমগো তো বাইত থিকা উডাইয়া দিবোঐ দরকার অইলে আপনেরে শুদ্দা উডাইয়া দিবো।

একথা শুনে মুখ চুন হয়ে গেল মোতালেবের। কোনও রকমে সে বলল, না এই কথা আমি কই নাই। কীরে বাদলা, কইছি?

বাদলা বলল, হ কইছেন।

বাদলাও যে এরকম সাক্ষী দিবে ভাবেনি মোতালেব। সে একেবারে বেকুব হয়ে গেল। মুখে আর কথা জুটল না।

AMARBOI.COM

এনামুল ততক্ষণে বেশ রেগেছে। রাগলে নাকের পাটা ফুলে যায় তার। এখনও ফুলল। গম্ভীর গলায় বলল, আমি আগেও দুই চাইরবার হুনছি আমগো ঘরে যারা থাকে তাগ লগে খারাপ ব্যবহার করেন আপনে। উল্টাপাল্টা কথা কন। আমার মা খালারেও বলে বকাবকি করেন। এত সাহস আপনে পান কই? আমরা কি আপনের হাতের ফাক দিয়া পইড়া যাই? বিপদে পড়লে তো পয়লা দৌড়াইয়া যান ঢাকায়, আমগো বাসায়। টেকা দিয়া সাহাইয্য করলে আপনেরে আমিঐ করি। মাইয়ার চিকিৎসা করাইবেন কইয়া তিন চাইর মাস আগেও তো পাচ হাজার টেকা আনছেন আমার কাছ থিকা।

একথা শুনে ঝট করে এনামুলের দিকে তাকালেন দেলোয়ারা। কও কী? পাচ হাজার টেকা আনছে? কবে আনলো? তুমি দিহি আমারে কিছু কইলা না?

কই নাই এমতেঐ। মাইনষের উপকার কইরা সেই কথা না কওনঐ ভাল।

মাইয়ার চিকিৎসা কইলাম ও করায় নাই।

তাইলে কী করছে টেকা আইন্না?

রাবি বলল, কী আর করবো? খাইছে। পরের টেকা বইয়া বইয়া খাইতে তো বহুত মজা।

মোতালেব তখন মাথা নিচু করে বসে আছে। যেন কারও দিকে তাকাবার মুখ আর নাই তার।

দেলোয়ারা আবার মোতালেবের দিকে তাকালেন। এত কিছুর পরও আমগো লগে এত বড় বড়কথা কেমতে কচ তুই! আরে তর তো থাকনের কাম আমগো চাকর বাকরের লাহান।

এনামুল শ্লেষের গলায় বলল, কাম কাইজ যা চায় তাও তো চাকর বাকরের কামঐ। কামলার কাম।

তারপর মোতালেবের দিকে তাকিয়ে বলল, ঐ মিয়া আমগো বাড়ির কামের মাইনষের লগে এত বড় বড়কথা কইয়া আমগো কাছে কাম চাইতে আহেন, সাহাইয্য চাইতে আহেন, শরম করে না আপনের? তহন বড়কথা থাকে কই?

মোতালেব মাথা তুলল না, কথা বলল না।

এনামুল বলল, মজজিদের কাম কয়দিনের মইদ্যেঐ শুরু করুম আমি। কনটাক আপনেরে দিমু না। ঐ আশা কইরা লাভ নাই। লেবারগ সর্দারিডা ইচ্ছা করলে আপনেরে আমি দিতে পারি। রোজ দরে পয়সা পাইবেন। তয় হেইডাও ফাইনাল না। মাওলানা সাবের লগে কথা কইয়া লই। দেহি হেয় কী কয়।

এবার মুখ তুলল মোতালেব। কাতর গলায় বলল, তুমি কইলে আমি গিয়া মাওলানা সাবরে ধরি।

না আপনের ধরনের কাম নাই। তয় আমার মনে অয় লেবার সর্দারিও আপনে পাইবেন না। মাওলানা সাবে না করবো। এই হগল তদারকি হেয় নিজেঐ করবো।

মোতালেব বুঝে গেল নানা রকম কায়দায় অপমান যা করার করা হয়েছে তাকে। কাজের লোভের মুলাটা নাকের আগায় ঝুলিয়ে দিয়েও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মসজিদের কাজে তার আর কোনও আশা নাই।

ব্যাজার মুখ করে উঠে দাড়াল সে। কারও দিকে না তাকিয়ে দুয়ারের দিকে পা বাড়াল।

AMARBOI.COM

এনামুল বলল, যান গা নি?

হ। কী করুম আর।

কামডা পাইলে কি এমতে যাইতেন গা?

মোতালেব কথা বলল না।

এনামুল বলল, ধরেন লেবার সর্দারির কাম আপনেরে আমি দিয়া দিলাম।

লগে লগে মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল মোতালেবের। তুমি তো ইচ্ছা করলে দিতে পারোঐ। মাওলানা সাবরে লাগেনি!

না তা লাগে না। কাম আমার, টেকা আমার। আমার যারে ইচ্ছা তারে আমি দিমু। আপনেরে দিয়া দিলাম।

আলহামদুলিল্লাহ।

তয় আমার কহেকখান কথা আপনের মাইন্না চলতে অইবো।

চলুম।

আমার মা খালার সামনে, আমগো বাইত্তে যারা থাকে, মতলা রাবি বাদলা অগো সামনে সিনা টান কইরা হাটতে পারবেন না। এমুনভাবে হাটবেন, মালিকের সামনে চাকররা যেমতে হাটে। কথা কইবেন এমুনভাবে, আপনের গলার আওজে য্যান বুজা যায়, অরা মালিক আর আপনে অইলেন চাকর। কোনও রকমের হামতাম (আস্ফালন) করলে লেবার সর্দারি আপনের থাকবো না। ঠিক আছে?

মোতালেব বিনীত গলায় বলল, ঠিক আছে।

তয় যান অহন।

মোতালেব মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল।

মোতালেব বেরিয়ে যেতেই দেলোয়ারার দিকে তাকিয়ে হাসল এনামুল। কী কন আম্মা! উচিত শিক্ষা দিছি না?

দেলোয়ারাও হাসলেন। হ একদম উচিত শিক্ষা দিছো বাজান। জিন্দেগানিতে আর বড়কথা কইতে পারবো না।

রাবি বলল, কথা যাঐ কইছেন না কইছেন, কামডা তো ঠিকঐ দিলেন মামা!

এনামুল আবার হাসল। কেন যে দিছি হেইডা বোজলে তুই আর মতলার বউ হইতি না। তুই হইতি আমার খালা। খালায় যা বোজনের ঠিকঐ বোজছে।

গভীর রাতে মাকে টেনে তুলল তছি পাগলনি। ওমা, ওডো তো। ওডো।

ছাপড়া ঘরের ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। এই অন্ধকারে পাশাপাশি শুয়েছিল তিনজন মানুষ। তছি তছির মা আর আবদুলের ছোটছেলে বারেক। বারেক একেবারে দাদী

AMARBOI.COM

ন্যাওটা। দিনেরবেলা যেখানে থাকুক না থাকুক সন্ধ্যা হলে দাদীর আঁচল আর ছাড়ে না। রাতের খাওয়া দাওয়া সব দাদীর হাতে। পেশাব পায়খানা ধরলে তাও করাতে হবে দাদীর। আর ঘুম তো আছেই। দাদীর বিছানায় শুয়ে তার বুকের কাছে মুখ গুঁজে না দিলে ঘুমই হয় না বারেকের।

এদিকে সন্ধ্যার পর থেকে নাতিটা তার লগে লগে থাকে বলে, দিনের আলো নিভে যাওয়ার পর থেকে তছির মাও বারেকের জন্য আকুল হয়ে যায়। বারেককে এক পলক না দেখলে অস্থির লাগে। বারেক একরাত কাছে না থাকলে ঘুম হয় না। বাড়ির পুবের ভিটার ছাপড়াঘরের মেঝেতে একপাশে পাগল মেয়ে অন্যপাশে নাতি না থাকলে অসহায় লাগে। মনে হয় কী যেন নাই, কী যেন নাই।

গিরস্তের সংসারে বউ শাশুড়ির ঝগড়া তো আছেই। কোনও কোনওদিন আবদুলের বউ আর তার শাশুড়ির ঝগড়া হলে, শাশুড়িকে জব্দ করবার জন্য রাতেরবেলা ছোট ছেলেটাকে নিজের কাছে আটকে রাখে আবদুলের বউ। মায়ের হাতে ভাত পানি ভয়ে ভয়ে খায় ছেলে কিন্তু শোয়ার সময় লাগে গণ্ডগোল। ছেলে কিছুতেই অন্য ভাই বোনের লগে মা বাবার পাশে শোবে না। প্রথমে ঘ্যান ঘ্যান করবে, আমি দাদীর কাছে যামু। ওমা, আমি দাদীর কাছে যামু। তারপর আরম্ভ করবে কান্না। শাশুড়ির ওপরকার জেদ তখন ছেলের ওপর ঝাড়ে আবদুলের বউ। গুমগুম করে কিল মারে ছেলের পিঠে। দাঁতে দাঁত চেপে বকাবাজি করে ছেলেকে। চুপ কর গোলামের পো। চুপ কর। দাদীর কাছে যাইবো! তুই কি তর দাদীর পেডে পয়দা অইছস না আমার পেডে! দাদীর কাছে হুইলে ঘুম আহে আমার কাছে আইবো না ক্যা?

ছেলে তারপর গুঙিয়ে গুঙিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদে। মারের ভয়ে আর কথা বলে না। রাত গভীর হয়, ছেলের আর ঘুম আসে না। মা বাবা ভাই বোনের পাশে শুয়ে উসপিস উসপিস করে সে, এপাশ ওপাশ করে আর থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

ওদিকে তছির পাশে শুয়ে তার মায়েরও একই অবস্থা। ঘুম আসে না। কী রকম যে ছটফট ছটফট করে! মায়ের এই অবস্থা দেখে তছি পাগলনিরও মন খারাপ হয়। মাকে বুঝ দেওয়ার জন্য বলে, তুমি এমুন কইরো না মা। আট্টু সবুর করো, আট্টু রাইত অউক বারেকরে আমি আইন্না দিমুনে।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কেমতে আনবি? ঐ গোলামের ঝিয়ে কি পোলাডারে ছাড়বো?

ছাড়বো। তুমি দেইক্কোনে।

গভীর রাতে তছি তারপর ছাপড়াঘরের ঝাপ খুলে বেরয়। পা টিপে টিপে এসে দাঁড়ায় আবদুলের ঘরের সামনে। নরম হাতে বেড়ায় টোকা দিয়ে ফিসফিস করে ডাকে, বারেক, ও বারেক ঘুমাইছস বাজান, ঘুমাইছস?

বারেকও তার দাদী আর পাগল ফুফুর মতো জেগে থাকে। ফুফুর গলা শুনেই বিছানা থেকে মাথা তুলে ঘরের ভিতরটা দেখে। ফুফুর মতন ফিসফিস করে বলে, না ঘুমাই নাই ফুবু।

তাইলে বাইর অ। কেঐ যেন উদিস না পায়।

AMARBOI.COM

আইচ্ছা।

ছেলে তারপর পা টিপে টিপে ঝাপের কাছে যায়। যেন আওয়াজ না হয় এমন ভঙ্গিতে ঝাপ একটুখানি ফাঁক করে নিজের শিশু শরীর সেই ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দেয়। বাইরে বের হবার লগে লগে পাগল ফুফু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। আঁচলে জড়িয়ে বুকে করে নিয়ে যায় নিজেদের ঘরের দিকে। দাদীর বুকে নাতিকে পৌঁছে দেওয়ার পর যেন শান্তি তছির।

রাত দুপুরে পাগল ননদিনী এসে যে বেড়ায় টোকা দিয়ে তার ছেলেকে ডাকছে, ছেলে যে ঝাপ গলিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এসবই টের পায় আবদুলের বউ। তখন সে আর কোনও কথা বলে না। মানুষের জন্য মানুষের এই টান, মায়া মমতার এই খেলাটা তার ভাল লাগে। শাশুড়ির লগে ঝগড়াঝাটির কথা ভুলে যায়। ছেলে বেরিয়ে গেছে বলে আলগা হয়ে আছে ঝাপ। উঠে যত্ন করে সেই ঝাপ লাগায় সে। তারপর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে।

নাতিকে রাতেরবেলা নিজের কাছে রাখতে রাখতে তছির মায়ের এমন এক অভ্যাস হয়েছে, ঘুমিয়ে থাকলে বারেক ডাকলে তো মনে হয়ই বারেক ডাকছে, তছি ডাকলেও মনে হয় বারেকই ডাকছে। আজ রাতেও তাই হল। তছির ডাকে ধরফর করে উঠল সে! কিন্তু জড়িয়ে ধরল বারেককে। কী অইছে মিয়াভাই? ডাক পারো ক্যা? পেশাব করবা?

বারেক ঘুমে কাদা। সে কোনও সাড়া দিল না। অন্যপাশ থেকে তছি বলল, বারেকে তোমারে ডাক দেয় নাই। আমি ডাকদিছি।

ক্যা?

কথার কাম আছে।

তছির মা হাই তুলল। রাইত দোফরে কীয়ের কথা? বিয়ানে কইচ।

না বিয়ানে কওন যাইবো না। অহনঐ কমু!

ইস কুয়ারা।

কথাটা বলেই ভয় পেলে গেল তছির মা। রাত দুপুরে পাগল মেয়ের লগে রাগ করা ঠিক হবে না। কী না কী করে ফেলে। হয়তো চিইক্কর (চিৎকার) শুরু করল, হয়তো একহাতে মুঠি করে ধরল মায়ের চুল। হয়তো কিল থাবড় মারল মাকে, খামছি দিয়ে ছাল চামড়া তুলে ফেলল।

ভয়ে ভয়ে তছির মা তারপর বলল, আইচ্ছা ক।

এক বেডা আমারে নষ্ট করতে চাইছিলো।

কথাটা শুনে আঁতকে উঠল তছির মা। চোখে লেগে থাকা ঘুম পলকে উধাও হয়ে গেল। চাপা ভয়ার্ত গলায় বলল, কচ কী? কবে?

আইজঐ।

কোনহানে? সীতারামপুর। মুরলিভাজা কিনতে গিয়া?

না। আমি সীতারামপুর যাই নাই। আমি গেছিলাম কোলাপাড়া।

কার লগে গেছিলি?

ঘটনা খুলে বলল তছি। রুস্তম রিকশাআলা কীভাবে তাকে রিকশায় তুলেছে,

AMARBOI.COM

কীভাবে কোলাপাড়া বাজার থেকে কিনে এনেছে মুরুলিভাজা, কীভাবে নিয়ে গেছে খালপারের নির্জন ছাড়াবাড়িতে, কীভাবে দখল নিতে চেয়েছে তছির শরীরে আর কীভাবে তছি তাকে গামছার ফাঁসে আটকে শায়েস্তা করেছে, সব বলল। শেষ পর্যন্ত লোকটার যে চেতন ছিল না, বিঘত পরিমাণ জিভ বেরিয়ে এসেছিল মুখ থেকে এবং তছি তাকে লাথথি মেরে ফেলে দিয়েছে খালের পানিতে এসব শুনে গলা শুকিয়ে গেল তছির মায়ের। ঢোক গিলে কোনও রকম সে বলল, বেডায় মইরা যায় নাই তো? মাইরা হালাচ নাই তো বেডারে?

তছি নির্বিকার গলায় বলল, কইতে পারি না। আমার তহন কান্দন আইছিলো। কানতে কানতে সড়কে উটছি। দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাইত্তে আইছি। বাইত্তে আইয়াঐ দেকলা না কেথা মুড়াদা (কাঁথা মুড়ি দিয়ে) হুইয়া পড়লাম। তুমি ভাত খাইতে ডাকলা, উটলাম না। দোফইরা ভাত খাই নাই, রাইতকার ভাত খাই নাই। হুইয়াঐ রইলাম। কোন মরার মুরলি যে গোলামের পোয় খাওয়াইলো, আমার দিহি আর খিদাঐ লাগে না। আর এই যে এতক্ষুণ হুইয়া রইলাম, ঘুম কইলাম আহে নাই আমার। এমতেঐ হুইয়া রইলাম।

তছির মা বলল, আমি এই হগল চিন্তা করতাছি না। আমি চিন্তা করতাছি অন্যকথা।

কী কথা?

বেডা যুদি মইরা গিয়া থাকে তাইলে তো সব্বনাশ অইবো।

কীয়ের সব্বনাশ?

বাইত্তে দারগা পুলিশ আইবো। দারগা পুলিশ আইয়া ধইরা লইয়া যাইবো তরে। জেলে দিবো তরে, ফাসিতে দিবো।

একথায় তছি একেবারে দিশাহারা হয়ে গেল। ভয়ে আতংকে কুঁকড়ে গেল। কও কী?

হ। মানুষ খুন করলে ফাসিতে দেয়।

হায় হায় আমি তো এইডা বুজি নাই। ওমা, মা তয় আমি অহন কী করুম? দারগা পুলিশে আইয়া যুদি ধইরা লইয়া যায় আমারে? যুদি ফাসিতে দেয়?

যেন এই রাত দুপুরেই দারোগা পুলিশ এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির উঠানে, কোন ঘরে লুকিয়ে আছে তছি, জানার চেষ্টা করছে। এখুনি যেন ঝাপ সরিয়ে এই ঘরে ঢুকবে তারা, তছিকে ধরবে, এরকম আতংকিত অবস্থা হল তছির। অতিরিক্ত ভয় পাওয়া শিশু যেভাবে মায়ের বুকে মুখ লুকায়, মাকে দুইহাতে জড়িয়ে ধরে কুঁকড়ে মুকড়ে যায়, তছি তেমন শিশু হয়ে গেল, মায়ের বুকে মুখ লুকাল। শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে তার। গলা বন্ধ হয়ে আসছে। তবু ফিসফিস করে বলল, আমারে কোনওহানে হামলাইয়া (লুকিয়ে) থোও মা। কোনওহানে হামলাইয়া থোও। এমুন জাগায় হামলাও, দারগা পুলিশ আইয়া য্যান বিচড়াইয়া না পায় আমারে। আমার য্যান ফাসিতে না দেয়। মাগো, মরণরে বহুত ডরাই আমি।

অসহায় মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে তছির মা তখন স্থির হয়ে আছে। এই মেয়েকে সে কোথায় লুকিয়ে রাখবে!

AMARBOI.COM

হামিদা বলল, কীরে তুই তর বাপের লগে কথা কচ না?

উঠানের কোণে দাঁড়িয়ে ছাই দিয়ে দাঁত মাজছে নূরজাহান। খানিক আগে ঘুম থেকে উঠেই রান্নাচালায় ছুটে গেছে। চুলা থেকে নাড়ার ছাই তুলে বাঁহাতের তালুতে নিয়েছে। এখন উঠানের কোণে দাঁড়িয়ে সেই ছাই ডানহাতের এক আঙুলে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে দাঁত মাজছে। নূরজাহানের চারপাশে ঝকমক ঝকমক করছে শীত সকালের রোদ। গাছগাছালির ডালপালা চকেমাঠে জমে থাকা কুয়াশা কাটতে শুরু করেছে।

মায়ের কথা শুনে পিরিক করে থুতু ফেলল নূরজাহান। কথা বলল না।

ঘরের পুবকোণে, বাড়ির নামার দিকে কদু উসসির ঝাঁকা (লাউ সিমের মাচান)। লতার গোড়ার কাছে হাতদুয়ের লম্বা আর হাতখানেক চওড়া একখান গর্ত। পানির ঠিলা এনে সেই গর্তটার সামনে রেখেছে হামিদা। এখন ঠিলা কাত করে একটু একটু করে পানি ঢালছে গর্তে। কদু উসসির শিকড় ধীরে শুষে নিচ্ছে পানি। একবারে পানি ঢেলে গর্ত ভরে দিলে অতিরিক্ত পানির চাপে পচন ধরে যেতে পারে শিকড় বাকড়ে। এইজন্য এভাবে পানি দিতে হচ্ছে গোড়ায়। একবার কিছুটা পানি ঢেলে অপেক্ষা করতে হচ্ছে কখন মাটির তলায় চলে যায় পানি, কখন চুমুকে চুমুকে পানি শেষ করে আবার হাঁ করবে কদু উসসির শিকড়।

নূরজাহান কথা বলছে না দেখে চোখ তুলে মেয়ের দিকে তাকাল হামিদা। কথা কচ না ক্যা?

নূরজাহান আনমনা গলায় বলল, কী কমু?

জিগাইলাম যে তার বাপের লগে কথা কচ না ক্যা?

ক্যা কথা কই না জানো না তুমি?

থাবড় দিছে দেইক্কা!

নূরজাহান কথা বলল না। উদাস হয়ে চকের দিকে তাকিয়ে রইল।

হামিদা বলল, পোলাপানে দোষ করলে মা বাপে তাগো মারবো না?

নূরজাহান বলল, কী দোষ করছিলাম আমি?

মাওলানা সাবরে গাইল দিছস। রাজাকার কইছস।

কীর লেইগা কইছি জানো?

প্রথমবারের ঢেলে দেওয়া পানি শুষে নিয়েছে মাটি। ধীরে ধীরে মাটির তলায় মিলিয়ে যাচ্ছে পানি, এই দৃশ্য তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল হামিদা আর কথা বলছিল।

AMARBOI.COM

পানি মিলিয়ে যেতেই গর্তের মুখে আবার কাত করল ঠিলা। তুই কইলে সেন্না (তো) জানুম!

হোনতে চাইছো?

এই যে চাইতাছি। ক।

দাঁত মাজতে মাজতে উদাস হয়ে গেল নূরজাহান। অহন আর কইয়া কী অইবো!

কী আবার অইবো! হুনুম।

হোননের কাম নাই। মাইর যহন খাইছিই, আর কমু ক্যা?

গভীর অভিমানে যে বুক ভরে আছে মেয়ের হামিদা তা বুঝলো। বুঝে মন কেমন করে উঠল তার। মায়াবি গলায় বলল, ক আমারে। আমি তর বাপরে কমুনে। আমি কইলাম বুঝছি মাওলানা সাবে আগে তরে কিছু কইছে, নাইলে আতকা তুই তারে এই হগল কচ নাই।

নূরজাহান আবার থুতু ফেলল। আমারে কয় নাই, কইছে বাবারে।

কী কইছে?

দউবরা।

কথাটা বুঝতে পারল না হামিদা। বলল, কী, কী কইছে?

কইছে তুই দউবরার মাইয়া না! বাবার নাম কেঐ খারাপ কইরা কইলে আমার শইল জইল্লা যায়। তাও আমি কিছু কইতাম না। যহন আমারে অনেক আবল তাবল কথা কইছে তহন আমি তারে পচা মলবি কইছি। রাজাকার কইছি।

তর এই হগল কথার লেইগা মাওলানা সাবে তর বাপরে কী আপমান করছে তুই জানচ?

কী করছে?

হোনলে তর মায়া লাগবো।

আগের মতো অভিমানের গলায় নূরজাহান বলল, এমুন বাপের লেইগা আমার মায়া লাগে না।

একখান থাবড় মারছে দেইক্কা এত খারাপ হইয়া গেল বাপে?

আমারে কিছু না জিগাইয়া, কিছু না হুইন্না মারলো ক্যা? আগে বেবাক কথা আমারে জিগাইতো, বেবাক কথা হুইন্না যুদি দেখতো আমি দোষ করছি, একটা ক্যা দশটা থাবড় মারলেও আমি চেততাম না। কথা নাই বার্তা নাই বাইত্তে আইয়া থাবড় মারল আমারে!

ঠিলার শেষ পানি গর্তে ঢেলে উঠে দাঁড়াল হামিদা। খালি ঠিলা হাতে নূরজাহানের সামনে এসে দাঁড়াল। অমুন সময় মাথা ঠিক থাকে না মাইনষের।

নূরজাহান কথা বলল না, থুতু ফেলল।

হামিদা বলল, মাওলানা সাবে তর বাপরে বহুত অপমান করছে।

কী অপমান?

রস বেচতে গেছিলো তার বাইত্তে, রসের দাম তো দেয়ঐ নাই, তর কথা কইয়া বকাবাজি করছে তারবাদে গর্দানে ধাক্কা দিয়া বাড়ির নামায় হালায় দিছে। তরে থাবড় দেওনের পর এই হগল কথা কইয়া তর বাপে বহুত কানছে।

AMARBOI.COM

মায়ের কথা শুনে দাঁত মাজতে ভুলে গেল নূরজাহান, চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেল, শ্বাস ফেলতে ভুলে গেল। বাপকে গালাগাল করেছে মান্নান মাওলানা সেই গালাগাল পরিষ্কার শুনতে পেল সে। ঘেটি ধাক্কা দিয়ে কীভাবে বাড়ির নামায় ফেলে দিয়েছে সেই দৃশ্য চোখে দেখতে পেল। দেখে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল নূরজাহানের, চোখ জ্বলতে লাগল। নূরজাহানের ইচ্ছা হল এখনই মান্নান মাওলানার বাড়িতে ছুটে যায়। গিয়ে হাতের থাবায় মুঠ করে ধরে তার দাঁড়ি। একহাতে দাঁড়ি ধরে অন্যহাতে ঠাস ঠাস করে একটার পর একটা থাবড় মারে তার গালে। তারপর প্রচণ্ড জোড়ে এক লাথথি মারে তার কোকসা বরাবর। সেই লাথথি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে সে যেন গিয়ে পড়ে বাড়ির নামায়। যেখানে পড়েছিল দবির গাছি।

কিন্তু নূরজাহান মেয়ে। মেয়েরা কী পারে এমন করে কোনও পুরুষকে মারতে!

বুকফাটা ক্রোধে, দাঁতে দাঁত চেপে নূরজাহান বলল, আমি যে ক্যান মাইয়া অইয়া জন্মাইছি! আমি যে কেন পোলা অই নাই!

কাম করবেন না বাজান?

মুখ ঘুরিয়ে লোকটার দিকে তাকাল বদর। উদাস, নির্বিকার চোখে খানিক তাকিয়ে রইল তারপর আগের ভঙ্গিতে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। কথা বলল না।

AMARBOI.COM

দক্ষিণ মেদিনীমণ্ডলের মাঝ বরাবর, সড়কের নামায় চক। সেই চকে উদাস হয়ে বসেছিল বদর। পায়ের কাছে উপুড় করে রাখা তার য়োড়া। য়োড়ার দিকে তার মন নাই। য়োড়ার দিকে সে একবারও তাকায়নি। সে তাকিয়ে ছিল আকাশের দিকে। চোখে মুখে আশ্চর্য এক উদাসীনতা। আকাশের দিকে তাকিয়ে কী দেখছিল বদর কী দেখছিল না, বদর ছাড়া কেউ তা জানে না।

বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে। শীত সকালের কুয়াশা কেটেছে অনেক আগে। রোদ এখন দারাস সাপের মতো তেজাল। দুনিয়াদারি ভেসে যাওয়া এই রোদ তোয়াক্কা না করে নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে মাটিয়ালরা। সড়কের মুখে দাঁড়িয়ে তাদের কাজ তদারক করছে হেকমত। আলী আমজাদ সাইটে নাই বলে ছাতাটা সে নিজের মাথায় ধরে রেখেছে।

আড়চোখে একবার হেকমতকে দেখল লোকটা তারপর আবার বলল, কাম করবেন না?

এবার আর লোকটার দিকে তাকাল না বদর। আকাশের দিকে যেমন তাকিয়ে ছিল তেমন তাকিয়ে থেকেই শান্ত গলায় বলল, না।

ক্যা?

চোরেরা এই হগল কাম করে না। তারা খালি চুরি করে।

বদরের কথা বুঝতে পারল না লোকটা। অবাক গলায় বলল, জ্বে!

হ। হারাদিন ঘুমায় চোরেরা, হারারাইত চুরি করে। শইল্লে তেল মাইক্কা, লুঙ্গি কাছা দিয়া খন্তি হাতে লইয়া যায় গিরস্ত বাড়িতে। পিড়া খুইদ্দা গিরস্তঘরে সিং (সিঁধ) দেয়। দিনের বেলা চোরেগো কোনও কাম থাকে না। আমারও নাই।

ভাঙাচোরা শরীরের বয়স্ক লোকটা এবার থতমত খেল। মাজায় তার গামছার মতো করে বাঁধা খয়েরি রঙের পুরানা কালের একখান চাদর। গায়ে ছেঁড়া হাতাআলা গেঞ্জি। হাতে য়োড়া, মাথায় সাপের মতো কুণ্ডলি পাকান নাড়ার বিড়া। মুখের দাড়িমোচ ধুলায় ধূসর। কন্ট্রাক্টর সাহেব সাইটে নাই দেখে কাজে ফাঁকি দিয়ে বদরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে। আমোদ ফুর্তিতে ভরপুর বদর কাজ না করে চকে বসে আছে কেন জানার ভারি কৌতূহল হয়েছিল তার। অসুখ বিসুখ করেনি তো বদরের!

কন্ট্রাক্টর সাহেবের তুলনায় লেবার সরদার হেকমতও কম কঠিন লোক না। দশদিকে চোখ তার। হেকমতের সামনে কাজে ফাঁকি দেওয়া খুবই কঠিন। ফাঁকি হেকমতের চোখে পড়বেই। তবু ঝুঁকি লোকটা নিয়েছে। দূর থেকে বসে থাকা বদরকে দেখে বুকের ভিতরে আশ্চর্য এক মমত্ববোধ জেগে উঠেছিল তার। বদরের কাছে না এসে পারেনি। হেকমতের হাতে ধরা পড়লে পড়বে। কন্ট্রাক্টর সাহেবের মতো নির্দয় মানুষ না হেকমত। ধরা পড়লে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবে না। হাত পায়ে ধরে অনুনয় বিনয় করলে মাফ করে দিবে। বদরের জন্যে না হয় হেকমতের হাত পায়ে ধরবে সে!

কিন্তু বদর এসব কী বলছে! এসব কথার অর্থ কী? চোরদের কাজ থাকে না বলে তার কেন কাজ থাকবে না!

হাতে ধরা য়োড়া চকের ঘাসে নামিয়ে রাখল লোকটা। কনটেকদার সাব, হেকমত সবার কথা ভুলে বদরের পাশে বসল, নরম গলায় বলল, আপনের কথা কিছু বোঝলাম না বাজান।

মুখ ফিরিয়ে আবার লোকটার দিকে তাকাল বদর। চোখে অচেনা দৃষ্টি। আনমনা গলায় বলল, আপনে জানি কেডা?

লোকটা আবার থতমত খেল। বদরের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, আপনে আমারে চিনেন না?

চিনা চিনা লাগে! তয় মনে করতে পারতাছি না।

ক্যা?

কইতে পারি না।

চদরি বাইত্তে আরও অনেক মাইট্টালের লগে আপনেও থাকেন আমিও থাকি। একলগে রাইন্দা খাই, একলগে হুই। সুখদুঃখের কত পাচাইল আপনে আমি পাড়ি, আর আপনে আমারে চিনতাছেন না বাজান! কী অইছে আপনের?

কী যে অইছে কইতে পারি না।

AMARBOI.COM

কয়দিন ধইরা দেহি রাইত্রে ঘুমান না। উইট্টা বইয়া থাকেন। বিড়ি টানেন আর একলা একলা কথা কন। এমুন হাকিহুকি কইরা কন, কী কন হুনা যায় না। বোজতে পারি না। আমি যহন এহেনে কামে আইলাম তহন দেহি শইল্লে আপনের বেদম ফুর্তি। তিন জুয়ানের কাম করেন একলা। কনটেকদার সাবে এহেনে পাডায় আপনেরে, ওহেনে পাডায়। কয়দিন ধইরা দেহি আপনে আর অমুন নাই। আথকা কেমুন বদলাইয়া গেছেন। কাম করেন তো করেন না, কোনও মিহি যান তো যান না। খাইতেও দেহি না আগের লাহান। আপনের কী অইছে বাজান? মনে দুক্কু পাইছেন?

এসব কথায় চোখ ছলছল করে উঠল বদরের। লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

লোকটা এবার বদরের কাঁধে হাত দিল। আমারে আপনে কন বাজান কী অইছে আপনের? আমারে যুদি আপনে না চিন্না থাকেন তয় কই আমি কে! আমার নাম আদিলউদ্দিন। বাড়ি কামারগাও।

মুখ নত করে চোখের পানি সামলাল বদর। হ অহন চিনছি। যান, আপনে কামে যান।

কামে তো যামুঐ। আপনের কথাডা হুইন্না যাই।

আমার কথা হুইন্না আর কী করবেন! চোরের কথা কেঐ হোনে!

কীয়ের চোর? কীর লেইগা নিজেরে বারাবারে চোর কইতাছেন?

আমি কই না! আমারে কয় মাইনষে!

কোন মাইনষে চোর কয় আপনেরে?

কনটেকদার সাবে।

আলী আমজাদের কথা শুনে চমকাল আদিলউদ্দিন। কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে গেল। কনটেকদার সাবে! ক্যা, চোর কইছে ক্যা?

আমি বলে চা মিষ্টি আইন্না পয়সা চুরি করি! আমি বলে রুটি কেলা আইন্না পয়সা চুরি করি। কন, আমি বলে চোর!

কথা বলতে বলতে আবার চোখ ছলছল করে উঠল বদরের। গলা বুজে এল। জড়ান গলায় সে বলল, আমি ভাল বংশের পোলা। পেডের দায়ে মাইট্টাল অইছি। তয় মাইট্টালগিরি আমার ভাল্লাগে না। কনটেকদার সাবে আমারে এইমিহি ওইমিহি পাডায়, চা সিরকেট আনায়, কেলা রুটি আনায়, মিষ্টি আনায়, হেই কাম করতে আমার ভাল্লাগে। পয়সা চুরির লোভে আমি হেই কাম করি না। আমি চোর না। আমার মনে কোনও পাপ নাই। আপনেঐ কন, চোরঐ যদি অমু তাইলে এই কষ্টের কাম করতে আইছি ক্যা! তাইলে তো হারাদিন ঘুমাইতাম, হারারাইত চুরি করতাম। একদিন চুরি কইরা একমাস বইয়া খাইতাম। চোরে কোনওদিন এত কষ্ট করে! কন, আমি বলে চোর!

কথা শেষ করবার আগেই হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল বদর। হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। বদরের কথা শুনে, বদরের কান্না দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল আদিলউদ্দিন। কাজের কথা ভুলে সেও বসে রইল বদরের পাশে।

AMARBOI.COM

হাজামবাড়ির বড়ছেলে আবদুল বাড়ি ফিরল সন্ধ্যাবেলা। পরনে চেক লুঙ্গি আর ফুলহাতা আকাশি রঙের শার্ট। শার্টের ওপর খাকি রঙের মোটা একখান চাদর। চাদরটা গায়ে দেয়নি সে। মাফলারের মতো ভাঁজ করে গলার দুইপাশে ঝুলিয়ে রেখেছে। একহাতে ছোট্ট একখান চটের ব্যাগ। এই ব্যাগে লেপ তোশকের কাজ করবার সুই সুতা, কেঁচি, দুই এক টুকরা সালু কাপড়।

আবদুলের ঝাঁকড়া চুলে তুলার আঁশ লেগে আছে। পা ধুলায় ধূসর। পা দেখে বোঝা যায় বহুদূর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে সে। হাঁটার তালে ছিল বলে শরীর ফুটা করে বের হচ্ছিল গরম ভাপ। শীত টের পায়নি। ফলে চাদর গায়ে দেবার দরকার হয়নি।

আবদুলের স্বভাব হচ্ছে বাড়ি ঢুকেই পোলাপানের মতন মাকে ডাকা। কোথাও থেকে ফিরবার পর সে যেন আর বয়স্ক থাকে না, পোলাপান হয়ে যায়। কোথায় গিয়েছিল, কী করল, কী দেখল সব মাকে না বলা পর্যন্ত শান্তি নাই।

বিয়ার পর পর এই দেখে খুব হাসাহাসি করত আবদুলের বউ। স্বামীর লগে ঠাট্টা মশকরা করত। আজকাল আর করে না। দিনে দিনে মানিয়ে গেছে। আজকাল বাড়ি ফিরে মাকে আবদুল না ডাকলে আবদুলের বউরই যেন উসপিস উসপিস লাগে। স্বামীকে মনে করিয়ে দেয়, কী, বাইত্তে আইয়া তোমার মারে দিহি আইজ ডাকলা না!

আজ তেমন কিছুর দরকার হল না। আবদুল যখন বাড়িতে এসে উঠল ঠিক তখনই ঘাটপার থেকে উঠে এল আবদুলের বউ। কাঁখে ছোট মেয়ে। মেয়েটা আজ অবেলায় পায়খানা করেছে। পেট খারাপ হয়েছে। ঘাটে নিয়ে মেয়েকে ধুয়ে পাকলে আনল আবদুলের বউ। সন্ধ্যার হিম শীতল পানি শরীরে ছোঁয়াবার ফলে বিরক্ত হয়েছে মেয়ে। মায়ের কাঁখে বসে ঙো ঙো করে কাঁদছিল। বাড়িতে উঠে দুইবার মাত্র মাকে ডেকেছে আবদুল, মা ওমা, তারপরই বউর কোলে ছোট মেয়েকে কাঁদতে দেখে মায়ের কথা ভুলে গেছে। ব্যস্ত হয়ে বউর দিকে তাকিয়েছে। কী অইছে? মাইয়াডা কান্দে ক্যা?

বউ নরম গলায় বলল, হোচাইছি (শৌচ কর্ম) দেইক্কা। পেট নামাইছে।

কও কী! আথকা পেট নামাইলো?

কুনসুম কী মুখে দিছে কে জানে। হারাদিন চোক্কে চোক্কে রাখন যায়! আমার কাম কাইজ থাকে না!

আবদুল আর কথা বলল না। দুইহাত বাড়িয়ে বউর কোল থেকে মেয়েটাকে নিল। আহো মা, আমার কুলে আহো।

বাপের কোলে গিয়ে কান্না থামাল মেয়ে।

হাতের ব্যাগ বউর হাতে দিয়ে আবদুল বলল, মায় কো? মারে দিহি দেহি না। বাইত্তে নাই?

বউ বলল, আছে। ঘরে আছে।

কী করে?

কেমতে কমু! মনে অয় তোমার বইনের লগে কথা কয়।

আবদুল একটু চমকাল। কী কথা? তছির পাগলামি বাড়ছেনি?

কইতে পারি না। তয় হারাদিনঐ আজ বাইত্তে আছিলো। ঘর থিকাঐ বাইর অয় নাই।

ক্যা?

কী জানি!

আবদুল আর বউর দিকে তাকাল না, মা বোন যে ঘরে থাকে সেই ঘরের দুয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের ভিতর উঁকি মেরে ডাকল, মা ওমা, কো তুমি?

ঘরে কুপি জ্বলছে। কুপির সামনে আনমনা ভঙ্গিতে বসে আছে আবদুলের মা। পাশে কাঁথা মুড়া দিয়ে শুয়ে আছে তছি। আবদুলের ডাক শুনে একটুও নড়ল না। যেন গভীর ঘুমে ডুবে আছে। সকালের আগে এই ঘুম ভাঙবে না।

মায়ের দিকে তাকিয়ে আবদুল বলল, এমতে বইয়া রইছো ক্যা মা?

মা ম্লান কণ্ঠে বলল, কী করুম?

আমি ডাক দিলাম হোনো নাই?

হুনছি।

তয় দিহি বাইর অইলা না!

এমতেঐ।

তছি হুইয়া রইছে ক্যা?

কী জানি।

হুনলাম আইজ হারাদিন ঘরথনে বাইর অয় নাই। ক্যা? শইল খারাপ? জ্বরজ্বারি আইলোনি?

না। এমতেঐ।

পাগলামি বাড়ছে?

না। একদোম চুপচাপ আছে। হারাদিন ধইরা হুইয়া রইছে। বিচনা থিকা ওডে নাই, কথা কয় নাই, খায় নাই।

না খাইয়া থাকন ভাল না। এই রকম চুপচাপ থাকনও এক রকমের পাগলামি। রাইত্রে উডাইয়া ভাত খাওয়াইয়ো।

আইচ্ছা।

মেয়ে কোলে দুয়ারের সামনে বসল আবদুল। আমি আইজ গেছিলাম সমশপুর। একখান লেপ আর একখান তোশক বানাইলাম। বড় গিরস্তবাড়ি। রিডামাছ দিয়া ভাত খাওয়াইলো। মজুরি পাইছি একশো কুড়ি টেকা।

AMARBOI.COM

আবদুলের মা নরম গলায় বলল, ভাল।

এবার হঠাৎ করেই উত্তেজিত হল আবদুল। ওমা, তোমারে তো আসল কথাডাই কই নাই। কোলাপাড়ার ঐমিহি একখান কাম অইছে।

কী কাম বাজান?

খালের কচুড়িপেনার মইদ্যে একখান লাচ পাওয়া গেছে। জুয়ানমর্দ এক বেডার লাচ। গলায় গামছার গিট্টু দেওয়া। কারা জানি মাইরা খালে হালায় দিছে বেডারে। বেডার নাম রুস্তম। রিশকা বায়।

আবদুলের কথা শুনে ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মা। কথা বলতে ভুলে গেল।

আবদুল বলল, দুইন্নাইডা যে কী অইছে! মানুষ আর মানুষ নাই। মাইনষের জান গেছে কুত্তা বিলাইয়ের জান অইয়া। মাইনষের জানের কোনও দাম নাই। দুই চাইর পাচ টেকার লেইগা মাইনষের জান যায় গা। সামাইন্য ইট্টু অন্যায়ের লেইগা জান যায় গা।

আবদুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কও তো এই যে বেডাডা মইরা গেল, বেডারে যে এমতে মাইরা হালাইলো, বেডার বউ পোলাপানডি অহন কেমুন করবো! কী খাইবো, কেমতে বাইচ্চা থাকবো? যারা বেডারে মারলো তারা এই হগল কথা একবারও চিন্তা করলো না! মানুষ মানুষরে মাইরা হালায় কেমতে এইডাঐত্তো আমি বুজি না! ওমা, কেমতে মানুষরে মানুষ মাইরা হালায়? যহন একজন মানুষ আরেকজন মানুষরে মারে, তহন যে মারে তার মনে ইট্টু রহম অয় না? ইট্টু দয়ামায়া অয় না?

আবদুলের মা কোনও কথা বলে না, পাথর হয়ে থাকে। চোখের দৃষ্টি স্থির, মুখখান যেন জীবিত মানুষের মুখ না। মুখখান যেন মৃত মানুষের।

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আরও কথা হয়তো বলত আবদুল, কোলে বসা মেয়ে ঙো ঙো করে বলল, মার কাছে যামু। বাবা, মার কাছে যামু।

উঠে দাঁড়াল আবদুল। আইচ্ছা লও।

তারপর উঠানের দিকে পা বাড়িয়ে মাকে বলল, তছিরে উডাও মা। উডাইয়া ভাত পানি খাওয়াও।

মা তবু কথা বলল না।

গভীর রাতে ঘুমের ভিতর দবির গাছি টের পেল তার ঘাড়ের কাছে কে হাত বুলাচ্ছে। আশ্চর্য রকম মায়া মমতা মাখা নরম কোমল ছোট্ট হাতখানি। একবার ঘাড়ের এইদিকে যায় হাত, একবার ওই দিকে।

AMARBOI.COM

দবিরের ঘুম ভেঙে গেল।

ঘর ভর্তি অন্ধকার। দবির শুয়ে আছে মেঝেতে। পিঠের তলায় হোগলা, হোগলার তলায় পুরু করে বিছানো নাড়া। গায়ে আছে মোটা কাঁথা। ফলে রাত দুপুরের শীত যতই পড়ুক না কেন টের পাওয়া যায় না।

কিন্তু কে এমন করে হাত বুলাচ্ছে দবিরের ঘাড়ে!

এটা হামিদার হাত না। হামিদার হাত শক্ত, খরখরা। বহুদিন ধরে সংসারকর্ম করা হাত।

তাহলে!

তারপরই দবির শুনতে পেল মৃদু ফোঁসফোঁস একটা শব্দও হচ্ছে। ঘাড়ে যে হাত বুলাচ্ছে সেই মানুষটাই করছে শব্দটা। যেন বা গভীর কোনও কষ্ট বেদনায় কাঁদছে কেউ। কিন্তু কাঁদছে যে এটা কাউকে বোঝাতে চায় না। অতিকষ্টে চেপে রাখতে চাইছে কান্না, পারছে না। মৃদু একটা শব্দ হচ্ছেই।

দবির বুঝে গেল তার ঘাড়ে কার হাত! কে এমন করে কাঁদছে পাশে বসে!

ডানহাত ঘাড়ের দিকে তুলে আস্তে করে হাতখান ধরল সে। মায়াবি গলায় বলল, কী অইছে গো মা! কান্দো ক্যা!

বাবার যে ঘুম ভেঙে গেছে নূরজাহান তা বুঝতে পারেনি। বাবা তার হাত ধরার ফলে, কথা বলবার ফলে চেপে রাখা কান্না আর চাপতে পারল না সে। বুকের ভিতর আটকে থাকা সব কান্না বেরিয়ে এল। শব্দ করে কেঁদে উঠল নূরজাহান।

থতমত খেয়ে বিছানায় উঠে বসল দবির। দুইহাতে জড়িয়ে ধরল মেয়েকে। দিশাহারা গলায় বলল, কী অইছে মা, কী অইছে! এমুন কইরা কানতাছো ক্যা?

নূরজাহান কথা বলতে পারল না। বাবার বুকের কাছে মুখ গুঁজে ডো ডো করে কাঁদতে লাগল।

হামিদা শুয়েছিল চৌকির ওপর। কান্নার শব্দে হঠাৎ করেই ঘুম ভাঙল তার। ধরফর করে বিছানায় উঠে বসল। কী অইছে, আ? কে কান্দে?

দবির শান্ত গলায় বলল, নূরজাহান।

ক্যা?

কইতে পারি না।

কুনসুম উটলো নূরজাহান? কুনসুম গেল তোমার ওহেনে?

কী জানি! ঘুমের মইদ্যে উদিস পাইলাম আমার গরদানে কে হাইততাইতাছে আর নিঃসাড়ে কানতাছে। বোজলাম নূরজাহান। তারবাদে উটছি।

আবার মেয়ের দিকে মন দিল দবির। কী অইছে ক আমারে। কানতাছস ক্যা?

নূরজাহান তবু কথা বলে না, নূরজাহান তবু কাঁদে।

মেয়ের মাথায় পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে দবির বলল, আমি থাবড় মারছিলাম দেইক্কা কানতাছো মা! হেইডা তো ম্যালাদিন অইলো! এতদিন পরের কান্দন আইজ কানতাছো! এই রাত দোফরে হেই দুক্কে আইজ কানতাছো!

নূরজাহান কাঁদতে কাঁদতে বলল, না।

AMARBOI.COM

তয়?

আমি আগে হুনি নাই, আইজঐ হুনছি।

কী হোনছো তুমি? কী হোনছো মা?

মাওলানা স.বের কথা।

কী করছে মাওলানা সাবে?

তোমার বকাবাজি করছে, তোমার গরদানে ধাক্কা দিছে। আমার লেইগা বহুত অপমান কর্‌ছে তোমারে।

দবির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কী করুম মা! তকদিরে অপমান লেখা আছিলো, অইছি।

আমার লেইগা, বেবাক আমার লেইগা অইছে।

দবির কথা বলল না।

চৌকিতে বসা হামিদা বুঝে গেল বাপের অপমানের কথা শুনে ঘুমাতে পারেনি নূরজাহান। মায়ের পাশ থেকে উঠে বাপের কাছে চলে গেছে। মানুষটার ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বাড়ির নামায় ফেলে দিয়েছিল মান্নান মাওলানা, এই জন্যে তার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল নূরজাহান। বাড়িতে এসে হামিদাকে কথাগুলি বলার পর স্বামীর অপমানের দৃশ্যটা যেমন করে চোখের ওপর দেখতে পেয়েছিল হামিদা, যে দৃশ্য দেখে বুক ফেটে গিয়েছিল তার, চোখ ফেটে গিয়েছিল, স্বামীর মাথা বুকে জড়িয়ে ধরে যেমন করে কেঁদেছিল সে, নূরজাহানেরও বুঝি তাই হয়েছে। বাবার ঘাড়ে ধাক্কা দিয়েছেন মান্নান মাওলানা, নিশ্চয় ঘাড়ে খুব ব্যথা পেয়েছে বাবা, এই ভেবে নিশিরাতে উঠে তার ঘাড়ে এমন করে হাত বুলাচ্ছিল সে। সেই ফাঁকে বাবার অপমানের দৃশ্য চোখে দেখে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে। বাপ মায়ের জন্য অতিরিক্ত টান থাকলে, অতিরিক্ত মায়া মমতা থাকলে এমনই তো হয় সন্তানের! বাইরে থেকে যা-ই মনে হোক ভিতরে ভিতরে নূরজাহান খুব নরম মনের মেয়ে। মানুষের জন্য তীব্র মায়া মমতা তার।

তারপরই আর একটা কথা মনে হল হামিদার। মান্নান মাওলানার বাড়ি থেকে অপমান হয়ে আসার পর, নূরজাহানকে থাবড় মারার পর বাবা মেয়ের মধ্যে যে অভিমান জমেছিল আজ এই রাতদুপুরে তা ভেঙে যাচ্ছে। মেয়ের চোখের পানিতে, বাপের আদরে সোহাগে বরফের মতো জমে ওঠা অভিমান গলে যাচ্ছে। এক সংসারের তিনজন মানুষের দুইজনই যদি নিজেদের মান অভিমান নিয়ে থাকে, কেউ কথা বলে না কারও লগে, সেটা হয় বেকায়দার সংসার। তৃতীয় মানুষটা থাকে কষ্টে। সে পড়ে যায় দুইজনের মাঝখানে। না এইদিক যেতে পারে সে, না ওইদিক। হামিদা ছিল সেই অবস্থায়। আজ সেটা ভেঙে গেল। এখন বাপ মেয়ে যত ইচ্ছা আদর আল্লাদ করুক, যত ইচ্ছা রাগ দুঃখ করুক হামিদার কী! সে এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে।

কাঁথা মুড়া দিয়ে হামিদা তারপর শুয়ে পড়ল। তবে কান খাড়া করে রাখল বাপ মেয়ের দিকে। কী কথা বলে তারা, কেমন করে দূর হয় দুইজন মানুষের অভিমান, জানতে ইচ্ছা করে তার!

ততক্ষণে কান্না থেমে গেছে নূরজাহানের। অনেকক্ষণ গুঙিয়ে গুঙিয়ে কান্নার পর

কান্না থামলেও তার রেশ থাকে। থেকে থেকে হেচকি মতন ওঠে। এখন তেমন উঠছে নূরজাহানের। গলা আছে রুদ্ধ হয়ে। তবু জড়ান অস্পষ্ট গলায় কথা বলছে সে। ও বাবা, মাওলানা সাবে বহুত জোরে ধাক্কা দিছে তোমার গরদানে? তুমি খুব দুক্কু পাইছো, না? দেহি কোন জাগায় ধাক্কা দিছে!

বাবার ঘাড়ের কাছে আবার হাত বুলায় নূরজাহান। আমি বুজি নাই, আমি কিচ্ছু বুজি নাই বাবা! কোনওদিন দেহি নাই তুমি আমার শইল্লে হাত উডাইছো! রস বেইচ্চা বাইত্তে আইয়া কথা নাই বার্তা নাই থাবড় মারলা আমারে। শইল্লে দুক্কু পাইলাম কি পাইলাম না উদিস পাইলাম না। মনডা কেমুন জানি অইয়া গেল।

মেয়ের কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল দবির। কোনও কোনও মাইর আছে শইল্লে লাগলেও শইল্লে তা লাগে না, লাগে মনে। মাওলানা সাবে যে ধাক্কাডা দিছে ধাক্কাডা গরদানে লাগে নাই আমার, লাগছে মনে। এর লেইগাঐ বাইত্তে আইয়া থাবড়ডা তরে মারলাম। অতজোরে একখান থাবড় খাইয়াও তুই কানলি না। আমার মিহি চাইয়া রইলি। তারপর চুপচাপ বাইতথন বাইর অইয়া গেলি। আমি বোজলাম থাবড়ডা তর শইল্লে লাগে নাই, লাগছে মনে। শইল্লের মাইর দুই একদিনের মইদ্যে ভুইল্লা যায় মাইনষে। মনের মাইর ভোলে না।

একটু থেমে দবির বলল, মাওলানা সাবরে তুই রাজাকার কইছিলি ক্যা?

আবার একখান হেচকি তুলল নূরজাহান। তোমার লেইগা।

দবির খুবই অবাক হল। আমার লেইগা?

হ।

ঘটনা খুলে বলল নূরজাহান। শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল দবির। বাপের নাম বিকৃত করে বলেছে বলে এমন জাঁদরেল লোক মান্নান মাওলানার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিল নূরজাহান! সারা গ্রাম যার ভয়ে কাঁপে, যাকে তোয়াজ করে, যার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবার সাহস নাই কারও, এতটুকু একটা মেয়ে দাঁড়িয়েছে তার মুখামুখি! তাও এই সামান্য কারণে। যে কথা গ্রামের সাহসী মানুষরা পর্যন্ত এখন আর বলার সাহস পায় না, গ্রামের মুক্তিযোদ্ধারা পর্যন্ত চেপে রাখে যে কথা, নির্দ্বিধায় সেইকথা বলে দিয়েছে! এই সাহস মেয়েটা পেল কোথায়!

তারপরই ভয় পেয়ে গেল দবির। বুকটা হিম হয়ে এল তার। মেয়েমানুষের এত সাহস ভাল না। তাও নূরজাহানের মতো কিশোরী মেয়ের, যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো মেয়ের। মান্নান মাওলানা যে ধরনের লোক, মেয়েটার কী না কী ক্ষতি করে দেয়! বয়স যাই হোক, গায়ে এখনও শুয়োরের মতন শক্তি তাঁর। লজ্জা শরম কিছুই নাই। মান্নান মাওলানা পারে না এমন কাজ দুনিয়াতে নাই। গ্রামের কোন নির্জনে পেয়ে চেপে ধরবে নূরজাহানের মুখ। নিজে না পারলে লাগিয়ে দেবে ছেলেকে। সর্বনাশ হয়ে যাবে মেয়েটার।

এসব ভেবে নিজের অজান্তেই মেয়েকে বুকের কাছে চেপে ধরল দবির। ভয়ার্ত গলায় বলল, এইডা তুই ভাল করচ নাই মা, এইডা তুই ভাল করচ নাই।

দবির গাছির হঠাৎ উত্তেজনায় নূরজাহান অবাক হল। কান্নার আর একটা হেচকি

AMARBOI.COM

তুলল। তারপর রাগ অভিমানের গলায় বলল, ভাল করুম না ক্যা? আমার সামনে আমার বাপের নাম খারাপ কইরা কইবো ক্যা? আতাহার দাদার সামনে তার বাপরে তুমি যদি কও মননাইন্না, হেয় তোমারে ছাইড়া দিবো!

দবির কাতর গলায় বলল, অরা আর আমরা এক না মা।

এক না ক্যা! অগ বাপ বাপ, আর আমগো বাপ বাপ না!

মেয়ের রাগটা বুঝল দবির, অভিমানটা বুঝল। বুঝেও অন্যভাবে বুঝ দেওয়ার চেষ্টা করল মেয়েকে। মেয়ের মাথায় পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, এই দুইন্নাইতে যাগো যত জাগাজমিন, যাগো যত টেকা পয়সা, তাগো তত জোর। জোরডা তারা দেহায় গরিব মাইনষের লগে, গরিব মাইনষের উপরে। নিজেগো লাহান জাগাজমিনআলা মাইনষের লগে, টেকা পয়সাআলা মাইনষের লগে দেহাইতে পারে না। মাওলানা সাবের জাগাজমিনের আকাল নাই, টেকা পয়সার আকাল নাই। একপোলা থাকে জাপানে। মাসে লাক লাক টেকা পাডায়। আরেক পোলা অইলো গুণ্ডাপাণ্ডা, ডাকাইত। দুইন্নাইর কেঐরে ডরায় না। এর লেইগা মান্নান মাওলানার জোরের কমতি নাই। এই জোরডাই হেয় আমগ লাহান গরিব মাইনষের লগে দেহায়। তয় জোরের উপরে দিয়াও তো জোর আছে। খাইগো বাড়ির মাইনষের সামনে কইলাম মান্নান মাওলানা আবার মিচাবিলাই (ভেজা বিড়াল) হইয়া থাকে। খাইগো টেকা পয়সা জাগাজমিন মান্নান মাওলানার থিকা অনেক বেশি। তারা মান্নান মাওলানারে গনায় ধরে না।

নূরজাহান ঝাঁঝাল গলায় বলল, গনায় আমিও ধরতাম না যদি আল্লায় খালি আমারে পোলা বানাইতো।

দবির হাসল। পোলা বানাইলেঐতো অইতো না। জাগাজমিন, টেকা পয়সাও থাকন লাগতো।

না থাকলেও অইতো। পোলা অইলে শইল্লে বেশি শক্তি থাকতো আমার। যে কোনও মাইনষের লগে মারামারি করনের ক্ষমতা থাকতো। জাগাজমিন, টেকা পয়সার জোর আমি শইল দিয়া ঠেকাইতাম। কাশেম কাকারে যেমতে ইচ্ছা অমনে মারছে মাওলানা সাবে। কাশেম কাকার জাগায় আমি অইলে মাইর খাইতাম না। মইরা গেলে যাইতাম তাও মাওলানা সাবরে মাইর দিয়া দিতাম। তোমার জাগায়ও যুদি আমি অইতাম বাবা, মাওলানা সাবের বাইত্তে খাড়ইয়া রসের দাম তার কাছে থিকা আদায় কইরা আনতাম। আমার গরদানে ধাক্কা দিলে আমিও তার গরদানে ধাক্কা দিতাম। বেবাক কথা হোননের পর আমার খালি একটাই দুক্কু লাগছে বাবা, আল্লায় আমারে পোলা বানাইলো না ক্যা! আল্লায় আমারে মাইয়া বানাইলো ক্যা!

মেয়ের মাথায় পিঠে আবার হাত বুলাতে লাগল দবির। নরম মায়াবি গলায় বলল, এই হগল দুক্কু করণ ভাল না মা। আল্লায় যা করে মাইনষের ভালর লেইগাই করে।

একটু থেমে বলল, অহন থিকা বাইতথন তুই ইট্টু কম বাইর অবি মা। একলা একলা যেহেনে ওহেনে যাবি না। মাওলানা সাবের লগে দেহা অইলেও তার মিহি চাবি না। তার লগে কথা কবি না। খবরদার তারে কোনওদিন আর গাইলগুইল দিচ না। রাজাকার কইচ না। তাইলে কইলাম সব্বনাশ অইয়া যাইবো। তাইলে কইলাম আর

AMARBOI.COM

বাচন নাই। এইবার খালি রসের দামডা গেছে, গাইল খাইছি, গরদানে ধাক্কা খাইছি, আবার যুদি মাওলানা সাবরে তুই কিছু কচ তাইলে আমারে হেয় জানে মাইরা হালাইবো। তর যে কোন সব্বনাশ করবো তুই চিন্তাও করতে পারবি না! সাবদান মা, সাবদান। আমারে মারিচ না, নিজের সব্বনাশ করিচ না।

নূরজাহান কথা বলল না। কান্নার রেশ কেটে গেছে তার, বন্ধ হয়েছে হেচকি। চৌকিতে শুয়ে আছে মা, খানিক আগে কথা বলছিল, এখন জেগে আছে না ঘুমিয়ে কে জানে। নূরজাহানের মনে এখন ঘুরপাক খাচ্ছে বাবার কথাগুলি। আজকের এইরাত দুপুরের আগে কখনও এমন অনুনয়ের স্বরে নূরজাহানের লগে কথা বলেনি বাবা। এমন কাতর হয়নি বেঁচে থাকার জন্য, এমন কাতর হয়নি মেয়ের সর্বনাশ ঠেকাতে।

মান্নান মাওলানার ওপর জমে থাকা রাগ ক্রোধ তারপর পানি হয়ে গেল নূরজাহানের। রাগ ক্রোধের জায়গায় জমে উঠল গভীর এক দুঃখ বেদনা। দীর্ঘ একখান শ্বাস ফেলে নূরজাহান বলল, আল্লার দুইন্নাইডা জানি কেমুন বাবা! দুইন্নাইর মানুষটি জানি কেমুন! কেঐ খালি মারে, কেঐ খালি মাইর খায়। তয় তোমার কথাডি আমি মনে রাখুম বাবা। মাওলানা সাবের মিহি কোনও দিন চক্কু উডাইয়া চামু না। ভাল মন্দ কিছুই কোনওদিন তারে আর কমু না।

দবির কথা বলবার আগেই চৌকির ওপর পাশ ফিরল হামিদা। ঘুমজড়ান গলায় স্বামীকে বলল, এলা হুইয়া পড়ো। রাইত বিয়ান অইয়া আইলো। ইট্টু বাদেই তো আবার উঠবা!

দবির বলল, তোমার ঘুম তুমি ঘুমাও, আমার ঘুম আইতাছে না। আমি মাইয়াডার লগে কথা কই।

আর কী কথা! বেবাকঐত্তো কইছো!

তারপর নূরজাহানকে ডাকল হামিদা। তুই উট্টা আয়। আইয়া হুইয়া পড়।

নূরজাহানও একই কথা বলল। তুমি ঘুমাও।

তারপর দবিরকে বলল, তোমারে একখান কথা জিগাই বাবা। রাজাকার কয় কারে?

দবির হাসল। তুই জানচ না? না জাইন্না মাওলানা সাবরে কইলি কেমতে?

মাইনষের কাছে হুনছি মওলানা সাবে রাজাকার। হুইন্না বুজছি রাজাকার জিনিসটা খারাপ। এর লেইগাঐ কইছি।

আসলেঐ রাজাকাররা খারাপ। তর জন্মের আগে এই দেশটা বাংলাদেশ আছিলো না, আছিল অন্য একখান দেশ। হেই দেশের নাম পাকিস্তান। তয় পাকিস্তান আছিলো আবার দুইখান। পশ্চিম পাকিস্তান আর পূব্ব পাকিস্তান। বাংলাদেশটা আছিলো পূব্ব পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানডা আছিল ম্যালা দূরে, হিন্দুস্তান ছাড়াইয়া। ঐ অত দূর থিকা আইয়া পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমগো শাসন করত, আমগো দেশের মাইনষের ওপরে অইত্যাচার করতো আর আমগো দেশের ধন সম্পদ টেকা পয়সা বেবাক লইয়া যাইতো। অগো ভাষা অইলো উরদু আর আমগো বাংলা। একবার আমগো ভাষাডাও কাইরা নিতে চাইছিলো অরা। পারে নাই। ঢাকার রাস্তায় গুল্লি কইরা মানুষ মারছিলো। এই হগল দেইক্কা একাত্তোর সালে স্বাদীনতা যুইদ্ধের ডাক দিছিলো শেকসাবে, শেক

AMARBOI.COM

মজিবর রহমান সাবে। পাকিস্তানীগো লগে বাঙ্গালীর যুইদ্ধ লাইগা গেছিলো। তিরিশলাক বাঙ্গালী শহীদ অইছিলো হেই যুইদ্ধে। নয়মাস চলছিলো যুইদ্ধ, তারপর দেশ স্বাদীন অইলো। বাংলাদেশ অইলো। স্বাদীন করনের লেইগা যারা যুইদ্ধ করছে তারা অইলো মুক্তিযোদ্ধা। আর যারা স্বাদীনতা চায় নাই, বাঙ্গালী অইয়াও পাকিস্তানীগো পক্ষে আছিলো, বাঙ্গালীগো মারছে, মুক্তিযোদ্ধাগো মারছে, মা বইনের ইজ্জত নষ্ট করছে, তারা অইলো রাজাকার। যুইদ্ধের সময় মাওলানা সাবে এই কাম করছে।

নূরজাহান বলল, বুজছি। তাইলে তো মাওলানা সাবে রাজাকারঐ।

হ। তয় অহন আর কেঐ তারে রাজাকার কয় না।

ক্যা?

ডরে। রাজাকারগো অহন ম্যালা জোর। মাওলানা সাবরে দেইক্কা বোজচ না?

হ বুজি। ও বাবা, মাওলানা সাবের লাহান রাজাকার কি বাংলাদেশে আরও আছে?

আছে, ম্যালা রাজাকার আছে। দেশটার মইদ্যে অহনও যে অশান্তি এই হগল অশান্তি করতাছে রাজাকাররাঐ।

এত রাজাকার বাইচ্চা থাকলো কেমতে? দেশ যহন স্বাদীন অইলো, মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকারগো মারে নাই?

বেবাকরে মারতে পারে নাই। ম্যালা রাজাকার এইমিহি ঐমিহি পলাইয়া গেছিলো গা। পাচ ছয় বচ্ছর পর ধীরেসুস্তে ফিরত আইছে। আইয়া আবার আগের লাহান জোর পাইয়া গেছে।

কেমতে?

এই হগল তুই বুজবি না মা। রাজনীতির প্যাচ।

ও বাবা, স্বাদীনতার পর মান্নান মাওলানাও পলাইছিলো?

হ।

কই?

হেইডা কইতে পারি না।

ফিরত আইছে কবে?

ম্যালাদিন বাদে।

তহন মুক্তিযোদ্ধারা তারে ধরে নাই ক্যা? মাইরা হালায় নাই ক্যা?

অতদিনে মুক্তিযোদ্ধাগো জোর কইম্মা গেছে। রাজাকারগো জোর অইয়া গেছে বেশি। কেমতে মারবো?

নূরজাহান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ইস মান্নান মাওলানারে যুদি মাইরা হালাইতো, মান্নান মাওলানা যুদি না থাকতো তাইলে আমগো গেরামডা ঠাণ্ডা থাকতো। বহুত ভাল থাকতো গেরামডা।

দবির উদাস গলায় বলল, মাওলানা সাবের লাহান কোনও রাজাকারই যুদি না থাকতো তাইলে পুরা দেশটাই ঠাণ্ডা থাকতো। বহুত ভাল থাকতো দেশটা।

ঠিক তখনই শীতরাত্রির গভীর নির্জনতা ভেঙে কোন গৃহস্থবাড়ির মাটির খোঁয়াড়ে বসে বাগ দিল একটা মোরগ। সেই বাগ ছড়িয়ে গেল চারদিকে। তারপরই যেন জেগে

AMARBOI.COM

উঠল গ্রাম গৃহস্থের প্রতিটির বাড়ির খোঁয়াড়বন্দি মোরগ। যে যার মতো করে গলা খুলল, বাগ দিতে লাগল। মোরগদের নিয়মই এই, একজন গলা খুললে, একজনের সাড়া পেলে সবাই সাড়া দেয়। শিয়ালদের মতো।

মোরগের বাগ শুনে নূরজাহান একটু চঞ্চল হল। হায় হায় রাইত পোয়াইয়া গেলনি? ও বাবা, ঘুমাইবা না তুমি?

দবির মৃদু হাসল। নাগো মা, আর ঘুমানের টাইম নাই। অহনঐ বাইর অওন লাগবো।

চৌকির ওপর কাঁথা মুড়া দিয়ে তখন বেভোরে ঘুমাচ্ছে হামিদা।

তছি ফিসফিস করে বলল, তুমি আমার চুলডি কাইট্টা দেও মা।

কথাটা বুঝতে পারল না তছির মা। দুইদিন ধরে খুবই আনমনা সে, খুবই চিন্তিত। প্রথমে তছির মুখে, তারপর আবদুলের মুখে ঘটনা শোনার পর থেকে তছির চিন্তায় না খেতে পারে, না ঘুমাতে পারে। একপাশে বারেক আর একপাশে তছিকে নিয়ে শুয়ে থাকে ঠিকই ঘুম আসে না।

বারেক ছেলেমানুষ, সারাদিন টো টো করে ঘোরে, শোয়ার লগে লগেই ঘুমে কাদা হয়ে যায়। আগে তছিও ছিল বারেকের মতোই। শোয়ার পরই ঘুমিয়ে যেত। যে রাতে মাকে ডেকে তুলে ঘটনাটা বলল সে রাত থেকে ঘুমায় না। মোটা কাঁথায় শরীর ঢেকে এমনভাবে শুয়ে থাকে যেন গভীর ঘুমে ডুবে আছে। দুনিয়াদারির খবর নাই। কানের কাছে টিকারা (গয়না নৌকায় ব্যবহারের ঢোল বিশেষ) বাজালেও যেন এই ঘুম ভাঙবে না।

কিন্তু মা জানে, তছি আসলে ঘুমায় না। তছি আসলে সংসার থেকে, মানুষের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখছে। একটু শব্দ সে করতে চাইছে না, কোনও ভাবেই জানাতে চাইছে না সে আছে এই সংসারে, সে আছে এই ঘরে! সারাদিন মোটা কাঁথার তলায় নিজেকে আসলে লুকিয়ে রাখছে তছি। যেন কাঁথা থেকে বের হলেই লোকে জেনে যাবে রিকশাআলা রুস্তমকে খুন করেছে সে। দারোগা পুলিশ এসে ধরবে তাকে, হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর খুনের দায়ে ফাঁসি হবে তছির।

মাকে ঘটনা বলার পরদিন, সারাদিন কিচ্ছু মুখে দেয়নি তছি। আবদুলের কথায় রাতেরবেলা তছির ভাতপানি এনে তার মাথার কাছে রেখেছে মা। রেখে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করেছে মেয়েকে। ওট মা। উইট্টা ভাতপানি খা। কপালে যা আছে তাই অইবো। কপালের লেখন কেঐ খণ্ডাইতে পারে না। ওট।

AMARBOI.COM

তছি সাড়া দেয়নি, নড়েনি। ভাতপানি ঢেকে শুয়ে পড়েছে মা। কিন্তু ঘুমায়নি। গভীর রাতে শোনে অন্ধকার ঘরে যতটা সম্ভব শব্দ বাঁচিয়ে কাঁথার তলা থেকে বেরুচ্ছে তছি। বেরিয়ে, গিরস্তবাড়ির পালা (পোষা) বিড়ালকে ঠিকঠাক মতো খেতে না দিলে, রাতের অন্ধকারে ক্ষুধার্ত বিড়াল যেমন নিঃশব্দে এসে ঢোকে রান্নাঘরে, যেমন নিঃশব্দে যা পায় তাই খায়, তেমন করে ভাত খাচ্ছে তছি। মাটির বাসনে ভাত সালুন মাখায় এমন সাবধানে, যেন চারির আগা (নখের ডগা) বাসনে লেগে শব্দ না হয়। ভাতের লোকমা মুখে দিয়ে এমন সাবধানে চাবায়, যেন চাবায় না, যেন নিঃশব্দে গিলে ফেলছে ভাত। পানি খাওয়ার সময় গলায় এক ধরনের কোৎ কোৎ শব্দ হয় তছির। সেই শব্দটাও অতি সাবধানে লুকাতে চাইছে সে।

প্রথমে তছিকে মা বলতে চেয়েছে, আন্দারে খাইতে বইলি ক্যা? মাছের কাডাকোডা গলায় বিনবো! কুপি আঙ্গা।

তারপরই ভেবেছে, বললে ভয় পেয়ে যাবে তছি, দিশাহারা হয়ে যাবে। হয়তো খাওয়া শেষ করবে না, হয়তো পেটের খিদা পেটে নিয়েই, হাত মুখ না ধুয়েই ঢুকে যাবে কাঁথার তলায়। সারারাত কুঁকড়ে থাকবে ক্ষুধার কষ্টে। পাগল মেয়ে কিছুতেই বুঝতে চাইবে না মাকে কোনও ভয় নাই। বুক দিয়ে মা তাকে আগলে রাখবে। আঁচলের তলায় লুকিয়ে আড়াল করবে দুনিয়া থেকে।

তারপর গভীর কষ্টের এককান্না বুক ঠেলে উঠেছে তছির মায়ের। পাগল মেয়েটাকে নিয়ে এমনিতেই ছিল তার বিরাট দুঃখ। বয়স হয়েছে মেয়ের, এই বয়সী মেয়েদের কত আগেই বিয়াশাদি হয়ে যায়। স্বামী সন্তান নিয়ে সুখ দুঃখের সংসার করে তারা। তছির জীবন কখনও তেমন হবে না। কে বিয়া করবে পাগল মেয়েটিকে! জেনেশুনে কে সংসার করবে এই মেয়ের লগে! তছি পাগলি, একথা চেপে রেখে চালাকি করে যে তার বিয়া দিবে, দুইদিন পর জামাইবাড়ির লোক যখন বুঝে যাবে বউটা তাদের পাগলনি, আর কিছু না ভেবেই বাপের বাড়িতে ফিরত পাঠাবে মেয়েটাকে। লাভের লাভ কিছুই হবে না, টাকা পয়সা যাবে। জামাইকে ঘড়ি আংটি দিতে হবে, কাপড় চোপড় দিতে হবে। নগদ টাকাও দিতে হতে পারে। মেয়ে ফিরত পাঠাবার সময় ওইসব তো আর ফিরত পাঠাবে না তারা! আর একটা ডরও আছে। ভরন্ত শরীরের যুবতী মেয়ে, দুইদিনের স্বামী সহবাসেই যদি পেট হয় তাহলে হবে আর এক যন্ত্রণা। সারাজীবন বাপছাড়া সন্তানকে টানতে হবে পাগল মেয়েটার। সুতরাং তছির বিয়াশাদির কথা ভাবাই যায় না। জীবন কাটবে তার এইভাবেই। মা যতদিন বেঁচে আছে আগলে রাখবে মেয়েকে। যেমন করে পারে ঘর সংসারের মধ্যে আটকে রাখবে। মা মরবে তো পাখির মতন স্বাধীন হয়ে যাবে তছি। যখন যেদিকে ইচ্ছা উড়াল দিবে। কেউ ফিরেও তাকাবে না তছির দিকে। ভাইরা, ভাইর বউ পোলাপানরা যে থাকবে যাকে নিয়ে। কে তাকাবে তছির দিকে! আর মা না থাকলে তছিও গনায় ধরবে না কাউকে। ইচ্ছা হলে বাড়ি ফিরবে, ইচ্ছা হলে ফিরবে না। দিনে দিনে গ্রামের হাটবাজার রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ানো, গাছতলায় বসা থাকা পাগলনি হয়ে যাবে। গায়ে কাপড় থাকবে না। দুষ্টু ছেলেরা চাকা মারবে।

তছির মায়ের এইসব দুঃখ চাপা পড়ে গেছে খুনের ঘটনায়। এখন যেন আর দুঃখ

AMARBOI.COM

বলে কিছু নাই তার, এখন বুকে সারাক্ষণের এক উদ্বেগ। খালি মনে হয় এই বুঝি দেশ গ্রামের লোকে জেনে গেল, এই বুঝি দারোগা পুলিশে জেনে গেল রুস্তম রিকশাআলাকে খুন করেছে তছি। কেন করেছে সেই কথা কেউ শুনতে চাইবে না, বুঝতে চাইবে না। খুন করেছে জানাজানি হওয়ার পরই ধরবে মেয়েটাকে। ধরা পড়ার পর কিছুদিন জেলে থাকবে মেয়ে। তারপর ফাঁসি হবে। এই যে সারাদিন তছির পিছনে লেগে আছে মা, তছিকে আগলে আগলে রাখছে, তখন আর এইসবের দরকার হবে না। রাতেরবেলা মায়ের একপাশে তছি, আরেক পাশে বারেক, বারেক ঠিকই থাকবে, তছির পাশটা থাকবে খালি।

কিন্তু মেয়েটা যদি না থাকে তাহলে সারাদিন কার পিছনে লেগে থাকবে মা! কাকে আগলাবে! রাতেরবেলা ঘুম ভেঙে যখন দেখবে তছির পাশটা খালি, বিছানা খালি, অন্ধকার ঘরে সেই শূন্যতা কেমন করে সহ্য করবে সে! বুকটা হু হু করবে না তার!

দুইদিন ধরে এই ভাবনায়, এই উদ্বেগে বেঁচেও যেন মরে আছে তছির মা। কাঁথার তলায় নিঃসাড় হয়ে থাকে তছি আর মা বসে থাকে তার মাথার কাছে। কেউ কোনও কথা বললে সহজে বুঝতে পারে না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মানুষটার মুখের দিকে।

তছির মুখের দিকেও তেমন করেই তাকিয়ে ছিল।

তছির হাতে জংধরা পুরানা একখান কেচি (কাচি)। ঘরের মেঝেতে, যেখানে সে বসে আছে তার পাশে চলটা ওঠা, ভাঙাচোরা একখান টিনের বাটি। বাটিতে একটু পানি। বাটির পাশে ছোট্ট এক টুকরা বাংলা সাবান আর কাগজে প্যাচানো একখান ব্লেডের অর্ধেক। জিনিসগুলি দেখেও যেন কিছুই বুঝতে পারল না তছির মা। যেমন তাকিয়ে ছিল তেমন তাকিয়ে রইল মেয়ের দিকে।

মাত্র দুই তিনদিনে মেয়েটা যেন একেবারেই বদলে গেছে, একেবারেই অন্যরকম হয়ে গেছে। চোখ ঢুকেছে গদে (গর্তে)। চোখের কোলে এমন করে কালি পড়েছে, যেন কোনও শিশু মায়ের কাজলদানি থেকে চুরি করে কাজল দিতে গিয়ে জায়গা মতো লাগাতে পারেনি কাজল, চোখের সামনে লেপটে দিয়েছে। পাগল হলেও অচেনা কেউ তছির মুখ দেখে তাকে পাগল ভাবতে পারবে না। ঢলঢলে, ভরাট সুন্দর মুখ তছির। এই বয়সি গিরস্তঘরের স্বাভাবিক মেয়েদের যেমন হয় তেমন। মাত্র দুইতিন দিনে সেই মুখ ভেঙে গেছে।

পাগলরা পানি ভয় পায়, পানি পছন্দ করে না। তছি করে। শীতকাল নাই খরালিকাল নাই গোসলটা সে নিয়মিত করে। শীতকালে গোসল করে হাত পায়ে না হলেও মুখে এক খাবলা সউষ্যার তেল সে মাখেই। ফলে মুখটা খুব কালচে দেখায়, তবে তেলতেল করে। শুকিয়ে আমসি হয় না মুখ, খড়ি ওঠে না। ঠোঁট দুইখান তাজা থাকে।

সেদিনের পর থেকে গোসল করে না তছি, ঠোঁটে মুখে তেল ছোয়ায় না। ফলে মুখখানা খড়িওঠা, সাদাটে ঠোঁট প্রচণ্ড খরায় শুকিয়ে যাওয়া মাঠের মতো। পাকা আমড়ার আঁশের মতো দাগ পড়েছে ঠোঁটে।

তছির মাথার চুল কাউয়া চিলের বাসার মতন। চুল ভর্তি উকুন। দুই চারদিন পর

পর উকুনের জ্বালায় পাগল হয়ে তছি নিজেই চপচপ করে তেল দেয় মাথায়। তেল দিয়ে চুল ভিজিয়ে, একপাশে সরু দাঁত অন্যপাশে একটু মোটা এমন একখান কালো বেঁটে কাঁকুই দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চুল আঁচড়ায়। কাঁকুইয়ের দাঁতে আটকে পড়া উকুন পিছার শলা দিয়ে খুঁচিয়ে বের করে মারে।

সেদিনের পর থেকে কাজটা তছি আর করেনি। সারাক্ষণই শুয়ে আছে বলে চুল হয়েছে কাউয়ার বাসা। এই যে তছি এখন বসে আছে, হঠাৎ করে তার মাথার দিকে তাকালে মনে হয় এটা কোনও যুবতী মেয়ের মাথা না। এ এক গ্রাম্য অনাথ বালিকার মাথা। চুলা জ্বালবার আশায় মাথায় করে শুকনা কচুরির বোঝা বয়ে নিচ্ছে সে। মাথার চারপাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে কচুরির বিষণ্ন কালো ছোবা।

তছি আবার ফিসফিস করে বলল, কী অইলো! ও মা।

এবার তব্দ (স্তব্ধ) ভাব ভাঙল মায়ের, চোখে পলক পড়ল। একটু নড়ল সে, একটু ব্যস্ত হল। কী কচ?

তছি অস্থির গলায় বলল, কী কইছি হোনো নাই তুমি! আমার চুলডি কাইট্টা দেও। নাইড়া (ন্যাড়া) কইরা দেও আমারে।

একথায় মা একেবারে দিশাহারা হয়ে গেল। হায় হায় কচ কী? নাইড়া অবি ক্যা?

মায়ের গলা একটু চড়ে গিয়েছিল, শুনে ভয় পেল তছি। দুয়ারের দিকে তাকিয়ে হিসহিস করে বলল, আস্তে আস্তে কথা কও। কেঐ হুনবো!

গলা নামাল মা। হুনলে কী অইবো! আমগো বাইত্তে তো অন্যমানুষ নাই!

না থাউক, আইতে কতুক্ষুণ!

তারপর ভাউয়া (কোলা) ব্যাঙের মতো একখান লাফ দিল তছি, লাফ দিয়ে দুয়ারের সামনে গেল। দ্রুত হাতে ঝাপ লাগাল। তোমারে না কইছি ঘরের ঝাপ সব সময় লাগায় রাখবা। খোলা রাখছো ক্যা?

আমি ইট্টু বাইরে গেছিলাম।

বাইরে কম কম যাইবা তুমি। হারাদিন এইঘরে বইয়া থাকবা। আমি কেথা মুড়াদা হুইয়া থাকুম তুমি থাকবা আমার শিথানে বইয়া। ঘরের ঝাপ বন্দ রাখবা য্যান বাইরে থিকা দেইক্কা কেঐ উদিস না পায় এই ঘরে মানুষ আছে। বাইরে গেলেও ঝাপ বন্দ কইরা রাইক্কা যাইবা; বাড়ির বেবাকতেরে কইয়া দিবা দারগা পুলিশে যুদি আমারে বিচড়াইতে আহে কইয়া দিব তছি বাইত্তে নাই। পাগলনি তো, কই জানি গেছে গা! কেঐরে কিছু কইয়া যায় নাই।

তছির কথা শুনে বুক তোলপাড় করে উঠল মায়ের। পাগল মেয়ে, ঝাপ বন্ধ করে কাঁথার তলায় লুকিয়ে থাকলে কী দারোগা পুলিশে তাকে খুঁজে পাবে না! তারা কী এত সোজা জিনিস, বাড়ির মানুষের কাছে শুনবে তছি বাড়িতে নাই আর সেইকথা বিশ্বাস করে ফিরে যাবে! লাথথি মেরে তছির ঘরের ঝাপ খুলবে না তারা! কাঁথা তুলে দেখবে না কে শুয়ে আছে!

একথা তছিকে বলা যাবে না। বললে এতই ভয় পাবে সে, বাড়ি ছেড়ে কোথায় না কোথায় চলে যাবে! হয়তো আর কোনওদিন ফিরেই আসবে না। যুবতী মেয়ে কোথায়

AMARBOI.COM

কার হাতে গিয়ে পড়বে, কে খাবলা (খুবলে) দিয়ে খাবে মেয়েটাকে। এক রুস্তমকে মেরে নিজেকে রক্ষা করেছে সে। দেশে তো রুস্তমের আকাল নাই। কতজনকে মারবে তছি! তারচেয়ে যেভাবে ঘরে লুকিয়ে আছে সেভাবেই থাকুক। আর যাই হোক মায়ের চোখের সামনে তো রইল! দারোগা পুলিশের হাতে ধরা পড়া যদি কপালে থাকে, ধরা সে পড়বেই। ফাঁসি যদি কপালে থাকে, ফাঁসি তার হবেই। কপালের লেখা কে খণ্ডাতে পারে!

আনমনা গলায় মা বলল, দারগা পুলিশের কথা কেঐরে আমি কমু না।

কথাটা যেন বুঝতে পারল না তছি। বলল, ক্যা?

কেঐ তো জানে না বেডারে তুই মাইরা হালাইছস!

তুমি তো জানো! আমি তোমারে বেবাক ঘটনা কইছি না! বড়দাদায়ও তো হুইন্নাইছে!

মা বুঝল এই কথাটা তছি একেবারেই অস্বাভাবিক ভাবে বলছে। কথা বেশিরভাগ সময় সে স্বাভাবিক ভাবেই বলে। স্বাভাবিকভাবে বলতে বলতে নিজের অজান্তেই এক সময় অস্বাভাবিক হয়ে যায়, তছি তা বুঝতে পারে না। ওটাই তার পাগলামি। এখন সেই পাগলামিটা তছি করতে শুরু করেছে। তবে এইসব সময় তছির কথার বিরোধিতা করা মুশকিল। সে যা বলবে তাই মেনে নিতে হবে, সেই মতো কথা বলতে হবে। নয়তো কথার পাগলামি বাদ দিয়ে অন্যরকম পাগলামি শুরু করবে তছি। মা ভাই বুঝবে না, ছেলে বুড়া বুঝবে না, মারামারি লাগিয়ে দেবে।

এখন অবশ্য সেই ভয় নাই। তছি আছে বিরাট ভয়ে। এখন কথার পিঠে বুঝিয়ে কথা বলতে পারলে স্বাভাবিক মানুষের মতন সেই কথার ভালমন্দ বোঝার চেষ্টা করবে।

মা বলল, আবদুল হোনছে খালের মইদ্যে একবেডার লাচ পাওয়া গেছে। বেডারে যে তুই মারছস হেইডা হোনছেনি?

তছি বিজ্ঞের মতো বলল, না, কার কাছে হোনবো! আমি তো বড়দাদারে কই নাই।

কোনওদিন কইচও না। খালি আবদুলরেঐ না, দুইন্নাইর কেঐরেঐ কইচ না। কইলে এককান দুইকান কইরা বেবাকতে জাইন্না যাইবো। পুলিশ দারগায়ও জানবো। জানলে আর রক্ষা নাই।

তছি ভয়ার্ত গলায় বলল, তাইলে আমি যে তোমারে কইয়া হালাইছি!

আমারে কইছস কী অইছে! আমি কী কেঐরে কমুনি?

একহাতে কেচি অন্যহাতে থাবা দিয়ে মায়ের একটা হাত ধরল তছি। কাতর অনুনয়ের গলায় বলল, কইয়ো না মা, কেঐর তুমি কইয়ো না! কইলে কইলাম দারগা পুলিশে আইয়া ধরবো আমারে। জেল অইবো আমার, ফাসি অইবো।

তছির কথা শুনে বুকটা হু হু করে উঠল মায়ের। চোখ ছলছল করে উঠল। কথা বলতে পারল না সে। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চোখের পানি সামলাতে লাগল।

তছি সেসব খেয়াল করল না। বলল, আমিও কেঐরে আর কোনওদিন কমু না। মইরা গেলেও কমু না। কমু কেমতে! ঘর থনেঐত্তো বাইর অমু না! কেঐর লগে তো দেহাই অইবো না আমার! কেথা মুড়া দিয়া, ঘরের ঝাপ বন্দ কইরা হারাদিন হারারাইত

হুইয়া থাকুম। তুমি বইয়া থাকবা আমার শিথানে। দুই একখান কথা কইলে তোমার লগে কমু।

চোখের পানি সামাল দিয়ে মা বলল, হারাদিন কেমতে তর শিথানে বইয়া থাকুম আমি! আমার কাম কাইজ নাই!

থাকলে থাকবো, কাম কাইজ তুমি করতে পারবা না।

তারপর আগের মতন কাতর গলায় বলল, মাগো, তুমি শিথানে বইয়া না থাকলে আমার বহুত ডর করবো। খালি মনে অইবো অহনেঐ পুলিশ দারগায় আইয়া ধইরা লইয়া যাইবো আমারে। অহনেঐ ফাসি দিবো। তুমি শিথানে বইয়া থাকলে তারা আমারে ধরতে পারবো না। ফাসি দিতে পারবো না।

শুনে আবার চোখ ভরে পানি এল মায়ের।

তছি বলল, দিন দোফরে আর কোনওদিনও ঘর থনে বাইর অমুনা আমি। ঘরের ভিতরে থাকুম, কেথার নিচে থাকুম। খাওন দাওন পেশাব পাইখানা নাওন ধোওন বেবাক করুম রাইত্রে, বেবাকতে ঘুমাই যাওনের পর, চুপ্পে চুপ্পে। দিনে দোফরে ঘর থনে বাইর অইলেঐ মাইনষের লগে কথা কইতে ইচ্ছা করবো আমার, বাইত থনে বাইর অইয়া যাইতে ইচ্ছা করবো। কথা কইতে গিয়া কারে আমি এই কথা কইয়া হালামু! বাইত থনে বাইর অইয়া গেলে কোনহানে পুলিশে দারগায় আমারে দেইক্কা হালাইবো! এর লেইগাঐ নাইড়া অইয়া যামু। নাইরা অইয়া গেলে ঘরথনে বাইর অইতে শরম করবো আমার। মাইনষের সামনে যাইতে, মাইনষের লগে কথা কইতে শরম করবো। দেও, চুলডি আগে কেচি দিয়া কাইট্টা দেও মা। গোড়া থিকা কাইট্টা, এই যে সাপান (সাবান) পানি আছে, মাথায় সাপান ঘইষ্যা, ফেনা উডাইয়া এই বেলেড দিয়া ছাইচ্ছা (চেঁছে) দেও।

এবার ব্যাপারটা বুঝল মা, বুঝে হতভম্ব হয়ে গেল। ভয়ে আতংকে ভিতরে ভিতরে পাগলামি বেড়ে গেছে তছির। মাথা নাইড়া করার চিন্তা পাগলামি ছাড়া কিছু না। এই পাগলামি থেকে মেয়েটাকে এখন কেমন করে ফিরাবে সে! এই বয়সী মেয়ে নাইড়া হয়!

তছিকে বুঝ দেওয়ার গলায় মা বলল, ঘর থনে বাইর নাইলে না অইলি, যেমতে যা করতে চাছ কর, নাইড়া অওনের কাম কী! সিয়ানা মাইয়ারা কোনওদিন নাইড়া অয়?

না অয় না। আমি অমু। নাইড়া না অইলে হারাদিন কেথার তলে থাকতে ইচ্ছা করবো না আমার। বাইত থনে বাইর অইয়া যাইতে ইচ্ছা করবো। নেও তাড়াতাড়ি করো।

কেচিটা মায়ের দিকে এগিয়ে দিল তছি।

কিন্তু মা নড়ে না। যেমন বসেছিল, বসে থাকে।

তছি বলল, নাইড়া অওনের আরেকখান দরকারও আছে মা। হেদিনের পর থিকা মাথাডা বহুত গরম অইয়া রইছে। চুলার আগুনে হাড়ির ভাত যেমুন বলকায়, আমার মাথাডা অমুন বলকায়। নাইড়া অইলে বলকানিডা কমবো। উকুনে খাইয়া হালাইলো মাথা, উকুনডিও কমবো। এক কামে ম্যালা কাম অইবো। নেও ধরো কেচিডা।

কেচি তবু ধরল না মা। আগের মতন বুঝ দেওয়া গলায় বলল, মাথায় তেল দিয়া

AMARBOI.COM

দেই মা তাইলে মাথার বলকানি কমবো। কাকই দিয়া এচড়াইয়া দিমুনে, উকুন মাইরা দিমুনে। নাইড়া অওনের কাম নাই।

এবার চট করে রেগে গেল তছি। গদে ঢোকা চোখ ধ্বক করে জ্বলে উঠল। দাঁত মুখ খিঁচে সাপের মতো হিসহিস করে বলল, ঐ মাগি এতো প্যাচাইল পারচ ক্যা! নাইড়া করতে কইছি কর, নাইলে তরেঐ আমি নাইড়া কইরা দিমু। নে ধর কেচি।

জোর করে মায়ের হাতে কেচি ধরিয়ে দিল তছি। মাথা এগিয়ে দিল তার দিকে।

তছির এই রাগারাগিতে না, নিজেকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টায়, বাঁচিয়ে রাখবার আশায় পাগল মেয়ের যে অসহায় চেষ্টা সেই কথা ভেবে পানিতে আবার চোখ ভরে গেল তছির মায়ের। চোখের পানিতে ভাসতে ভাসতে তছির চুলে ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে কেচি চালাতে লাগল সে।

সড়কের মাঝখানে চেয়ার নিয়ে বসেছে আলী আমজাদ। আজ শুক্রবার, মাটিয়ালদের সপ্তাহ দেওয়ার দিন। শেষ বিকালে কাজটা করে সে। যখন দিনের মাটিয়ালদের কাজ শেষ, রাতের মাটিয়ালদের কাজ শুরু।

অন্যান্য দিন বাড়ি যাক না যাক, শুক্রবার দুপুরের দিকে কাজের সাইট ঘুরে, হেকমতের কাছ থেকে মাটিয়ালদের টাকা পয়সার হিসাব বুঝে বাড়িতে চলে যায় আলী আমজাদ। গিয়ে নাওয়া খাওয়া সেরে, হাতে একখান অল্পদামী ব্রিফকেস, বেশ একটা ভাব ধরে বিকালের মুখে ফিরে আসে। খুব বেশি টাকা পয়সা নিজের লগে রাখে না সে। টাকা রাখে বাড়িতে। সপ্তাহে এই একদিন গিয়ে ব্রিফকেস ভরে নিয়ে আসে।

আলী আমজাদের হাতে ব্রিফকেস দেখে খুশিতে ফেটে পড়ে মাটিয়ালরা। তারা জানে ব্রিফকেসে কী! সপ্তাহ পেয়ে কী করবে না করবে, মনে মনে হিসাব করে। ফলে প্রত্যেকেই থাকে কমবেশি আনমনা। এসবের ফাঁকেই, আলী আমজাদ সাইটে আসবার আগেই হেকমতকে বলে আশপাশের বাড়ি থেকে একখান চেয়ার জোগাড় করে রাখে বদর। সাহেব এসে আরাম করে বসবেন চেয়ারে, কোলে ব্রিফকেস নিয়ে টাকা গুনে দেবেন মাটিয়ালদের। সরাসরি নিজ হাতে দিবেন না, পাশে ছাতা হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে হেকমত, মাটিয়ালের মুখ দেখে, তার রোজ মনে করে নিজে একবার গুনে টাকাটা দেবেন হেকমতের হাতে। হেকমত আর একবার গুনে তবে দেবে মাটিয়ালকে। দুইজন মানুষের চোখ হাত ফাঁকি দিয়ে এক টাকা বেশি যাওয়ার পথ নাই কারও হাতে।

সপ্তাহ নেওয়ার সময় য়োড়া হাতে লাইন ধরে দাঁড়ায় মাটিয়ালরা। বদর তাদের লাইন ঠিক করে দেয়। আগপিছ নিয়ে কেউ কোনও ঝামেলা করলে সেইসব মিটায়।

AMARBOI.COM

বেশ একখান মাতাব্বরি ভাব থাকে তার। যেন হেকমতের পরই তার জায়গা, সে কোনও সাধারণ মাটিয়াল না। সাহেব তাকে দিয়ে অন্যান্য কাজ করায় বলে সেও যেন ছোটখাট একজন ম্যানেজার। আর ফুর্তিবাজ মানুষ বদর, শরীরে সারাক্ষণই আমুদে ভাব। ফলে মাটিয়ালরা তাকে পছন্দও করে। সে কোনও ঝামেলা মিটালে, অন্যায় ভাবেও যদি মিটায় কেউ প্রতিবাদ করে না!

সেই বদর কয়েকদিন ধরে একেবারেই অন্যরকম, একেবারেই চুপচাপ। স্বভাব বদলে গেছে তার। দুই তিনদিন ধরে কাজই করে না। কথাও বলে না কারও সঙ্গে। উদাস হয়ে চকে বসে থাকে। সাহেবের জন্য আজ চেয়ার আনতে যায়নি। মাটিয়ালদের লাইন ঠিক রাখার জন্য হামতাম (হম্বিতম্বি) করছে না। মরার মতো সবার শেষে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে য়োড়া, চোখ আসমানের দিকে। একজন করে টাকা নিয়ে বিদায় হচ্ছে, লাইন আগায়, বদর আগায় না।

এই ব্যাপারটা খেয়াল করল আদিলদ্দি। সে ছিল লাইনের মাঝামাঝি। নিজের সপ্তাহ নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার সময় দেখে লাইন অনেকখানি আগিয়েছে তারপর বেশ ফাঁক, ফাঁকের শেষে একা উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বদর। দেখে যা বোঝার বুঝে গেল সে। নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল বদরের পাশে। আস্তে করে ধাক্কা দিল বদরকে। খাড়ই রইলেন ক্যা! যান, আউগগান।

প্রথমে একটু চমকাল বদর, আদিলদ্দির মুখের দিকে তাকাল তারপর পা ফেলল। আদিলদ্দি বুঝে গেল টাকা হাতে না পাওয়া তরি বদরের লগে তার থাকতে হবে। সময় নষ্ট হবে, হোক। চদরি বাড়ির ছাপড়া ঘরে গিয়ে, পুকুরে ডুব দিয়েই রান্না বসাতে বসাতে আজ দেরি হয়ে যাবে, হোক। মনমরা ছেলেটার লগে থাকা দরকার।

আদিলদ্দি রইল।

বদরের লগে আদিলদ্দিকে দেখেই শিয়ালের মতন খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল আলী আমজাদ। ঐ চুতমারানির পো, তুই না টেকা নিলি? আবার লাইনে খাড়াইছস ক্যা?

আদিলদ্দি নরম গলায় বলল, আমি লাইনে খাড়ই নাই সাব। বদরের লগে আছি।

ক্যা? বদইরা কি নতুন মাইট্টাল! বোজে না কিছু, না টেকা পয়সা চিনে না? সর তুই। সর এহেন থিকা।

আদিলদ্দি একপাশে সরে দাঁড়াল।

একপলক বদরের দিকে তাকিয়ে হেকমতের দিকে তাকাল আলী আমজাদ। কোলে রাখা প্রায় শেষ হয়ে আসা টাকার ব্রিফকেস বন্ধ করতে করতে বলল, বদইরা তো কয়দিন ধইরা ঠিকঠাক মতন কাম করে না। বইয়া থাকে, আসমানের মিহি চাইয়া থাকে। আমার আষ্টহান চক্কু, বেবাক দেখি আমি। দেইক্কাও কিছু কই নাই। কমু ক্যা, কেঐর ইচ্ছা অইলে কাম করবো, ইচ্ছা অইলে করবো না। কামে ফাকি দিবো, আমার চক্কে পড়বো তাও আমি কিছু কমু না। খালি টেকাডা দেওনের সময় দেইক্কা লমু।

বদরকে না হেকমতকে আলী আমজাদ বলল, হেকমইত্তা, ক কয়দিন ঠিক মতন কাম করছে বদইরা আর কয়দিন ফাকি দিছে?

হেকমত বলল, এই হাপ্তায় ঠিক মতন কাম করছে তিনদিন। তারপর থিকা ফাকি

AMARBOI.COM

দিছে। কাম করে তো করে না, য়োড়া মাথায় উডায় তো উডায় না, বইয়া থাকে। একলা একলা কথা কয়। যারে সামনে পায় তারেই কয়, কন, আমি বলে চোর!

একথা শুনে ভুরু কুঁচকাল আলী আমজাদ। এক পলক বদরের দিকে তাকাল তারপরই স্বাভাবিক হয়ে গেল। যা ইচ্ছা কউক গা। ঐ হগল হুইন্না আমার লাব নাই। আমারে আসল কথা ক, ঠিক মতন কাম করছে তিনদিন!

হ।

পয়সা পাইবো তিনদিনেরঐ। বাকি চাইর দিনের পয়সা দিমু না।

মনে মনে বদরের রোজ হিসাব করে ব্রিফকেস খুলে টাকা বের করল আলী আমজাদ। হেকমতের হাতে দিল। তারপর ব্রিফকেস বন্ধ করে চেয়ারের ওপর রেখে উঠে দাঁড়াল। কোটের পকেট থেকে প্যাকেট বের করে সিগ্রেট ধরাল। ধরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে টানতে লাগল।

কাতর চোখে বদর তখন তাকিয়ে আছে আলী আমজাদের দিকে। হেকমতের হাতে তার টাকা, সেদিকে খেয়াল নাই। টাকাটা হেকমত তার দিকে বাড়িয়ে দিতেই, টাকা না ধরে, হেকমতের দিকে না তাকিয়ে ভাঙা গলায় আলী আমজাদকে ডাকল। সাহেব।

বদরের দিকে তাকাল না আলী আমজাদ, কথাও বলল না। সিগ্রেটে টান দিয়ে হেকমতকে বলল, কইয়া দে, দাপড়াইয়া মইরা গেলেও আর একটা পয়সা দিমু না আমি।

কথার লগে নাকমুখ দিয়ে ধুমা বের হল। হেকমত সেসব খেয়াল করল না। আলী আমজাদের কথাগুলি বদরকে বলবে, তার আগেই আলী আমজাদকে বদর বলল, আমি সাহেব পয়সা চাই না।

চমকে বদরের মুখের দিকে তাকাল আলী আমজাদ। তয়?

তিনদিনের পয়সা দিছেন হেইডাও আপনে রাইক্কা দেন।

আলী আমজাদ তো হলই, বদরের কথা শুনে হেকমত আর দূরে দাঁড়ান আদিলদ্দিও অবাক হয়ে গেছে। সিগ্রেটে টান দিতে গিয়েছিল আলী আমজাদ, সিগ্রেট ধরা হাত মুখের সামনে উঠে থেমে থাকল, আর হেকমত এবং আদিলদ্দি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বদরের দিকে।

বদর কারও দিকেই তাকাল না। আগের মতোই ভাঙা গলায় বলল, আমি কোনও পয়সা চাই না সাহেব। আমার কোনও পয়সার লোব নাই। তিনদিন কাম করছি না সাতদিন করছি আমি কোনও ইসাব (হিসাব) করুম না। কয়টেকা পামু না পামু ইসাব করুম না। টেকাডি আপনে রাইক্কা দেন। তাও আপনে কন, আমি চোর না। আমি আপনের পয়সা চুরি করি নাই।

কথা বলতে বলতে ভাঙা গলা জড়িয়ে এল বদরের, চোখ ভরে গেল পানিতে। কারও মুখের দিকে আর তাকাল না সে। একহাতে অসহায় ভঙ্গিতে ধরা য়োড়াখান, অন্যহাতে চোখ মুছতে মুছতে পশ্চিম দিককার চকে নেমে গেল। এই চক পাড়ি দিয়ে, ধান আর তিল কাউনের বিল পাড়ি দিয়ে নিজগ্রামে ফিরে যাবে বদর।

তখন শীত বিকালের পদ্মার পানির মতন আলো মুছে দিচ্ছিল দিনশেষের অন্ধকার, কুয়াশা। কুয়াশায় অন্ধকারে আস্তেধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল একজন মানুষ।

AMARBOI.COM

রাত দুপুরে মান্নান মাওলানা শোনেন তাঁর গোয়ালঘরে কী রকম একটা নড়াচড়ার শব্দ! গরুগুলো যেন একটু বেশি নড়ছে, লেজ নেড়ে, কান লতর পতর করে একটু বেশি শব্দ করছে।

কনকনা শীতের রাতে গরুদের আচরণও হয় মানুষের মতে। নড়াচড়া কম করে তারা, শব্দ কম করে। যেখানে দাঁড়ায় তো দাঁড়িয়ে থাকে, বসে তো বসেই থাকে। জাবর কাটে না। নাদে কম, চনায় কম। শীতের হাত থেকে গরুদের বাঁচাবার জন্য গোয়াল ঘরে পুরু করে খড়নাড়া বিছিয়ে দেয় গিরস্তরা। শীত কাতুরে কোনও কোনও গরুর পিঠে মোটা ছালার চট বেঁধে দেয়। এই বাড়িতে এমন শীত কাতুরে গরু নাই একটাও। পিঠে ছালার চট বাঁধবার দরকার হয়নি কোনও গরুর। তবে গোয়ালঘরে খড়নাড়া বিছানো হয়েছে। দুইতিন দিন আগে কাজটা করেছে নতুন গোমস্তা হাফিজদ্দি। শীত আরও পড়েছে বলে গরুরা খুব কষ্ট পাচ্ছিল।

এরকম শীতের রাতে গরুরা কেন আজ নড়াচড়া করছে! ব্যাপারটা কী! মশায় কামড়াচ্ছে! এই শীতে তো মশা থাকবার কথা না! যা আছে সন্ধ্যাবেলা ধুপ দেওয়ার পর এইমুখি হওয়ার কথা না! মাকুন্দা কাশেমের মতো হাফিজদ্দিও তো ধুপ দেওয়া শুরু করেছে! আজ সন্ধ্যায়ও তো দিল! তাহলে?

লেপের তলা থেকে মাথা বের করলেন মান্নান মাওলানা। জোড় বালিশ শিথান দিয়ে শোয়ার অভ্যাস তাঁর। কাত হয়ে শুয়ে ছিলেন বলে এককান চাপা পড়ে আছে আর এককান খোলা। এককানে শোনা শব্দ ঠিক নাও হতে পারে। বালিশ থেকে মাথা উঁচু করে দুইকান খাড়া করলেন তিনি। হঠাৎ করে ঘুম ভেঙেছে বলে প্রথমে একটু দিশাহারা ছিলেন। সেইভাব কাটিয়ে পরিষ্কার শুনতে পেলেন গরুদের নড়াচড়ার শব্দ।

না, মশার কামড়ে এমন নড়াচড়ার কথা না গরুদের। শিয়াল ঢোকেনি তো গোয়ালে! নাকি বাঘদাসা ঢুকেছে!

কচি নরম বাছুড়ের লোভে কখনও কখনও গিরস্তের গোয়ালে হানা দেয় শিয়াল। একলা না, দল বেঁধে। চতুর জীব তো, দল বেঁধে গোয়ালে ঢুকে তাগড়া জোয়ান গাই গরুগুলিকে ত্যক্ত করতে থাকে কয়েকটাতে। কোনওটায় পা কামড় দিয়ে ধরে কোনও গরুর, কোনওটায় লাফ দিয়ে ওঠে পিঠের দিকে। শিং বাগিয়ে তাদেরকে তাড়া করতে ব্যস্ত হয় গরুগুলি আর সেই ফাঁকে তিনচারটা শিয়ালে মিলে বাছুরটাকে কায়দা করে ফেলে। কেউ কামড় দিয়ে ধরে ঢোর, কেউ এই ঠ্যাং ওই ঠ্যাং। তারপর টেনে নিয়ে যায় চকে।

গোয়ালে শিয়াল ঢুকলে বেশ একটা হুড়াহুড়ির শব্দ হয়! গরুদের নাকমুখ দিয়ে বেরয় রাগ ক্রোধের ভোসভোসানি। এখনকার শব্দটা তেমন না। যদি বাঘদাসাও ঢুকে থাকে, রাগ ক্রোধের শব্দ তো গরুরা করবেই। করছে না তো!

বাঘদাসা সাহসী জীব। বাঘের দাস তো, বাঘের মতো না হলেও শিয়ালের মতো না, সাহস শিয়ালদের চেয়ে অনেক বেশি। ক্ষুধার জ্বালায় পাগল হয়ে একাই কখনও কখনও হানা দেয় গিরস্তের গোয়ালে। পাঁচ দশটা গরুর সামনেই হয়তো আক্রমণ করে বসে বাছুরকে। খাবলা দিয়ে মাংস তুলে ফেলে।

তেমন হলে তো বাছুড়টার আর্তনাদে লগে লগে জেগে যাবে বাড়ির লোক। কোনও বাছুর তো তেমন আর্তনাদ করছে না! তাহলে!

তারপরই মান্নান মাওলানার মাথায় এল অন্য চিন্তা। গরুচোর ঢোকেনি তো তাঁর গোয়ালে! রাত দুপুরে গোয়ালে অচেনা মানুষ দেখে নড়াচড়া করছে না তো গরুগুলি!

বিছানায় উঠে বসলেন মান্নান মাওলানা। পাশে শোয়া স্ত্রীকে ধাক্কাতে লাগলেন। তবে শব্দ করে ডাকলেন না তাঁকে।

দুই তিনবার ধাক্কাতেই সাড়া দিলেন স্ত্রী। কী অইছে! এমুন করেন ক্যা?

স্ত্রীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে মান্নান মাওলানা বললেন, চুপ। কথা কইয়ো না। চোর আইছে।

চোর আসছে শুনে ভয়ে প্রায় আর্তনাদ করে উঠতে গিয়েছিলেন স্ত্রী, মান্নান মাওলানা তাঁর মুখ চেপে ধরলেন। কইলাম যে চুপ! হোনো, গরুচোর। গোয়াইল ঘরে হানছে। গরু চোররা কইলাম এক দুইজনের বেশি আহে না। ইচ্ছা করলেই ধরন যায়। আমি আইজ ধরুম। ওডো তুমি। উইট্টা আমার লগে বাইর অও। আমি একহাতে শরকি লমু আরেক হাতে টচ (টর্চ) লাইট। তুমি এমুন কইরা দুয়ার খোলবা য্যান আওজ না অয়। আমি তারবাদে গোয়াইলের সামনে গিয়াঐ, টচ মাইরাঐ শরকি দিয়া একজনরে গাইত্তা (গেঁথে) হালামু। আর তুমি আর্তাহারেরে ডাক দিবা, হাফিজদ্দিরে ডাক দিবা।

বাড়িতে চোর আসার পর, চোর কোনও ঘরে থাকার পরও যে এত ঠাণ্ডা মাথায় চোর ধরার ফন্দি করতে পারে তাঁর স্বামী, এত এত বছর ধরে মানুষটার লগে সংসার করার পরও, মানুষটার হাজার রকমের কায়কারবার দেখবার পরও মান্নান মাওলানার স্ত্রীর তা বিশ্বাস হচ্ছিল না। কী রকম একটা ঘোর লেগে গেল তাঁর। স্বামীর কথা মতন নিঃশব্দে বিছানা থেকে নামল সে।

ততক্ষণে শক্ত করে লুঙ্গি কাছা মেরেছেন মান্নান মাওলানা, বালিশের তলা থেকে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ বের করে হাতে নিয়েছেন আর মাথার কাছে, ঢেউটিনের বেড়ার এককোণে দাঁড় করিয়ে রাখা শরকি নিয়েছেন। তাঁর কথা মতো সাবধানে দুয়ার খুলেছেন স্ত্রী, মান্নান মাওলানা ঘর থেকে বেরুলেন।

বাইরে আজ প্রচণ্ড শীত, হাড্ডিগুড্ডির (হাড়গোড়ের) ভিতর পর্যন্ত কাঁপন ধরে যায় এমন। মান্নান মাওলানার গায়ে হাফহাতা গেঞ্জি। এমনিতে শীত কাতুরে লোক তবু কিছুমাত্র শীত টের পেলেন না। বরং শরীর তাঁর ফেটে পড়ছিল গরমে। শরকি বাগিয়ে সাবধানী পায়ে গোয়ালঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আচমকা টর্চ জ্বেলেই চিৎকার করে উঠলেন, খবরদার! দৌড় দিলেঐ শরকি দিয়া গাইত্তা হালামু।

টর্চের আলোয় গোয়ালঘরের মাঝখানটা আলোকিত হয়েছে। সেই আলোয় দেখা

AMARBOI.COM

গেল মাকুন্দা কাশেম বসে আছে দুইতিনটা গাই গরুর মাঝখানে। গায়ে নতুন লুঙ্গি পিরন আর তুস রঙের নতুন চাদর। বুকের কাছে দুইহাতে জড়িয়ে রেখেছে গোয়ালের সবচেয়ে ছোট বাছুরটা। টর্চের আলো পড়ায় বাছুরটা আর সে একই রকমের হতবাক চোখে তাকিয়ে আছে মান্নান মাওলানার দিকে।

পরিষ্কার দেখেও যেন মাকুন্দা কাশেমকে চিনতে পারলেন না মান্নান মাওলানা। শরকি আগের মতোই বাগিয়ে রেখে বললেন, খবরদার! সাবধান! লড়লেঐ শরকি দিয়া পাড় দিমু।

মান্নান মাওলানার কথা মতন ততক্ষণে তাঁর নিজের কাজ করে ফেলেছেন স্ত্রী। আতাহার ও হাফিজদ্দিকে ডেকে তুলেছেন। বাংলাঘর থেকে কাছা মেরে বেরিয়ে এসেছে তাগড়া জোয়ান আতাহার আর হাফিজদ্দি। আতাহারের হাতে লোহা কাঠের ডাণ্ডা। এই ডাণ্ডা মাথার কাছে নিয়ে শোয় সে। হাফিজদ্দির হাতে ছিল বাঁশের লাঠি। গোয়ালঘরের সামনে এসে বিশাল একখান হাঁক দিল সে। কে কোনহানে আছেন, আউগগান। চোর ধরছি।

হাফিজদ্দির লগে গলা মিলিয়ে চিৎকার দিতে গিয়েছিল আতাহার তার আগেই মান্নান মাওলানা বললেন, আগে ধর তারবাদে চিক্কইর দে।

ততক্ষণে মাকুন্দা কশেমকে চিনে ফেলেছে আতাহার। চিনে বেকুব হয়ে গেছে। চোর ধরার উত্তেজনা নাই হয়ে গেছে তার। মান্নান মাওলানার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ও বাবা, কো চোর? এইডা তো মাকুন্দা!

আতাহারের মতো মাকুন্দা কাশেমকে তিনিও চিনেছিলেন। তবু ছেলেকে একখান ধমক দিলেন। মাকুন্দা অইছে কী অইছে! ও কি অহন আর আমগো বাড়ির গোমস্তা? ও চোর অইতে পারে না! ও তো আমার গরু চুরি করতেঐ আইছে। দেহচ না বাছুরডারে কেমতে প্যাচাইয়া ধরছে। ধর শুয়োরের পোরে, বান, পিডা।

এবার যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারল আতাহার, বুঝে লাফ দিয়ে গোয়ালে ঢুকল। একহাতে খামচে ধরল মাকুন্দা কাশেমের গলার কাছের পিরন চাদর, শূন্যি (শূন্য) করে তাকে নিয়ে এল গোয়ালের বাইরে। আতাহারের আচরণে কাশেমের চেয়েও যেন বেশি ভয় পেল বাছুরটা, ছটফট করে মায়ের পেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল তাদের প্রিয় মানুষটাকে নিয়ে অন্য কয়েকটা মানুষের কায়কারবার।

মান্নান মাওলানা আতাহার আর হাফিজদ্দির চিল্লাচিল্লিতে বাড়ির প্রতিটা ঘরে মানুষ জেগে উঠেছে, জ্বলে উঠেছে কুপিবাতি। দুয়ার জানালা খুলে বাইরে তাকিয়েছে বাড়ির বউঝিরা, পোলাপানরা। শীতে কাঁপতে কাঁপতে কেউ কেউ এসে দাঁড়িয়েছে উঠানে। মান্নান মাওলানা কাউকে খেয়াল করলেন না, কারও দিকে তাকালেন না, আতাহারকে বললেন, বান শুয়োরের পোরে।

গোয়াল ঘরের বাইরের দিককার একটা খুঁটির লগে কাশেমের চাদর দিয়েই কাশেমকে শক্ত করে প্যাঁচিয়ে বাঁধতে লাগল আতাহার। ততক্ষণে যেন হতবাক ভাব কেটেছে মাকুন্দা কাশেমের। ব্যাপারটা যেন বুঝতে পেরেছে সে। বুঝতে পেরে দিশাহারা গলায় বলল, আমারে বান্দেন ক্যা? আমি তো চোর না! চুরি করতে আহি নাই।

মান্নান মাওলানা এগিয়ে গিয়ে ধাম করে একটা লাথথি মারলেন মাকুন্দা কাশেমের পেট বরাবর। চুরি করতে না আইলে রাইত দোফরে আমার বাইত্তে আইছস ক্যা! তুই এই বাড়ির কে? গোয়াইলে আইয়া হানছচ ক্যা? বাছুরডারে এমতে প্যাচাইয়া ধরছিলি

AMARBOI.COM

ক্যা? বাছুরডারে কুলে লইয়া তো উইট্টা খাড়ইছিলি! শরকি হাতে আমি সামনে আইয়া না খাড়ইলে, টচ না মারলে তো এতুক্ষুণে বাছুরডা লইয়া পলাইতি। শরকি দিয়া পাড় দিমু দেইক্কা লড়তে পারচ নাই। বইয়া পড়ছস।

যে রকম একখান লাথথি খেয়েছে তাতে কেঁদে ফেলবার কথা কাশেমের। কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, এই অবস্থায় কান্না আসে না মানুষের। এই অবস্থায় অস্থির লাগে, সাঁতার না জানা মানুষের মতন পানিতে ডুবে যাওয়ার সময় যেমন লাগে তেমন লাগে। কাশেমেরও লাগছিল। অসহায় চোখে মান্নান মাওলানার মুখের দিকে তাকাল সে। আতাহার আর আতাহারের মায়ের মুখের দিকে তাকাল। কাতর গলায় বলল, না না। বাছুর কুলে লইয়া খাড়ই নাই আমি। বাছুরডারে বুকে প্যাচাই ধইরা, এই চাইদ্দর দিয়া প্যাচাইয়া বইয়া রইছিলাম। আইজ বহুত শীত পড়ছে। শীতে বহুত কষ্ট পাইতাছিল বাছুরডা। আমি চোর না। চুরি করতে আহি নাই। গরুডির লেইগা মায়া লাগে দেইক্কা আইছি। দিনে আপনে আইতে দেন না দেইক্কা রাইত্রে আহি। রোজ রাইত্রে আইয়া গরুডির লগে থাকি। আমি চোর অমু ক্যা! আমি তো কনটেকদার সাবের মাইট্টাল অইছি। ভাল টেকা রুজি করি। এই যে দেহেন না নতুন লুঙ্গি পিরন কিনছি, চাইদ্দর কিনছি।

এক ফাঁকে শরকিটা গোয়াল ঘরের একপাশে দাঁড় করিয়েছে মান্নান মাওলানা, হাতের টর্চ দিয়েছেন স্ত্রীর হাতে। দুই হাতই মুক্ত এখন। আর টর্চ এখন জ্বালবারও দরকার নাই। ঘর থেকে আসা কুপিবাতির আলোয় আলোকিত হয়ে গেছে বাড়ি। সেই আলোয় গোয়ালঘরের খুঁটির লগে বাঁধা মাকুন্দা কাশেমকেও গরুর মতোই অবলা দেখায়। যেন সে কোনও মানুষ না, যেন সেও গরু, গিরস্তের গোয়ালে বাঁধা।

কিন্তু কাশেমের কথা বিন্দুমাত্র পাত্তা দিলেন না মান্নান মাওলানা। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতন গো গো করতে লাগলেন। দুইহাতে অবিরাম চড়থাবড় কিল ঘুষি মারতে লাগলেন কাশেমকে। লাথথি কন্নি মারতে লাগলেন। চোর না, তুমি চোর না শুয়োরের পো! তুমি সাদু! রাইত দোফরে গোয়াইল ঘরে হানছো গরুডির লেইগা মায়া লাগে দেইক্কা! আমারে ভোদাই (বোকা) পাইছো! যা বুজাইবা তাই বুজুম আমি! আরে চুতমারানির পো, তরে তো আমি চিনি! চুন্নির জানাজায় গেছস দেইক্কা তরে আমি বাইত থিকা খেদাই দিছি। বাইত্তে আর আইতে দেই নাই। তুই আইছস হেই শোদ লইতে। আমার বাছুর চুরি কইরা শোদ লবি তুই। বাছুরডা হাজার টেকার কম দাম অইবো না। চুরি করতে পারলে বড়লোক অইয়া যাইতি তুই। মাইট্টালগিরি করন লাগতো না। বুজি, বেবাক বুজি আমি। তয় আমার বাড়ির জিনিস চুরি করন এত সোজা না। দোয়া পইড়া বাড়ি বাইন্দা থুইছি আমি। চোর আইলে ধরা পড়বোঐ। আল্লার কুদরত। তুইও পড়ছস।

ততক্ষণে কাশেম আর কাশেম নাই, চেহারা বদলে গেছে তার। নাক ফেটে দরদর করে রক্ত পড়ছে, ঠোঁট কেটে ঝুলে পড়েছে। দাঁতের গোড়ায় গোড়ায় রক্ত। বুঝি জিবলাও কেটেছে। মুখের এদিক ওদিক শালুকের মতো ফুলে উঠেছে। কাশেমের মুখ আর মানুষের মুখ মনে হচ্ছে না।

তবু কাঁদল না কাশেম। জড়ানো কাতর গলায়, দুইহাত মোনাজাতের ভঙ্গিতে তুলে মান্নান মাওলানাকে বলল, বিশ্বাস করেন হুজুর, আমারে আপনে বিশ্বাস করেন। আমি মিছাকথা কই নাই। আমি চুরি করতে আহি নাই। গরুডিরে না দেইক্কা থাকতে পারি

না, মায়া লাগে দেইক্কা আহি। চুরি করলে তো আগেঐ করতাম! মায়া না লাগলে এই রকম শীতের রাইত্রে কেঐ আইয়া গোয়াইলে হানদে! আপনের বাইত্তে নাইলে থাকতে না দেন অন্য বাইত্তে তো থাকতে পারতাম!

এবার মান্নান মাওলানা আর কথা বলবার সুযোগ পেলেন না। কথা বলল আতাহার। ভেক ধরছো হালার পো, যা বুজাইবা তাঐ বুজুম আমরা! যত মায়াঐ লাগুক রাইত্রে আইয়া মাইনষে কোনও দিন গরুর লগে থাকে!

মাকুন্দা কাশেম আবার কী বলতে চাইল, তার আগেই আতাহারের দিকে তাকিয়ে মান্নান মাওলানা বললেন, এত প্যাচাইল পারতাছস ক্যা তুই? পিডাচ না ক্যা! গিড়ায় গিড়ায় পিডা, নল্লি ভাইঙ্গা দে। জিন্দেগীতে যেন উইট্টা খাড়ইতে না পারে। পিডা।

কাশেম এবার মান্নান মাওলানার স্ত্রীর দিকে তাকাল। আম্মা, আম্মা আপনে হুজুররে বুজান। আপনে আতাহার দাদারে বুজান। ছোডকাল থিকা আপনেগো বাইত্তে থাকি। আপনে তো আমারে চিনেন! আপনে তো জানেন আমি চোর না! আমি মিছাকথা কই না। আপনে তাগো বুজান।

কাশেমের কথা শেষ হওয়ার আগেই, স্ত্রীকে কোনও কথার বলবার সুযোগ না দিয়েই আতাহারের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন মান্নান মাওলানা। কী কই তরে! পিডাচ না ক্যা! পিডাইয়া লুলা কইরা হালা। বিয়ান অউক, দারগা পুলিশ দিয়া ধরাই দিমুনে।

এইবার দুইহাতে লোহা কাঠের ডাণ্ডাটা তুলল আতাহার। কোনওদিকে না তাকিয়ে প্রচণ্ড জোরে কাশেমের ডানহাটু বরাবর একটা বাড়ি দিল। পলকের জন্য আঘাতটা যেন বুঝতে পারল না কাশেম। তারপরই চিৎকার দিয়া উঠল। আল্লারে!

আতাহার তা গ্রাহ্য করল না। আবার বাড়ি মারল। আবার, আবার।

মাকুন্দা কাশেমের বুকফাঁটা আর্তনাদে তখন স্তব্ধ হয়েছিল জেগে ওঠা মানুষ, ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছিল শীতরাত্রির নিস্তব্ধতা। মাকুন্দা কাশেমের আর্তনাদে তখন কাঁদতে ভুলে গিয়েছিল আচমকা ঘুমভাঙা শিশু, রুদ্ধ হয়েছিল উত্তরের হাওয়া। মাকুন্দা কাশেমের আর্তনাদে তখন চৌচির হচ্ছিল সাত আসমান, কেঁপে কেঁপে উঠছিল আল্লাহতালার আরশ।

খালি ভার ঘরের ছনছায় নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল দবির। অসহায় ভঙ্গিতে পিড়ায় বসে মন খারাপ করা গলায় বলল, একখান খারাপ সমবাত আছে।

উঠানের কোণে জলচৌকিতে বসে রোদ পোহাচ্ছে নূরজাহান। বেলা হয়েছে তবু শীত কমেনি। গায়ে চাদরের মতো জড়িয়ে রেখেছে আকাশি রঙের পাতলা কাঁথা।

বাড়ির পুবদিককার নামায় যে কদু উসসির ঝাকা সেই ঝাকার ঝকমকে রোদে টুকটুক করে লাফাচ্ছে একজোরা ভাত শালিক। আনমনা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে শালিক দেখছিল নূরজাহান। কথা শুনে দবিরের মুখের দিকে তাকাল। অলস গলায় বলল, কী?

কাইশ্যা ধরা পড়ছে।

কথাটা শুনে চমকাল নূরজাহান। থতমত খেল। অলস আনমনা ভাব কেটে গেল। এই নামের মানুষটাকে জন্মের পর থেকে চিনার পরও যেন এখন আর চিনতে পারল না। বলল, কোন কাইশ্যা?

মাকুন্দা।

এবার যেন চিনল নূরজাহান। আকুল গলায় বলল, কই ধরা পড়ছে?

মাওলানা সাবের বাইত্তে গরু চুরি করতে গেছিলো।

মাজায় লাঠির বাড়ি খেয়ে যেমন করে লাফিয়ে ওঠে নিরীহ আরজিনা ঠিক তেমন করে লাফিয়ে উঠল নূরজাহান। গা থেকে গাছের পাতার মতো খসে পড়ল কাঁথা। নূরজাহান ভ্রূক্ষেপ করল না। চারপাশের ডালিমরাঙা রোদ ম্লান করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, না না না, না। কাশেম কাকায় চুরি করতে যায় নাই। ক্যান গেছে আমি জানি। কাকায় আমারে বেবাক কথা কইছে।

তারপর গরুদের লগে কাশেমের রাতযাপনের ঘটনা অস্থির গলায় দবিরকে বলল নূরজাহান। হামিদা ছিল রান্নাচালায়, কখন এসে দাঁড়িয়েছে নূরজাহান আর দবিরের সামনে ওরা তা খেয়াল করল না।

মেয়ের কথা শুনে দবির তখন বোবা হয়ে গেছে। নূরজাহানের মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, কচ কী তুই! আ, কচ কী! কাইশ্যা তো তাইলে নির্দোষ! কাইশ্যা তো তাইলে চোর না!

হ, হ। একদোম নির্দোষ। হেয় চোর না। মাওলানা সাবে ইচ্ছা কইরা তারে ধরছে।

দবির করুণ গলায় বলল, খালি ধরলে তো ভালঐ আছিলো, বাপেপুতে মিলা যেই মাইরডা দিছে!

এই হগল মাওলানা সাবের চালাকি। বদমাশি। ছনুফুবুর জানাজা পড়তে আইছিলো দেইক্কা কাশেম কাকার উপরে হেয় চেইত্তা আছিলো। বহুত রাগ অইয়া আছিলো কাশেম কাকার উপরে। মাইরা ধইরা বাইত থিকা খেদাই দিয়াও রাগ মিডে নাই। আইজ গরুচোর বানাইয়া, পিডাইয়া আড্ডিগুড্ডি ভাইঙ্গা হেই রাগ মিডাইতাছে।

এতক্ষণ নূরজাহানের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল হামিদা। মেয়ের কথা শেষ হতেই স্বামীর দিকে তাকিয়ে চিন্তিত গলায় বলল, মাকুন্দা অহন কো?

রান্নাচালার পিছন দিককার বাঁশঝাড়ের মাথার ওপর দিয়ে রোদে ভেসে যাওয়া আসমানের দিকে তাকাল দবির। দারগা পুলিশে ধইরা লইয়া যাইতাছে। মাইরের চোডে হাত পায়ের গিড়া (গাঁট) ভাইঙ্গা গেছে। হাঁটতে পারে না কাইশ্যা। আতুড় লুলা মাইনষের লাহান হেউচড়াইয়া হেউচড়াইয়া যাইতাছে। তার মইদ্যেও মাজায় দড়ি বানছে পুলিশে। য্যান দড়ি না বানলে দৌড় দিয়া পলাই যাইবো কাইশ্যা। আহা রে, কাইশ্যার কি আর দৌড় দেওনের জোরবল আছে! জিন্দেগিডা ছেমড়ার বিনাশ কইরা দিছে মাওলানা সাবে। টুন্ডা (অথর্ব) কইরা দিছে।

AMARBOI.COM

এবার হঠাৎ একটা দৌড় দিল নূরজাহান। ছনুবুড়ির মৃত্যুর কথা শুনে যেমন দৌড় দিয়েছিল ঠিক তেমন করে দৌড়ে চকে নেমে গেল। পিছন থেকে চিৎকার করে হামিদা তাকে ডাকল। নূরজাহান শুনল না, নূরজাহান ফিরে তাকাল না।

দবির বলল, যাউক, ডাইক্কো না। কাইশ্যারে শেষ দেহা দেইক্কাহুক।

মুখ ঘুরিয়ে স্বামীর দিকে তাকাল হামিদা। এইডা কেমুন কথা কইলা! শেষ দেহা দেখবো ক্যা? মাকুন্দা কি মইরা গেছেনি! জেলে গেলে মানুষ মইরা যায় না, ফিরা আহে।

দবির আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কাইশ্যা আইবো না। কেমতে আইবো কও! মানুষ জেলে গেলে চেষ্টা তদবির কইরা, টেকা পয়সা খরচা কইরা তারে ছাড়াইয়া আনতে অয়। কাইশ্যার লেইগা চেষ্টা করবো কে! টেকা পয়সা খরচা করবো কে! আছে কেডা অর!

হামিদা কথা বলল না। চিন্তিত চোখে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাঁশঝাড়ের মাথায় রোদ ঝলমল নীল আসমান। সেই আসমানের দিকে তাকিয়ে উদাস গলায় দবির বলল, কাইশ্যা আর কোনওদিন ফিরত আইবো না। কাইশ্যার লগে আমগো আর কোনওদিনও দেহা অইবো না। দিনে দিনে দিন যাইবো। পয়লা পয়লা দুই চাইরদিন কাইশ্যার প্যাচাইল পাড়বো দেশ গেরামের মাইনষে। তারবাদে ভুইল্লা যাইবো। কে কারে কয়দিন মনে রাখে, কও! ছনুবুজির কথা কেডা মনে রাখছে! কাইশ্যার কথাও কেঐ মনে রাখবো না। এই গেরামে যে কাশেম নামে একজন মানুষ আছিলো, মাইনষে যে তারে কইতো মাকুন্দা কাশেম, এই কথা কেঐ মনে রাখবো না। কোনও কিছুই বেশিদিন মনে রাখে না মাইনষে। মা বাপ মইরা গেলে দুই চাইরদিন বাদে ভুইল্লা যায়, কইলজার টুকরার লাহান পোলাপান মইরা গেলে ভুইল্লা যায়। জামাই মইরা গেলে বউয়ে ভুইল্লা যায় তার কথা। বউ মইরা গেলে তার কথা ভুইল্লা জামাই আবার বিয়া করে। কেঐ কাঐরে মনে রাখে না। মানুষ এই রকমঐ।

হাঁটতে না পারা আতুর লুলা মানুষ যেমন করে পথ চলে, সড়কের মাটিতে তেমন করে ছেছড়ে ছেছড়ে আগাচ্ছে মাকুন্দা কাশেম। তার মুখ আর মানুষের মুখ নাই, শরীর আর মানুষের শরীর নাই। মাথার কত জায়গায় ফেটেছে, কত জায়গা ফেটে যে রক্ত বের হয়েছে কে জানে! গোসল করবার পরও কোন কোনও সৌখিন গিরস্ত যেমন করে তেল দেয় মাথায়, মাথার চুলে সর্বক্ষণ যেমন থাকে তাদের ভিজা ভিজা ভাব, মাকুন্দা কাশেমের মাথা তেমন করে ভিজে আছে রক্তে। কোথাও কোথাও রক্ত শুকিয়ে জট বেঁধেছে চুল। ডানদিককার জুলপির পাশ দিয়ে কখন নেমেছিল কাইয়া লউঙের (কড়ে

আঙুল) মতন মোটা একখান রক্তের ধারা, কখন শুকিয়ে কালো চটচটে হয়েছে সেই রক্ত, কাশেম নিজেও তা জানে না। কপালের তিনচার জায়গা গাবের মুচির মতন ফুলে আছে। বাইল্লামাছের মতন সাদা গাল থুতনি কালচে, থেতলানো। ছাল চামড়া উঠে থকথক করছে সারামুখ। দুইচোখের কোলও গাল থুতনির মতনই। থেতলে ফুলে চোখ দুইটা প্রায় ঢেকে দিয়েছে। বাঁ দিককার কান ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে। নাকের ডগা ভেঙে মিশে গেছে ওপরের ঠোঁটের লগে। নিচের ঠোঁট কে যেন গরুর খুরে থেতলে যাওয়া টুকটুকি (টিকটিকি)। মুখের ভিতর, সামনের মারির একটা দাঁতটাও নাই। কদুবিচির মতন কখন খসে পড়েছে সব। জিভখান হয়েছে ফালা ফালা। কদিন আগে কিনা নতুন পিরন লুঙ্গি ছিঁড়ে ফেঁসে একাকার। পিরনের বুকের কাছে একটাও বুতাম নাই। একটা হাতা কোথায় উড়ে গেছে। লুঙ্গি আর লুঙ্গি নাই। ত্যানার টুকরার মতন ঝুলে আছে মাজায়। তবে লুঙ্গির গিঁট শক্ত করে দেওয়া। এত মারের পরও গিঁটটা কেন যে খোলেনি!

লুঙ্গি পিরনের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কাশেমের শরীর, কালসিটে, রক্তাক্ত, থকথকে। লাঠির বাড়িতে গুড়া হয়েছে দুইহাতের কনই, দুইপায়ের হাঁটু গুড়গুড়া। হাত পায়ের চার পাঁচখান চারি উধাও হয়ে গেছে।

এমন মারও মানুষ মানুষকে মারে! এত মার খেয়েও বেঁচে থাকে মানুষ! কেমন করে বেঁচে আছে মাকুন্দা কাশেম!

কাশেমের দুইপাশে দুইজন পুলিশ। মাজায় পেঁচিয়ে যে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে তাকে সেই দড়ির মাথা ধরে রেখেছে একজন পুলিশ। বিরক্তিতে মুখ ছেঁয়ে আছে পুলিশটির। তাদের লগে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না বলে কাশেমের ওপর বেদম রেগেছে সে। প্রায়ই বুট পরা পা তুলে লাথথি মারছে। যা তা ভাষায় গালিগালাজ করছে। এই সব তুচ্ছ গালিগালাজ আর সামান্য মার এখন গায়ে লাগছে না কাশেমের। সে তার মতো আগাচ্ছে।

AMARBOI.COM

পুলিশ দারোগার ভয়ে কাশেমের সামনে কোনও লোক নাই, পিছনে ভেঙে পড়েছে সারা গ্রামের লোক। মান্নান মাওলানা আছেন কাশেমের একবারে পিঠের কাছে, ঘাড়ের ওপর। যেন ঘাড় পিঠ ঠেলে ঠেলে তিনিই মাকুন্দা কাশেমকে বের করে দিচ্ছেন গ্রাম থেকে।

মান্নান মাওলানার পাশে আছে আরেকজন পুলিশ। বোধহয় অন্য দুইজনের তুলনায় সে একটু বড়। দারোগা। হাসিমুখে তোয়াজের স্বরে তার লগে কথা বলছেন মান্নান মাওলানা। দারোগা সাহেব ফুক ফুক করে সিগ্রেট টানছেন আর মান্নান মাওলানার কথা শুনে মাথা দোলাচ্ছেন।

নূরজাহান এসবের কিছুই দেখল না, কিছুই খেয়াল করল না। পাগলের মতন ছুটতে ছুটতে কাশেমের একেবারের সামনে এসে দাঁড়াল। দারোগা পুলিশের ভয়ে যে কাশেমের আগে আগে কেউ হাঁটছে না, সবাই হাঁটছে পিছন পিছন, নূরজাহান তাও খেয়াল করল না। সব জেনেও, সব বুঝেও আকুল গলায় বলল, কী অইছে কাশেম কাকা? কী অইছে আপনের?

নূরজাহানকে এভাবে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে নিজেদের অজান্তেই যেন দাঁড়িয়ে

গেছে সবাই। কাশেমও থেমেছে, থেমে অচেনা মুখ তুলে নূরজাহানের দিকে তাকিয়েছে। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে নূরজাহান আবার বলল, কী অইছে?

অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছিল না মাকুন্দা কাশেম। ধরা পড়ার পর থেকে, মার শুরু হওয়ার পর থেকে কাঁদতে কাঁদতে কখন যে চোখের পানি শেষ করে ফেলেছে উদিস পায়নি। এখন নূরজাহানের কথা শুনে কোথা থেকে, কেমন করে যেন পানি এল চোখে। চোখের কোণ ভরে গেল। ভাঙাচোরা কাতর গলায় কাশেম বলল, আতাহার দাদারে কইলাম, গেরামের বেবাক মাইনষেরে কইলাম, কেঐ বিশ্বাস করলো না মা, কেঐ আমার কথা বিশ্বাস করলো না। কত পায় হাতে ধরলাম, কত কানলাম, কেঐ বিশ্বাস করলো না।

কাশেম শব্দ করে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, এই গেরাম ছাইড়া আমি কোনওদিন যাইতে চাই নাই। এই গেরোমে আমার কেঐ নাই, খালি গেরামডা আছিলো আমার। গেরামের গাছগাছলা, বাড়িঘর, ক্ষেতখোলা, তোমগো লাহান কয়েকজন মানুষ আর ঐ গরুডি, এই হগল লইয়া এই গেরামে জীবনভর পইড়া থাকতে চাইছি আমি। অইলো না, এই গেরামে, তোমগো কাছে থাকন আমার অইলো না। গরুডির কাছে থাকন অইলো না। আইজ এই গেরাম ছাইড়া আমার যাইতে অইতাছে। তাও চোর অইয়া। মা, মাগো আমি কোনও দোষ করি নাই মা। কেঐর লগে কোনওদিন খারাপ ব্যভার করি নাই, গাইল দেই নাই কেঐরে, মিছাকথা কই নাই। তাও আমার কপালডা এমুন অইলো!

গভীর কষ্টের কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এল কাশেমের গলা। মাথা নিচু করে চোখের পানি সামলাতে লাগল সে। ভেঙে ঝুলে পড়া ডানহাত অতিকষ্টে তুলে চোখ মুছতে চাইল। পারল না। তার আগেই দড়ি ধরা পুলিশকে মান্নান মাওলানা বললেন, যান আউগগান। কী হোনেন অর কথা! চোরে তো কত কথাই কয়!

মাকুন্দা কাশেমের কথা শুনে বুক তোলপাড় করছিল নূরজাহানের। চোখ ভরে আসছিল পানিতে। মান্নান মাওলানার কথা শুনে সেই ভাব কেটে গেল। বুকের ভিতর ফুঁসে উঠল তীব্র ঘৃণা। ইচ্ছা হল একহাতে মুঠ করে ধরে মান্নান মাওলানার দাঁড়ি, অন্যহাতে সর্বশক্তি দিয়ে একটার পর একটা থাবড় মারে তার দুইগালে। মেরে গাল মুখ ফাটিয়ে ফেলে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে, তুই তো মানুষ না। তুই অইলি শুয়োরের বাচ্চা। তুই অইলি কুত্তার বাচ্চা।

নূরজাহান তা করল না। ফণা তোলা জাতসাপের মতো একদৃষ্টে খানিক তাকিয়ে রইল মান্নান মাওলানার মুখের দিকে, তারপর কোনও কিছু না ভেবে মাকুন্দা কাশেমের মাথার উপর দিয়ে থু করে একদলা থুতু ছিটিয়ে দিল মান্নান মাওলানার মুখ বরাবর। থুতু গিয়ে লাগল মান্নান মাওলানার দুই ঠোঁটের ঠিক মাঝখানে। এমন আচমকা ঘটল ঘটনা, মান্নান মাওলানা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন নূরজাহানের মুখের দিকে।

মাকুন্দা কাশেমের পিছনে দাঁড়ানো শয়ে শয়ে লোকও তখন মাওলানা সাহেবের মতন স্তব্ধ হয়ে আছে। স্তব্ধ হয়েছে দারোগা পুলিশরা, স্তব্ধ হয়েছে বেদম মার খাওয়া

AMARBOI.COM

মাকুন্দা কাশেম। চোখে পলক ফেলতে ভুলে গেছে সবলোক, নড়তে ভুলে গেছে, শ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে। যেন সাত আসমান ভেঙে মাথায় পড়ছে তাদের, যেন আশ্চর্য এক জাদুমন্ত্রে মাটির মতো মৌন হয়েছে তারা।

তখন প্রকৃতি ছিল প্রকৃতির মতন উদাস, নির্বিকার। শীতের বেলা তেজাল হচ্ছিল। তীক্ষ্ণরোদ উষ্ণ করে তুলছিল দেশ গ্রাম। স্বচ্ছ আকাশ ছুঁয়ে দূর নদীচরের দিকে উড়ে যাচ্ছিল ভিনদেশী পাখি। পথপাশের হিজল ছায়ায় বসে একাকী ডাকছিল এক ডাহুকী। আর বহুদূরের কোন অচিনলোক থেকে আসা উত্তরের হাওয়া বইছিল হু হু করে।

AMARBOI.COM

প্রথম পর্ব সমাপ্ত